বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

জামালপুর

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

জামালপুর

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

নির্বাহী সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

আহমদ আজিজ

সংগ্রাহক

মো. ইনামুল হক

রজব বকশী

মো. ইসমাইল হোসেন সাদী

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
জামালপুর

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪২০/ ডিসেম্বর ২০১৩

বাএ ৫১৫৯

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত নব্বই টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : JAMALPUR (Present state of Folklore in Jamalpur District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Executive Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : December 2013. Price : Tk. 390.00 only. US$: 10.00

ISBN-984-07-5178-6

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন

www.pathagar.com

স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থপাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   - ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   - খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

www.pathagar.com

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active

www.pathagar.com

tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক

www.pathagar.com

ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারীপুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন

www.pathagar.com

(বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই ।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা) ।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা) ।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি.), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি,

www.pathagar.com

পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা

www.pathagar.com

ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত),
২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)
একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ

www.pathagar.com

থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, পরিকল্পনা উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব এ.কে.এম. মাহবুবুল আলম ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, উৎপাদন কর্মকর্তা শাহ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান জামালপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে জামালপুরের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-১১৬

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল ২৩
খ. ভৌগোলিক অবস্থান ২৯
গ. জনবসতির পরিচয় ৩১
ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৫
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল ৪৩
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪৭
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ৫১
জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি ৬৫
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ ৭৫
ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৯৩

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ১১৭-১৫৪

ক. লোকগল্প/ কাহিনি/কিস্‌সা ১১৭
খ. কিংবদন্তি ১৩৬
গ. লোকছড়া ১৩৭
ঘ. লোককবিতা ১৫১
ঙ. পুথিসাহিত্য ১৫৩

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১৫৫-১৬১

লোকশিল্প ১৫৫
১. কাঁসাশিল্প ১৫৫
২. বাঁশ ও কারুশিল্প ১৫৬
৩. নকশি পাখা ১৫৯
৪. নকশি শিকা ১৬০
৫. নকশি কাঁথা ১৬০

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১৬২-১৬৩

লোকসংগীত (folk song) ১৬৪-২৯৭

ক. মাজারের গান ১৬৪
খ. মর্সিয়া ১৭০

www.pathagar.com

গ. ধর্মীয় সংগীত ১৮৬
ঘ. আওয়াজ ১৮৮
ঙ. ধুয়া ১৯২
চ. মালসি গান ১৯৮
ছ. উদাসী গান ২০৫
জ. মেয়েলি গীত ২০৮
ঝ. বারমাসি ২৬৮
ঞ. সারিগান ২৭৮
ট. ঘাটুগান ২৮১
ঠ. আসরের গান ২৮৫
ড. জারি গান ২৯১
ঢ. একদিল গান ২৯২

লোকউৎসব (folk festival) ২৯৮-৩০৬

১. মৌসুমি উৎসব ২৯৮
২. লোকউৎসব ও অনুষ্ঠান ২৯৯
৩. উরস ও মেলা ৩০৩
৪. ঈদুল ফিতরের ঈদ ও গ্রামীণ মেলা ৩০৪
৫. ঈদুল আযহার ঈদ ও মজলিস ৩০৫

আচার-অনুষ্ঠান (ritual) ৩০৭-৩০৮

লোকখাদ্য (folk food) ৩০৯-৩১১

১. কলার পিঠা ৩০৯
২. পিঠালি ৩১০
৩. মিষ্টান্ন ৩১১

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য (folk theatre & dances) ৩১২-৪১৫

ক. লোকনাট্য
১. খায়রুন সুন্দরি ৩১২
২. চন্দ্রাবতী ৩৫২
৩. সুজন সুন্দরি ৩৬৪
৪. বেহুলা নাচাড়ি ৩৭৮
খ. লোকনৃত্য
গীতি আলেখ্য ৪১১

লোকক্রীড়া (folk games) ৪১৬-৪২৩

১. হাডুডু ৪১৬

www.pathagar.com

২. গোল্লাছুট ৪১৭
৩. পাঁচগুটি ৪১৭
৪. হাঁসাহাঁসি বা তইতই খেলা ৪১৮
৫. কুমির খেলা ৪১৮
৬. বলাই খেলা ৪১৮
৭. রান্নাবান্না খেলা ৪১৮
৮. পুতুল খেলা ৪১৯
৯. ঢেঁকি খেলা ৪১৯
১০. ঘুড়ির খেলা ৪১৯
১১. লাঠিখেলা ৪২০
১২. ঘোড়দৌড় ৪২১
১৩. নৌকাবাইচ ৪২১
১৪. কলার আটি কলার ডুম ৪২১
১৫. একতালি বাই বল্টু ৪২২
১৬. হলদি গাছতলে নিম পাখি ৪২২

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৪২৪-৪২৬

১. মিস্ত্রি বা ছুতার ৪২৪
২. কুলু বা তেলি ৪২৪
৩. জেলে ৪২৫
৪. কামার ৪২৫
৫. গাছি ৪২৫

ধাঁধা (riddle) ৪২৭-৪৫৮

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৪৫৯-৪৮৫

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৪৮৬-৪৮৭

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৪৮৮-৪৯২

১. ঢেঁকি ৪৮৮
২. ঘানি ৪৮৯
৩. চাঁই, পলো, বাইর ৪৯০
৪. হুঁকা ৪৯০
৫. লাঙল ৪৯১
৬. জাঁতি বা ছরতা ৪৯১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী বিধৌত প্রকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত গারো পাহাড়ের পাদদেশে জামালপুর জেলা অবস্থিত। জামালপুর জেলার পূর্বনাম ছিল সিংহজানী। তার আগে এ অঞ্চলের নাম 'গঞ্জের হাট' ছিল বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেন। তবে এ নাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মোঘল আমলে সিংহজানী মৌজা ছিল জাফরশাহি পরগণার অধীন। মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) হযরত শাহ জামাল (র.) নামক একজন সাধক দরবেশ সুদূর ইয়েমেন প্রদেশ থেকে সিংহজানী মৌজায় আগমন করেন। তিনি এখানে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। কথিত আছে, তিনি ধার্মিক ও অলৌকিক গুণাবলী সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অলৌকিক গুণাবলীর কথা ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একথা সুদূর দিল্লীর মোঘল দরবারেও পৌঁছে যায়। সম্রাট আকবর হযরত শাহ জামাল (র.) এর অলৌকিক গুণাবলীর বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে তাঁর খানকা শরিফের ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্তমান জামালপুর জেলার অন্তর্গত কয়েকটি পরগণা 'পিরপাল' দানের সনদ তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সাধক দরবেশ তা গ্রহণ করেননি।

পরবর্তীকালে এ অঞ্চল হযরত শাহ জামাল (র.) এর নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে এবং তাঁর নাম অনুসারেই প্রথমে জামালপুর থানার, পরে জামালপুর মহকুমার এবং আরো পরে জামালপুর জেলার নামকরণ হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে, ১৭৮৭ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলার অধীনে ১৮৩৪ সালে জামালপুর থানা গঠিত হয়। ১৮৪৫ সালে জামালপুরকে প্রশাসনিক মহকুমায় উন্নীত করা হয়। ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত জামালপুর সেনানিবাসের মেজরগণ এ অঞ্চল শাসন করত। ১৮৫৩ সাল থেকে মহকুমার হাকিম দ্বারা এ অঞ্চল প্রশাসনিকভাবে পরিচালিত হতে থাকে। ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল জামালপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সময় জামালপুর মহকুমার আয়তন ছিল শেরপুরসহ ১৩১৫ বর্গমাইল। জামালপুর সদর থেকে সমগ্র অঞ্চলের আইন শৃংখলা ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল মহকুমা হাকিম ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার উপর। এ সমগ্র অঞ্চলের শাসনভার বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে ১৮৭৬ সালে তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল জামালপুরকে জেলায় রূপান্তরিত করার সুপারিশ করেন। ১৯১২ সালে লর্ড কার্জন জামালপুরকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের দ্বিতীয় প্রশাসনিক জেলায় উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে লেভিন্স কমিটি ময়মনসিংহ জেলাকে বিভক্ত করে তিনটি জেলা সৃষ্টি করার সুপারিশ করেন। লেভিন্স কমিটি জামালপুর ও টাঙ্গাইল মহকুমা নিয়ে যে জেলা গঠন করার প্রস্তাব করেন, তাতে জেলা হেডকোয়ার্টার

www.pathagar.com

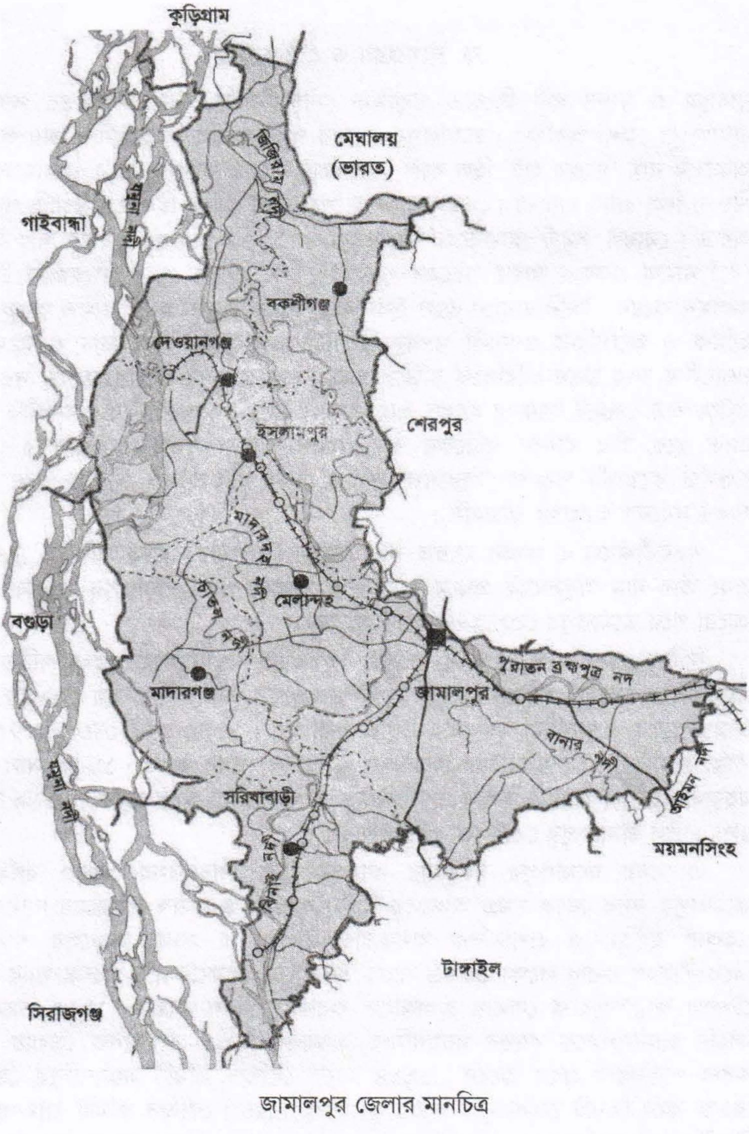

জামালপুর জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

স্থাপনের জন্য জামালপুরকে উপযুক্ত স্থান বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯১৭ সালে জামালপুরকে নতুন জেলা হিসেবে গঠন করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার জামালপুর মহকুমার পৌর এলাকার ৩৯২.৪৫১ একর জমি অধিগ্রহণ করে। উক্ত অধিগ্রহণকৃত জমিতে জেলা প্রশাসকের অফিস ভবন, জজকোর্ট, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, জেলা স্কুল, জেলখানা, পৌরসভা, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য স্থাপনার নকশা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা এবং সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি কারণে ইংরেজ সরকার কর্তৃক জেলা স্থাপনের প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। বর্তমানে উক্ত অধিগ্রহণকৃত জমির উপর গড়ে উঠেছে সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, কৃষিফার্ম, বিজিবি ক্যাম্প, হাসপাতাল, ডিসি ও এসপি'র অফিস ও স্টেডিয়াম।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জামালপুরকে জেলা করার উদ্যোগ অনেকটাই স্থিমিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার জামালপুরকে জেলা করার দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জামালপুরকে জেলা করার ওয়াদা করেন। কিন্তু ১৯৭৫-এর আগস্টে তিনি নিহত হলে এবং দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটলে তা আর বাস্তবায়িত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে সেনাশাসক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর জামালপুর মহকুমাকে বাংলাদেশের ২০তম জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৭৯ সালের ১লা মে নবগঠিত জামালপুর জেলার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

বর্তমানে জামালপুর জেলা ৭টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। উপজেলাগুলো হলো— জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ। নিম্নে উপজেলাসমূহের নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

সদর উপজেলা : জামালপুর জেলার নামকরণের ইতিহাসই জামালপুর সদর উপজেলার নামকরণের ইতিহাস- যার বিবরণ শুরুতেই প্রদান করা হয়েছে। ১৮৩৪ সালে জামালপুর থানা গঠিত হয়। ১৮৪৫ সালে জামালপুর মহকুমায় রূপান্তরিত হয়। ১লা এপ্রিল ১৮৬৯ সালে জামালপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে জামালপুর জেলা ঘোষিত হয়। ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে জামালপুর সদর উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জামালপুর সদর উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ১৫টি, পৌরসভা ১টি। গ্রাম ৩৫৩ টি, মৌজা ৩০০টি। ইউনিয়নসমূহের নাম— কেন্দুয়া, মেষ্টা, তিতপল্লা, দিগপাইত, শরীফপুর, শাহবাজপুর, রশীদপুর, লক্ষ্মীরচর, রানাগাছা, শ্রীপুর, বাঁশচরা, তুলশীরচর, নরুন্দী, ইটাইল ও ঘোড়াধাপ।

মেলান্দহ উপজেলা : মেলান্দহের নামকরণের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে অনুমান করা হয় যে, এ অঞ্চলে অতীতে 'মেলা' বা অনেক 'দহ' বা জলাশয় ছিল। এই 'মেলা' ও 'দহে'র মিলিত উচ্চারণেই 'মেলান্দহ' নামের উদ্ভব হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন কয়েকটি দহের মিলনস্থলে এ স্থানটি গড়ে উঠেছে বলে এর নাম মিলন্দহ > মিলান্দহ> মেলান্দহ হয়েছে। 'মেলান্দহ'

www.pathagar.com

নামের ব্যাপারে অন্য একটি ধারণাও প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলের একটি মৌজার নাম ছিল মেলান্দহ। এ মৌজার নামেই পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের নাম মেলান্দহ হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

জামালপুর জেলার একটি সমৃদ্ধ জনপদের নাম মেলান্দহ। এ অঞ্চল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জমিদারির বিভিন্ন পরগণার অধীনস্থ ছিল। ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চলটি ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার আওতাভুক্ত হয় এবং ১৯২৫ সালের ২১শে মে থানা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৮৩ সালের ১৫ই এপ্রিল মেলান্দহ থানা মেলান্দহ উপজেলায় উন্নীত হয়। এ উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ১০টি, পৌরসভা ১টি। উপজেলাস্থ গ্রামের সংখ্যা ১৯২টি, মৌজা ১৪০টি। ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– দুরমুট, কুলিয়া, মাহমুদপুর, নাংলা, নয়ানগর, আদ্রা, চরবানী পাকুরিয়া, ফুলকোচা, ঘোষেরপাড়া ও ঝাউগড়া।

সরিষাবাড়ি উপজেলা : ব্রহ্মপুত্র, ঝিনাই ও যমুনা নদীর পলল দ্বারা গঠিত সরিষাবাড়ির ভূঅঞ্চল। প্রাচীনকালে এখানে প্রচুর পরিমাণে সরিষা উৎপন্ন হতো। উৎপাদিত সরিষা বিক্রয়ের জন্য ক্রমে এখানে বাজার গড়ে ওঠে। ধারণা করা হয় এই সরিষা থেকেই এই অঞ্চলের নামকরণ সরিষাবাড়ি হয়েছে। সরিষাবাড়ির নামকরণের বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না।

পূর্বে সরিষাবাড়ি টাঙ্গাইল মহকুমার অধীনে ছিল। ১৯২০ সালে টাঙ্গাইল মহকুমা থেকে জামালপুর মহকুমাধীনে চলে আসে। ১৯৬০ সালের ২৯শে আগস্ট সরিষাবাড়ি থানা গঠিত হয়। ১৯৮৩ সালে সরিষাবাড়ি উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সরিষাবাড়ি উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ৮টি, পৌরসভা ১টি। গ্রাম সংখ্যা ১৮২টি ও মৌজা ১৩৮টি। ইউনিয়নগুলো হলো– ভাটারা, সাতপোয়া, কামরাবান্দা, মহাদান, ডোয়াইল, পোগলদিঘা, আওনা ও পিংনা।

ইসলামপুর উপজেলা : ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী বিধৌত একটি প্রাচীন জনপদের নাম ইসলামপুর। ইসলামপুর নামকরণের বিষয়ে তিনটি মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতটি হলো— মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইসলাম খাঁ বাংলার সুবেদার হয়ে আসেন। সুবেদার ইসলাম খাঁ কোনো এক সময়ে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই অঞ্চলের নামকরণ হয় ইসলামপুর। দ্বিতীয় মতটি হলো– ইসলাম শাহ্ নামে একজন কামেল পির এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। তাঁর নামানুসারে এলাকার নামকরণ ইসলামপুর হয়েছে। তৃতীয় মতটি হলো– প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ইসলামপুর নামে একটি মৌজা ছিল। এই মৌজায় স্থানীয় জনগণ একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করে। থানা সৃষ্টি হলে মৌজার নামানুসারেই থানার নামকরণ হয় ইসলামপুর।

১৯১৪ সালে জামালপুর মহকুমাধীনে ইসলামপুর থানা গঠিত হয়। জামালপুর জেলা হওয়ার পর ১৯৮৩ সালের ৩রা নভেম্বর ইসলামপুর উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ১২টি ও পৌরসভা ১টি। গ্রাম সংখ্যা ১৪৩টি, মৌজা ৮৬টি। ইউনিয়নগুলো হলো– কুলকান্দি, পাতশী, বেলগাছা, চিনাডুলি, গাইবান্ধা,

www.pathagar.com

সাপধরি, নোয়ারপাড়া, পলবান্ধা, গোয়ালের চর, চর পুটিমারি, চর গোয়ালিনী ও ইসলামপুর।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা : ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী বিধৌত একটি প্রাচীন জনপদের নাম দেওয়ানগঞ্জ। দেওয়ানগঞ্জ নামটি কীভাবে হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে স্থানীয়ভাবে এ ব্যাপারে লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। ব্রিটিশ পূর্বকালে দেওয়ান শাহ্ জামাল ও দেওয়ান শাহ্ জালাল নামে দুই জন ব্যক্তি এই অঞ্চলে এসে বসবাস করেছিলেন। তাঁরা কী ছিলেন, কী করতেন সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে প্রচলিত মত এই যে, পরবর্তীকালে তাঁদের নামানুসারেই এই অঞ্চলের নামকরণ হয় দেওয়ানগঞ্জ।

১৮৬৬ সালের আগে দেওয়ানগঞ্জ ছিল বগুড়া জেলার অধীন। ১৮৬৬ সালে বগুড়া জেলা থেকে দেওয়ানগঞ্জ পৃথক হয়ে ময়মনসিংহ জেলার অধীনে তথা জামালপুর মহকুমার অধীনে চলে আসে। ১৮৭৪ সালে জামালপুর মহকুমার অধীনে দেওয়ানগঞ্জ থানা গঠিত হয়। এর প্রায় সোয়াশ বছর পর ৩রা নভেম্বর ১৯৮২ সালে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ৮টি, পৌরসভা ১টি। গ্রাম সংখ্যা ১৬৪টি ও মৌজার সংখ্যা ৪৭টি। ইউনিয়নের নামগুলো হলো– ডাংধরা, চর আমখাওয়া, হাতিভাঙ্গা, পাররামপুর, বাহাদুরাবাদ, চিকাজানী, চুকাইবাড়ি ও দেওয়ানগঞ্জ।

মাদারগঞ্জ উপজেলা : মাদারগঞ্জ নামটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'গঞ্জ' শব্দটির অর্থ সকলের জানা। এর অর্থ হাট বা বাজার। তবে 'মাদার' শব্দটি নিয়ে নানাজনের নানা মত এখনো প্রচলিত আছে। কিংবদন্তি আছে, যুমনার তীরবর্তী এ অঞ্চলে একসময় 'মাদার' পিরের ভক্তরা গানের আসর বসাতেন। সেই গানের আসরকে কেন্দ্র করে এখানে লোকজনের সমাগম ঘটত। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে গানের আসরকে কেন্দ্র করে যেহেতু লোকসমাগম হত, তাই কিছু মানুষ গ্রাম্য কিছু জিনিসপত্র নিয়েও বসত বিক্রি-বাট্টা করার জন্য। এভাবেই ক্রমে একসময় বড় হাটে পরিণত হয় এলাকাটি। যেহেতু মাদার পিরের গানের আসরকে কেন্দ্র করে হাট বা গঞ্জের সৃষ্টি, তাই এলাকাটির নাম একসময় হয়ে যায় মাদারগঞ্জ। এই হাটকে কেন্দ্র করেই ঘটতে থাকে ব্যবসাপাতির প্রসার। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন হাট-বাজার করতে এমনকি অনেক দূরের কৃষিজীবী মানুষও এখানে তাঁদের পণ্য নিয়ে আসতে থাকেন বেচাকেনা করার জন্য। আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে স্থায়ী দোকানপাট। মানুষের এই আনাগোনার কারণেই এই অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যেমন– স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, 'গঞ্জ' নামের অর্থ হাট আর আরবি ভাষায় 'মাদার' শব্দের অর্থ গ্রাম। এর পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় গ্রামের হাট। আর সরকারি দলিলপত্রে দেখা যায়, যমুনা নদীর উপকূলে 'জামথল মাদারগঞ্জ' ও 'নওখিল মাদারগঞ্জ' নামে দুটি মৌজা আছে। এখানে সারাক্ষণ লোকের আনাগোনা থাকত। কেউ কেউ অনুমান করেন এ থেকেই হয়তো মাদারগঞ্জ নামের উৎপত্তি।

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জ প্রথমে ময়মনসিংহ জেলার ভৌগোলিক মানচিত্রে স্থান লাভ করে। ১৯০৬ সালের ১৫ই জুন মাদারগঞ্জ বৃহত্তর ময়মনিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার একটি থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে এ থানাটি একটি বিশিষ্ট থানা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর এ দেশের ৪৬০টি থানাকে পর্যায়ক্রমে মান উন্নীত থানায় রূপান্তর করা হয়। মাদারগঞ্জ ১৯৮৩ সালের ২৪শে মার্চ মডেল থানা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীকালে মান উন্নীত থানাগুলোকে উপজেলায় রূপান্তর করা হলে মাদারগঞ্জ থানাও উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে মাদারগঞ্জ পৌরসভার কার্যক্রম শুরু হয়। মাদারগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ৭টি, পৌরসভা ১টি। গ্রাম ১৫০টি, মৌজা ১২১টি। ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– চরপাকেরদহ, কড়ইচড়া, গুনারিতলা, বালিজুড়ি, আদারভিটা, জোড়াখালি ও সিধুলী।

বকশীগঞ্জ উপজেলা : ভারতের মেঘালয় সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে বকশীগঞ্জ উপজেলার অবস্থান। বকশীগঞ্জের পূর্বনাম রাজেন্দ্রগঞ্জ। ব্রিটিশ আমলে পাতিলাদহ পরগনার জমিদার ছিলেন মহারাজা প্রদ্যুতকুমার ঠাকুর। পাতিলাদহ পরগনা ছিল পশ্চিম ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলাব্যাপী। জানা যায়, ১৭৬৩ সালে ফকির মজনু শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন। ১৭৭৬ সালে বগুড়ায় মজনু শাহের বাহিনী ও ইংরেজদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পরাজিত মজনু শাহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে বিহারের মাখনপুরে তার মৃত্যু ঘটে। ফকির মজনু শাহের মৃত্যুর পর ফকির আন্দোলন কিছুটা থেমে গেলেও তার শিষ্য ফকিররা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করতে থাকে। ফকির মজনু শাহের একজন শিষ্য ছিলেন ফকির মাদার বখ্‌শ। ১৮০০ সালে ব্রিটিশ সরকার কঠোর হাতে ফকির আন্দোলন দমন করে। এ সময় ফকির মাদার বখ্‌শ পরিবারসহ রাজেন্দ্রগঞ্জের সীমান্ত চরকাউরিয়া সীমারপাড় গ্রামে আগমন করেন। এখানে একটি বটগাছের নীচে খানকা স্থাপন করে আধ্যাত্মিক চর্চায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। কিছু দিনের মধ্যে তার ফকিরি গুণাবলী চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় ফকির মাদার বখ্‌শ বকশী এ অঞ্চলে বকশী ফকির নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারেই এলাকার নামকরণ হয় বকশীগঞ্জ।

ব্রিটিশ আমলে বকশীগঞ্জ ছিল দেওয়ানগঞ্জ থানার একটি গ্রাম। ১৯৩৭ সালে দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত বকশীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। এ উপজেলা গঠনকালে বকশীগঞ্জ ছিল দেওয়ানগঞ্জ থানার একটি ইউনিয়ন। ৩০শে এপ্রিল, ১৯৮২ সালে বকশীগঞ্জ থানা এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ সালে উপজেলা গঠন করা হয়। শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলা থেকে বাট্টাজোড় ও কামালপুর এবং দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ৫টি অঞ্চল নিয়ে এ উপজেলার সৃষ্টি করা হয়। বকশীগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ৭টি। গ্রাম ১৯৮টি, মৌজা ২৫টি। ইউনিয়নগুলোর নাম হলো– বকশীগঞ্জ সদর, নিলাখিয়া, মেরুরচর, সাধুরপাড়া, বগারচর, বাট্টাজোড় ও ধানুয়া কামালপুর।

www.pathagar.com

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

জামালপুর জেলার আয়তন ২০৩১.৯৮ বর্গকিলোমিটার। এ জেলার ভৌগোলিক সীমানা— উত্তরে শেরপুর জেলা ও ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলা, পূর্বে ময়মনসিংহ জেলা ও পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ জেলা ও যমুনা নদী।

জামালপুর জেলা ২৪.২০° থেকে ২৪.৫০° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.৪০° থেকে ৯০.০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এখানকার মৌসুমী জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। শীত ও গরম মধ্যম ধরনের। শীতকালে প্রচুর কুয়াশা হয়। বর্ষাকাল ছাড়াও নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি মাসে কখনও কখনও বৃষ্টিপাত হয়। জামালপুর জেলা মূলত বেলে-দোআঁশ, দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ মাটি সমৃদ্ধ এলাকা। মোট জমির পরিমাণ ৫১২৮২৯ একর। আবাদি জমির পরিমাণ ৩,৭২,৮১৯ একর। প্রধান অর্থকরী ফসল ধান, পাট, ইক্ষু, সরিষা, গম, ভুট্টা ও বিভিন্ন প্রকার ডাল। এছাড়া বেগুন, আলু, মরিচ, পটল, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও বিভিন্ন প্রকার শাক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চরাঞ্চলগুলোতে মিষ্টি আলু ও চিনাবাদামের ব্যাপক চাষ হয়। এলাকার ৭০% ভূমি সমতল। বাকি অংশ অসমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। বনভূমির পরিমাণ ৭০৯৪.৯২ একর। পাহাড় ও নদনদী বেষ্টিত এই অঞ্চলের সমতল ভূমি উর্বর ও পলিসিক্ত। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮৭৫ মি.লি. থেকে ১৯৫০ মি.লি.। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩০° থেকে ৩৬° সেলসিয়াস। নিম্নে উপজেলাসমূহের ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ তুলে ধরা হলো—

সদর উপজেলা : জামালপুর সদর উপজেলার আয়তন ৪৮৯.৫৬ বর্গ কিলোমিটার। এর ভৌগোলিক সীমানা— উত্তরে শেরপুর জেলা, দক্ষিণে মধুপুর এবং সরিষাবাড়ি উপজেলা, পশ্চিমে মেলান্দহ উপজেলা ও মাদারগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে মুক্তাগাছা উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলা। এ উপজেলা ২৪.৪২° থেকে ২৪.৫৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.৫২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ উপজেলার মৌসুমী জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। শীতকালে প্রচুর কুয়াশা হয়। উপজেলার ভূমি এটেঁল, বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ প্রকৃতির। এখানে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। এলাকার সমতল ভূমি পলিসিক্ত ও উর্বর। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৯২.৫৫ মি.লি.। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩০° থেকে ৩৩° সেলসিয়াস। এই উপজেলার প্রধান কৃষি পণ্য ধান, পাট, ইক্ষু, গম, সরিষা ইত্যাদি। মোট জমির পরিমাণ ৩৭২০০ হেক্টর। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৭৬২৮০ হেক্টর।

মেলান্দহ উপজেলা : মেলান্দহ উপজেলার আয়তন ২৫৮.৩২ বর্গকিলোমিটার। এর ভৌগোলিক সীমানা হলো— উত্তরে ইসলামপুর উপজেলা, পূর্বে জামালপুর সদর ও শেরপুর জেলা, দক্ষিণে জামালপুর সদর ও সরিষাবাড়ি উপজেলা এবং পশ্চিমে মাদারগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলা। তাছাড়া এ উপজেলা ২৪.৫১° থেকে ২৫.৫° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.৪২° থেকে ৮৯.৫৩° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

উপজেলার বেশির ভাগ ভূমি সমতল তবে পশ্চিম অংশের ভূমি নিম্নসমতল। প্রায় প্রতিবছর উপজেলার এ অংশ বন্যা কবলিত হয় এবং প্রচুর রবিশস্যের ক্ষতি হয়। মাটি বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

www.pathagar.com

শীতকালে ঘন কুয়াশা হয়। গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা ৩২ সেলসিয়াস থেকে ৩৬ সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাত ৮৬০ সে.মি.। মোট কৃষিজমির পরিমাণ ৪৯২১২ একর। আবাদি জমির পরিমাণ ৪৭০০০ একর। এ উপজেলার প্রধান কৃষিপণ্য ধান, ইক্ষু, গম, পাট, সরিষা, ডাল, আলু ও সবজি।

সরিষাবাড়ি উপজেলা : সরিষাবাড়ি উপজেলার আয়তন ২৬৩.৪৮ বর্গ কিলোমিটার। এই উপজেলার উত্তরে মাদারগঞ্জ উপজেলা ও জামালপুর সদর, দক্ষিণে ভুয়াপুর উপজেলা ও টাঙ্গাইল জেলা, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ জেলা ও পূর্বে গোপালপুর উপজেলা ও টাঙ্গাইল জেলা। এ উপজেলার অবস্থান ২৪.০৪ ° থেকে ২৪.৫০° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.৪৩° থেকে ৮৯.৫৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস থেকে ৩৬° সেলসিয়াস। শীতকালে ২০° থেকে ২৪° সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাত ৮৫৩ সে.মি.। এখানকার মাটি বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ। এ উপজেলার প্রধান কৃষিপণ্য ধান, পাট, সরিষা, গম, আলু, ডাল ইত্যাদি। এখানকার মোট জমির পরিমাণ ২৭৩১৪ হেক্টর। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২২৩০০ হেক্টর।

ইসলামপুর উপজেলা : ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী বিধৌত ইসলামপুর উপজেলার আয়তন ৩৪৩.০২ বর্গ কিলোমিটার। এই উপজেলার উত্তরে দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলা ও পূর্বে শেরপুর জেলা। এই উপজেলা ২৪.৫৭° থেকে ২৫.১০° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.৩৮° থেকে ৮৯.৫৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। নদী, খাল, বিল পরিবৃত এই উপজেলা একটি বন্যাপ্রবণ এলাকা। এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস থেকে ৩৩° সেলসিয়াস। এখানকার ভূমি বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ। এখানকার প্রধান কৃষিপণ্য ধান, পাট, ইক্ষু, আলু, সরিষা, ডাল ও নানা রকমের সবজি। এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৩৫৭০০ হেক্টর। আবাদি জমির পরিমাণ ২৫১৫০ হেক্টর। অনাবাদি জমির পরিমাণ ২১২৫ হেক্টর।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা : জামালপুর জেলা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার অবস্থান। এই উপজেলার আয়তন ২৭৭.৭৫ বর্গ কিলোমিটার। দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ভৌগোলিক সীমানা– উত্তরে কুড়িগ্রাম জেলা, দক্ষিণে ইসলামপুর উপজেলা, পশ্চিমে গাইবান্ধা জেলা ও পূর্বে ভারত ও বকশীগঞ্জ উপজেলা। এছাড়া ২৫.০৬° উত্তর থেকে ২৫.২৬° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.৪০° থেকে ৮৯.৫১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার অবস্থান। উপজেলার অধিকাংশ ভূমি চরাঞ্চল। প্রতিবছরই বন্যায় প্লাবিত হয়। ফলে মাটি পলিসিক্ত ও উর্বর। এখানকার মাটি বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ প্রকৃতির। শীতকালেও কদাচিৎ বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস থেকে ৩৬° সেলসিয়াস। মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৩৮৩৩০ হেক্টর। আবাদি জমির পরিমাণ ১৮৪০০ হেক্টর। বনভূমির পরিমাণ ২০১ হেক্টর। এই উপজেলার প্রধান কৃষিপণ্য ইক্ষু। তাছাড়া, ধান, পাট, ভুট্টা, সরিষা, মাষ-মশুরি-খেসারি ডাল, মিষ্টি আলু, পিয়াজ, মরিচ প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জ উপজেলা : জামালপুর জেলা সদর থেকে সড়কপথে ৩৪ কিলোমিটার পশ্চিমে যমুনা নদীর পূর্ব তীরবর্তী এলাকা জুড়ে মাদারগঞ্জ উপজেলার অবস্থান। এ জেলার সবচেয়ে কম এলাকা জুড়ে মাদারগঞ্জ উপজেলার সীমানা নির্ধারিত। এই উপজেলার আয়তন ৯০ বর্গমাইল। এর ভৌগোলিক সীমানা– উপজেলার পশ্চিমে যমুনা নদী, পূর্বে মেলান্দহ, উত্তরে ইসলামপুর ও মেলান্দহ উপজেলা, দক্ষিণে সরিষাবাড়ি ও সারিয়াকান্দি উপজেলা। তাছাড়া, ভৌগোলিক দিক থেকে মাদারগঞ্জ ২৪.৪৭° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.৪০° দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

উপজেলার মাটির প্রকৃতি বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল-দোঁআশ। ভূমি উর্বর ও পলিসিক্ত। প্রায় প্রতিবছর এ অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়। শীতকালে ঘন কুয়াশা পড়ে। গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস থেকে ৩৭° সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাত ৮৫৩ সে.মি.। এ উপজেলার মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৪২৫৫০ একর। এখানে দু-ফসলি জমির পরিমাণ বেশি। এ উপজেলার প্রধান ফসল হচ্ছে ধান, পাট ও ইক্ষু। ধান-পাটের পাশাপাশি গমও এ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য শস্য। রবি শস্যের দিক দিয়ে বেগুন, মরিচ, আলু, পটল, টমেটো, বিভিন্নপ্রকার শাক, ফুলকপি ও বাঁধাকপি ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। তাছাড়া এ অঞ্চলে মিষ্টি আলু, চিনা বাদাম, কাউন প্রভৃতি ফসল জন্মে। প্রাচীনকালে ভূমিকম্পের ফলে এখানকার খাল-বিলের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, নদীর গতিপথও পরিবর্তিত হয়েছে।

বকশীগঞ্জ উপজেলা : বকশীগঞ্জ উপজেলা আয়তন ২০৪.৩০ বর্গ কি.মি.। ভৌগোলিক সীমারেখায় বকশীগঞ্জ উপজেলার অবস্থান উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদী ও গারো পাহাড় বেষ্টিত। এ উপজেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয়, দক্ষিণে ইসলামপুর উপজেলা, পূর্বে শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলা এবং পশ্চিমে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা। ভৌগোলিক মানচিত্রের উত্তরে ২৫.০৬° থেকে ২৫.১৮° অক্ষাংশের মধ্যে এবং পূর্বে ৮৯.৫৪° থেকে ৮৯.৫৬° দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এখানকার মৌসুমী আবহাওয়া উষ্ণ, আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩০° থেকে ৩৭° সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাত গড়ে ৮৩৪ সে.মি.। শীতকালে প্রচণ্ড শীত এবং ঘন কুয়াশা হয়। এই অঞ্চলের উত্তরে নদী ও পাহাড়বেষ্টিত ভূমি বেলে ও এঁটেল-দোআঁশ। অন্যান্য অঞ্চলের ভূমি সমতল, উর্বর ও পলিসিক্ত। এই উপজেলার প্রধান কৃষিপণ্য ধান, পাট, গম, ইক্ষু, ডাল, সরিষা, আলু, পিয়াজ, সবজি, সুপারি প্রভৃতি। মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৫০৮৮৪ একর। আবাদি জমির পরিমাণ ৩৪৭৭৬ একর। বনভূমি ৭০৯৪.৯২ একর।

গ. জনবসতির পরিচয়

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এলাকাটি ছিল পাহাড়-জঙ্গলবেষ্টিত উঁচু-নিচু ভূমি। এ অঞ্চলে গারো পাহাড়ে আদিবাসী সম্প্রদায় গারো, হাজং ও কোচ বাস করত। এ মঙ্গোলীয়েট গোত্রের বসবাস দেখে মনে হয় খ্রিষ্টপূর্ব কালেও এখানকার গড় ও পাহাড়ি এলাকায় জনবসতি ছিল। এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিধি এখনকার মতো সু-বিস্তীর্ণ ছিল না। মূল ভূ-খণ্ডের পশ্চিমে যমুনা এবং পূর্বে গারো পাহাড় থেকে পূর্ব-দক্ষিণে গড় সিংহজানী পর্যন্ত মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবহমান ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদে ভাগ

www.pathagar.com

হয়ে উত্তরে গারো পাহাড় এলাকাটি প্রাচীন রাজ্যে কামরূপ এবং দক্ষিণে গড় সিংহজানী এলাকা পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালের বিবর্তনে যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবহমানতা ও ভাঙ্গা-গড়ায় কাদামাটি জমে বর্তমান জেলার বিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ড গড়ে ওঠে। একই সঙ্গে উদ্ভব ঘটে দশানী, জিঞ্জিরাম, বংশ, ঝিনাই, ঝারকাটা নদনদী ও খালবিলের। কালক্রমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এখানে এসে বসতি গড়ে তোলে। গোড়াপত্তন ও বিকাশের সময় এ অঞ্চল দীর্ঘকাল প্রাচীন বাংলা গৌড়ের অধীনে ছিল। প্রাচীন বঙ্গে সেনবংশের রাজত্বকালে (১১০০-১২০৩ খ্রি.) হিন্দুদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রচলনের ফলে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন রামপালের (বিক্রমপুর) শাসনভার গ্রহণ করে কৌলিন্য প্রথা চালু করেন। তার নব পরিণীতা ডোম কন্যার অন্ন গ্রহণে সমগ্র সমাজকে বাধ্য করতে থাকে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি গোত্রের লোকজন বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। জাতবিচ্যুতির ভয়ে তারা শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও পূর্ব ময়মনসিংহ প্রভৃতি বল্লাল সেনের শাসন বহির্ভূত এলাকায় এসে আবাস স্থাপন করে।

১৪শ-১৬শ শতাব্দীতে গারো রাজ্যের নিম্নভাগে উত্তরাংশে বংশ নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও পূর্বে মেঘনা নদী–এ সীমার মধ্যে কোচ-সামন্তদের রাজত্ব ছিল। বারো ভূঁইয়ার অন্যতম ঈসা খাঁ সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল হতে কোচ ও গারো সামন্তদের গারো পাহাড়ে বিতাড়িত করেন। পরে জেওয়ার হয়বৎনগর, বোকাই প্রভৃতি জমিদারি সৃষ্টি হয়। বোকাই নগরের নিকট গৌরীপুর, কাশিপুর, রামগোলাপপুর, আঠারবাড়ি প্রভৃতি জমিদারি স্টেট গঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে প্রাচীনকাল হতে মুসলমান নবাব ও হিন্দু জমিদাররা রাজত্ব করেছে। টাঙ্গাইলের করটিয়া, দেলদুয়ার, ধনবাড়ি ও সন্তোষের জমিদারগণ বহু পুরাতন। মুক্তাগাছার জগৎকিশোর রায় ও মহারাজা সূর্যকান্ত রায় চৌধুরী ময়মনসিংহ জেলার বৃহৎ জমিদার ছিলেন। পাতিলাদহের মহারাজা প্রদ্যুতকুমার ঠাকুরের পশ্চিম ময়মনসিংহসহ রংপুর জেলাব্যাপী বিশাল জমিদারি ছিল। এসব জমিদার গোষ্ঠী ছাড়াও নয়ানী ও দশানী জমিদার, টানহাটা, দিগপাইত, পোয়াইব, ধলা, পূর্বধলা, সেনবাড়ি, ইটনা প্রভৃতি বহু জমিদার ও তালুকদার জেলাময় ছড়িয়ে পড়েছিল। মাৎস্যন্যায় ও ব্রিটিশ রাজত্বের শোষণ- শাসনের মূল ভিত্তি হিসেবে এসব জমিদারির সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে প্রসার লাভ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রামপালের (বিক্রমপুর) রাজা বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার প্রচলনে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ শ্রেণির হিন্দুরা রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমি থেকে জাতিবিচ্যুতির কারণে ক্রমে এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। ঈসা খাঁর শাসনামলে বহু মুসলমানের আগমন ঘটে এবং বিরল-বসতি অরণ্যভূমিতে লোকালয় গড়ে উঠে। কথিত আছে, এ সময়ে ৩৬০ জন আউলিয়া বা কামেল-পির-দরবেশ পদ্মা নদী পার হয়ে এ প্রদেশে প্রবেশ করে বিভিন্ন স্থানে দরগাহ স্থাপন করেন। এ পির-দরবেশ-আউলিয়ারা ক্রমে বিভিন্ন পরগণা দখল করে। উল্লেখ্য, ঈসা খাঁর মৃত্যুর একশত বছরের মধ্যে ঈসা খাঁ অধিকৃত ২২ পরগণার মধ্যে ১১ পরগণার অধিকাংশ মুসলমান পির-আমির-উমরাও অধিকার করে নেয়।

www.pathagar.com

বিজয়চন্দ্র নাগ তাঁর নাগ বংশের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন– ১৪১২ সালে দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ুন বহু সৈন্য-সামন্ত, কুলি-মজুর-শ্রমিক শ্রেণির লোকজন নিয়ে দশকাহনিয়া (শেরপুর) অঞ্চলে অনাবাদি জঙ্গল কেটে আবাদের উপযুক্ত করেন। ঐ সময় গড়দলিপা (বর্তমান গড়দরিপা) শাসন করতেন কোচ রাজা দলিপ সামন্ত। সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ুন রাজা দলিপা সামন্তকে পরাজিত ও হত্যা করে গড়দলিপা বা গড়জরিপা দখল করেন। ঐ সময় থেকে এ অঞ্চলে মুসলমানরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। মুঘল সেনাপতি মীর জুমলার আসাম বিজয়কালে এ অঞ্চলের প্রতি তার প্রথম নজর পড়ে। আব্দুল ওয়াহাব সরকার তাঁর বাংলাদেশের লোকগীতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– বৃহত্তর স্বার্থে আমরা অস্ট্রালয়েট নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সাথে মিশ্রিত হয়েছে মঙ্গোলীয় ও নিগ্রোলয়েট জনগোষ্ঠী। সাংস্কৃতিক বিবেচনায় আমাদেরকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পড়তে হয়নি, বরং তারা আমাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এ জনপদে বিভিন্ন সময় এসেছে– ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ, আফগান, পাঠান, মুঘল, ইরানি, সিরিয়, তুর্কি, পুর্তুগীজ ও ইংরেজ। এরা স্থানীয় জনস্রোতের ধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

জামালপুর জেলার জনবসতির উপরিউক্ত ইতিহাসই উপজেলাসমূহের জনবসতির গোড়াপত্তনের ইতিহাস। এভাবেই এই এলাকায় জনবসতির গোড়াপত্তন ঘটে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ মাদারগঞ্জ উপজেলার কথা বলা যায়। এ উপজেলায় শেখ, খন্দকার, মির্জা, মৃধা, আকন্দ, খান প্রভৃতি বংশ-উপাধিধারী বাসিন্দা রয়েছে। এসব বংশের পূর্বপুরুষের বেশির ভাগই বাইরের দেশ থেকে কেউ ব্যবসাসূত্রে, কেউ চাকরিসূত্রে, কেউ বৈবাহিক সূত্রে এ অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। শেখরা এককালে জজিরাতুল আরব আর উত্তর আফ্রিকার মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকার অধিবাসী ছিলেন। স্বভাবে তাঁরা ছিলেন ভাগ্যান্বেষী। খন্দকারদের আদিপুরুষ ইরাক থেকে বাংলাদেশে আসে, এটা প্রায় সর্বজনবিদিত। তবে তাঁরা প্রথমে বসতি স্থাপন করেন বর্তমান পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার শানিলা গ্রামে। সেই খন্দকারদের এক ছেলে, নাম খন্দকার জবান আলী ধর্ম প্রচারের জন্য মাদারগঞ্জে আসেন। তখন এই এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তাঁকে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধক্রমে তিনি বাংলা ১৩০০ সালে মাদারগঞ্জের বলদভরা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন। মির্জাদের আদিপুরুষ যাঁরা মাদারগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তাঁরা ইরান থেকে এসেছিলেন বলে লোকমুখে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠরা বলে থাকেন যে তাঁদের কেউ কেউ এসেছিলেন মঙ্গোলীয়া থেকে। তাঁদের ভাষ্যমতে, সম্রাট বাবর যখন ভারত জয় করেন, তখনই তাঁরা এ দেশে এসেছিলেন। এমনকি মির্জা মোহাম্মদ আলিবর্দী খান তাঁদের কৃতীপুরুষ বলে দাবি করেন। তবে মাদারগঞ্জে তাঁরা কবে নাগাদ বসবাস শুরু করেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে অনুমান করা যায় না। একইভাবে মৃধা, আকন্দ, খান বংশ-উপাধিধারীরা ঠিক কোথা থেকে মাদারগঞ্জে এসে বসতি স্থাপন করেছেন, তার যথাযথ তথ্য পাওয়া যায় না।

এভাবে হিসাব করলে দেখা যায়, মাদারগঞ্জে বসবাসকারী ব্যক্তিদের আদি পুরুষদের বেশির ভাগই বহিরাগত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশার সুবাদে এসে

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর উর্বরভূমির কারণে তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছেন। অদ্যাবধি তারাই মাদারগঞ্জের সুখ-দুঃখের অংশীদার।

তবে প্রতি উপজেলাতেই বংশগত উপাধি নিয়ে আদিবাসীন্দার দাবিদার আছে। যেমন– মাদারগঞ্জ উপজেলায় যাদের বংশগত উপাধি 'মণ্ডল' তারা নিজেদেরকে মাদারগঞ্জের আদিবাসী বলে দাবি করে থাকে। তবে তারাও কবে, কোন সময়কালে মাদারগঞ্জে এসে বসবাস শুরু করেছে তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। জেলার সকল উপজেলাতেই এই সকল বংশগত উপাধির জনগোষ্ঠী রয়েছে।

জামালপুর জেলায় প্রধানত মুসলমান ও হিন্দু এই দুই সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস। অন্যান্য ধর্মের লোকসংখ্যা একেবারেই কম। এর মধ্যে মুসলমান জনগোষ্ঠীই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় গারো, কোচ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। বর্তমানে জামালপুর জেলার মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও আদিবাসীসহ মোট জনংখ্যা ২১,৯২,৮৯০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১১,০৯,০৪২ জন ও মহিলা ১০,৮৩,৭৪৮ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ১০৭৯ জন। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায় নিজস্ব নিয়ম-রীতি অনুযায়ী ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। এ জেলায় ধর্মীয় উগ্রতা নেই। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোক এখানে মিলেমিশে বসবাস করে।

এ জেলার জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। উপজেলাসমূহের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর পেশা কৃষি। বলা যায়, শতকরা ৭৭ ভাগ লোকই কৃষি পেশায় নিয়োজিত। বাকি ২৩% এর মধ্যে রয়েছে কুলি, মজুর, রিক্সাচালক, ভ্যানচালক, অটোচালক, দোকানের কর্মচারী, দরজি, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, কামার, কুমার, সোনারু, গোয়ালা, জেলে, নাপিত, মেথর, মুচি, ধোপা ইত্যাদি পেশার লোক। বর্তমানে জেলাসদরসহ উপজেলাসমূহে চাকুরিজীবীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিটি উপজেলাতেই হাট-বাজার, স্কুল, মাদ্‌রাসা, কলেজ, হাসপাতাল, সরকারি অফিস, আদালত ইত্যাদি রয়েছে। বর্তমানে জেলার রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে। জেলাসদর থেকে উপজেলায় যাওয়ার পাকা রাস্তা ও রেললাইন রয়েছে। এ জেলা থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের মাধ্যম ট্রেন, বাস ইত্যাদি। মালামাল পরিবহনের জন্য রয়েছে ট্রাক। সদূর অতীতে ব্যবহৃত পালকি, সোয়ারি, কাঠের চাকার গরুর গাড়ি এখন আর দেখা যায় না। তবে কোনো কোনো উপজেলায় মালামাল বহনের জন্য মহিষের গাড়ির প্রচলন আছে। এ জেলার অধিকাংশ ঘরবাড়ি কাঁচা। সেমি পাকা ও পাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা কম। প্রত্যন্ত গ্রামে ও চরাঞ্চলে ছনের ঘরও দেখা যায়। জেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই বেশি। এর মধ্যে ভূমিহীন দিন মজুরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। অর্থনৈতিক বিবেচনায় জামালপুর জেলা একটি দরিদ্র অঞ্চল হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। নিম্নে উপজেলাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান ২০০১ সালের আদমশুমারি মোতাবেক প্রদান করা হলো—

সদর উপজেলা : এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৫৬৮৭২৬ জন। পুরুষ ২৯০১৫৯ জন, মহিলা ২৭৮৫৬৭ জন। এর মধ্যে মুসলমান ৫৪৭০০৬ জন, হিন্দু

www.pathagar.com

২০৮০৭ জন, বৌদ্ধ ২৯৯ জন, খ্রিষ্টান ৩৬ জন এবং অন্যান্য ৫৭৮ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ১১৬২ জন।

মেলান্দহ উপজেলা : এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৯২৩৪৭ জন। পুরুষ ১৪৯৭০৮ জন ও মহিলা ১৪২৬৩৯ জন। এর মধ্যে মুসলমান ২৮৩৩৪৭ জন, হিন্দু ৩৭৯৮ জন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য নিয়ে ২৮ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ১২১৯ জন।

সরিষাবাড়ি উপজেলা : এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩১৬০০৭ জন। পুরুষ ১৬১৬৮৩ জন ও মহিলা ১৫৪৩২৪ জন। এর মধ্যে মুসলমান ৩০৭২২২ জন, হিন্দু ৮৬৯২ জন, বৌদ্ধ ৩৯ জন এবং অন্যান্য ৫৪ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ১১৯৯ জন।

ইসলামপুর উপজেলা : এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৮৯৩৩৭ জন। পুরুষ ১৪৮১৫৮ জন ও মহিলা ১৪১৭৯ জন। এর মধ্যে মুসলমান ২৮৪৯৮০ জন, হিন্দু ৪১৮১ জন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ১৭৬ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৮৪৪ জন।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা : এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২২৯৩০৭ জন। পুরুষ ১১৫২৯১ জন ও মহিলা ১১৪০১৬ জন। এর মধ্যে মুসলমান ২২৫৩১৭ জন, হিন্দু ৩৮০৭ জন, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য নিয়ে ১৮৩ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৮২৬ জন।

মাদারগঞ্জ উপজেলা : এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২৩৩০৪৯ জন। পুরুষ ১১৯৩৬৮ জন ও মহিলা ১১৩৬৮১ জন। এর মধ্যে মুসলমান ২২৮৭৬৯ জন, হিন্দু ৪১৫৮ জন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য নিয়ে ১১৮ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ১০৩৪ জন।

বকশীগঞ্জ উপজেলা : এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৭৮৪৩৬ জন। পুরুষ ৯১৩২৭ জন ও মহিলা ৮৭১০৯ জন। এর মধ্যে মুসলমান ১৭৩৭৩১ জন, হিন্দু ২০০৬ জন, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী ২১৬০ জন, বৌদ্ধ ৪৭৩ জন এবং অন্যান্য ৬৬ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৮৭৪ জন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অতি প্রাচীনকালে জামালপুর তথা ময়মনসিংহ জেলার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন– অতি প্রাচীনকালে বাংলাদেশের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, হিমালয় পবর্তের পাদদেশ থেকে ভারতের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। এখনও হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কালাদি পাওয়া যায়। তারা অনুমান করে বলেন– গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে আসা কাদামাটি থেকে বাংলাদেশের উৎপত্তি হয়েছে।

কালের বিবর্তনে বাংলাদেশের এ অংশ সমুদ্রতলদেশ থেকে উত্থিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ময়মনসিংহ তথা বৃহত্তর জামালপুরের ইতিহাস

www.pathagar.com

ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। ঐ সময় জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, ইসলামপুর, সরিষাবাড়ি, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ অঞ্চলগুলো কর্দমাক্ত, গভীর অরণ্য ও জঙ্গলাবৃত ছিল এবং এক সময় অনার্যরা এখানে বসবাস করত।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইতিহাসে গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময় কামরূপ বা আসাম উপত্যকার উল্লেখ আছে। ঐ সময় ময়মনসিংহ জেলার সমগ্র ভূখণ্ড– জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও টাঙ্গাইল অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। কামরূপ প্রাগজ্যোতিষ দেশ নামে পরিচিত ছিল। প্রাগজ্যোতিষ (কামরূপ) এর রাজধানী ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। প্রাগজ্যোতিষপুরের বর্তমান নাম গৌহাটি– এখন ভারতের আসাম রাজ্যের রাজধানী।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৯-৬৪৫ খ্রি.) চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি পুণ্ড্রবর্ধন হতে একটি বিশাল নদ (ব্রহ্মপুত্র) অতিক্রম করে কামরূপ রাজ্যে আগমন করেন। ঐ সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হয় এবং সমগ্র অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্নতত্ত্ববিদ রমেশচন্দ্র দত্ত এই দুই হাজার মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডকে আধুনিক আসাম, মণিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেন। কামরূপ (প্রাগজ্যোতিষ) রাজ্য তখন কুমার ভাস্কর বর্মন শাসন করতেন। পরে হিউয়েন সাং সমতটে আগমন করেন। ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের দক্ষিণ, ঢাকা ও ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চল সমতট বলে পরিচিত ছিল। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ কাহিনির বিবরণে দেখা যায়, ঐ সময়ের বঙ্গভূমি ৬টি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল– ১. পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ) ২. কামরূপ (ময়মনসিংহের পূর্ব ভাগসহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম) ৩. সমতট (ঢাকা ও ফরিদপুর) ৪. কমলাঙ্গ (ত্রিপুরা ও কুমিল্লা) ৫ তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ–পশ্চিমবঙ্গ) ৬. কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ)। এখানে অনুমান করা যায়, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ (বর্তমান পশ্চিম ময়মনসিংহ) পুণ্ড্র ও পূর্বভাগ (পূর্ব ময়মনসিংহ) কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এ ময়মনসিংহের একটি অঞ্চল বর্তমান জামালপুর।

ময়মনসিংহ জেলা বিবরণীর রচয়িতা এফএ সাকসীর মতে, এ অঞ্চল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত কোচ-সামন্তদের অধীনে ছিল। দলিপা সামন্ত নামে এক কোচরাজা এ অঞ্চল শাসন করত। তার রাজধানী ছিল গড়দলিপা। গড়দলিপা বা গড়জরিপা এখন শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী থানার অন্তর্ভুক্ত। কোচবংশীয় রাজারা বহু বছর গড়দলিপা শাসন করে। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ক্রমাগত আক্রমণে কোচ-সামন্তদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৪৯১ সালে সাইফুদ্দিন দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের নির্দেশে সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ুন কোচরাজা দলিপা সামন্তকে পরাজিত এবং হত্যা করে গড়দলিপা দখল করে। সেই থেকে এ অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসে।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৪৯৩-১৫১৯) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কামরূপ রাজ্য দখল করে পুত্র নুসরত শাহকে অধিপতি করেন। তিনি পুত্র নুসরত শাহের নামানুসারে এলাকার নাম নসরতশাহি অভিহিত করেন। পরবর্তী সময়ে ঐ অঞ্চলের একাংশ নাসিরুজিয়া বা নাসিরাবাদ পরগনা নামে পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

১৫৮০ সালে সম্রাট আকবর তার রাজস্ব সচিব টোডরমলকে বাংলায় ভূমি বন্দোবস্তের জন্য পাঠায়। টোডরমল সুবা বাংলাকে ২৪টি সরকারে বিভক্ত করেন। করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী অঞ্চল বঙ্গকে সরকার বাজুহার নামে অভিহিত করেন। এ সরকার বাজুহা আজকের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা নামে পরিচিত। সরকার বাজুহারকে আবার ৩২টি পরগণায় বিভক্ত করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৫৯৫ সালে সেনাপতি মানসিংহ ঈসা খাঁর সুবর্ণ গ্রাম আক্রমণ করে। ১৫৫৯ সালের পরে ২২টি পরগণার অধিপতি ছিলেন ঈসা খাঁ। ১৫৯৯ সালে ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসা খাঁ এবং আফগান সেনা খাজা উসমান খাঁ এ অঞ্চল শাসন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে (১৬০৫-১৬১৭) সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল মুঘলদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ঐ সময় নবাব ইসলাম খাঁ যুদ্ধে মুসা খাঁ ও খাজা উসমান খাঁকে পরাজিত করে। ১৬১৩ সালে থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ জন মুঘল শাসক সমগ্র বাংলাদেশ শাসন করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দখল করে। ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ২৮টি দেওয়ান শাসিত এলাকাকে ১৪টি জেলায় পরিণত করে। ১৭৮৭ সালে মে মাসে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়। ঐ সময় জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা সরাসরি ময়মনসিংহ জেলার অধীনে আসে। ১৮০৭ সালে শেরপুরের মৃগী নদীর তীরে কালিগঞ্জ একটি থানা ও আদালত এবং জামালপুরের হাজিগঞ্জে একটি থানা স্থাপিত হয়। শেরপুর কালিগঞ্জের ব্রহ্মপুত্র ও ঝিনাই নদীর সঙ্গমস্থলে অস্থায়ী সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুবিধার্থে কালিগঞ্জ থানা শেরপুর এবং হাজিগঞ্জ থানা জামালপুরে স্থানান্তরিত করে। ১৮০৯ সালে পাতিলাদহ পরগনার কতক অংশ রংপুর থেকে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮২৬ সালে রংপুর সেনানিবাস জামালপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

ব্রিটিশ আমলে শেরপুরসহ জামালপুরের আয়তন ছিল ১৩১৫ বর্গমাইল। জামালপুর মহকুমার সীমানা ছিল উত্তরে গারো পাহাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা, পশ্চিমে যমুনা নদী, দক্ষিণে টাঙ্গাইল মহকুমা, পূর্বে ময়মনসিংহ জেলা। ঐ সময় জামালপুর মহকুমার উপর দিয়ে সোমেশ্বরী, ভোগাই, দশানী, মৃগী, ঝিনাই, ঝারকাটা, বংশ, বানার, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা প্রভৃতি নদ-নদী প্রবহমান ছিল। ১৮৪৫ সালে শেরপুর, হাজিপুর, পিংনা ও সিরাজগঞ্জ পুলিশ সার্কেল নিয়ে জামালপুর মহকুমা গঠন করা হয়। ১৯৭৮ সালে ২৬ ডিসেম্বর জামালপুর জেলা গঠিত হয়। নিম্নে উপজেলাসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো—

সদর উপজেলা : জামালপুর জেলার নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল এবং জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে জামালপুর সদর উপজেলার ইতিহাসের অনেকখানি বিধৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জামালপুর সদর উপজেলা অনেক ইতিহাস ও স্মৃতি-বিজড়িত একটি প্রাচীন অঞ্চল। জামালপুর সদরে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হযরত শাহ জামাল (র.) এর মাজার, দয়াময়ী মন্দির, শিবমন্দির, খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্র, বড় মসজিদ ইত্যাদি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, গৌড়ের আফগানদের সঙ্গে দিল্লীর মুঘলদের রাজ্যবিস্তার নিয়ে সংঘাত হলে আফগানরা

www.pathagar.com

মুঘলদের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে জামালপুর সদরের পাথালিয়া মৌজায় একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। এখনও পাথালিয়ায় পল্টন নামের জনশ্রুতি আছে।

এ অঞ্চলে হযরত শাহ জামাল (র.) এর আগমনকালে (১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ সালের মধ্যে) এ অঞ্চলের নাম ছিল সিংহজানী। তার আগে এই অঞ্চলের নাম 'গঞ্জেরহাট' ছিল বলে কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন। তবে এ নাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হযরত শাহ জামাল (র.) এর আগমনের সময় এ অঞ্চল ছিল একটি অজ গ্রাম। ক্রমে এ অঞ্চল শহর হয়ে উঠতে থাকে।

বর্তমানে জামালপুর সদর জেলাসদরও বটে। জামালপুর সদরের কোনো প্রাচীন শাসনকেন্দ্রিক ঐতিহ্য নেই। যা আছে তা ইংরেজ আমলের। এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসন সুরক্ষা ও আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে জামালপুর সদরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জামালপুরের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ইংরেজরা ১৮৪৫ সালে জামালপুরকে প্রশাসনিক মহকুমায় উন্নীত করে। বিশেষ করে তৎকালে মধুপুর জঙ্গলের বিস্তৃতি ছিল জামালপুর পৌর এলাকা পর্যন্ত। দক্ষিণে মধুপুর জঙ্গল ও উত্তরে শেরপুরের বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ফকির-সন্ন্যাসীদের দমন করার জন্যই জামালপুরে একটি শাসনকেন্দ্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফকির-সন্ন্যাসীদের দমন করার জন্য ইংরেজরা জামালপুর সদর এলাকাধীন রশিদপুরের নিকটে সেনানিবাস স্থাপন করে। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত সেনানিবাসের মেজরগণ এ অঞ্চল শাসন করত। পরবর্তীকালে মহকুমার প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটগণ। সন্ন্যাসীদের অবস্থানের জন্য একসময় জামালপুরের নাম সন্ন্যাসীগঞ্জে পরিণত হয়েছিল। এখনও শহরের পশ্চিম দিকে সন্ন্যাসীপাড়া, সন্ন্যাসীভিটা নামে পাড়া রয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে জামালপুর অঞ্চল ছিল জাফরশাহি পরগণার অধীন। আর জাফরশাহি পরগণার মালিক ছিলেন গৌরীপুরের জমিদারগণ। জামালপুর সদরে গৌরীপুর জমিদারদের কাচারিঘর ছিল– যার প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। এছাড়া দয়াময়ী মন্দিরের পাশের এবং পিছনের যে মাঠ– যেখানে এখন বৈশাখী মেলা হয়– একসময় তা গৌরীপুর কাচারির মাঠ নামেই পরিচিত ছিল।

জামালপুর সদরের এক বিলুপ্ত গৌরবের নাম **'চৈতন্য নার্সারী'** নামের এক উদ্ভিদ উদ্যান। ১৮৯৪ সালে এই উদ্ভিদ উদ্যানটি প্রতিষ্ঠা করেন মোক্তার ঈশ্বরচন্দ্র গুহ। তিনি সদরের বোসপাড়ায় ৪৫ বিঘা জমির উপর এই চৈতন্য নার্সারী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং উদ্যান চর্চার গোড়া পত্তন করেন। তিনি তাঁর নার্সারিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চারা বীজ সংগ্রহ করেছিলেন। জানা যায়, তাঁর উদ্যানে তিনি ৪৬৬৮টি বিভিন্ন জাতের ফুল-ফল, লতা-গুল্ম ও অর্থকরী বৃক্ষের সমাহার ঘটিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনের ও বাহাদুরশাহ পার্কের পাম গাছগুলো এ নার্সারির সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন বীজ-চারা উৎপন্ন করতেন এবং দেশ-বিদেশে তা বিক্রি হত। ঢাকার তাঁতিবাজারে তাঁর একটি বীজ-চারা বিক্রয়ের কেন্দ্র ছিল। বিশ্বের নানা দেশ হতে চৈতন্য নার্সারির প্রতিষ্ঠাতাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেছিল।

জামালপুর সদরের আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে ১৮৮১ সালে। টিও ডনো নামে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সর্বপ্রথম এ শহরে একটি ইংরেজি মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী সময়ে স্কুলটি 'ডনো হাই স্কুল' নামে পরিচিতি পায়। বর্তমানে স্কুলটি 'জামালপুর জিলা স্কুল' নামে পরিচিত।

মেলান্দহ উপজেলা : মেলান্দহ উপজেলার প্রাচীন ইতিহাসে হযরত শাহ কামাল (র.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৫০৩ সালে হযরত শাহ কামাল মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেন প্রদেশ থেকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে আগমন করেন। তিনি উপজেলার দুরমুট ইউনিয়নে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থান গ্রহণ করেন। বর্তমানে সেখানে হযরত শাহ কামালের (র.) মাজার রয়েছে। প্রতি বছর সেখানে উরস অনুষ্ঠিত হয়। উরস উপলক্ষে ১লা বৈশাখ থেকে ৩১শে বৈশাখ পর্যন্ত মাসব্যাপী মেলাও অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মেলান্দহ নামটি তিনদহের মিলনস্থল মিলন্দহ থেকে কালক্রমে মেলান্দহ হয়েছে। এ অঞ্চলটি শুধু তিনদহের মিলনস্থল ছিল না, অনেক লোকের দেখা সাক্ষাৎ, মিলন ও সমাগমের স্থানে পরিণত হয়েছিল। সেই প্রাচীনকালেই। তবে বর্তমান মেলান্দহ বাজারটি বসত কামাখ্যা তলায়। আদিপৈত গ্রামের জমিদার-কর্মচারী হরদেব ও রাজচন্দ্র দেব স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় মেলান্দহ বাজারের পত্তন করেন। তখনকার দিনে মেলান্দহ বাজারে দুধ, মাছ, তেল, লবণের মত খুব সামান্য জিনিসের বেচা কেনা হত। সে সময় টাকা পয়সার মুদ্রার প্রচলন তেমন হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'বিনিময় প্রথা'র মাধ্যমে জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হত। কলের কাপড়ের প্রচলন তখনও শুরু হয়নি। ঘরে ঘরে তুলা থেকে চরকায় সুতা তৈরি করা হত। ব্যবসায়ীরা তুলা আমদানি করে গ্রামে গ্রামে কাটুনিদের দিয়ে যেত। তারা সুতা কেটে পারিশ্রমিক হিসেবে এক চতুর্থাংশ রেখে বাকি সুতা ব্যবসায়ীদের দিয়ে দিত। আধাসের বা দশ ছটাক সুতায় একটি শাড়ি বুনানো যেত। গায়ের চাদরের সুতা আরো কম লাগত। মানুষের জীবন ছিল কষ্টসাধ্য এবং অনাড়ম্বরপূর্ণ। মানুষের নীতি-নৈতিকতা ছিল উন্নত এবং সামাজিক বন্ধন ছিল মজবুত।

কথিত আছে যে, ২৫০ বছর আগে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা নদী 'লৌহজং' বর্তমান মেলান্দহ বাজারের উপর দিয়ে প্রবহমান ছিল। এই নদীর উভয় তীর ছিল ঘনবসতিপূর্ণ। ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নদীটি ভরাট হয়ে যায়। পরে ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধিতে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকেই চলে যায় স্থানান্তরে। ফল ক্রমশ স্থানটি লোকবিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ওঠে। অনেকদিন পর একদল লোক এসে মেলান্দহের আশপাশে বসতি স্থাপন করে। আস্তে আস্তে আবার লোকালয় গড়ে ওঠে। জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ শুরু হয়। তখন এ অঞ্চলে কয়েকজন বিশিষ্ট জমিদার স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এদের মধ্যে মহিরামকুলের মহিরাম লাহিড়ি ও মালঞ্চার চন্দ্রকান্ত রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। পাচুরপাড়ায় বাস করতেন একজন প্রতাপশালী জমিদার। খুব কাছাকাছি ছিল এসব জমিদারি এলাকাগুলো। এসব জমিদারদের অনেক কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। বহুলোক চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন শুরু করে। জমিদার মহিরামকুল লাহিড়ির মৃত্যুর পর তাঁর নামে এ অঞ্চলের নাম হয় মহিরামকুল। মহিরামকুলের পূর্বনাম ছিল চন্দ্রকোনা। মেলান্দহ বাজার উন্নয়নে

www.pathagar.com

মহিরামকুল জমিদারদের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁরা মালঞ্চার গোবিন্দপুর বাজার এবং জামালপুর সদরের সকাল বাজারেরও পত্তন করেছিলেন। মহিরামকুলে জমিদারদের কাচারিবাড়ি এখনও ভগ্নদশায় তাঁদের স্মৃতিবহন করছে।

নবাবি আমলে মেলান্দহ উপজেলা রাণী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কথিত আছে যে, মেলান্দহ অঞ্চলের কোনো এক নদীতে জাফর নামের একজন নমদাস দুইজন সঙ্গীকে নিয়ে নদীতে মাছ ধরছিল। এ সময় রাণী ভবানীর দেওয়ান নৌকা করে যাওয়ার সময় তাদের নিকট কর দাবি করলে তারা তিনজনই এক টাকা করে কর দিতে রাজি হয়েছিল। ঐ সময় ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা নদী ঝিনাই নদী তীরের এই অঞ্চলটি জাফরশাহি পরগণা নামে পরিচিত লাভ করেছিল।

ব্রিটিশ যুগের শুরুর কালেই বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে ফকির সন্নাসী বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল। ঐ সময় সন্নাসী দলপতি শাহ মজরত মেলান্দহের মালঞ্চা কাচারি লুঠ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জামালপুর মহকুমার সর্বত্র কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঐ সময় মেলান্দহ অঞ্চলের ঝাউগড়ার চেং সরকার কৃষকদের অধিকার আদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তখন মেলান্দহ আমবাড়িয়ার স্টেটের মালিক হেমনগরের জমিদার কৃষক-বিদ্রোহী চেং সরকারকে গ্রেপ্তার করে হেমনগর জেলখানায় ছয় মাস আটকে রেখেছিল। এলাকার বিদ্রোহী কৃষকরা এই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে জামালপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট টিও ডনো সাহেবের নিকট অভিযোগ দায়ের করে। চেং সরকার ছয় মাস পর কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

সরিষাবাড়ি উপজেলা : একসময় সরিষাবাড়ি পুখরিয়া ও জাফরশাহি পরগনার অধীনে ছিল। ব্রিটিশ আমলে সরিষাবাড়িতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর ছিল। এখানে ব্রিটিশ ও মারোয়াড়ীদের বেলিং কুটির ছিল। ঐ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সরিষাবাড়ি বিখ্যাত ছিল। সরিষাবাড়িকে বলা হত দ্বিতীয় নারায়ণগঞ্জ। সরিষাবাড়ি উপজেলার একটি অন্যতম ইউনিয়ন পিংনা। ব্রিটিশ আমলে পিংনা পুলিশ সার্কেল গঠিত হয়। একসময় পিংনা নাটোরের মহারাণীর শাসনাধীনে ছিল। ব্রিটিশ আমলে পিংনা নদীবন্দর থেকে সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও কলকাতার সঙ্গে নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ঐ সময় পিংনায় ফৌজদারি ও মুনসেফ কোর্ট ছিল। মহাকবি কায়কোবাদ পিংনায় পোস্টমাস্টার থাকাকালীন 'মহাশশ্মান' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জামালপুর মহকুমার সর্বত্র কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় সরিষাবাড়ি অঞ্চলে জাহেদ খাঁ কৃষকদের সংগঠিত করে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এই কৃষক নেতা জাহেদ খাঁ জমিদার-জোতদারদের অবৈধ কর ও খাজনা আরোপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ব্রিটিশ সরকারের জেল-জুলুম উপেক্ষা করে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন।

১৯৬৭ সালে সরিষাবাড়িতে আলহাজ্ব জুটমিল লি. নামে একটি বৃহৎ শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়। শিল্পায়নের অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় উপজেলার তারাকান্দিতে স্থাপিত হয়েছে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎশিল্প কারখানা যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি

www.pathagar.com

লি.। ১৯৯২ সাল থেকে এই কারখানায় প্রতিদিন ১৭শ মেট্রিক টন দানাদার ইউরিয়া সার উৎপাদিত হচ্ছে।

ইসলামপুর উপজেলা : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী বিধৌত একটি প্রাচীন জনপদের নাম ইসলামপুর। ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার শাখা নদী ও খাল-বিল বহুল এই এলাকা নদীভাঙ্গন ও বন্যাপ্রবণ। প্রাচীনকালে ভূমিকম্পে এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অনেকটা বদলে গেছে বলে জনশ্রুতি আছে। ইংরেজ আমলে এই অঞ্চল ছিল পাতিলাদহ পরগণার অধীন। বর্তমানে ইসলামপুর সরকারি কলেজের পশ্চিমে দিকে সদররাস্তার দক্ষিণে পাতিলাদহ পরগণার কাচারিঘর ছিল। বর্তমানে সেখানে সরকারি রাজস্ব বিভাগের বিভিন্ন অফিস বিদ্যমান।

এই উপজেলার সাথে ইংরেজ আমলের নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের নানা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই উপজেলার সদর থেকে দেড়মাইল দূরে পলবান্ধা ইউনিয়ন। এই পলবান্ধা ইউনিয়নের ২৬৬ একর জমিসহ আশপাশের বিস্তৃত কৃষিজমিতে অত্যাচারী নীলকর সাহেবেরা চাষিদের নীলচাষে বাধ্য করেছিল। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি নীল চাষ হত। এখানে ইংরেজদের নীলকুঠি ছিল। এখনও নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এবং নীল প্রস্তুতের সরঞ্জামাদির চিহ্নসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

একসময় ইসলামপুর অঞ্চলটি তামা ও কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইসলামপুরের তামা কাঁসাজাত ধাতব শিল্প ও শিল্পের উচ্চস্থানের ব্যাপারে দেশ-বিদেশে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানকার কর্মকারেরা নানা আকৃতি ও প্রকৃতির কাঁসার থালা, বাটি, গ্লাস, রেকাবি, পানের বাটা, সুরমাদানি, আতরদানি, দীপাধার, ধূপাধার, খাট-পালঙ্কের খুরা, কলসি, জগ, কাঁসার ঘণ্টা, ছুরি- তারবারির, বাট প্রভৃতি প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত ছিল। এ প্রসংগে কিংবদন্তি আছে যে, ইসলামপুরী মসৃণ গ্লাসে থাকা মিষ্টি খাবার জন্য গ্লাসের কানি বেয়ে পিঁপড়াও উঠতে পারত না। এছাড়া ইসলামপুরের বড় গোল বেগুন ও আখের গুড় এ অঞ্চলসহ সারাদেশে বিখ্যাত।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা : ব্রিটিশ আমলে দেওয়ানগঞ্জ পাতিলাদহ পরগণার আওতাভুক্ত ছিল। পাতিলাদহ পরগণার বিস্তৃতি ছিল পশ্চিম ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলাব্যাপী। তখন এই পরগণার রাজস্ব রংপুর কালেক্টরে প্রদান করা হত। পাতিলাদহ পরগণার জমিদার ছিলেন মহারাজা প্রদ্যুতকুমার ঠাকুর। সে সময় তাঁর নামানুসারেই এই অঞ্চলকে প্রদ্যুতনগর বলা হত। ১৮৯৯ সালে দেওয়ানগঞ্জে রেলস্টেশন স্থাপিত হলে, রেলস্টেশনের নামকরণও করা হয় প্রদ্যুতনগর রেলস্টেশন। তবে পরবর্তীকালে প্রদ্যুতনগর নামটি স্থায়ীত্ব পায়নি। ফলে প্রদ্যুতনগর রেলস্টেশনের নামটিও পরিবর্তিত হয়ে দেওয়ানগঞ্জ রেলস্টেশন হয়েছে।

১৯৫৮ সালে দেওয়ানগঞ্জ জিলবাংলা সুগারমিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫১ একর জমির উপর পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের যৌথ কারিগরি প্রযুক্তি ও অর্থায়নে এই মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলের এলাকা নির্ধারিত হয় দেওয়ানগঞ্জ বকশীগঞ্জ, মেলান্দহ ও জামালপুর সদর। এই মিল প্রতিষ্ঠার পরই প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। বলা যেতে পারে জিলবাংলা সুগার মিলই এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি।

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জ উপজেলা : মাদারগঞ্জ উপজেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ অঞ্চলে কোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনও নেই। তবে জানা যায়, তিনশ বছর আগে এ অঞ্চলে বাউসমারি, কাতলামারি, চিড়াভিজাবিল, খড়কাবিল ও চতলাবিলসহ বিভিন্ন অঞ্চল মাটির নিচে দেবে যায়। এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। নদীর গতিপথও বদলে যায়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর আবার নতুন করে জেগে ওঠে মাদারগঞ্জ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯০৬ সালের ১৫ই জুন মাদারগঞ্জ একটি থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমাধীন মাদারগঞ্জ এলাকার দক্ষিণে একদিকে যমুনা নদীর উপকূল, অন্যদিকে খরকা বিলের এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে 'মাদারগঞ্জ' থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি নথিপত্রে মাদারগঞ্জ এলাকাধীন 'জামথল মাদারগঞ্জ' নামে একটি মৌজা আছে। এ জন্য অনেকে একসময় এই এলাকাকে জামথল মাদারগঞ্জ বলেও অভিহিত করত। এ ছাড়া যমুনা ও মাদারগঞ্জের পশ্চিম দিকে 'নওখিলা মাদারগঞ্জ' নামে একটি গ্রাম ছিল। বগুড়া থেকে শুরু করে দেশের অন্যান্য এলাকার লোকজন নওখিলার মাধ্যমে গোটা মাদারগঞ্জের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। কালের পরিক্রমায় যমুনা নদীর ভাঙনের কবল থেকে জামথল আর নওখিল নামক নামক মৌজা দুটি রক্ষা পায়নি, যমুনার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে জামথলেরচর নামে একটি এলাকা এখনও আছে, যেটা বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি আর মাদারগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেব পরিচিত।

বর্ষা মৌসুমে জামথলের অধিকাংশ এলাকা নদীর পানিতে ডুবে থাকে। মাদারগঞ্জের প্রশাসনিক থানা এই যমুনা নদীর কারণে পরিবর্তন করা হয়েছে। যেখানে থানার অবস্থান ছিল, সেই জায়গাটি দীর্ঘদিন যমুনার গর্ভে বিলীন থাকার পর বছর কয়েক আগে সেটি আবার স্থলভূমির দেখা পেলেও তা এখন এক বিশাল চরের অন্তর্গত। যমুনা নদীর ভাঙনের তীব্রতা টের পেয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষ থানার সব ধরনের দাপ্তরিক কার্যক্রম সরিয়ে তৎকালীন থানা নির্বাহী কর্মকর্তার (অধুনা UNO) কার্যালয়ের পাশে ভূমি নিবন্ধন অফিসে স্থানান্তর করেছিল। দীর্ঘদিন ভূমি অফিসের অতিরিক্ত একটি টিনশেড ঘরে থানার কার্যক্রম চলে। বর্তমানে মাদারগঞ্জ থানার কার্যক্রম তার নিজস্ব ভবন থেকেই পরিচালিত হচ্ছে। মাদারগঞ্জ সদরের অদূরে জোনাইল এলাকায় থানা ভবনটি অবস্থিত। আর এ মধ্য দিয়েই মাদারগঞ্জ থানা নতুন যুগে প্রবেশ করে। বর্তমানে মাদারগঞ্জ থানাটি দেশের অন্যতম মডেল থানা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মাদারগঞ্জ থানা এলাকাটির দক্ষিণ দিক দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত হয়েছে। সময়ের প্রবহমানতায় নদী বিভিন্ন সময় তার রাক্ষুসে স্বভাবের দরুণ তার গর্ভে বিলীন করে দিয়েছে তার বুক ঘেঁষে গড়ে ওঠা আসল মাদারগঞ্জের অনেকাংশই। তাই মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে মাদারগঞ্জের একেবারে লাগোয়া এলাকা বালিজুড়ি বাজারে আস্তে আস্তে মাদারগঞ্জের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই স্থানান্তরিত হয়েছে। দলিল-দস্তাবেজ এমনকি সরকারি কাগজপত্রে মাদারগঞ্জ লেখা হলেও বা বাইরের পরিচিতি মাদারগঞ্জ হলেও বর্তমানে বালিজুড়ি বাজারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠা কর্মচাঞ্চল্যময় এলাকাকেই

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জ সদর হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। কেননা, স্থান হিসেবে মাদারগঞ্জকে এখন খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। যদিও বালিজুড়িকে এখন আর মানুষ ক্ষুদ্রার্থে বাজার হিসেবে বিবেচনা করে না। এখন বালিজুড়ি বাজার মানে 'শহর'। বালিজুড়ি বাজার এখন মাদারগঞ্জ উপজেলা সদর তো বটেই, বালিজুড়ি বাজারকে ঘিরে এখন পুরো মাদারগঞ্জবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাও নির্ভর করে।

বকশীগঞ্জ উপজেলা : জামালপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী ও লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ উপজেলা বকশীগঞ্জ। এ উপজেলার অতীত ইতিহাস গৌরবময়। ব্রিটিশ আমলে পাতিলাদহ পরগনার রাজেন্দ্রগঞ্জ (বর্তমান বকশীগঞ্জ) মহারাজা প্রদ্যুতকুমার ঠাকুরের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বকশীগঞ্জ তহশীল অফিস সংলগ্ন মহারাজার পুরনো কাচারি ভবন কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ উপজেলার এক সময় নদ-নদী, খাল-বিলে পূর্ণ ছিল। ব্রহ্মপুত্রের শাখা দশানী নদীর উত্তাল জলে মহারাজার পাকপেয়াদা বহনকারি বজরা, সওদাগরের বাণিজ্যতরি ও মালবাহি জাহাজ চলাচল করত। এখানকার গয়নাঘাট ও কাঁঠালতলী ঘাট সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি আছে।

বকশীগঞ্জ উপজেলায় তেমন কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকলেও অন্যায় অত্যাচরের বিরুদ্ধে এখানকার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। ১৮২৫ সালে কৃষক বিদ্রোহের নেতা টিপু শাহ দু-বছর শেরপুরের রাজত্ব করেন। ১৮২৭ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে এক যুদ্ধে টিপু শাহ পরাজিত হয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৮৩৩ সালে তার অন্যতম শিষ্য জানকু পাথর বকশীগঞ্জের বাট্টাজোড়ের পাহাড়ি এলাকা থেকে অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে শেরপুর আক্রমণ করেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে জামালপুর পাবলিক মেলার হাঙ্গামার প্রতিশোধ নিতে এখানকার বিদ্রোহী কৃষকরা জমিদার জোতদারদের প্রতিষ্ঠিত বকশীগঞ্জ বাজার লুটতরাজ করে। এ সময় জমিদার জোতদারেরা কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা বকশীগঞ্জের চরকাউরিয়া, মালিরচর ও নিলাখিয়ার উর্বর জমিতে নীলচাষ শুরু করে। মালিরচরের নীলকুঠির ধ্বংস্তূপ এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ব্রিটিশ আমলে বকশীগঞ্জ মাঝপাড়ার ননী মাধব, বেনে মাধব ও রমেশ মাধব নামে তিন সহোদর স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। বকশীগঞ্জের কামালপুর পাহাড়ে গারো সম্প্রদায় বসবাস করে। এখানে রয়েছে একটি স্থলবন্দর। লাউচাপড়া গ্রামের সবুজ উঁচুনিচু গারো পাহাড় অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে একটি আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট এবং অবসর বিনোদন কেন্দ্র আছে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে বকশীগঞ্জবাসী প্রতিবাদ করেছে। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বকশীগঞ্জবাসীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে বকশীগঞ্জের কামালপুরে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে একটি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ।

ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল

জামালপুর জেলা নদ-নদী ও খাল-বিল বহুল অঞ্চল। এ জন্য প্রায় প্রতিবছর এ জেলার কিছু কিছু এলাকা বন্যাকবলিত হয়ে থাকে। জামালপুর জেলার প্রধান নদ-নদী দুটি–

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্র নদ ও যমুনা নদী। ব্রহ্মপুত্র নদ ও যমুনা নদীর শাখা-প্রশাখাই উপজেলাসমূহে প্রবহমান। এসব শাখা-প্রশাখা নদী উপজেলাসমূহে বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রথমে জেলার প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর উৎপত্তির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ব্রহ্মপুত্র নদ : ভারতের আসাম-পর্বতমালা-মধ্যস্থিত 'ব্রহ্মকুণ্ড' বা 'লোহিত্য-সরোবর' হতে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি। 'ব্রহ্মকুণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া ডাক্তার গ্রিফিথ্স এই মত প্রচার করিয়াছেন।' ব্রহ্মপুত্র আসাম প্রদেশ অতিক্রম করে রংপুরের চিলমারী দিয়ে জামালপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। একসময় ব্রহ্মপুত্র এক সুবিশাল নদ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার তিন গুণ ছিল বলে ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন লিখেছেন। তখন ব্রহ্মপুত্রের প্রশস্ততা ছিল ৮/১০ মাইলেরও বেশি। আইন-ই-আকবরিতে উল্লেখ রয়েছে– শেরপুর হতে জামালপুর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র দশমাইল প্রশস্ত ছিল। এই দশ মাইল পারাপারের জন্য দশকাহন কড়ি নির্দিষ্ট ছিল। যে কারণে শেরপুর একসময় 'দশকাহনীয়া শেরপুর' নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনা নদীর উৎপত্তি হয়। যমুনা নদীর উৎপত্তির ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। ফলে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ক্রমে তার বিশালত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্রের অবস্থা অনেক শোচনীয়। অশোক অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদ তীর্থবাজ বলে আখ্যাত হয়। সেদিন ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান হিন্দুদের এক পরম পবিত্র কাজ। সেদিন দূর-দূরান্ত থেকে হিন্দু নারীপুরুষ ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানের জন্য ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্তী স্থানসমূহে সমাগত হয়।

যমুনা নদী : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনা নদীর উৎপত্তি হয়। পূর্বে তা একটি ছোট্ট খালের মতো প্রবাহিত হত। তখন তা জনায়ী নামে পরিচিত ছিল। '১৭৭৮ সালে জেমস রেনেল সাহেব বঙ্গদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি 'যবুনা'র কোন চিহ্নই দেখান নাই।' ব্রহ্মপুত্র তখন বিশালকায় নদ। তার বুকে মহাস্রোত। 'দাত্তকোবার নিকট ব্রহ্মপুত্রের মুখ পলি পড়িয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্রতোয়া জনায়ী নদীতে ব্রহ্মপুত্রের প্রবলতর স্রোত প্রবাহিত হয় ও যবুনার উৎপত্তি হয়।' উদ্ধৃতি অংশে যমুনাকে যবুনা উল্লেখ করা হয়েছে। যমুনা নদী জামালপুর জেলার পশ্চিম সীমা রক্ষা করে চলেছে। নিম্নে জামালপুর জেলার উপজেলাভিত্তিক নদ-নদী ও খাল-বিলের পরিচয় তুলে ধরা হলো–

জামালপুর সদর : জামালপুর সদর উপজেলার প্রধান নদ-নদী ব্রহ্মপুত্র ও ঝিনাই। ঝিনাই ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী। একসময় ঝিনাই নদীর আকৃতি অনেক প্রশস্ত ছিল। তখন ঝিনাই নদীরপাড়ে ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এ উপজেলায় বিল আছে ৩৫টি এবং খাল আছে ১২টি।

মেলান্দহ উপজেলা : এ উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ঝিনাই, দাঁতভাঙ্গা ও কেখরা বা ঝারকাটা নদী। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

ঝিনাই নদী : প্রাচীনকালে অতি বেগবান ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা নদী হচ্ছে ঝিনাই। এটি মেলান্দহ থানার চরপলিশা গ্রামের সামনে দিয়ে দক্ষিণে সরিষাবাড়ির

www.pathagar.com

উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদীতে পড়েছে। মেলান্দহ অঞ্চলের জনজীবনে এ নদীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এ নদী নিয়ে একটি প্রবাদ এরকম—

ঝিনাই নদীর শীর্ণ কায়া শীর্ণ বেশ
দুই তীরে তার গঞ্জ গায়ের নাই গো শেষ।

এ নদীতে একসময় নৌকাবাইচ হতো। এসব বিচিত্র কাহিনি জনমনে আজও স্মৃতি হয়ে আছে। সারাবছর ধরে কত নৌকা চলত এ নদীর উপর। প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এ নদীতে। এখন এ নদী মৃত প্রায়। বর্ষাকালে পানির প্রবহমান থাকলেও শুকনা মৌসুমে শুকিয়ে যায়। জনজীবনে এ নদীর গুরুত্ব অনেক বেশি।

দাঁতভাঙ্গা নদী : অতি প্রাচীনকালে এ নদীটিও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ হতে উৎপন্ন হয়ে পয়লা ব্রিজের নীচ দিয়ে উরমা বিলের মধ্যদিয়ে দক্ষিণে বাশুরিয়া গ্রামের পাশ ঘেঁষে সরিষাবাড়িতে প্রবাহিত যমুনার সাথে মিশেছে। এই নদীটিই হাজরাবাড়ি এলাকায় দাঁতভাংগা ও পয়লা এলাকায় মাদারদহ নামে পরিচিত। এ নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এ নদীর মাছ দ্বারা মেলান্দহ এলাকার মাছের চাহিদা অনেকটা পূরণ হয়।

কেখরা বা ঝারকাটা নদী : এ নদীটিও ইসলামপুরে যমুনা নদী হতে উৎপন্ন হয়ে মাহমুদপুর বাজারের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে সরিষাবাড়িতে যমুনায় গিয়ে মিশেছে। এ নদীটি কেখরা বা ঝারকাটা নদী নামে পরিচিত। এ নদীর কৈ মাছ ছিল বিখ্যাত। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রবাদের প্রচলন রয়েছে—

কেখরা নদীর কৈ মাছ
খেতে বড় মজা
হরিপুরের তেলে যদি
কর তারে ভাজা।

তবে এ নদীতে আরো অনেক রকম মাছ পাওয়া যায়।

মেলান্দহ উপজেলায় ছোট বড় প্রায় দুইশতাধিক বিল আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রৌমারী বিল, গোদাডাংগা বিল, ডাংগার বিল, দরগাডাংগা বিল, ভারারদহ বিল, মরা গাং, সিথানি বিল, হরকা বিল, কালিদহ বিল, দরগাতলা বিল, কামাখ্যা বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রৌমারী বিল : এ বিল ঝাউগড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এতে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেত। এখনও রুই, কাতলা ছাড়াও বিভিন্ন রকম মাছ চাষ করা হয়।

গোদাডাংগা বিল : ফুলকোচা উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে এর অবস্থান। এর তীরে স্কুলের অবস্থান হওয়ায় উভয়েই উভয়ের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। এর ঝকঝকে পানিতে রুই কাতলা মাছ ভেসে বেড়ায়। এ বিলের সুস্বাদু কর্তি মাছ সকলের প্রিয় ছিল। এখন এ বিল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষের ফলে এ বিলের মাছে এখন আগের সেই স্বাদ আর পাওয়া যায় না।

ডাংগার বিল : এ বিলটি বালুয়াটা গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। এখন এ বিলটি ভরাট করে ইরিধানের চাষ করা হয়।

www.pathagar.com

দরগাডাংগা বিল : দুরমুঠে এ বিলের পশ্চিমপাড় ঘেষে হযরত শাহ কামালের (র.) স্মৃতিবিজড়িত মাজার শরিফের পূর্বপাড় ঘেষে বিলটি অবস্থিত। উক্ত দরগাহের নামানুসারে এ বিলের নামকরণ হয় দরগাডাংগা বিল। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা নদী দরগার গা ঘেঁষে প্রবাহিত হচ্ছিল। এর দক্ষিণ দিকে চারদিক থেকে পলিমাটি এসে এ নদীটি ভরাট হয়ে যায়। এ বিলটিকে ঘিরে অনেক অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে। হযরত শাহ কামালের মাজারে শিরনি দিতে আসা লোকজন পাকসাফ হয়ে পবিত্র শরীর মনে থালা-বাসন বড় ডেকচি প্রার্থনা করলে সেগুলো বিল থেকে আপনা-আপনি ভেসে উঠত। তারপর ব্যবহার শেষে সেগুলো ফেরত দিলে আপনা আপনি পানিতে ডুবে যেত। শুধু মাজারে শিরনি দেওয়া উপলক্ষে নয়, ঐ এলাকার কেউ যদি বিয়ে-সাদির জন্য থালা-বাসন ইত্যাদি প্রার্থনা করলে সেগুলোও পাওয়া যেত। এ বিলে এখনও হরেক রকম মাছ পাওয়া যায়।

ভারারদহ বিল : ৪ নং ইউনিয়নের পশ্চিমে ৬নং আদ্রা ইউনিয়নের উত্তরে এক বিরাট এলাকা জুড়ে ভারারদহ বিলটির অবস্থান। বকচড়িসহ আরো কয়েকটি ছোট ছোট বিলের সমন্বয়ে গঠিত এ বিলের আগের রূপটি নেই। খাসজমি বন্দোবস্তের কারণে স্থানীয় লোকজনের দখলে চলে গেছে। এ বিলের চারদিকে ইরি বুরো ধানের চাষ হয। আগে শীত মৌসুমের পৌষমাস থেকে এ বিলের মাছ ধরা শুরু হত। দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে লোক এসে ভোর থেকে সারাদিন মাছ ধরত। একে স্থানীয় ভাষায় বলা হত বোয়াইতনামা। এখন বোয়াইতের চল প্রায় বিলুপ্ত।

এছাড়া অন্যান্য বিলের মধ্যে মামা-ভাগিনা, মরা গাং, সিথানি বিল, হরকা বিল, উর্মাবিল, মরা গাং, কালিদহ, কামাখ্যা বিলের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব বিলকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে। যেমন জালালপুরের কালিদহ বিলে প্রতি বছর কালীমূর্তি ভেসে উঠত, কামাখ্যা বিলে অমাবস্যার রাতে মানুষ অসাধ্য সাধন করার সাধনা করত ইত্যাদি। এসব বিল লোকজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। কৃষিকাজ, মাছধরা, নৌকাবাইচের কেন্দ্র এ বিলগুলো মানুষের জীবন-জীবিকার বড় উৎসও বটে।

সরিষাবাড়ি উপজেলা : এ উপজেলার প্রধান নদ-নদী ৬টি। এ নদীগুলো ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর শাখা নদী। নদীগুলো হলো— যমুনা, ঝিনাই, জলগতিনাথ, পেরুয়া রৌহা, খালিশাকুড়ি ও শিশুয়া। এ উপজেলাতেও বেশ কয়েকটি খাল-বিল রয়েছে।

ইসলামপুর উপজেলা : এ উপজেলার প্রধান নদ-নদী ব্রহ্মপুত্র, দশানী ও যমুনা। এ উপজেলাতেও অনেক খাল-বিল রয়েছে।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা : এ উপজেলার প্রধান নদ-নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও জিঞ্জিরাম। এ উপজেলাতেও কয়েকটি খাল ও বিল রয়েছে।

মাদারগঞ্জ উপজেলা : যমুনা নদীই মাদারগঞ্জের প্রধান নদী। যমুনা ছাড়া চতলা ও ঝড়কাটা নামে দুটি আলাদা নদী প্রবাহিত। চতলা ও ঝাড়কাঁটা দুটি নদীই যমুনার শাখা নদী। শাখা নদী দুটিই আবার স্থানভেদে পৃথক নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ ছাড়া এ উপজেলায় খাল-বিল আছে প্রচুর। যেগুলোতে একসময় সারা বছর পানি জমে থাকত। সেসব খাল-বিলের পানিতে পাওয়া যেত প্রচুর মাছ। এসব দিয়ে সারা বছরের মাছের চাহিদা মেটাত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় লোকজন।

www.pathagar.com

খরকা, ভুরভুরে, পানাগাড়ি ও কইয়ের বিলের নাম-ডাক এখনো এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখে মুখে শোনা যায়। প্রতিটি বিলেই একসময় প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। শুধু তা-ই নয়, এসব বিলের পানি দিয়ে তীরঘেঁষা জমিতে ধানও উৎপাদন করা হতো। স্থানীয় লোকজন এসব বিলের মাছ দিয়েই তাদের নিত্যদিনের আমিষের প্রয়োজন মেটাত। অনেকে আবার বিলের মাছের ওপর জীবিকাও নির্বাহ করত। তবে বর্তমানে কইয়ের বিলের কোনো অস্তিত্ব নেই। জনরব আছে এই বিলের কই মাছ ছিল অন্য যে কোনো জায়গার কই মাছের চেয়ে বেশি সুস্বাদু। এমনকি এই বিলে কই মাছই বেশি পাওঁয়া যেত অন্য মাছের তুলনায়। আর পানাগাড়ি বিলটি আজ থেকে বছর বিশেক আগেও তার স্বভাবধর্ম নিয়ে টিকে ছিল। কিন্তু ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আশপাশের মানুষ বিলটি দখল করে এখন বসতি গড়া শুরু করেছে। প্রচুর বাড়িঘর চোখে পড়ে এখন বিল-এলাকায় গেলে। কিয়দংশ এখনো ফাঁকা থাকলেও সেসব জায়গায় ইরি ধানের চাষ করা হয়। তবে পানাগাড়ি বিলের অস্তিত্ব এখনো বিলুপ্ত হয়নি। ধান চাষ করা বিশাল এলাকা চোখে পড়লে এখনো বিলের অস্তিত্বই জানান দেয়। আর যমুনা নদীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকায় নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভুরভুরে আর খরকা বিল দুটি এখনো টিকে আছে। বিশেষ করে খরকা বিলে পানি বাড়া-কমা নির্ভর করে যমুনা নদীর পানির হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর। সরাসরি সংযোগ না থাকায় একটু দেরিতে হলেও ভুরভুরে বিলে যমুনার পানি বৃদ্ধির প্রমাণ পেতে হয় খরকার মাধ্যমেই। জনবসতির প্রাবল্যের দরুন বিল দুটির চারপাশ ছোট হয়ে এলেও এখনো সারা বছর পানিপ্রবাহ থাকে বিল দুটিতে। তবে মাছের প্রাচুর্য আর আগের মতো দেখা যায় না।

বকশীগঞ্জ উপজেলা : এ উপজেলার প্রধান নদ-নদী ব্রহ্মপুত্র, দশানী ও জিঞ্জিরাম। বিল ৫টি ও খাল ৩টি। বিলগুলোর নাম হলো— জোরকাবিল, মালিরচর বিল, সিঙ্গিডোবা বিল, কুড়িবিল বা দুর্গাদহ বিল ও জয়ন্তী বিল।

চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জামালপুর জেলায় ইংরেজি বা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা ঘটে ১৮৮১ সালে, ব্রিটিশ শাসনামলে। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন জামালপুর মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন টিও ডনো নামের এক ইংরেজ। তিনি ১৮৮১ সালে জামালপুর মহকুমা শহরে সর্বপ্রথম একটি ইংরেজি মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে তৎকালীন জামালপুর মহকুমায় শিক্ষার নবযুগের সূচনা হয়। এ জন্য এই ইংরেজ ব্যক্তিটিকেই জামালপুরের আধুনিক শিক্ষার অগ্রদূত বলে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীসময়ে স্কুলটি 'ডনো হাই স্কুল' নামে পরিচিতি পায়। বর্তমানে এই স্কুল 'জামালপুর জিলা স্কুল' নামে পরিচিত।

টিও ডনো সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে এতদঅঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক. মুসলমান সমাজে মসজিদকেন্দ্রিক মক্তবে ধর্মীয় পাঠদান ব্যবস্থা; দুই. হিন্দু সমাজে পাঠশালা, টোল বা গুরুগৃহকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মুসলমান সমাজ তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী ছিল। তারা ধর্মীয় শিক্ষাকে ধর্মীয় অনুশাসন জ্ঞান করত।

www.pathagar.com

ডনো সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠার পর কিছুকালের মধ্যেই জামালপুর শহরে এবং মহকুমার অন্যত্রও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। আরো পরে '৪৭ এর দেশবিভাগের বছরে এ অঞ্চলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়। ক্রমে জামালপুর সদরসহ অন্যান্য থানাতেও দুই/একটি করে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর জামালপুর জেলায় অধিকাংশ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে এতদঅঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে।

১৯৭২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়কালে জামালপুর জেলায় বহু প্রাইমারি স্কুল, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি স্কুল ও আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশকিছু স্কুল এবং কলেজ সরকারিকরণ হয়েছে। বর্তমানে জামালপুর জেলার শিক্ষার হার ৪৫%। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে এই শিক্ষার হার ছিল ১৪.৭৯%। নিম্নে উপজেলাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম এবং কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো।

সদর উপজেলা : জামালপুর সদর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয়গুলো হলো– জামালপুর জিলা স্কুল (১৮৮১), জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮২), সিংহজানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০১), সিংহজানী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৮), কৈডোলা শাহবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, (১৯২০) বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৪), নান্দিনা এম.এইচ.কে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৫), নান্দিনা এম. গার্লস স্কুল, জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৪), নুরুন্দি হাই স্কুল ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এখানে বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান নাম উল্লিখিত হয়েছে।

জামালপুর জিলা স্কুল সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি তৎকালীন স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী মহিমচন্দ্র ঘোষ ও মহিমচন্দ্র সেনের উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে আরবান গার্লস স্কুল নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। লক্ষ্য ছিল মেয়েদের শিক্ষার বিস্তার। জামালপুর পাবলিক মেলার অর্থানুকূল্যে স্কুলটি বিল্ডিং করা হয়। পরবর্তীকালে স্কুলটি জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সিংহজানী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়টি তৎকালীন তারাকান্ত আচার্য, শশী মোহন দে, গোলাম মোহাম্মদ, দেবেন্দ্রনাথ সেন রায়, অক্ষয় কুমার সেন রায় প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। নান্দিনা এম.এইচ.কে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন সুশীল কুমার বসু। তৎকালে এই স্কুলে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছিল। জামালপুরের শিক্ষাবিস্তারে স্কুলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি নান্দিনা এম. গার্লস স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন।

জামালপুর জেলার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো– জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ (১৯৪৭), নান্দিনা শেখ আনোয়ার হোসাইন কলেজ (১৯৬৬), সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ (১৯৬৭), নরুন্দি কলেজ ইত্যাদি।

তৎকালীন জামালপুর মহকুমায় মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্‌রাসা হতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে শহরের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে, কাজী আশরাফ হোসেন, গোলাম

www.pathagar.com

মোহাম্মদ, আব্দুল করিম (সাবেক স্পিকার), আব্দুর রহিম, বিলায়েত হোসেন, ইদ্রিস আলী খাঁ, মেহের আলী, আব্দুল হামিদ, গুরুসদয় দত্ত, (তৎকালীন অবাঙালি এসডিও) পানাউল্লাহ আহম্মদ ও ফয়েজউদ্দিন প্রমুখ জামালপুর শহরে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে জামালপুর পাবলিক মেলার ফান্ড থেকে প্রদত্ত ২০,০০০/- টাকা দিয়ে প্রস্তাবিত জামালপুর কলেজ নামকরণে একটি অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করা হয়। পাবলিক মেলা প্রদত্ত আয়ের ৩৮১৩ টাকা ব্রিটিশ সরকারকে প্রদান করে কলেজের নামে বরাদ্দের জন্য ৯৩ বিঘা জমি ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। উপরন্তু ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে জামালপুরের কলেজ স্থাপনের কাজ স্থগিত হয়ে পড়ে। এর তিন বছর পর ১৯৪৬ সালে জামালপুরে একটি দ্বিতীয় শ্রেণির আর্ট কলেজ এফিলিয়েশন প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় জামালপুর মহকুমাধীন মাদারগঞ্জ থানার দানবীর আশেক মাহমুদ তালুকদার কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৪০,০০০/- টাকা দান করেন। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কলেজটির নাম পরিবর্তন করে আশেক মাহমুদ কলেজ নামকরণ করা হয়। দেশ বিভাগের সময় প্রতিষ্ঠিত আশেক মাহমুদ কলেজ এ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন জামালপুর মহকুমায় একমাত্র আশেক মাহমুদ কলেজটি ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। এ কলেজের ইতিহাস গর্ব করার মতো। বহু ছাত্র সম্মানিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। বর্তমানে এই ঐতিহ্যবাহী কলেজটিতে অনার্স বিভাগ খোলা হয়েছে।

সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন জনাব সফির উদ্দিন আহমদ। তিনি জামালপুর শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী জাহেদা বেগমের নামানুসারে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে কলেজটি সরকারিকরণ হয়। জামালপুর সদরে এটিই একমাত্র মেয়েদের জন্য কলেজ। সেদিক থেকে কলেজটির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

মেলান্দহ উপজেলা : মেলান্দহ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয়গুলো হলো– হাজরাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় (১৯২৬), মেলান্দহ উমির উদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৭), কলাবাধা উচ্চ বিদ্যালয়, ফুলকোচা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝাউগড়া উচ্চ বিদ্যালয়, মাহমুদপুর হাই স্কুল, মেলান্দহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি। মেলান্দহ উমির উদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়টি এ উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল। কলাবাধা উচ্চ বিদ্যালয়টিও বিখ্যাত। দুরমুট ইউনিয়নের সৈয়দ রশিদুজ্জামান ও কলাবাধার রাজেন্দ্র চন্দ্র সেনের উদ্যোগে ও অর্থায়নে কলাবাধা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ উপজেলার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো— মেলান্দহ সরকারি মহাবিদ্যালয়, জাহানারা লতিফ মহিলা মহাবিদ্যালয়, হাজরাবাড়ি সিরাজুল হক কলেজ এবং সাম্প্রতিককালের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ফিশারি কলেজ ইত্যাদি।

সরিষাবাড়ি উপজেলা : সরিষাবাড়ি উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো– পিংনা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯৬), ডোয়াইল উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১১), চাপারকোণা মহেষচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯), সরিষাবাড়ি আর.ডি.এম.

www.pathagar.com

পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২০), রিয়াজউদ্দিন তালুকদার উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৯), ভাটারা হাই স্কুল ইত্যাদি।

সরিষাবাড়ি পিংনা উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৮৯৬ সালে। ১৯০৭ সালে বিদ্যোৎসাহী শশীমোহন চৌধুরী স্কুলটি বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তর করেন। প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ এই স্কুলে পড়েছেন। ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এই স্কুল পরিদর্শন করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন ও মৌলবি তমিজ উদ্দিন খান প্রমুখ। সরিষাবাড়ি আর.ডি.এম. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে রানী দিনমনি চৌধুরানী। বিদ্যোৎসাহী মৌলবি মোতাহের আলী খানের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় ভাটারা হাই স্কুল। তিনি দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাসও স্থাপন করেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো– আলহাজ্ব রিয়াজউদ্দিন তালুকদার ডিগ্রি কলেজ (১৯৬৭), পোগলদিঘা কলেজ, মাহমুদা সালাম মহিলা কলেজ, পিংনা সুজাত আলী কলেজ ইত্যাদি।

ইসলামপুর উপজেলা : এ উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইসলামপুর নেকজাহান পাইলট বিদ্যালয় (১৯১৫), ইসলামপুর জে.জে.কে.এম. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ (১৯১৮), নেকজাহান গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, চিনাডুলী এস.এন. উচ্চ বিদ্যালয়, গুঠাইল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢেংগারগর ফজলুল হক উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি। ১৯১৫ সালে ইসলামপুরের জমিদার আইজউদ্দিন চৌধুরীর অর্থায়নে সাবেক এম.এল.এ. রফিক উদ্দিন খাঁ নেকজাহান পাইলট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার আইজউদ্দিন চৌধুরীর মাতা নেকজাহান বিবির স্মরণে স্কুলটির নামকরণ হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো– ইসলামপুর কলেজ, পারভেজ মেমোরিয়াল মহিলা কলেজ, মলমগঞ্জ মডেল কলেজ ইত্যাদি।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা : দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো হলো– দেওয়ানগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯), জিলবাংলা সুগার মিল উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, দেওয়ানগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সানন্দবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, সানন্দবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি। দেওয়ানগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি উত্তরাঞ্চলের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি। ব্রিটিশ আমলে প্রাদেশিক রেজিস্টার মি. ডনোফন কো-অপারেটিভ ব্যাংকের অর্থায়নে দেওয়ানগঞ্জ কো-অপারেটিভ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এটি দেওয়ানগঞ্জ হাই স্কুল নামে অভিহিত হয়। সাবেক এম.এল.এ. ডা. রফিক উদ্দিনের পিতা ছমির উদ্দিন তালুকদার এই স্কুলের নামে ১২ বিঘা জমি দান করেন। বর্তমানে স্কুলটি সরকারিকরণ হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ.কে. মেমোরিয়াল কলেজ (১৯৭০), সানন্দবাড়ি কলেজ, মোফাজ্জল হোসেন মেমোরিয়াল কলেজ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জ উপজেলা : মাদারগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো : বালিজুড়ি এফ.এম.উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১০), বালিজুড়ি আর.এ. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মহিষবাথান আর.এম. উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারগঞ্জ এ.এম. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, আদারভিটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি। বালিজুড়ি এম.এম. উচ্চ বিদ্যালয়টি মাদারগঞ্জের সাবেক এম.এন.এ. রফাতউদ্দিন তালুকদারের পিতা ফাজেল মাহমুদ প্রতিষ্ঠা করেন। দানবীর হাজি ফাজেল মাহমুদ এ অঞ্চলে 'মহসীন' বলে খ্যাত ছিলেন।

মাদারগঞ্জ উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মাদারগঞ্জ এ.এইচ.জেড. সরকারি কলেজ (১৯৬৮), নূরুন্নাহার মির্জা কাসেম মহিলা কলেজ ইত্যাদি।

বকশীগঞ্জ উপজেলা : বকশীগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো– সারমারা নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৯১), বকশীগঞ্জ এন.এম. উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৫), নীলক্ষিয়া আর.জে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩০), বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি। সারমারা নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়টিই বকশীগঞ্জের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি একটি মাইনর স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে স্কুলটি হাই স্কুলে উন্নীত হয়। বকশীগঞ্জ এন.এম. উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রথমে মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জোতদারময়েজ উদ্দিন সিদ্দিকী এটি প্রতিষ্ঠান করেন। পরে এটি নূর মোহাম্মদ হাই স্কুলে পরিণত হয়। এ সময় জোতদার মঈনউদ্দিন ও তাঁর ভগ্নিপতি মির্জা আসাদ উদ্দিন হায়দার নিলক্ষিয়ায় একটি মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সাবেক এম.এল.সি. আজিজুর রহমান ও সাবেক অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে নিলক্ষিয়া রূপজান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় নামকরণ করেন।

বকশীগঞ্জ উপজেলার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো– বকশীগঞ্জ কিয়ামতউল্লাহ সরকারি কলেজ, বকশীগঞ্জ খোতেমুন মইন মহিলা ডিগ্রি কলেজ ইত্যাদি।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

হযরত শাহ্ জামাল (র.) এর মাজার : জামালপুর জেলার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন হযরত শাহ্ জামাল (র.) এর মাজার। এই মাজারটি জামালপুর সদর উপজেলার উত্তরে, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে, সদর পুলিশ স্টেশন এবং কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ মাঠের মাঝামাঝি সদর রাস্তার পাশে অবস্থিত।

হযরত শাহ্ জামাল (র.) সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সাল-তারিখ, তাঁর শৈশব-কৈশোর জীবন, শিক্ষা জীবন, সংসার-জীবন— এসব সম্পর্কে ইতিহাসে কোনো বিবরণ নেই। তিনি বিয়ে করেছিলেন কিনা, তাঁর সন্তান-সন্তুতি বা কোনো বংশধর ছিল কিনা– সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এমনকি, তিনি এই মাজার শরিফেই সমাহিত আছেন কিনা– সে সম্পর্কেও কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই।

www.pathagar.com

তাঁর সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হলো– ভারত সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, ১৫৫৬ সাল থেকে ১৬০৫ সালের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সুদূর ইয়েমেন প্রদেশ থেকে তিনি এই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল সিংহজানী। দরগার নামফলকে উল্লেখ আছে– 'হযরত শাহ্ জামাল (র.) সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ইয়েমেন থেকে সিংহজানী মৌজায় আগমন করে ইসলাম প্রচারে ব্রত হন। সম্রাট আকবর হযরত শাহ্ জামাল (র.) এর অলৌকিক কার্যাবলী জ্ঞাত হয়ে তাঁকে ভূমি উপহারের সনদে ভূষিত করেন। হযরত শাহ্ জামাল (র.) এর নাম অনুসারে জামালপুর জেলার নামকরণ হয়েছে।' উল্লিখিত লেখা থেকে জানা যায়, তিনি এই অঞ্চলে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি অলৌকিক গুণাবলী সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁর অলৌকিক গুণাবলীর কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে মাজারের নামফলকে উৎকীর্ণ এ-লেখা পরবর্তীকালের, জামালপুর জেলা (১৯৭৮ সালে) হওয়ার পর।

তবে জামালপুরের ইতিহাসকার গোলাম মোহাম্মদের ১৯৫৪ সালে মুদ্রিত 'জামালপুরের গণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থেও হযরত শাহ্ জামাল (র.) সম্পর্কে উপরোক্ত তথ্যেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন– 'ভারত সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আরবের ইয়েমেন প্রদেশ হইতে, দেশভ্রমণ উপলক্ষে, হজরত শায়েখ জামাল নামক একজন কামেল এই উপবিভাগে আগমন করেন এবং ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া স্বচ্ছতোয়া ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে বর্ত্তমান জামালপুর নামক স্থানে তাঁহার আস্তানা বা তপোবন স্থাপন করত মোরাকেবা ও মোশাহেদায়রত থাকেন। তাঁহার কৃচ্ছসাধনা ও অলৌকিক কার্যাবলীর কথা অচিরেই দিল্লী পর্যন্ত পহুছিলে (পৌঁছেছিল)

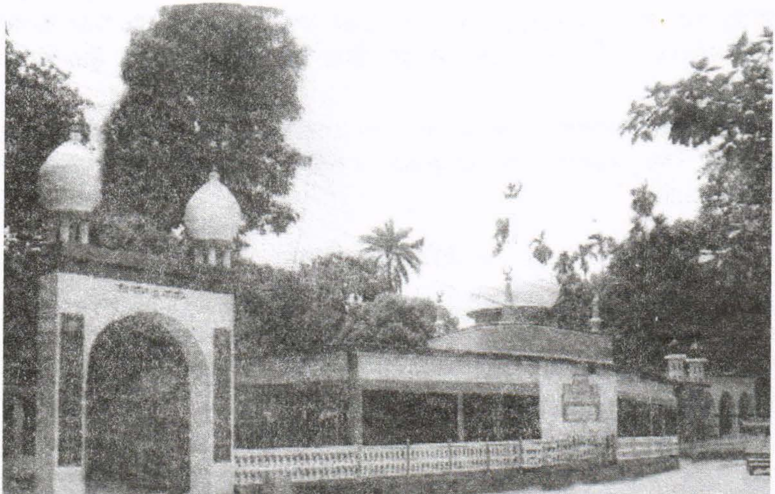

হযরত শাহ্ জামাল (র.)-এর মাজার

www.pathagar.com

মহামান্য ভারত সম্রাট, তাঁহার খান্‌কা শরীফের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে (নির্বাহিতে) বর্ত্তমান জামালপুরের অন্তর্গত কয়েকটি পরগণা 'পীরপাল' দান পূর্ব্বক পীর সাহেবের নিকট উহার সনদ পাঠাইয়া দেন। কিন্তু নিস্পৃহ আওলিয়া উহা গ্রহণ করেন নাই'। তাঁর লেখা থেকে আরও জানা যায়– 'জামালপুরে শাহ জামাল সাহেবের রওজা আছে কিনা ইতিহাসে তার উল্লেখ নাই।'

হযরত শাহ্ জামাল (র.) যখন সিংহজানী মৌজায় আগমন করেন, তখন সিংহজানী ছিল এক অজ গ্রাম। তাঁর আগমনের পরেই এতদঅঞ্চলে মানুষের সমাগম বাড়ে এবং ক্রমে শহর হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। জামালপুর জেলার রজতজয়ন্তী স্মরণিকার একটি লেখা থেকে জানা যায়, 'হযরত শাহ্ জামাল (র.) এর বর্তমান মাজারটি একটি বৃহৎ বটগাছের নিচে ছিল। চারদিকে জঙ্গলে ভরা ছিল। বটগাছটি কেটে এই মাজারের মূল অংশ উদ্ধার করেন হযরত চুপ শাহ্ নামের এক কামেল পির। তিনি এখানে পরিষ্কার করে ছোট একটি চালার ব্যবস্থা করেন। এই মাজারের সাথে হযরত চুপ শাহ (র.) এরও একটি মাজার রয়েছে। তিনি ময়মনসিংহ জেলা শহরের পুলিশ লাইনে সমাহিত আছেন। চুপ শাহ্ (র.) এর আদেশে মো. নূরুল হুদা নামে এক শিষ্য দীর্ঘ ছত্রিশ বছর হযরত শাহ্ জামাল (র.) এর দরগা শরিফের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।'

হযরত শাহ জামাল (র.) এর এই সুপ্রাচীন মাজার শরিফে প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শেষ ৩দিন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ৬দিন মোট ৯দিন ব্যাপী উরস অনুষ্ঠিত হয়। তখন সারাদেশ থেকে এবং পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বহু ভক্ত-অনুরাগীর সমাগম ঘটে এই সুপ্রাচীন মাজার শরিফে।

ঐতিহ্যবাহী দয়াময়ী মন্দির : সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জামালপুর জেলাসদরে অবস্থিত দয়াময়ী মন্দির অন্যতম। প্রায় সোয়া তিনশ বছর আগে, বাংলা ১১০৪ সনে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলী খান। তার এক বিশ্বস্ত সহচর, ময়মনসিংহ ও জাফরশাহি পরগণার জায়গিরদার শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী শ্রী শ্রী ঁরী (ঈশ্বরী) দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এই মন্দিরে দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার বিগ্রহ শক্তি উপাসকদের দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছে।

শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পুত্র বগুড়া থেকে ময়মনসিংহের রামগোপালপুরে এসে জমিদারি গ্রহণ করলে-- এই মন্দিরটি রামগোপালপুরের জমিদার-কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ নারায়ণী দেবী চৌধুরানী তৎকালীন বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংয়ের সময়ে এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্রীবিগ্রহের নামে পাঁচ হাজার একরেরও বেশি জমি দান করে দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার নামে দেবোত্তর এস্টেটের গোড়াপত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পরবর্তী বংশধর, ময়মনসিংহের রামগোপালপুরের ভূস্বামী রাজা যোগেন্দ্র কিশোররায় চৌধুরী শক্তি উপাসকদের জাগ্রত এই অধিষ্ঠানকে ঘিরে

www.pathagar.com

পুনর্নির্মাণ করেন বর্তমান কাঠামোর এই মন্দির। লোকশ্রুতি আছে– রাজা যোগেন্দ্র কিশোররায় চৌধুরীর সহধর্মিনী রাণী রাধারঙ্গিনী দেবী চৌধুরানী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য রাজাকে পুনঃপুন অনুরোধ জানালে রাজা এই মন্দির পুনর্নির্মাণ করে রাণীর অনুরোধ রক্ষা করেন।

রামগোপালপুরের জমিদার-কর্তৃক মন্দিরে নিয়োজিত পুরোহিত দ্বারা পূজা-অর্চনা এবং কর্মচারী দ্বারা দয়াময়ী দেবোত্তর এস্টেট পরিচালিত হত। মন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বেই পুরোহিত-কর্মচারীদের আবাসস্থল ছিল যা এখনও আবাসস্থল হিসেবেই ব্যবহার হয়ে আসছে। মন্দিরের পার্শ্ববর্তী মাঠের উত্তরাংশে দয়াময়ী দেবোত্তর এস্টেটের কাচারিঘর ছিল। সেখানে দেবোত্তর এস্টেটের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষিত থাকত। পাশের পুকুরটিতে প্রচুর বোয়াল মাছ ছিল। তখন প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোগে ছাগশিশু (পাঠা)-র মাংসের মহাপ্রসাদের পাশাপাশি সেই বোয়াল মাছ দেয়া হত।

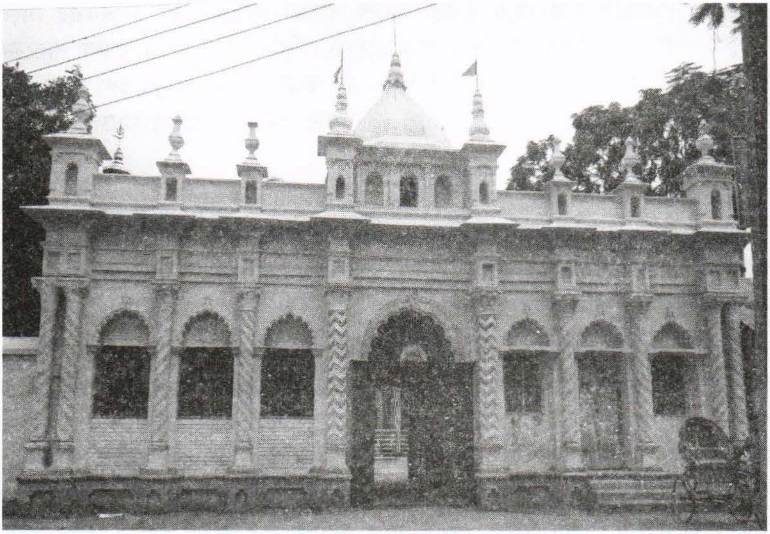

দয়াময়ী মন্দির

জনশ্রুতি ছিল, এ মন্দির বিগ্রহের অপরিমেয় স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান তৈজসপত্রাদি রয়েছে। মন্দিরে এক মণ ওজনের একটি রৌপ্যনির্মিত সিংহাসন ছিল। সিংহাসনটিতে রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর নাম লেখা ছিল। এসবের লোভে পাকিস্তান আমলে বেশ কয়েকবার চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। চোর-ডাকাত ধরাও পড়েছে। ডাকাত ধৃতকারীকে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৬১ সালে নিরাপত্তাজনিত কারণে মন্দিরের বিগ্রহাদির অলংকার এবং মূল্যবান তৈজসপত্র ময়মনসিংহের তদানীন্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (রাজস্ব) মাধ্যমে ময়মনসিংহের ট্রেজারিতে জমা রাখা হয়। যা এখনও উক্ত ট্রেজারিতেই আছে।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক এই মন্দির লুণ্ঠিত হয়। তারা শক্তিশালী বিস্ফুরণ দিয়ে তিন শতাধিক বছরের পুরনো কষ্টি পাথরে নির্মিত দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার বিগ্রহটি উড়িয়ে দেয়। তারা রৌপ্যনির্মিত সিংহাসনসহ লক্ষ লক্ষ টাকার বিগ্রহের স্বর্ণালংকার, তৈজসপত্র এবং বিভিন্ন সম্পদ লুণ্ঠন করে। তারা মন্দিরের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ফলে মন্দিরে পূজা-অর্চনার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার দেবোত্তর এস্টেট সরকার অধিগ্রহণ করে। দেবোত্তর কাচারিতে সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজও সরকারি হেফাজতে নেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের অর্থানুকূল্যে মন্দিরের বিগ্রহ পুনর্নির্মাণ করে পূজা-অর্চনা শুরু করা হয়। সেই সাথে মন্দিরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে নানাবিধ সংস্কার করে মন্দিরটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়।

এদেশে এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার জাগ্রত শক্তি মাহাত্যের নানা অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে। তাই বহু পূর্বকাল হতেই দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিনিয়তই ভক্তবৃন্দ ছুটে আসেন এ মন্দিরে। ছাগশিশু (পাঠা) ও অন্যান্য উপচার মানত করে। পূজা-অর্চনা শেষে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যায়। বর্তমানে দয়াময়ী মন্দিরে দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার বিগ্রহ ছাড়াও শিব বিগ্রহ ও অন্নপূর্ণা মাতার বিগ্রহও অধিষ্ঠিত রয়েছে।

প্রতিদিন এই মন্দিরে জাগরণ, ভোগ, বলি, যজ্ঞ ও সন্ধ্যা আরতির মাধ্যমে পূজা-অর্চনা করা হয়। এখানে অমাবস্যায় দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার, চতুর্দশীতে শিব বিগ্রহের এবং পূর্ণিমায় অন্নপূর্ণা মাতার বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। মন্দিরে ঋতুভিত্তিক উৎপাদিত সবজি-ফল দিয়েই ভোগ দেয়া হয়। এছাড়াও, ১৩ ভাদ্র তালের পিঠা, ৮ পৌষ থেকে ৮ ফাল্গুন দুই মাস বাল্যভোগ এবং পুরো মাঘ মাস শীতলা মায়ের ভোগ দেয়া হয়।

প্রতিবছরই শারদীয়া দুর্গোৎসবে মন্দির কমিটির উদ্যোগে দুর্গাপূজা, দীপান্বিতার মধ্যরাত্রে দয়াময়ী মাতার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পূজা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পূজা শেষে শহরের ভক্তবৃন্দের বাসাবাড়িতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শিব চতুর্দশী তিথিতে শ্রীশ্রী শিব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। সকল অনুষ্ঠানেই বিপুল পরিমাণ ভক্তবৃন্দের আগমন ঘটে। দীপান্বিতায় মন্দিরের প্রদীপ প্রজ্বলন, দুর্গাপূজায় অঞ্জলি প্রদান এবং বাংলা নববর্ষে শহরের প্রতিটি পরিবার থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বধূসহ সকল ভক্তরা মন্দিরে আগমন করেন। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করে ভাঁড়ে করে জল নিয়ে কীর্তন করতে করতে এসে মন্দিরের শিব বিগ্রহের মাথায় দিতে আগমন ঘটে।

প্রতিবছর বাসন্তী শুক্লা অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদে পূণ্যতীর্থ অষ্টমী স্নান উপলক্ষে তিন/চার দিন ভক্তবৃন্দের পদচারণায় মন্দির প্রাঙ্গণ সরগরম হয়ে উঠে। এ উপলক্ষে মন্দিরে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। দেশ-বিদেশ থেকেও ভক্তরা ছুটে আসেন মন্দিরে। এ তিথিতে শ্রীশ্রী ঁরী অন্নপূর্ণা মাতার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। অষ্টমী স্নানের দিনে শ্রীশ্রী ঁরী দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার নিকট ঈপ্সিত বস্তু লাভের আশায়

www.pathagar.com

ভক্তবৃন্দ ছাগশিশু (পাঠা) এবং অন্যান্য উপচার মানত করে নিয়ে আসেন মন্দিরে। ঐ দিন প্রতিবছরই মন্দিরে প্রায় আড়াই শ'র বেশি ছাগশিশু বলিদান হয়। ১৪০৪ সনের পর মন্দিরটির অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। কালের বিবর্তনে দয়াময়ী মহাদেব্যা মাতার সুপ্রাচীন মন্দিরটি আজও স্বমহিমায় টিকে রয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদ : জেলাসদর জামালপুর শহরের প্রায় মাঝখানে ঐতিহাসিক বড় মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের পাশেই শহরের নিয়মিত সকাল বাজার। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে, প্রায় আড়াইশ বছর আগে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় সৈন্যদলের রুটি সরবরাহকারী ঠিকাদার 'মহাম্মদ নন্দ রুটিওয়ালা' সাহেব এই পাকা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মসজিদটি পাকা মসজিদ নামে পরিচিতি ছিল। তিনি মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য শেখেরভিটা গ্রামে কিছু জমি এবং মসজিদের নিকটবর্তী কিছু জমি ক্রয় করে মসজিদের নামে ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন।

বড় মসজিদ

সে সময় পাকা মসজিদের দেয়ালে নন্দ রুটিওয়ালার নাম ও মসজিদ নির্মাণের তারিখ লেখা ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু নন্দ রুটিওয়ালার নির্মিত সেই পাকা মসজিদটি ১৩০৪ সনে সংঘটিত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। এই ভূমিকম্পে জেলার অসংখ্য কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। কোনো কোনো এলাকায় মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ভূ-গর্ভ থেকে তীব্রগতিতে পানি বালি ও কয়লা বের হয়ে আসে। এই প্রবল ভূমিকম্পের ফলে জেলার ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মৃগী, সোমেশ্বরী, দশানীসহ বহু নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং বহু খাল-বিল ভরাট হয়ে যায়। পাকা মসজিদটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সে স্থলে একটি টিনের মসজিদঘর তৈরি করা হয় এবং সেখানেই

www.pathagar.com

নামাজ পড়া চলতে থাকে। পঞ্চাশের দশকে স্থানীয় বাজারের ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী মরহুম নান্নু মিয়ার সক্রিয় উদ্যোগে এবং ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় সেখানে চুন-সুড়কি দিয়ে একটি ত্রিগম্বুজ বিশিষ্ট বড় আকারের মসজিদ নির্মিত হয়। সেই থেকে মসজিদটি বড় মসজিদ নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।

বছর দশেক আগে মুসুল্লিদের স্থান সংকুলানের অভাবে, ত্রিগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি ভেঙ্গে সেখানে তিনতলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমান মসজিদটিতে কোনো গম্বুজ নেই, তবে উত্তর-পূর্ব কোণে একটি উঁচু মিনার রয়েছে।

ঐতিহাসিক খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্র : জামালপুর সদরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের প্রবেশমুখের উত্তর পার্শ্বে ঐতিহাসিক খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত। এই খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্রটি ঐতিহাসিক এই জন্য যে, ইংরেজদের এই সমাধিক্ষেত্র স্থাপনের সাথে এ অঞ্চলের ইংরেজ বিরোধী নানা বিদ্রোহের ইতিহাস জড়িত। এ অঞ্চলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল (১৭৬০-১৮০০ সাল পর্যন্ত) ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৭৮৭ সালে ইংরেজ প্রশাসন এখানে সেনানিবাস স্থাপন করে। জামালপুর শহরের পশ্চিমপ্রান্তে ঝিনাই ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে রশিদপুরের কাছে ইংরেজদের জামালপুর সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছিল। সেনানিবাসে সৈন্যদের ক্যাম্প ছিল বলে এই স্থান পরবর্তীকালে কম্পপুর নামে পরিচিত লাভ করে। সেনানিবাসে অবস্থানরত ইংরেজদের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যই এই সমাধিক্ষেত্র তৈরি করা হয়।

খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্র

তখন একে বলা হত European Barial Ground। সেনানিবাসে অবস্থানরত ইংরেজদের মধ্যে যারা মারা যেত কিংবা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে যে সকল ইংরেজ সৈন্য বা কর্মচারী নিহত হত, তাদের মরদেহ এই সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হত। ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান হলে জামালপুর সেনানিবাস রংপুরে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু পুনরায় এই অঞ্চলে বেনিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহ ও

www.pathagar.com

পাগলপন্থীদের বিদ্রোহের উদ্ভব হলে, ১৮২৬ সালে পুনরায় ইংরেজ সরকার জামালপুরে সেনানিবাস স্থাপন করে। এ সকল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে যে সকল ইংরেজ সৈন্য নিহত হয়েছে তাদের মরদেহও এই সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়েছে। সমাধির গায়ে উৎকীর্ণ এপিটাফ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো কোনো সমাধিতে দুইজনের, কোনো কোনো সমাধিতে চারজনের মরদেহ একসাথে সমাধিস্থ করা হয়েছে। সমাধির গায়ে উৎকীর্ণ এপিটাফ থেকে তা প্রতীয়মান হয়। তবে বর্তমানে অধিকাংশ এপিটাফের লেখা কালের ধুলোয় অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। সমাধির গায়ে উৎকীর্ণ এপিটাফের দুটি নমুনা নিচে দেয় হলো।

এপিটাফ-১

TO THE MEMORY OF
CHARLES UPTON TRIPP
CAPT.N & ADJUT. 36 REGT. N-1
OB, 6TH JULY, 1840

This monument is erected by his brother officers. A tribute of their esteem & regard.

এপিটাফ-২

Sacred to the Memory of
JOHN MILLER EWING ESQR
OF GLASGO, SCOTLAND
WHO DIED AT RUSSEEDPORE FACTORY (বর্তমানে রশিদপুর)
On the 7th December, 1938, Aged 27.

পাকিস্তান আমলে খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্রটি Lord Curzon -এর Ancient Shirines Preservation Act -এর বিধান বলে রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর উক্ত সমাধিক্ষেত্রটি রক্ষণাবেক্ষণে কোনো সরকারি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে কয়েক বছর আগে স্থানীয় এলজিইডি-এর পক্ষ থেকে সমাধিক্ষেত্রটির বাউন্ডারি প্রাচীর করে দেয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক কারণেই খ্রিষ্টান সমাধিক্ষেত্রটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

হযরত শাহ্ কামাল (র.) এর মাজার : জামালপুর জেলার এক ঐতিহাসিক প্রাচীন ধর্মীয় নিদর্শন হযরত শাহ্ কামাল (র.) এর মাজার। মাজারটি জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে দুরমুট নামক গ্রামে অবস্থিত। ইতিহাস থেকে জানা হয়, হযরত শাহ্ কামাল (র.) ১৫০৩ সালে আরবের ইয়েমেন থেকে এই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। তিনি একজন ইয়েমেনবাসী ছিলেন। তিনি ইয়েমেন থেকে প্রথমে পাঞ্জাবের মুলতানে আসেন। সেখানে তিনি কয়েকবছর অবস্থান করেন। তারপর মুলতান থেকে তিনি এই অঞ্চলে এসে ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্তী গারোপাহাড়ের পাদদেশে আস্তানা স্থাপন করে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন।

জামালপুরের ইতিহাসকার গোলাম মোহাম্মদ তাঁর 'জামালপুরের গণইতিবৃত্ত' গ্রন্থে হযরত শাহ্ কামাল (র.) সম্পর্কে লিখেছেন : '১৫০৩ খৃঃ অব্দে ইয়েমেন দেশ হইতে হজরত শায়েখ্ মোহাম্মদ কামাল দেশ ভ্রমন উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসেন এবং পাঞ্জাবের মুলতান নগরীতে কয়েক বৎসর অবস্থান করার পর এই উপবিভাগে তশরিফ আনেন। ব্রহ্মপুত্র বা

www.pathagar.com

জিঞ্জিরা নদীর তীরে পত্রপল্লবে সুশোভিত পাহাড়ের এক মনোরম শৃঙ্গোপরি তাঁহার তপোবন স্থাপন করিয়া নিরন্তর জপোমগ্ন থাকেন।' বর্তমানে এই স্থানটি জামালপুর জেলার সীমান্তবর্তী বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া কামালপুর এলাকাধীন। 'কামালপুর' নামটিও হযরত শাহ্ কামাল (র.)-এর নামানুসারেই করা হয়েছে। সেখান থেকে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বর্তমান মেলান্দহ উপজেলার দুরমুট নামক গ্রামে চলে আসেন।

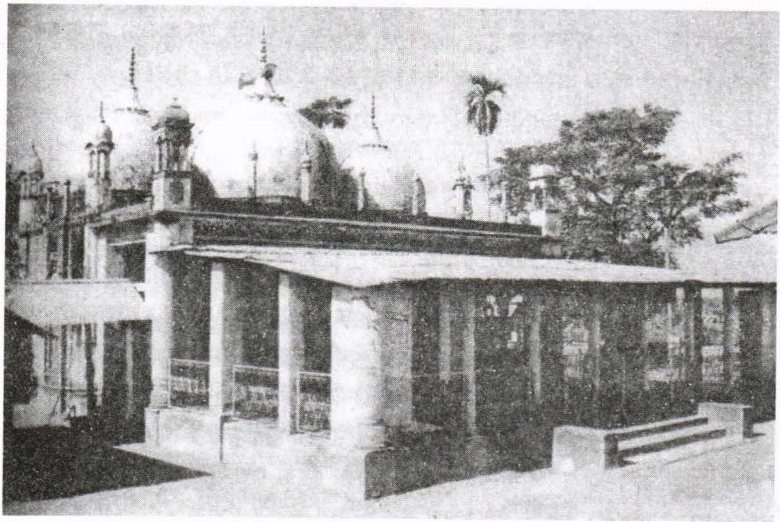

হযরত শাহ্ কামাল (র.)-এর মাজার

দুরমুট গ্রামে অবস্থানকালে হযরত শাহ্ কামাল (র.) -এর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও নানা অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে নদীর গতিপথকে পরিবর্তিত করে দুরমুট গ্রামকে নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করেন বলে কথিত আছে। তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন বলেও কাহিনি প্রচলিত আছে। কাহিনিটি এরূপ : 'একদিন তিনি পথ চলার সময় দেখতে পান সাঈদ নামের এক ব্যক্তি তার একমাত্র পুত্র ইসমাইলের মৃত্যুতে খুবই শোকাকুল হয়ে পড়েছেন। এই দেখে তাঁর মনে দয়ার সঞ্চার হয়। তখন তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে ইসমাইলকে পুনর্জীবিত করেন' (ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শন, দরজি আবদুল ওয়াহাব, প্রকাশক- গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১)। গোলাম মোহাম্মদ লিখেছেন– 'তিনি একজন কামেল ও দোয়া-মক্‌বুল আওলিয়া ছিলেন। তাঁহার দুআয় মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ায় শেরপুরের জমিদারগণ তাঁহাকে তালুক ও ভূসম্পত্তি নজর প্রদান করেন। কামালপুর, গেদরা প্রভৃতি মৌজা এই তালুকের অন্তর্ভুক্ত। ইস্পিন্দিয়ার খাঁন গাজি ও রাজা মনীন্দ্র নারায়ণ হইতেও তিনি ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কড়ইবাড়ির জমিদার তাঁহাকে বাক্‌লাই মৌজা লাখেরাজ প্রদান করেন।'

হযরত শাহ্ কামাল (র.) এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যা জানা যায়, তাঁর চার স্ত্রী ছিলেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। এ কারণে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজা শাহ্

www.pathagar.com

নিয়ামতউল্লাহ তাঁর সম্পত্তির মালিক হন। তাঁর চার স্ত্রীর মধ্যে একমাত্র বারোই বিবির নাম ইতিহাস থেকে জানা যায়। বারোই বিবি সম্পর্কে বিভিন্ন গল্পকথাও প্রচলিত আছে। দুরমুট ছিল হিন্দুপ্রধান এলাকা। তখন এ অঞ্চল বারই রাজা নামে জনৈক রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কথিত আছে হযরত শাহ্ কামাল একদিন বারই রাজার বাড়িতে গিয়ে দেখেন দেবীর পূজা মণ্ডপের বেদীতে অনেক খাদ্য সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলো দেখে শাহ কামাল জানতে চান যে, মাটির তৈরি মূর্তি যেহেতু খেতে পারে না তাহলে সে খাবারগুলো কেন রাখা হয়েছে? মণ্ডপের তত্ত্বাবধায়করা উত্তরে বলেছেন যে, এগুলো দেবীর সম্মানে রাখা হয়েছে, দেবীর ভক্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য। তখন শাহ্ কামাল আবার জানতে চান তারা তাদের দেবীকে খাওয়াতে পারবে কিনা? তখন বারই রাজার লোকেরা শাহ্ কামালকে পাল্টা প্রশ্ন করে যে সে খাওয়াতে পারবে কিনা ? শাহ্ কামাল বলেন তিনি যদি খাওয়াতে পারেন তাহলে বারই রাজার মেয়েকে তাঁর কাছে বিয়ে দিতে হবে। বারই রাজার লোকেরা ভেবেছে দেবীকে খাওয়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব না সুতরাং রাজকন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ের প্রশ্নই উঠে না। শাহ্ কামালের হাতে একটা লাঠি ছিল। সে লাঠি হাতে দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে দেবীকে হুকুম করলেন খাওয়ার জন্য। আর অমনি দেবী খাওয়া শুরু করল এবং সব খাবার খেয়ে নিল। তখন সবাই অবাক। অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়ে গেল। এখন রাজা রাজকন্যাকে পাগলের হাতে কিভাবে সমর্পণ করবেন! তারা প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করলেন। শাহ কামাল আস্তানার দিকে রওয়ানা দিলে বারই রাজার কন্যা শাহ্ কামালের জন্য দিওয়ানা হয়ে রাজবাড়ি ছেড়ে পাগলিনী বেশে শাহ কামালের পেছনে পেছনে ছুটে আসতে থাকেন। এসব দেখে অনেক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বারই রাজকন্যাকে বিয়ে করে শাহ কামাল (র.) এর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে। আবার বারই বিবি নিয়ে অন্য একটি গল্পও প্রচলিত আছে। বারোই বিবি ছিলেন সারুলিয়া গ্রামের হিন্দু পান বিক্রেতা পরিবারের মেয়ে। হযরত শাহ্ কামাল (র.) এর আধ্যাত্মিক গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখনও বারোইকান্দি গ্রামে বারোই বিবির মাজার বিদ্যমান। বারোইকান্দি গ্রামের নামটিও বারোই বিবির নামানুসারেই হয়েছে।

হযরত শাহ্ কামাল (র.) ১৬৪৪ সালে পরলোক গমন করেন। প্রতিবছর দুরমুট মাজারে উরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দুরমুট মাজারসহ সাত জায়গায় তাঁর মাজার আছে। এর মধ্যে ভারতের মেঘালয়ের এবং আসামের মহেন্দ্রগঞ্জের মাজার উল্লেখযোগ্য। সেখানেও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা এবং মানুষকে ইসলামের পথে পরিচালিত করার নানা কাহিনি প্রচলিত আছে।

তথ্যসূত্র : (ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা : ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশত বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৭)।

ঐতিহাসিক গান্ধী আশ্রম : ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে পরাধীনতার শৃংখল মোচনের লক্ষে পরিচালিত লড়াই-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় স্বদেশের হিতব্রতে মানবকল্যাণের লক্ষে গড়ে ওঠে জামালপুর গান্ধী আশ্রম। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংসা আন্দোলনের পথরেখা ধরে ১৯৩৪ সালে গান্ধী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। কিংবদন্তি কৃষক নেতা নাসির উদ্দিন সরকার

www.pathagar.com

ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজিয়া খাতুন ছিলেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আশ্রমের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল খাদি কাপড় বোনা থেকে স্বাস্থ্য সেবাসহ স্বদেশের হিতব্রতে বিবিধ কর্মসূচি। স্বদেশ চেতনা ও দেশপ্রেমে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল আশ্রমের অন্যতম লক্ষ। পাকিস্তানি শাসকচক্র ১৯৪৮ সালে বার বার হামলা ও আক্রমণ চালিয়ে আশ্রমের বহু স্থাপনা গুড়িয়ে দেয়। টিকে থাকে শুধু অফিসঘরটি। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে ২০০৭ সালের ২রা অক্টোবর মাহত্মা গান্ধী জন্মদিন জাতিসংঘ আহুত আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে পুনরায় জামালপুর গান্ধী আশ্রমের শুভদায়ী নানা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

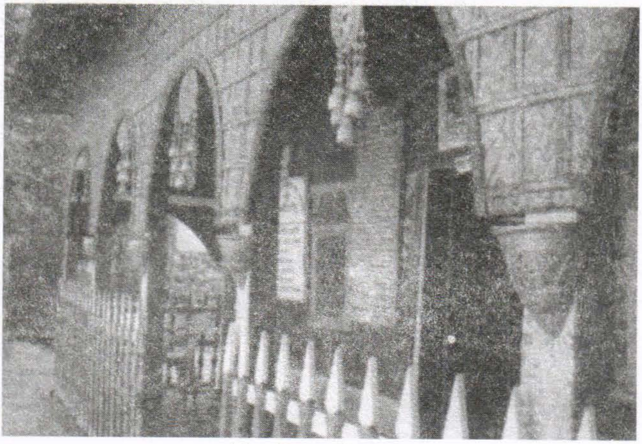

ঐতিহাসিক গান্ধী আশ্রম

মহারাজা প্রদ্যুত কুমার ঠাকুরের কাচারিভবন : বকশীগঞ্জের পূর্বনাম রাজেন্দ্রগঞ্জ। ব্রিটিশ আমলের পাতিলাদহ পরগনা রাজেন্দ্রগঞ্জ মাহারাজা প্রদ্যুতকুমার ঠাকুরের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাহারাজা প্রদ্যুতকুমার ঠাকুর কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে দেওয়ানগঞ্জে এসে জমিদারি কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। সম্ভবত সতেরশ শতকের মধ্যভাগে পাতিলাদহ পরগনার রাজেন্দ্রগঞ্জে মহারাজা খাজনা আদায়ের জন্য একটি কাচারিঘর স্থাপন করেন। পাতিলাদহ পরগনা পশ্চিম ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। তখন রংপুর জেলা কালেক্টরে রাজস্ব প্রদান করা হত। বকশীগঞ্জের কাচারি ভবন সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। এখানে জমিদার জোতদারের নায়েব ম্যানেজার হাতি ঘোড়ায় চড়ে খাজনা আদায় করত। তখন কাচারি ভবনের আশেপাশে হাতি ঘোড়া বাঁধা থাকত। শোনা যায় কাচারি ঘরের পাশ দিয়ে কেউ ছাতা মাথায় কিংবা জুতা পায়ে হেঁটে যেতে পারত না।

ঢাকার লালবাগ কেল্লার মত কাচারির ভবনটির নির্মাণ শৈলী। এ ভবন নির্মাণে ছোট ছোট ইটের গাঁথুনিতে একপ্রকার আঠালো মাটির আস্তরণ ব্যবহার করা হয়। পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দোয়ারি ভবনটির প্রতি কাঠের দরজায় হাতি ঘোড়া সওয়ারি পাকপেয়াদার

www.pathagar.com

নকশা আঁকা দেখা যায়। দরজার উপরের দেয়ালে কচুপাতার অপূর্ব নকশা সহজেই মন কেড়ে নেয়।

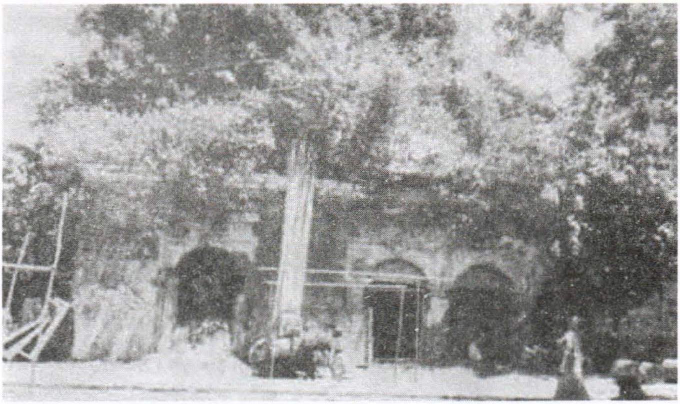

মহারাজা প্রদ্যুতকুমার ঠাকুরের কাচারিভবন

১৯০৮ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ঐতিহ্যবাহী কাচারি ভবনে ফাটল ধরে কিয়দংশ মাটিতে দেবে যায়। ঐ সময় ভবনটি পুর্নসংস্কার করে জমিদারি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে পরিত্যাক্ত এ ভবনের দিকে কেউ নজর দেয়নি। কালের বিবর্তনে বকশীগঞ্জ পৌর শহরের তহসিল অফিস সংলগ্ন কাচারি ভবনের ধ্বংসাবশেষ নীরব সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

ঐতিহ্যবাহী দালানি জামে মসজিদ : অবিভক্ত বাংলার সাবেক এম.এল.সি. আজিজুর রহমান নান্না মিয়ার পিতা মঙ্গন উদ্দিন শেখের অন্যতম কীর্তি নিলক্ষিয়া দালানি জামে মসজিদ। জোতদার মঙ্গন উদ্দিন শেখের একক প্রচেষ্টায় নির্মিত মসজিদটি স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। সম্পূর্ণ দেশীয় নকশায় স্থানীয় দক্ষ মিস্ত্রি দ্বারা দীর্ঘ ৬ বছরে মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এ দালানি জামে মসজিদ স্থানীয় লোকজন এবং জোতদার বাড়ির কর্মচারীদের নামাজ আদায়ের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। জানা যায়, মসজিদের উত্তর পার্শ্বে জোতদার সাহেবের কাচারিঘর ছিল। একটু দূরে পূর্ব পশ্চিমমুখী একটি সেমি দালানঘরে দারোয়ান ও পিয়ন রাত্রিযাপন করত। ত্রিশ-চল্লিশ গজ পূর্ব দিকে উত্তর দক্ষিণমুখী একটি সেমি দালানঘর দেখা যায়। এটি মেহমানখানা ছিল। এখানে দূর-দূরান্তের প্রজা ও আত্মীয় স্বজনরা– রাত্রিযাপন করত। এছাড়াও জোতদার বাড়িতে বেশ কয়েকটি চৌচালা ঘর ছিল।

আঠার শতকের শেষ ভাগে নির্মিত মসজিদের ভিতরে বাইরে স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীর বেষ্টিত মসজিদের দৈর্ঘ্য ৭ফুট ও প্রস্থ ৩০ফুট। ৩গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ৮টি দরজা। দরজার উপরে লিংডন বরাবর ফুলপাতার অপূর্ব নকশা আঁকা। ঐতিহ্যবাহী এ প্রাচীন মসজিদের অপূর্ব কারুকার্যময় প্রবেশ পথ দেখে মনে হয় কোন রাজবাড়ির ফটক।

www.pathagar.com

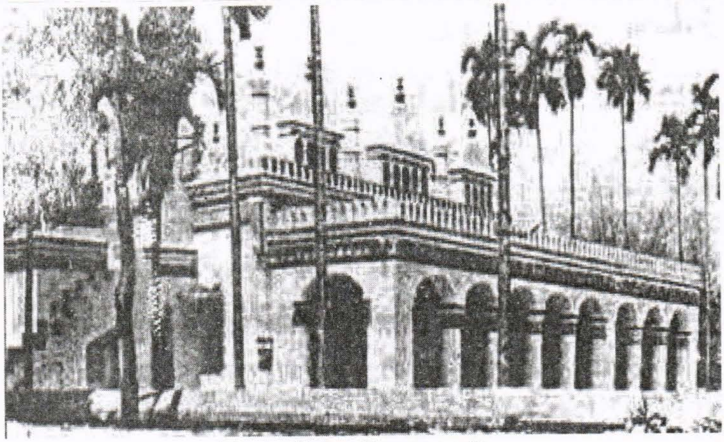

ঐতিহ্যবাহী দালানি জামে মসজিদ

জানা যায়, মসজিদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জোতদার মঈন উদ্দিন শেখ কিছু জমি ওয়াকফ করে গেছেন। বিভিন্ন সময় স্থানীয়ভাবে মসজিদের সংস্কার করা হলেও পূর্বের সৌন্দর্য ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

কামালপুরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ : বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার কামালপুর এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল কামালপুর রণাঙ্গন। মুক্তিযুদ্ধে ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল আবু তাহের।

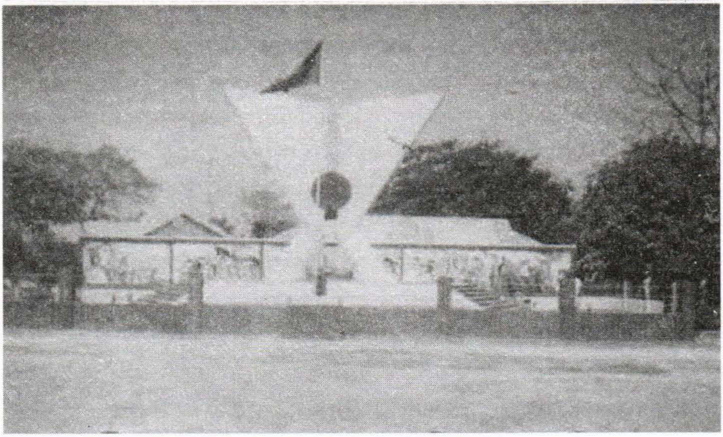

কামালপুরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ

www.pathagar.com

ভৌগোলিক কারণে মুক্তিযুদ্ধে কামালপুর এলাকার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখানে বিওপি ক্যাম্পে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় রণকৌশলগত কারণে মুক্তিবাহিনীরা বার বার আক্রমণ করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীদের এই ঘাঁটি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৩১শে জুলাইয়ের আক্রমণ। ঐদিন ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজের নেতৃত্বে এই ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজসহ ৬৫জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। এই জামালপুর রণাঙ্গনেই সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু তাহের ১৪ই নভেম্বর এক সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুর গোলার আঘাতে একটি পা হারান।।

অবশেষে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা ২৪শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের ঘাঁটি চারিদিক দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর সদর দপ্তর জামালপুরের সাথে কামালপুরের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের খাদ্য ও গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাদের মনোবলও ভেঙ্গে যায়। ৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এ সংবাদ বিবিসি থেকেও প্রচার করা হয়। মূলত উত্তর রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই দুর্ভেদ্য ঘাঁটির পতনের মধ্য দিয়েই সূচিত হয় জামালপুরসহ ঢাকা বিজয়ের পথ।

মহান মুক্তিযুদ্ধে কামালপুর রণাঙ্গনে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য শহিদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ বীর উত্তম এর স্মরণে নির্মিত হয়েছে এক স্মৃতিসৌধ। কামালপুর বাজার সংলগ্ন বিজিবি ক্যাম্পের সম্মুখ মাঠের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক কামালপুর মুক্তিযুদ্ধের স্মারক। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করেন। স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করেন ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী।

তিনফুট প্রাচীরবেষ্টিত উড়ন্ত পায়রার আকৃতিবিশিষ্ট স্মৃতিসৌধের সম্মুখভাগে রয়েছে একটি স্বচ্ছ জলে ভরা চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চায় ফুটন্ত লাল পদ্মগুচ্ছ যেন রক্তাক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিচ্ছবি। মূলবেদীর সামান্য নিচের অংশে জামালপুর রণাঙ্গনের কতিপয় যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারই সঙ্গে ৬৫জন শহিদ মুক্তিবাহিনীসহ স্বাধীনতা-উত্তর ২৯জন রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা পাথরে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কামালপুর রণাঙ্গনের সামরিক মানচিত্র এবং শহিদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ বীর উত্তম-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী মোজাইক পাথরে খোদাই করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বেদীর পিছনের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে একাত্তরের যুদ্ধদৃশ্য এবং স্বাধীনতার স্থপতি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি। স্মৃতিসৌধের গায়ে একটি ফলকে লেখা রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার অমর চারটি পঙ্‌ক্তি : উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

www.pathagar.com

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

দেশের ২০তম জেলারূপে জামালপুরের প্রতিষ্ঠা ১৯৭৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। জেলা হিসেবে নবীন হলেও জনপদ ও জনবসতির দিক থেকে জামালপুর নবীন নয় কোনোমতে। প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদরূপে এ অঞ্চলের ইতিহাস সে তুলনায় বেশ পুরোনো। জামালপুরের ভূপ্রকৃতি ও ভূসংস্থান, সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও ঐতিহ্য সবকিছুর মাঝেই রয়েছে প্রাচীনত্বের ছাপ। অন্যায়-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই-সংগ্রামের নানা কাহিনিও বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ।

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনাপর্ব থেকেই এ জনপদ প্রসিদ্ধি অর্জন করে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের অশান্ত এক জনপদরূপে। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল প্রায় চারদশককাল পরিব্যাপ্ত এই বিদ্রোহের পটভূমিতে এই জনপদের পরিচিতি লাভ করেছিল সন্ন্যাসীগঞ্জরূপে। বিস্মৃতপ্রায় সন্ন্যাসীগঞ্জের স্মৃতি আজও ধারণ করে আছে আশপাশের সন্ন্যাসীর চর, সন্ন্যাসীর ভিটা প্রভৃতি জনপদের নাম। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের পর উনিশ শতকে এ অঞ্চলে টিপু পাগলের নেতৃত্বে পাগলপন্থী বিদ্রোহ, দুবরাজ পাথর, জানকু পাথরের নেতৃত্বে আদিবাসী গারো-হাজংদের বিদ্রোহ, ছপাতি গারোর নেতৃত্বে স্বাধীন গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠার লড়াই, বক্সারি-বরকন্দাজ বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহসহ ছোট-বড় নানান লড়াই-সংগ্রাম এই অঞ্চলের বিদ্রোহী খ্যাতি আরও বাড়িয়ে দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জামালপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে সরিষাবাড়ি ও মেলান্দহে প্রচণ্ড জমিদার বিরোধী কৃষক আন্দোলন দেখা দেয়। ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সরিষাবাড়ি অঞ্চলে জাহেদ খাঁ ও মেলান্দহ অঞ্চলে চেং সরকার। চেং সরকারের বাড়ি ছিল ঝাউগড়া ইউনিয়নে। আমবাড়িয়া এস্টেটের মালিক হেমনগরের জমিদার তাকে ধরে নিয়ে হেমনগর মালখানায় আটক করে। মেলান্দহের কৃষকেরা এই বেআইনী আটকের বিরুদ্ধে জামালপুরের তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ডনো সাহেবের নিকট অভিযোগ দায়ের করে। তিনি বিদ্রোহী চেং সরকারকে মুক্ত করেন। চেং সরকার প্রায় ৬ মাসকাল জমিদারের মালখানায় আটক ছিলেন।

১৯০৫ সালে জামালপুরে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯১২ সালে জনাব খোশমামুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে কামারের চরে এক বিরাট কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কৃষক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষক প্রজা আন্দোলনের অন্যতম নেতা জনাব এ.কে. ফজলুল হক। এর কিছুদিন পূর্বে তিনি জামালপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯২০-২১ সালে জামালপুরের অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠে। ঐ আন্দোলন যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন আবদুর রহিম উকিল সাহেবের বড় ভাই জনাব ফজলুল করিম সাহেব। তিনি করটিয়ার জমিদার চাঁদ মিঞা সাহেবের সঙ্গে একই জেলে আটক ছিলেন। সেই সময় থেকেই জামালপুরে একটানা চলছে স্বাধীনতার জন্য লড়াই ও কৃষক আন্দোলন।

ঐ সময় থেকে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম, কংগ্রেসের নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং অবশেষে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নানকার, তেভাগা ও টক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সরকারের বর্বর দমননীতির

www.pathagar.com

ফলে আন্দোলন সশস্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। এই সময়েই বর্বর পাকিস্তানি দমননীতি ও বাঙালির অধিকার হরণের প্রতিবাদে জামালপুরে প্রথম গড়ে উঠে আওয়ামী মুসলিমলীগ। ১৯৫২ সালে জামালপুরে গড়ে উঠে শক্তিশালী ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জামালপুরের মাটিতে কবর রচিত হয় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব শাহির মার্শাল-ল জারির সাথে সাথে জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী তরুণেরা সূচনা করে পুনরায় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের। নিম্নে উপজেলাভিত্তিক ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম এবং কারো কারো সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

সদর উপজেলা : জামালপুর সদর উপজেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ হলেন– মৌলভী হামিদউদ্দীন আহমেদ, খন্দকার মতিউর রহমান, তৈয়ব আলী আহমদ, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস, সফির উদ্দীন আহমদ, ডা. রমনী মোহন সাহা, আশুতোষ দত্ত, কিরণ চন্দ্র দে, বিধু সেন, আব্দুল হামিদ, হায়দর আলী মল্লিক, তাছির উদ্দিন আহম্মদ, শামসুদ্দীন আহমদ, কফিল উদ্দিন মোক্তার, কল্যাণ তালুকদার, সামসুজ্জোহা মোক্তার, আব্দুল ওয়াহেদ মাস্টার, সৈয়দ হারুনুর রশীদ, আলী আসাদ, সৈয়দ আব্দুস সাত্তার, সৈয়দ আব্দুস সোবহান, মো. দিদারুল আলম (খুররম), মো. আখতারুজ্জামান (মতি মিয়া), ক্ষিতীশ তালুকদার, সৈয়দ ইমামুর রশীদ, কল্যাণ চৌধুরী, মুখলেছুর রহমান ফকির, মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ, এড. আব্দুল হাকিম, রেজাউল করিম হীরা, সুকুমার চৌধুরী, উৎপল কান্তি ধর, ফয়েজুর রহমান, মাহবুবুর রহমান আনসারী প্রমুখ।

মৌলবি হামিদউদ্দীন আহমেদ : জন্ম লাঙ্গলজোড়া গ্রাম, জামালপুর, ১৮৪১ (আনুমানিক)। সমাজসেবী, আইনজীবী। প্রথম জীবনে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ। পরে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি এবং ঐ স্কুল থেকে ১৮৬৪-তে প্রবেশিকা এবং ১৯৬৮-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস। পরে বি.এল. পাস। তিনি ন্যাশনাল মহামেডান এসোশিয়েশন ময়মনসিংহ শাখার অনারারি সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেসের রাজনীতি করতেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের বার্ষিকীতে যোগদান করেন। পরে সৈয়দ আহমদের সাথে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে যোগদেন। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট ও প্রথম মুসলমান উকিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকতেই আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। বয়োজ্যেষ্ঠ বলে বসু তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কিছুদিন মহারাজা শশিকান্তেরও বাল্যশিক্ষক। বেশ কটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। ময়মনসিংহে ওকালতি শুরু করেই একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজের নেতা হিসেবে নিজের স্থান করে নেন। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক সচেতন দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের সমর্থক। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭৭-এর ২০ আগস্ট 'ময়মনসিংহ সভা' নামে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান সদস্যগণ একত্রে এই সভায় মিলিত হতেন এবং কাজে অংশ নিতেন। ১৮৯৯-তে আনন্দমোহন বসু ময়মনসিংহ কর্তৃক মিলিতভাবে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান। ময়মনসিংহে সিটি কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন। এরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মৌলবি হামিদউদ্দীন। মৃত্যু. ১৯১৫।

তৈয়ব আলী আহমদ : জামালপুর সদর থানার মেষ্টা ইউনিয়নের আড়ংহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সাল থেকেই সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

একজন নিবেদিত প্রাণ কংগ্রেস কর্মী। ১৯৫২ সালে জামালপুরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার পুত্র সুজাউদ্দৌলা (সুজা মিয়া) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম কর্মী ছিলেন।

এডভোকেট আব্দুল হাকিম : জামালপুর জেলার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সাবেক এম.এন.এ. ও এমপি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এডভোকেট আব্দুল হাকিম ১৯২৫ সালে জামালপুর সদর উপজেলার পাথালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজি জয়েনউদ্দীন আকন্দ। এডভোকেট আব্দুল হাকিম ১৯৪৬ সালে তৎকালীন ডনো স্কুল (বর্তমানে জামালপুর জিলা স্কুল) থেকে মেট্রিক, ১৯৪৬ সালে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে আই.এ. এবং এই কলেজ থেকে ১৯৫০ সালে বি.এ. পাস করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এমএ পাস করেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৭ সালে জামালপুর মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে আশেক মাহমুদ কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক এবং জামালপুর মহকুমা আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, তিনি পরবর্তী ১০ বছর জামালপুর আওয়ামীলীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনে তিনি জামালপুরসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনেও তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে অন্যতম প্যানেল আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্নেল আবু তাহের মামলারও তিনি আইনজীবী ছিলেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ-৩ আসন থেকে এম.এন.এ. নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি জামালপুরের মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে গঠিত স্বাধীন বাংলা ফুটবল ফেডারেশনের তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি জামালপুর সদর আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে গভর্নর হিসেবে নিযুক্তি প্রদান করেন।

এডভোকেট আব্দুল হাকিম জামালপুর জেলা আইনজীবী সমিতির একাধিকবার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি জামালপুর রেডক্রস সোসাইটি ও জেলা ক্রীড়াসংস্থারও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও জামালপুরের কৃতিসন্তান ৯ই জুন ২০০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সরকারি অনুমোদনক্রমে তাঁর নামে জামালপুর স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে।

ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস : যুগান্তর দলের একজন বিখ্যাত কর্মী। জামালপুর গুদারাঘাট শুটিং কেসে তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন। বহরমপুর জেল থেকে পালিয়ে বিনয়-বাদল-দীনেশের

www.pathagar.com

কেসে পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে আন্দামানের জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। জামালপুর গুদারা ঘাট শুটিং কেসের সঙ্গে রবি নিয়োগী, খোকা রায় প্রমুখও জড়িত ছিলেন।

সফির উদ্দীন আহমদ : ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। জামালপুরে আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা। জামালপুর জাহেদা সফির মহিলা কলেজ তাঁর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫১ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

আশুতোষ দত্ত : জামালপুরের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তার পিতা প্রকাশ দত্তও জামালপুরের একজন বিখ্যাত দেশকর্মী ছিলেন। আশু দত্ত ময়মনসিংহ জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বহুবার জেল ভোগ করেছেন এবং বহুকাল আত্মগোপনে কাটিয়েছেন। তাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বজ্রাপুর কুমারপাড়ার একজন বৃদ্ধা মহিলা ও তার পুত্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

তাছির উদ্দিন আহমদ : ত্যাগী জাতীয়তাবাদী কর্মী, গণতন্ত্রী দল আওয়ামীলীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আওয়ামী লীগ 'মুসলিম' শব্দ পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেননি। তিনি জীবনে বহুবার কারাবরণ করেছেন। তাঁর আত্মত্যাগ তুলনাহীন।

হায়দর আলী মল্লিক : একজন জাতীয়তাবাদী কর্মী। জামালপুরে আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম স্রষ্টা। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে জামালপুর হতে এম.এল.এ. নির্বাচিত হন। ৯২(ক) ধারার আমলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ১৯৫১ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সৈয়দ আব্দুস সাত্তার : ১৯৪৮ সালে কৃষক সভায় বক্তৃতা দেওয়ার দায়ে ছোট ভাই সৈয়দ আব্দুস সোবহানের সঙ্গে জেলে নিক্ষিপ্ত হন। ১৯৫১ সালে দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঐ বছরেই যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ বছরেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের সময় জামালপুর গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করেন।

সৈয়দ আব্দুস সোবহান : একজন বামপন্থী কর্মী। জামালপুরে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। ১৯৫৪ সালে ৯২(ক) ধারা জারির পর বড় ভাই সাত্তার সাহেবের সাথে একযোগে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। তিনি বহুবার কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

মো. দিদারুল আলম (খুররম) : কবি ফজলুর রহমান আজনবী সাহেবের প্রথম পুত্র। ১৯৪৮ সালে খাদ্যমন্ত্রীর জামালপুর আগমন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেতৃত্ব দিয়ে প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনে প্রথম সারিতে থেকে কারাভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের কর্মী হিসাবে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কারাবরণ করেন এবং আত্মগোপনে থেকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি জেলা আওয়ামীলীগের কার্যকরী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

www.pathagar.com

মো. আখতারুজ্জামান (মতি মিয়া) : জামালপুরে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি জামালপুরের ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগের স্রষ্টাদের অন্যতম। বহুবার কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। জামালপুর আওয়ামীলীগের প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

মেলান্দহ উপজেলা : মেলান্দহ উপজেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিরা হলেন– নাসিরউদ্দিন সরকার, যতীন সাহা, আজগর আলী মৃধা, তৈয়ব আলী সরকার, ডা. কোরাইশ, ডা. মহসীন, রাজিয়া খাতুন, মোয়াজ্জেম হোসেন, ডা. নূরুল ইসলাম, আব্দুল হাই বাচ্চু, খায়রুল বাশার চিশতী প্রমুখ।

নাসিরউদ্দিন সরকার : ঝাউগড়া ইউনিয়নের কাপাসহাটিয়া গ্রামে ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তার স্কুল শিক্ষকের নিকট বামপন্থী আন্দোলনের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে জামালপুর মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। তিনি গণতন্ত্রী দল ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।

নাসিরউদ্দিন সরকার উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত গান্ধীবাদী বামপন্থী নেতা ছিলেন। আজীবন তিনি গ্রামের বাড়িতেই অবস্থান করেছেন। তিনি তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন গান্ধী আশ্রম। এ বাড়িতে কংগ্রেসের বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। দেশ বিভাগের পর গান্ধী আশ্রম ভেঙ্গে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে মারধর করে মৃত্যু-পথযাত্রী করে পথে ফেলে চলে যায় মুসলিম লীগের গুণ্ডারা। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর জীবন রক্ষা পায়। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পর কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারত চলে যাওয়ার প্রস্তাব আসে। দেশের প্রতি ভালবাসা ও দায়িত্ববোধ থেকে এ প্রস্তাব তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কাপাসহাটিয়ার নাসিরউদ্দিন সরকারের এই বাড়ি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে এই বাড়িটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ইতোমধ্যে একটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই জাদুঘরের উদ্যোগে বৃহত্তর ময়মনসিংহের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগ্রহের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

যতীন সাহা : একজন ত্যাগী কমিউনিস্ট। ঝাউগড়া অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের স্রষ্টা। বহুদিন আত্মগোপনে ছিলেন। ১৯৫১ সালে দাঙ্গার ফলে জামালপুর শহরে চলে আসতে বাধ্য হন। তাঁর স্ত্রী বিড়ি বানিয়ে সন্তানদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। অবশেষে শহরের আশ্রয় হারিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন।

তৈয়ব আলী সরকার : জামালপুরের মেলান্দহ থানার ঝাউগড়া ইউনিয়নে ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে জামালপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি মহকুমা কংগ্রেসের সদস্য হন। যতীন সাহার সংস্পর্শে তিনি বিভিন্ন সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে যতীন সাহার সঙ্গে প্রথম গ্রেপ্তার হন। জামালপুরে তিনি কৃষক নেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পক্ষে প্রচারাভিযানে অংশ নেন। ১৯৫৬ সালে ন্যাপের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬২ সালে কুখ্যাত মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালে ন্যাপ ভেঙ্গে গেলে তিনি মোজাফফর ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তিনি জামালপুর মহকুমার প্রত্যেক থানায় কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের পক্ষে কাজ করেন। ১৯৭৫-'৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে গণতন্ত্রী পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন।

রাজিয়া খাতুন : তিনি জামালপুরের মেলান্দহ থানার পাছগাছি গ্রামে ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস মেলান্দহের ঝাউগড়া ইউনিয়নের কাপাসহাটিয়া। পিতা জামালপুরের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা নাসিরউদ্দিন সরকার। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তিনি জামালপুর মহকুমা শাখার কংগ্রেস সদস্য পদ লাভ করেন। ১৫ বছর বয়সে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সময় বিপ্লবী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ গুপ্তের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। রাজিয়া খাতুন জামালপুর কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি কেন্দ্রীয় অধিবেশনে জামালপুর মহকুমার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল হাই বাচ্চুমিয়া : মেলান্দহের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবকদের মধ্যে একজন। তিনি গোড়া থেকে আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি তাঁর পিতা মফিজ উদ্দিন মণ্ডলের মৃত্যুর পর খুব অল্প বয়সে ৪নং নাংলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই থেকে একটানা ৩৪ বছর চেয়ারম্যান ছিলেন। জনগণ তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল। তিনি ছিলেন গোটা পশ্চিম জামালপুরে একটা প্রতিষ্ঠানের মত। অনেক মানুষের কাছে তিনি ছিলেন বটবৃক্ষের মত। ২০০০ সালে তাঁর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে মেলান্দহের রাজনৈতিক অঙ্গনের একটি বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের অবসান ঘটে।

খাইরুল বাশার চিশতি : মেলান্দহের স্মরণীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নাম খাইরুল বাশার চিশতি। চরপাড়া গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ভাসানী ন্যাপের নেতা ছিলেন। পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। স্থানীয়ভাবে মেলান্দহের সার্বিক উন্নয়নেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। মেলান্দহবাসী তাঁকে চিরদিন বিনম্রচিত্তে স্মরণ রাখবে।

সরিষাবাড়ি উপজেলা : সরিষাবাড়ি উপজেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিরা হলেন : মোহন সাহা, শান্তি রায়, এড. মোয়াজ্জেম হোসেন, আব্দুল মালেক, এড. মতিউর রহমান তালুকদার, ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার প্রমুখ।

শান্তি রায় : সরিষাবাড়ির সু-সন্তান। একজন বামপন্থী নেতা। অধ্যাপক ও লেখক। বাংলাদেশের মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিচয় তুলে একখানা মূল্যবান ইতিহাস পুস্তক রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

আব্দুল মালেক : জামালপুরের সরিষাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসেবে সরিষাবাড়ি এলাকা থেকে এমপিএ নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের একজন বলিষ্ঠ ও ত্যাগী নেতা। সরিষাবাড়ি এলাকার আর্থ-সামাজিকসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং জেলা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক।

এড. মতিউর রহমান তালুকদার : জন্ম জামালপুরের সরিষাবাড়ি। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে জামালপুর কোর্টে আইন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি দীর্ঘদিন জামালপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি জেলা মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

ইসলামপুর উপজেলা : ইসলামপুর উপজেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ঐতিহ্যধারী ব্যক্তিত্বরা হলেন— ঘটি পালোয়ান, হাসান হাফিজুর রহমান, খালেদ মোশাররফ, রাশেদ মোশাররফ, আ. মালেক, আনসার আলী প্রমুখ।

ঘটি পালোয়ান : একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তিনি ইসলামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

হাসান হাফিজুর রহমান : জন্ম. মাতুলালয়, জামালপুর শহর ১৪ই জুন ১৯৩২। পৈতৃক নিবাস, কুলকান্দি গ্রাম, জামালপুর। কবি ও সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। পিতা আবদুর রহমান (স্কুল-শিক্ষক)। স্ত্রী সাঈদা হাসান (অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মফিজউদ্দিন ফকিরের কন্যা)। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৪৬) ও ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪৮) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯৫১) এবং বাংলায় এম.এ. (১৯৫৫) ডিগ্রি লাভ। ফেব্রুয়ারির (১৯৫২) ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। তাঁর

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদনায় ভাষা-আন্দোলনের ওপর প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৫৩) প্রকাশিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক (১৯৫৪-১৯৫৫)। ১৯৫২-তে বেগম পত্রিকায়, ১৯৫৩-১৯৫৪-তে সওগাত পত্রিকায় ও ১৯৫৫-১৯৫৭-তে দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন। মাসিক সাহিত্যপত্র সমকাল (১৯৫৭)-এর সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফরের সহযোগী। ১৯৫৭-তে জগন্নাথ কলেজের বাংলার প্রভাষক নিযুক্ত। ১৯৬৪-র গোড়ার দিকে চাকরিচ্যুত হন। কয়েক মাস দৈনিক পয়গামে সহকারী সম্পাদক হিসেব কর্ম সম্পাদন। ১৯৬৫-র ১লা জানুয়ারি দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান। প্রেস্ট্রাস্ট পত্রিকায় (দৈনিক পাকিস্তান) সাংবাদিকতা করলেও গণ-চেতনা ও গণ-দাবির প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ। রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এই বক্তব্য উপস্থাপন করে পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে পদক্ষেপের বিরোধিতা (জুন ১৯৬৭)। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৯৭১) শুরুর পর পরই কুমিল্লা জেলার এক গ্রামে গিয়ে

www.pathagar.com

আশ্রয় গ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গ্রামবাসীদের মনোবল চাঙ্গা করার লক্ষ্যে কর্ম সম্পাদন। স্বাধীনতার পর দৈনিক পাকিস্তান দৈনিক বাংলা নামে প্রকাশিত হলে এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতির পদ লাভ (১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭১)। মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলার (১৯৭৩-১৯৭৪), মস্কো থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সংস্থাপন বিভাগের ও.এস.ডি. (১৯৭৪-১৯৭৫)। বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য (১৯৭৬-১৯৭৯)। ১৯৭৭-এ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস প্রকল্প'-এর প্রধান নিযুক্ত। তাঁর সম্পাদনায় ১৬ খণ্ডে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র' (১৯৮২-১৮৮৩) প্রকাশিত। কবি, সমালোচক ও গল্পকার হিসেবে খ্যাত। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলায় যে আধুনিক কাব্যান্দোলনের উন্মেষ ঘটে তার অন্যতম স্থপতি। তাঁর সাহিত্যকর্মে জনজীবনের প্রত্যাশা, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ এবং মানুষের সংগ্রামী জীবনচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সমাজ ও জীবনের অঙ্গীকারে তাঁর সাহিত্য প্রগতিশীল শিল্প-পরিচর্যায় সমৃদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ-কবিতা: বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২), বজ্রে চেরা আঁধার আমার ভেতরের বাঘ (১৯৮৩), ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী (১৯৮৩); প্রবন্ধ: আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫) মূল্যবোধের জন্যে (১৯৭০), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), আলোকিত গহবর (১৯৭৭); গল্প: আরো দু'টি মৃত্যু (১৯৭০)। পুরস্কার: লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৬৭), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭১), সুফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৬), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণ পদক (১৯৮২), একুশে পদক-১৯৮৪ (মরণোত্তর) লাভ। মৃত্যু. হার্ট, লিভার ও কিডনির চিকিৎসার জন্য মস্কো গমন (১৭ই জানুয়ারি ১৯৮৩)। সেখানকার সেন্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে পরলোক গমন, ১লা এপ্রিল ১৯৮৩।

খালেদ মোশাররফ : জন্ম. মোশাররফগঞ্জ গ্রাম, ইসলামপুর থানা, জামালপুর, ১৯৩৮। মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৫৩-তে কক্সবাজার স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৫৫-তে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. পাস। ১৯৫৪-তে ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৫-তে কাকুল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে যোগদান। ১৯৫৭-তে কমিশন লাভ। ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে রংপুর, মোগলহাট, লালমনিরহাট এবং হিলিতে অবস্থান গ্রহণ। এ-সময় ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত। কমিশন প্রাপ্তির পর থেকে ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুলে নানা প্রশিক্ষণ গ্রহণ। যুদ্ধের পর কাকুল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ইন্সস্ট্রাক্টর নিযুক্ত। এখান থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ এবং মেজর পদে উন্নীত। ১৯৬৮-তে কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে পি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য সঙ্গে সঙ্গে খারিয়াতে ৫৭ ব্রিগেডের 'ব্রিগেড মেজর' নিযুক্ত। ১৯৭০-এর মার্চে ঢাকায় বদলি। প্রশিক্ষণের জন্য প্রথমে জার্মানি, পরে লন্ডন গমন।

খালেদ মোশাররফ

www.pathagar.com

১৯৭১-এর ২৪ মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ। দায়িত্ব বুঝে নেবার পরপরই কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক শমশেরনগর যাত্রা। পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর শাফায়াত জামিলের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রাককালীন দেশের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা। ২৫ মার্চ শমশেরনগর পৌঁছে দেখতে পান চারপাশে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অবস্থান। ২৬ মার্চ শাফায়াত জামিলের কাছ থেকে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার খবর লাভ। সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারে শমশেরনগর ত্যাগ এবং ২৭ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গমন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একত্রীকরণ এবং কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন। ঐ দিন রাতেই সব অবাঙালি অফিসারদের বন্দী করেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যই পি.আর. পুলিশ এবং ছাত্র-জনতাকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োজিত। ৩০ মার্চ মেজর শফিউল্লাহর ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ তাঁর প্রতিরক্ষায় যোগদান। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে সম্মিলিত বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে স্থানান্তরকরণ। এপ্রিলের মাঝামাঝি পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে বিশেষ করে বিমান আক্রমণে টিকতে না পেরে পশ্চাৎপরণ এবং ২৭শে এপ্রিল স্বীয় বাহিনী নিয়ে ভারতে গমন। ৩০শে এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত। যুদ্ধের সময়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত। ২৩ অক্টোবর শত্রুপক্ষের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত। গুলি মাথায় খুলি ভেদ করে যায়। লক্ষ্ণৌ সামরিক হাসপাতালে অস্ত্রোপাচার এবং দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ। বাংলাদেশ স্বাধীন (১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১) হওয়ার পর ১৯৭২-এর জানুয়ারির প্রথম দিকে ঢাকায় আগমন এবং আর্মি হেড কোয়ার্টারে স্টাফ অফিসার নিযুক্ত। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ নিযুক্ত। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'বীরোত্তম' খেতাবে ভূষিত (১৯৭২)। খালেদ মোশাররফ ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান নিহত হলে তার প্রতিবাদে ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) তৎকর্তৃক এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটন। ৭ই নভেম্বর (১৯৭৫) তাঁর প্রতিপক্ষের অপর একটি পাল্টা অভ্যুত্থানের ফলে নিহত হন। মৃত্যু. ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট. ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫।

রাশেদ মোশাররফ : রাশেদ মোশাররফ ১৯৩৮ সালে ইসলামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোশাররফ হোসেন ও মাতার নাম জমিলা আক্তার। তাঁর পিতা মোশাররফ হোসেন ছিলেন একজন ত্যাগী জাতীয়তাবাদী কর্মী। রাশেদ মোশাররফও ছিলেন একজন ত্যাগী ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ও ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তিনি এমপিএ নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামপুর থানার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এবং জামালপুর জেলা

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধেরও একজন সংগঠক ছিলেন। তিনি ইসলামপুর এলাকায় আওয়ামীলীগ থেকে ৬ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামীলীগ সরকারের ভূমিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামপুর উপজেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তাঁর অগ্রজ খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ও কে ফোর্সের অধিনায়ক। এই বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ১০ই নভেম্বর ২০১১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা : দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা হলেন— মো. ফজলুল করিম, স্পিকার আব্দুল করিম, এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

মো. ফজলুল করিম : তিনি স্পিকার আব্দুল করিমের বড় ভাই। ১৯২১ সালে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। জেলখানায় করটিয়ার জমিদার চাঁদ মিয়া সাহেবের সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর ভাই আব্দুল করিম ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সংসদে স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মাদারগঞ্জ উপজেলা : মাদারগঞ্জ উপজেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা হলেন— গিয়াস উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ করিমুজ্জামান তালুকদার, আহছান উল্লাহ, ডা. মুনির উদ্দিন আহমদ, ডা. সৈয়দ জামান, সৈয়দ আখতারুজ্জামান, আলাউদ্দিন বি.এস.সি., আশরাফ তালুকদার প্রমুখ।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ : গিয়াস উদ্দিন আহমদ ১৮৮৯ সালে মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চর নান্দিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সনে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করে প্রথম কারাবরণ করেন। জেলে তিনি যুগান্তর দলের সংস্পর্শে-আসেন। জেল-মুক্ত হয়ে জামালপুরে এসে শক্তিশালী কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলেন। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে এম.এল.এ. নির্বাচিত হন এবং খাদ্যমন্ত্রী পদে নিয়োজিত হন। তিনি ২৯ জুলাই ১৯৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ করিমুজ্জামান তালুকদার : সৈয়দ করিমুজ্জামান নেতাজী সুভাষ বসুর অনুসারী একজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪০ সালে নেতাজী সুভাষ বসু সাংগঠনিক সফরে জামালপুরে এসে সৈয়দ করিমুজ্জামানের চন্দ্রার বাড়িতে উঠেছিলেন। ১৯৭০ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী-লীগের প্রার্থী হিসেবে মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ এলাকা থেকে এম.এন.এ. নির্বাচিত হন।

ডা. মনির উদ্দিন আহমদ : ডা. মনির উদ্দিন আহমদ ১৯০০ সালে মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চর নান্দিনায় জন্মগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে কলকাতায় চলে যান। কলকাতার কংগ্রেস নেতা বিধান রায়ের সংস্পর্শে এসে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক ও অহিংস রাজনৈতিক কর্মী। কলকাতা থাকাকালীন কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেস ও স্বরাজ দলেও জড়িত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে জামালপুরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হাজার হাজার মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

বকশীগঞ্জ উপজেলা : বকশীগঞ্জ উপজেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিরা হলেন— আজিজুর রহমান নান্না মিয়া, নঈম উদ্দিন আহমদ, মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার, এড. আশরাফ হোসেন, এম.এ. ছাত্তার, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

নঈম উদ্দিন আহমেদ : নঈম উদ্দিন আহমেদ ১৯০০ সালে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৮ সালে জামালপুর ডনো স্কুল (বর্তমান জেলা স্কুল) থেকে মেট্রিক পাশ করেন। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আই.এ. উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা সিটি কলেজে ইংরেজিতে অনার্সে ভর্তি হন। বকশীগঞ্জ নূর মোহাম্মদ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি প্রজ্ঞাবান সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও ফারসি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি ১৯৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মীর্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার : মীর্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার ১৯০৫ সালে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। ১৯৩৯ সালে শেরপুর জি.কে. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, ১৯৪১ সালে ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই কলেজে বি.এ. ভর্তি হন। বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তিনি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিলে নেতৃত্ব দেন। তিনি ব্রিটিশ আমলে শেরপুর অঞ্চলের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি পাতিলাদহ পরগনার একাংশের জোতদারি ছেড়ে জামালপুর শহরে বসবাস করতে শুরু করেন। এখান থেকে ১৯৫০ সালে আমিনা প্রেস স্থাপন করে 'তওফিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ আসামের জঙ্গলে (ভ্রমণ কাহিনি) ও উপন্যাস মায়ার ভিটা প্রকাশিত হয়।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামালপুর জেলা ছিল ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। জামালপুর মহকুমার রয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে জামালপুর মহকুমার গৌরবময় অবদান রয়েছে। জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জ থানাধীন বকশীগঞ্জ ইউনিয়নে সংঘটিত 'কামালপুর যুদ্ধ' মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। কামালপুর রণাঙ্গন ছিল ১১ নম্বর সেক্টরের অধীন। কামালপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাটি। মুক্তিযুদ্ধে কামালপুর ঘাটির পতনের মধ্যদিয়েই জামালপুরসহ ঢাকা বিজয়ের পথ সূচিত হয়।

জামালপুর জেলার সব উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় প্রধানত আওয়ামীলীগ। পাশাপাশি ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টির নেতৃবৃন্দও সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদান রেখেছে।

একাত্তরের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পর জামালপুর জেলার সর্বত্র পাকিস্তান বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতর

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের জন্য জেলার সব উপজেলায় সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সব উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। ঐ সময় ছুটিতে থাকা কিংবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে। দেশমাতৃকার মুক্তির সংগ্রাম হাজার হাজার ছাত্র-যুবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকে। অধিকাংশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শারীরিক কসরতসহ ড্যামি অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সদর উপজেলাসহ সব উপজেলায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত লাল-সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলনে নেতৃত্ব দেন এলাকার নির্বাচিত এমএনএ, এমপিএ, স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ, আওয়ামীলীগ, ন্যাপ, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ের নেতৃবৃন্দ।

জামালপুর জেলায় পাকবাহিনী প্রবেশ করে ২২শে এপ্রিল। প্রথমে সদর উপজেলায় পরে সব উপজেলায় প্রবেশ করে এবং মাদারগঞ্জ উপজেলা ব্যতীত সব উপজেলায় ক্যাম্পস্থাপন করে। ভৌগোলিক কারণে মাদারগঞ্জ উপজেলায় পাকবাহিনী কোনো স্থায়ী ক্যাম্পস্থাপন করতে পারেনি। উপজেলাগুলোতে ক্যাম্পস্থাপন করে পাকবাহিনী আওয়ামীলীগ ও ন্যাপের নেতাকর্মীসহ অসংখ্য মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন হত্যা করে; বাড়িঘর, গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়; লুটতরাজ চালায় এবং অসংখ্য নারী নির্যাতন করে। পাকবাহিনীর ক্যাম্পস্থাপন ও হত্যাযজ্ঞের ফলে সদর উপজেলাসহ সব উপজেলার এমএনএ, এমপিএ আওয়ামীলীগ ও ন্যাপের নেতাকর্মী ও মুক্তিকামী ছাত্রযুবকেরা ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে থাকে।

জেলায় পাকবাহিনীর প্রবেশ ও ক্যাম্পস্থাপনের পর প্রতিটি উপজেলায় স্বাধীনতাবিরোধী মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি ও রাজাকার আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। তারাও ক্যাম্পস্থাপন করে। তারা নানাভাবে হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করে। তারা স্থানীয় পাকক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং স্বাধীনতার সমর্থকদের খবরাখবর পৌঁছে দিত! গ্রাম-গঞ্জ থেকে হাঁস-মুরগী গরু-ছাগল লুট করে এনে পাকক্যাম্পে সরবরাহ করতো। শান্তি কমিটি ও রাজাকার আলবদর বাহিনী প্রতিটি উপজেলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা প্রতিটি এলাকায় লুটপাট হত্যাযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ করে। তাদের অত্যাচার নির্যাতনে প্রতিটি উপজেলার সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

জামালপুর জেলার সব উপজেলায় পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হয় কামালপুরে। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে বহু মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ হতাহত হয়। অপরদিকে বহু পাকসেনা ও রাজাকার-আলবদরও হতাহত হয়। জামালপুর জেলায় সর্বপ্রথম শত্রুমুক্ত হয় বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা ৫ই ডিসেম্বরে। এরপর পর্যায়ক্রমে সব উপজেলা শত্রুমুক্ত হয়। সবশেষে শত্রুমুক্ত হয় সরিষাবাড়ি উপজেলা ১২ই ডিসেম্বরে। জামালপুর জেলার মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩২৭১ জন। এর মধ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৫২জন; যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৫৭জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১২জন।

www.pathagar.com

নিম্নে উপজেলাভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিররণ তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধকালীন সব উপজেলা থানা ছিল। এখানে থানাগুলোকে উপজেলা হিসেবেই উল্লেখ করা হলো।

সদর উপজেলা

জামালপুর সদর মহকুমায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামীলীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামীলীগ পার্টি (ন্যাপ)। এ দুটি রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর জামালপুর সদর উপজেলায় সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এডভোকেট আবদুল হাকিম এমএনএ। সদস্য ছিলেন– এডভোকেট আক্তারুজ্জামান এমপিএ, এডভোকেট মতিয়র রহমান তালুকদার, এডভোকেট আবদুস সোবহান, মন্মথনাথ দে, ক্ষিতিশ তালুকদার, রেজাউল করিম হীরা, অধ্যাপক ইমামুর রশীদ, শাহনেওয়াজ, ওয়াহেদ মাস্টার, সৈয়দ আলী মণ্ডল প্রমুখ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন– আবদুল মতিন হীরু। সদস্য ছিলেন– মো. শহীদুল্লাহ, ফয়েজুর রহমান, সুকুমার চৌধুরী, উৎপল কান্তি ধর, মাহাবুর আনসারী, সফিকুল ইসলাম খোকা, হাফিজুর রহমান বাদশা, সৈয়দ আশরাফ হোসেন, মেরাজুল ইসলাম, সোলায়মান হক, এম. রিয়াজুল হক, আমজাদ হোসেন মল্লিক, সিদ্দিকুর রহমান, ফজলুল বারী তারা প্রমুখ।

১৩ই মার্চ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জামালপুর শহরের গৌরীপুর মাঠে এক জনসভার আয়োজন করে। সেখানে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন আবদুল মতিন হীরু। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগ করেন হাফিজুর রহমান বাদশা, মেরাজুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন চান, আবদুল মালেকসহ অনেকে। সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল মান্নান। এ সময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন সুশান্ত দেব কানু, মোকাররম হোসেন ভুলু, জাহানারা বেগম ও তৌহিদা। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে জামালপুরে পালিত হয় প্রতিরোধ দিবস। ২৪শে মার্চ এডভোকেট আবদুল হাকিম এমএনএ, এডভোকেট আক্তারুজ্জামান এমপিএ, এডভোকেট মতিয়র রহমান তালুকদার ও অধ্যাপক ইমামুর রশীদের নেতৃত্বে জামালপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এসময় জামালপুর মহকুমার নেতৃবর্গ প্রত্যেক থানা-ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেন। মহকুমারসদরসহ প্রত্যেক থানায় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে গঠিত হয় ট্রেনিং সেন্টার। জামালপুর শহরে স্কাউট মাঠে ছাত্রযুবকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। ড্যামি অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। ইপিআর-এর এক অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার আ. হাকিম ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষক ছিলেন। পাকবাহিনী যাতে জামালপুরে আসতে না পারে তার জন্য মহড়া শুরু হয়।

www.pathagar.com

২৫শে মার্চ কালোরাতে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে, ভস্মিভূত হয় বহু প্রতিষ্ঠান। তবে জামালপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে দীর্ঘ ২৭ দিনেও ঢুকতে পারেনি পাক হানাদার বাহিনী। ২৫শে মার্চ থেকে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত জামালপুরে ইপিআর পুলিশ, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীরা টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এমএনএ আবদুল হাকিমের নেতৃত্বে এবং তৎকালীন বিমান বাহিনীর সদস্য মাহবুব হোসেন চৌধুরী ও নৌবাহিনীর সদস্য মিন্টুর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা মধুপুর ব্রিজ এবং জামালপুর সীমানায় কয়েকটি কালভার্ট বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে পাকবাহিনীদের জামালপুরে প্রবেশ প্রতিরোধ করে।

২০শে এপ্রিল সকাল ১০টায় পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান আঘাত হানে জামালপুরের মাটিতে। বোমা ফেলা হয় রেলস্টেশন, মালগুদাম রোড ও ব্রহ্মপুত্র ফেরিঘাটসহ বিভিন্ন জায়গায়। গুলি চালানো হয় বিমান থেকে। ঐদিন ফেরিঘাটে ৭জন সাধারণ মানুষ মারা যায়। পরে পাকবাহিনীর বিমান হামলার মুখে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। ২২শে এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী বোম্বিং করতে করতে মধুপুর হয়ে জামালপুর শহরে প্রবেশ করে। পাকবাহিনী পিটিআই ভবনে ক্যাম্পস্থাপন করে। সেদিন পাথালিয়া, গুয়াবাড়ি, ও বেলটিয়া গ্রাম তাদের সিক্স ইন পাউডারের গোলায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাকবাহিনী শহরের প্রাণকেন্দ্র তমালতলায় শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। বকুলতলায় টিএন্ডটি অফিসে ৬জন কর্মচারীকে পিটিআই ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারা দেওয়ানপাড়ার গুদারাঘাটে ও পাথালিয়ায় আওয়ামী সমর্থক কয়েকজনকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। তাদের হত্যা অগ্নিসংযোগ আর লুটপাটে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে জামালপুরবাসী। দলে দলে ছাত্র-যুবকেরা পাড়ি দেয় ভারতে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করে।

জামালপুরে পাকবাহিনীর ক্যাম্পস্থাপনের পর স্থানীয় মুসলিম লীগের সহায়তায় এবং স্বাধীনতাবিরোধী চক্রদের নিয়ে গঠিত হয় শান্তি কমিটি। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয় ইউসুফ আলী মাস্টার, সেক্রেটারি হয় মক্তব আলী কবিরাজ। এরপর গঠিত হয় ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃত্বে রাজাকার আলবদর বাহিনী। রাজাকার আলবদর বাহিনী ক্যাম্পস্থাপন করে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ হোস্টেলে। এটি তাদের নির্যাতন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার হয়। শান্তি কমিটি ও রাজাকার আলবদরদের সহায়তায় পাকবাহিনী আওয়ামীলীগ ও ন্যাপের নেতাকর্মীদের পাকক্যাম্পে ধরে এনে হত্যাযজ্ঞ চালায়। শুধু পাকক্যাম্পে নয় পাকবাহিনী অসংখ্য মানুষকে শেরপুর ফেরিঘাটে ধরে এনে চোখ বেঁধে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এরপর লাশ ব্রহ্মপুত্র নদে ভাসিয়ে দিত। রাজাকার আলবদররা মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিকামী সাধারণ মানুষকে ধরে এনে কলেজ হোস্টেল ক্যাম্পে নানা রকম নির্যাতন চালায়। তারপর কেন্দ্রীয় শ্মশানঘাটে ও ফওতি গোরস্তানে নিয়ে হত্যা করে। লাশের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। রাজাকার আলবদররা পাক হানাদার বাহিনীর মনোরঞ্জনের জন্য নারীও সরবরাহ করত। নারীদের রাখা হতো পানি উন্নয়ন বোর্ডে। এটি ব্যবহার হতো নারী নির্যাতনের কেন্দ্র হিসেবে। ধর্ষিত, নির্যাতিত নারীদের

www.pathagar.com

মৃত্যু হলে ব্রহ্মপুত্র নদে ভাসিয়ে দেয়া হত। ব্রহ্মপুত্র নদ মৃত মানুষের গলিত লাশে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পরও শহরের মানুষ অনেকদিন এই নদের মাছ খায়নি।

জামালপুরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় ১০ই ডিসেম্বর। ৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কামালপুর ঘাটির পতন হলে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে জামালপুরের দিকে অগ্রসর হয়। ৯ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ক্লের তার ৩টি ব্যাটালিয়ন এবং আর্টিলারি রেজিমেন্ট নিয়ে জামালপুর পৌঁছে যান। দুটো ব্যাটালিয়নকে রাতের অন্ধকারে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়ে জামালপুরের অদূরে অবস্থান করতে বলেন। তার নির্দেশে পাকবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানের উপর শুরু করা হয় বিমান হামলা। এদিকে ৩১ বালুচের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদ প্রায় ১৫০০ সৈন্য, এক ব্যাটারি, (৬টি) ভারি মর্টার, ৬টি পাউন্ডার গান নিয়ে একটি দুর্গে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেন। ব্রিগেডিয়ার ক্লের রক্তপাত ও সাধারণ মানুষের জীবনহানি এড়ানোর জন্য লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান। চিঠি নিয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল হক মুন্সী। চিঠি পেয়ে লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। চিঠি বহনের অপরাধে এসএমজির বাটের আঘাতে জহুরুল মুন্সীর উপরের পাটির ৪টি দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। অন্য সৈন্যরা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে জহুরুল মুন্সীর পা ঝাঁঝরা করে ফেলে। জহুরুল মুন্সীকে প্রাণে না মেরে তাকে ফেরৎ পাঠানো হয়, সেই সঙ্গে আত্মসমর্পণের আহ্বান প্রত্যাখান করে যুদ্ধের আহবান জানিয়ে ব্রিগেডিয়ার ক্লের কাছে চিঠির জবাব পাঠান লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদ। ১০ই ডিসেম্বর সকালে শুরু হয় জামালপুর দখলের প্রচণ্ড যুদ্ধ। যৌথ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পরাজয় অনিবার্য বুঝতে পেরে লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে ৩১ বালুচরে রাতের অন্ধকারে পশ্চাদপসারণ শুরু করে। কিন্তু ৩১ বালুচরে পশ্চাদপসরণকালে ব্রিগেডিয়ার ক্লের গোপন স্থানে অবস্থানরত মিত্রবাহিনীর দুটো ব্যাটালিয়নের আক্রমণসীমায় গিয়ে পড়ে। মিত্রবাহিনী শুরু করে প্রচণ্ড আক্রমণ। সকাল ৪টার দিকে যুদ্ধ শেষ হয়। এটিই হচ্ছে রক্তক্ষয়ী জামালপুরের যুদ্ধ। সকালে দেখা যায় সর্বত্র পড়ে আছে পাক সেনাদের অসংখ্য মৃতদেহ আর আহতরা কাতরাচ্ছে। এই যুদ্ধে ২৩৫জন পাকসেনা নিহত হয়, আহত হয় ২৩জন আর মিত্রবাহিনীর হাতে বন্দি হয় ৬১জন। পাকবাহিনীর এই পরাজয়ের পর জামালপুর মূল ঘাঁটিতে অবস্থানকারী ৩১ বালুচের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৩৭৬জন সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর ১জন মারাঠা সৈন্য, লাইন ইনফ্যান্টির ১০জন এবং ১৩গার্ড রেজিমেন্টের ১জন সেনা নিহত হয় এবং ৮জন সেনা আহত হয়। ১০ই ডিসেম্বরের যুদ্ধেই জামালপুর শত্রুমুক্ত হয়।

জামালপুর সদর উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬৮১জন। এর মধ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১২জন; যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১৪জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১জন– তাঁর নাম মুক্তিযোদ্ধা রইচউদ্দিন বীর প্রতীক। তিনি ১১ নম্বর সেক্টরে মেজর আজিজের নেতৃত্বে কামালপুর, বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ ও জামালপুরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

www.pathagar.com

মেলান্দহ উপজেলা

মেলান্দহ উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামীলীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। এ দুটি দলের নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেলান্দহ উপজেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন আবদুল হাই বাচ্চু এমপিএ। সদস্য ছিলেন– ডা. নূরল ইসলাম, আবদুর রশিদ আনসারী, ময়ান হাজারি, হাসান হাজারি, শামসুল চেয়ারম্যান, লেবু চেয়ারম্যান, আবদুল বারী, এডভোকেট আফতাব উদ্দিন চৌধুরী, আবদুল খালেক মোল্লা, আবদুল আজিজ, বাবুল তালুকদার, আবদুর রহমান প্রমুখ। এ উপজেলার ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিলেন– হারুন অর রশিদ, আবদুল আজিজ, আনিসুর রহমান প্রমুখ ছাত্রনেতা। ছাত্র ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন– মিনহাজ উদ্দিন, নবীরুল ইসলাম, মন্টু তালুকদার, দীপেন বসাক প্রমুখ। এছাড়া ন্যাপ ভাসানীর খায়রুল বাশার চিশতীও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আবদুল হাই বাচ্চু এমপিএ-র নেতৃত্বে উমিরউদ্দিন পাইলট হাই স্কুল মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত লাল-সবুজের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐ মাঠেই আওয়ামীলীগ ও ন্যাপের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মহসিন ও হাবিলদার সুলতান আহমদ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

২৩ই এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মেশিনগানের গুলি ছুড়তে ছুড়তে মেলান্দহ উপজেলায় প্রবেশ করে। ঐদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব মালঞ্চে ঢুকে আওয়ামীলীগের নেতা আবদুল মজিদের চাকর ওমর আলীকে গুলি করে হত্যা করে। মুক্তিবাহিনীরা দাগি রেলওয়ে ব্রিজ ভেঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু হানাদার বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে মুক্তিবাহিনী গ্রামাঞ্চলে গা-ঢাকা দেয়। ঐ দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করে। তারা মালঞ্চের আজগর আলী, আবদুল গনি ও ভাঙনী ডাঙ্গার আবদুল হক সরকারের বাড়িতে এবং গোবিন্দগঞ্জ বাজারে মতিউর রহমানের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। হানাদার বাহিনী মেলান্দহ থানা ও সিও অফিসে ক্যাম্পস্থাপন করে। এলাকার মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা ভারতে চলে যায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

মেলান্দহে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আসার পর পিডিবি ও মুসলিম লীগের সমর্থকদের দ্বারা শান্তি কমিটি ও রাজাকার-আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। এরা এলাকায় লুঠপাট, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। শুরুতেই আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। মেলান্দহ উপজেলার ছেন্যা, ফুলছেন্যা, শাহজাদপুর, জামালপুর ও আদিপৈত গ্রামে রাজাকার-আলবদরদের দোর্দণ্ড প্রতাপে গ্রামবাসী আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করত। এদের দেয়া তালিকা অনুযায়ী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক লোকজন ধরে এনে অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন চালাত এবং পরে নির্মমভাবে হত্যা করত। এ

www.pathagar.com

অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা বেশকয়েকটি ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে। বর্তমান উপজেলা পরিষদের পিছনে রয়েছে যুদ্ধকালীন বধ্যভূমি। এখানেই বাচ্চু মিয়া, গোলাপ ডাক্তার ও বারেক কসাইসহ বহু লোককে হত্যা করা হয়েছে।

মেলান্দহ উপজেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়লার ব্রিজ যুদ্ধ ও বানিয়াপাড়া যুদ্ধ। ১০ই নভেম্বর সকালে মেলান্দহের রাজাকার কমান্ডার আবদুল হক সরকার মুক্তিযোদ্ধা আবদুল করিমের নিকট একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে বিনেতটংগী স্কুলের মাঠে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল করিম ৪০জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কয়লা ব্রিজে অবস্থান নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজের উপর থেকে দেখে পাকসেনারা নৌকা দিয়ে নদী পার হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী পাকবাহিনীকে লক্ষ্য করে এলএমজি ব্রাশ ফায়ার করে। ঘটনাস্থলেই ১২জন পাকসেনা নিহত হয়। হঠাৎ তিনদিক থেকে পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। পিছনে নদী থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা রমেজ উদ্দিন ও আবদুল কুদ্দুস শহিদ হন। নভেম্বর মাসেই বদি কোম্পানির নেতৃত্বে মাহমুদপুর বানিয়াপাড়ায় আরও একটি যুদ্ধ হয়। ঐদিন ইউপি চেয়ারম্যান লেবুমিয়ার বাড়িতে ৫৫জন মুক্তিযোদ্ধা খেতে আসে। খবর পেয়ে শতাধিক পাকিস্তানি সেনাসহ বদর-রাজাকার লেবু চেয়ারম্যানের বাড়ি ঘেরাও করে। শুরু হয় যুদ্ধ। দুপক্ষেই বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করে। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল, এলএমজি, স্টেনগান ও মর্টার ব্যবহার করে। পাকিস্তানি সেনারাও মেশিনগান ও ভারি অস্ত্রের গোলাবর্ষণ করে। সেদিনের তুমুলযুদ্ধে মাহমুদপুর বাজার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা সমর আলী শহিদ হন।

মেলান্দহ উপজেলার শেষবর্ডার এবং মাদারগঞ্জ উপজেলার পাশে বিনেতটংগি হাই স্কুল মাঠে ছিল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। মুক্তিবাহিনীরা ৯ই ডিসেম্বর মেলান্দহ থানায় অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মেলান্দহ থানার পাকক্যাম্পে ছিল পাঞ্জাবি মিলিশিয়া সৈন্য ও রাজাকারসহ ৪৬জন। মুক্তিবাহিনী রেকি করে জানতে পারে পাকসেনারা সাধারণত বাইরে যায় না। দুপুর দিকে ১২০জন মুক্তিযোদ্ধা পাকক্যাম্পের ১ কিলোমিটার দূরে অবস্থান নেয়। বিকেল ৩ টায় আলম কোম্পানির নেতৃত্বে মেলান্দহ হাই স্কুলের পশ্চিম দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল করিম পাকক্যাম্প লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে। ১০ মিনিটের মধ্যে রাজাকার কমান্ডার আবদুল হকে সরকারের ছোটভাই মোজাম্মেল হক মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে গোলাগুলি বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানায়। মুক্তিযোদ্ধারা মিলিশিয়া সৈন্য ও রাজাকারদের মেলান্দহ হাই স্কুল মাঠে ফলিং করার জন্য নির্দেশ দেয়; সেই সঙ্গে সমস্ত অস্ত্র থানার মাঠে লাইন করে রাখার জন্য বলা হয়। থানার ওসিকে অস্ত্র পাহারায় রেখে মুক্তিযোদ্ধারা মেলান্দহ হাই স্কুল মাঠে পাঞ্জাবি মিলিশিয়া সৈন্য ও রাজাকারদের আত্মসমর্পণ করায়। ঐ দিন মেলান্দহ উপজেলা শত্রুমুক্ত হয়।

মেলান্দহ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৪৮জন। এর মধ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪জন; যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা

www.pathagar.com

১জন– তাঁর নাম মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ সাদরুজ্জামান হেলাল বীর প্রতীক। তিনি সাদরুজ্জামান হেলাল কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন। তিনি ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে সহযোদ্ধাদের নিয়ে কামালপুর, বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জসহ জামালপুর জেলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

সরিষাবাড়ি উপজেলা

সরিষাবাড়ি উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল আওয়ামীলীগের হাতে। সরিষাবাড়ি উপজেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন আবদুল মালেক এমপিএ। সদস্য ছিলেন– মজিদ চেয়ারম্যান, আবদুল মান্নান, বুলবুল হোসেন, মাসুদ খান, আবদুল জলিল মাস্টার, ওয়াসিম উদ্দিন, মোতাহার হোসেন, আবদুল হালিম, আবদুল গনি প্রমুখ। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন– আ. মান্নান, আবদুল মতিন, বদিউজ্জামান, তোফাজ্জল হোসেন বাগু, নূরল ইসলাম, মজিবর রহমান, শাহনেওয়াজ প্রমুখ।

২৭শে মার্চ আবদুল মালেক এমপিএ-র নেতৃত্বে সরিষাবাড়ির গণময়দানে স্বাধীনতাকামী অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে গণময়দান মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং ছাত্র যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত সেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। এলাকার ছাত্র-যুবক দলে দলে এসে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার নূরল ইসলাম। সরিষাবাড়ি আরামনগর স্কুল মাঠেও আরেকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

২৪শে এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রচণ্ড সেলিং ও মেশিনগানের এলোপাথাড়ি গোলাবর্ষণ করতে করতে সরিষাবাড়ি উপজেলায় প্রবেশ করে। সরিষাবাড়িতে এসে তারা ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। এ পরিস্থিতিতে মুক্তির সৈনিকেরা বিভিন্ন গ্রামে গা-ঢাকা দেয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আলহাজ জুটমিল ও বর্তমান উপজেলা চত্বরে ক্যাম্পস্থাপন করে। সরিষাবাড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পস্থাপনের পর স্থানীয় মুসলিম লীগ, পিডিবি ও স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এরপর গঠিত হয় রাজাকার আলবদর বাহিনী। শান্তি কমিটির সদস্যরা এবং রাজাকার আলবদর বাহিনী এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ড চালায় এবং তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের বিভিন্ন অপকর্মে সহায়তা করে। এদের সহায়তায় হানাদার বাহিনী আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা করে, লুটপাট করে এবং অগ্নিসংযোগ করে। এদের সহায়তায় হানাদার বাহিনী বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে লোকজন ধরে এনে ক্যাম্পে নির্মম অত্যাচার নির্যাতনের পর হত্যা করে। পিংনার বধ্যভূমিতে বহু মানুষকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হয়। হানাদার বাহিনী সরিষাবাড়ির বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, গণহত্যা চালায় এবং বহু নারী ধর্ষণ করে।

www.pathagar.com

২রা জুলাই হানাদার বাহিনী পোগলদীঘা ইউনিয়নের পোটিয়ারপার গ্রামে ঢুকে চানমোহন সাহা, রাধামোহন সাহা, সুরেশ বর্মন ও ভোলানাথ সাহাকে নিজ বাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। ৭ই জুলাই মহাদান ইউনিয়নের বনগ্রামে ঢুকে আওয়ামীলীগের সমর্থক হাসান আলী ও কামরাবাদের আনোয়ার হোসেন, সহোদয় ভাই জামেজ উদ্দিন ও খোকা মিয়াকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া হানাদার বাহিনী সরিষাবাড়ির ভাটারা ইউনিয়নের পারপাড়ায় ঢুকে সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এ গ্রামের হারুন আকন্দ, যুদু শেখ, জিতেন ঘোষ, আরিকোনা শেখ, তৈবর আলী, উম্মে কুলসুম ও খোকা ঘোষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে এবং লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার-আলবদর সম্মিলিতভাবে কামরাবাদের বয়ারসিংহ গ্রামে ঢুকে সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এ গ্রামের বাসিন্দা তোনা মণ্ডল, ছানা উদ্দিন, ইনতুল্লাহ মুন্সী, খোকা মিয়া ও মহর মিয়াকে গুলি করে হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এছাড়া হানাদার বাহিনী অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ভাটারা ইউনিয়নের বাদুরিয়া গ্রামের ইয়াদ আলী ও খোপাদহ গ্রামের জবেদা খাতুন, আবদুর রশিদ, হামেদা খাতুন, কুলসুম বেগমকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে (সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন, সরিষাবাড়ি, জামালপুর)।

সরিষাবাড়ি উপজেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলো হলো— আরামনগর যুদ্ধ, বারইপটল যুদ্ধ, বাউসী ব্রিজ যুদ্ধ ও শিমলা বাজার যুদ্ধ। ৩০শে আগস্ট শেষরাতে আবুল হাসনাত মুক্তা কোম্পানি, লুৎফর রহমান লুধা কোম্পানি, বারী কোম্পানি ও মাসুদ কোম্পানি যৌথভাবে আরামনগর পাকিস্তানি মিলিশিয়া বাহিনীর মাদরাসা ক্যাম্প আক্রমণ করে। সকাল ৬টা পর্যন্ত মিলিশিয়া বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল গোলাবর্ষণ হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীরা মাদরাসা ক্যাম্প দখল করে এবং ২২জন মিলিশিয়া আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ সংবাদ পেয়ে ট্রেনযোগে জামালপুর থেকে সরিষাবাড়ি এসে দুদলে বিভক্ত হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মাদরাসা ক্যাম্প আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ৩জন পাকিস্ত ানি সেনা নিহত হয় এবং ৫জন গুরুতর আহত হয়। আরামনগর যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী শত্রু পক্ষের ১৮টি রাইফেল, কয়েকটি গ্রেনেড ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করে। ২৬শে সেপ্টেম্বর সরিষাবাড়ি বারইপটল গ্রামে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার হতাহত হয়। অপরদিকে ১২জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। সেদিনের ভয়াবহ যুদ্ধে বারইপটল গ্রামের ৫৭জন সাধারণ মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। সরিষাবাড়ি থানায় সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বাউসী ব্রিজে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই যুদ্ধ হয়। কোম্পানি কমান্ডার ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে ১২৪জন মুক্তিযোদ্ধা চেচিয়া বাধা জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে cut off party তে অবস্থান নেয়। কমান্ডার লুৎফর রহমান লুধা ও আবদুর রশীদের নেতৃত্বে এ্যাম্বুশে থাকার পর বাউশী ব্রিজে অবস্থানরত পাকসেনাদের উপর আক্রমণ করা হয়। এ দিকে

www.pathagar.com

ঘটনাচক্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এ্যাম্বুশে পড়ে যায় মুক্তিবাহিনীও। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করে। সকাল ৮টা পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মুক্তিযোদ্ধা রফিক বিএসসি, আবুল কালাম আজাদ, জালাল উদ্দিন ও আ. ছামাদ। পরে তাদের জামালপুর পাকক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। ৫ই ডিসেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী সরিষাবাড়ি থানা পাকক্যাম্প অবরোধ করে রাখে। ৮ই ডিসেম্বর সকালে কমান্ডার লুৎফর রহমান লুধার নেতৃত্বে শিমলা বাজার এবং বিকেল ৪টায় সরিষাবাড়ি থানা আক্রমণ করা হয়। থানার দারোগা রওশনসহ শতাধিক রাজাকার মোহাম্মদ আনসার মৌলভির নেতৃত্বে হাসপাতালে আশ্রয় নেয় এবং পরে মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। সরিষাবাড়ি ঘাটে তখনও পাকসেনারা অবস্থান করছিল। ১২ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং সরিষাবাড়ি শত্রুমুক্ত হয়।

সরিষাবাড়ি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৮৭৮জন। এর মধ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২২জন; যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১৩জন; খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২জন– মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাকিম বীর প্রতীক ও মুক্তিযোদ্ধা আনিসুর রহমান বীর প্রতীক। মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাকিম বীর প্রতীক ১১নম্বর সেক্টরের অধীনে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল এলাকায় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অসম বীরত্বের সঙ্গে গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধ করেন। মুক্তিযোদ্ধা আনিসুর রহমান বীর প্রতীকও ১১নম্বর সেক্টরের অধীনে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও বাহাদুরাবাদ ঘাটে পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধ করে বীরত্বের পরিচয় দেয়।

ইসলামপুর উপজেলা

ইসলামপুর উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামীলীগ। এ উপজেলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামীলীগ নেতা রাশেদ মোশাররফ এমপিএ। সদস্য ছিলেন– আবদুল মালেক, সামিউল হক ফারুকী, জিয়াউল হক, কেবিএম খাজা, আব্দুল বারী, আব্দুল হালিম, মেজর আনোয়ার, মোফাজ্জল হক, খন্দকার কাদের, আবদুল বারিক, ইদ্রিশ বাহাদুর, হাবিবুর রহমান খান, শামসুল হক, মজির উদ্দিন মাস্টার প্রমুখ। এছাড়া, জহুরুল হক, ডা. আজিজুর রহমান, ডা. খোরশেদুজ্জামান, পরিমল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রসংগঠনের মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন নেতৃত্ব দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– নূরুল হক, আবদুর রউফ, আবুল হাসেম, আনোয়ার উদ্দিন প্রমুখ। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– মোজাহারুল ইসলাম, আনসার আলী, নজরুল ইসলাম, আজিজুল হক প্রমুখ।

www.pathagar.com

ইসলামপুর উপজেলাতেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ছাত্র-যুবকদের প্রস্তুত করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ইসলামপুর নেকজাহান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ও জেজেকেএম গার্লস হাই স্কুল মাঠে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ ও আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণ দিতেন মেজর আনোয়ার, দারোগা আবদুর রহমান ও মতিউর রহমান। উল্লেখ্য, দারোগা আবদুর রহমান ও মতিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহিদ হন।

২৭শে এপ্রিল পাকবাহিনী নির্বিচারে গুলি করতে করতে ইসলামপুর উপজেলায় প্রবেশ করে। সেদিন পাকসেনারা সেনবাড়ি, পোদ্দারপাড়া, ঋষিপাড়াসহ কয়েকটি গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে। বর্বর পাকবাহিনী দিনভর সমগ্র এলাকায় চালায় নির্যাতন ও লুটপাট। তারা বর্তমান থানায় ক্যাম্পস্থাপন করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইসলামপুরে প্রবেশের একদিন আগে ২৬শে এপ্রিল থানার ওসি আবদুর রহমানের সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধারা থানা থেকে অস্ত্র লুট করে। ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যায় ঐ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা মুনছুর আলী সরকার ও জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে থানায় স্থাপিত পাকবাহিনী ক্যাম্প আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধা ও পাকসেনাদের মধ্যে তুমুল গোলাগুলি হয়। কিন্তু পাকসেনাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সমগ্র এলাকায় সাধারণ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ৩০শে এপ্রিল মুক্তিবাহিনী ইসলামপুর রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস করতে এসে স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানি দালাল আক্রাম হোসেনকে হত্যা করে চলে যায়। সেদিন সার্কেল অফিসার হাবিবুর রহমানের বাসাও আক্রমণ করে। কিন্তু সার্কেল অফিসার পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। এলাকার দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবকেরা ভারতে চলে যায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

ইসলামপুর উপজেলায় পাকবাহিনী ক্যাম্পস্থাপনের পর স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে শান্তি কমিটি এবং নেজামী ইসলামীর তত্ত্বাবধানে রাজাকার আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। বদর-রাজাকার বাহিনী পাকসেনাবাহিনীর ক্যাম্পে অবস্থান করে পাকসেনাদের নিয়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অপারেশন চালাত। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ লোকজন ধরে এনে পাকক্যাম্পে অকথ্য নির্যাতন চালাত। আগস্ট মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক মতিউর রহমানকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মুসলিম লীগের নেতা মতিউর রহমান চৌধুরীর ইঙ্গিতেই মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমানকে হত্যা করা হয়। পরে তাকে স্থানীয় গোরস্থানে কবর দেয়া হয়। ইসলামপুর উপজেলার পার্শ্ববর্তী মেলান্দহ উপজেলার দুর্মুঠ ইউনিয়নের আমবাড়িয়া গ্রামের বচু সর্দারের দুই মেধাবী ছেলে চান মিয়া ও সরুজ মিয়াকে মুক্তিবাহিনী সন্দেহে রাজাকার বাহিনী ধরে আনে পাকক্যাম্পে। তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। তাদের শরীর কেটে লবণ লাগিয়ে দেয়া হয়। এমনকি তাদের লিঙ্গ কেটে ফেলা হয়। এরপর তাদের মুখে কাপড় ঢুকিয়ে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। পাকসেনা ও বদর-রাজাকারদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ

www.pathagar.com

এলাকার সাধারণ মানুষ সর্বক্ষণ মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকত। পাকসেনাদের সহায়তায় বদর-রাজাকাররা মানুষ হত্যাসহ বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করতো। এলাকায় বদর-রাজাকার ও পাকসেনা কর্তৃক বেশ কয়েকটি নারী নির্যাতনের ঘটনাও সংঘটিত হয়।

ইসলামপুর উপজেলায় পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর দুটি সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম যুদ্ধটি হয় নভেম্বর মাসে ধর্মকুড়া বাজারে পাটগুদামে। এ যুদ্ধে কেউ হতাহত হয়নি। দ্বিতীয় যুদ্ধটি হয় পাথরঘাটা রেলওয়ে ব্রিজে। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম আহত হয়। এ ছাড়া যুদ্ধকালীন এক সকালে পাতশী ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের রৌহাকান্দা গ্রামে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসে। এ খবর পাকক্যাম্পে পৌঁছে গেলে বিকেলে ৪জন পাকসেনা ও ১২জন আলবদর তার বাড়ি ঘেরাও করে। এ পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের পর পর দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। অন্যদিকে গ্রেনেড বিস্ফোরণে ১জন পাকসেনা ও কয়েকজন বদর আহত হয়। ৯ই ডিসেম্বর ইসলামপুর উপজেলা শত্রুমুক্ত হয়।

ইসলামপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৩৮জন। এর মধ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৫জন; যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৯জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২জন– তাঁদের নাম মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম ও অপর জন মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান মিঠু বীর প্রতীক। খালেদ মোশাররফ ছিলেন ২নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার। মিজানুর রহমান মিঠু ১১নম্বর সেক্টরে সাদরুজ্জামান হেলাল কোম্পানির অধীনে বকশীগঞ্জ, কামালপুর, দেওয়ানগঞ্জসহ জামালপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করেন।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার মুক্তিযুদ্ধে পুরো নেতৃত্বে ছিল আওয়ামীলীগ। আর ছিল ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি (ন্যাপ)। দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন আবদুস ছামাদ এমএনএ। সদস্য ছিলেন– এডভোকেট আশরাফ হোসেন এমপিএ, এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন, মুকুল চৌধুরী, কামাল চৌধুরী, এসএম আবুল কালাম, এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক, রশিদুল ইসলাম, আনোয়ারুল আজিম ছানা, ইনসান আলী মাস্টার, রুহুল আমীন বাদশা প্রমুখ। এছাড়া রাশেদুল ইসলাম, চন্দ্র মোহন দাস প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– গাজী নাসির উদ্দিন, এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক, জুলফিকার আলী, যুগেশ কুমার রায়, আনোয়ারুল আজিম ছানা, হারুন হাবিব প্রমুখ।

১২ই মার্চ ছাত্রনেতা আনোয়ারুল আজিম ছানার নেতৃত্বে দেওয়ানগঞ্জ বেলতলী বাজারের রেলক্রসিং-এর পাশে একটি বাঁশ পুঁতে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে

www.pathagar.com

উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। স্লোগান তোলা হয় 'বীর বাঙালি অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। অফিস-আদালত, দোকান-পাট থেকে ভেঙ্গে ফেলা হয় পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি। সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশক্রমে জিলবাংলা সুগার মিলের মাঠে ও হাই স্কুল মাঠে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দেওয়ানগঞ্জ থানার ওসির সহযোগিতায় অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। এয়ার ফোর্সের রুহুল আমীন বাদশা এবং আনসার বাহিনীর কমান্ডার এসএম আবদুল খালেক প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন।

২৬শে এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারি অস্ত্রের গোলাবর্ষণ করতে করতে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে। পাকিস্তানি বাহিনী দেওয়ানগঞ্জে ঢুকে বিভিন্ন স্থানে হত্যাযজ্ঞ চালায়, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। তারা দেওয়ানগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে ও জিলবাংলা সুগার মিলে ক্যাম্পস্থাপন করে। ঐদিন তরুণ ছাত্রনেতা আনোয়ারুল আজিম ছানা সকলকে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজেও আত্মগোপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানপন্থী স্থানীয় দালালেরা তাকে খুঁজে পেয়ে পাকবাহিনীর হাতে সোপর্দ করে। পাকবাহিনী তাকে বাহাদুরাবাদ ঘাটে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ৬ই মে স্বাধীনতার সৈনিক আনোয়ারুল আজিম ছানা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় স্বাধীনতাযুদ্ধ তিনিই প্রথম শহিদ।

দেওয়ানগঞ্জে পাকসেনা বাহিনীর ক্যাম্পস্থাপনের পর স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রদের নিয়ে শান্তিকমিটি এবং রাজাকার-আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। রাজাকার-আলবদর বাহিনী আলিয়া মাদ্রাসায় ক্যাম্পস্থাপন করে। তারা হানাদার বাহিনীকে বিভিন্ন অপকর্মে সহায়তা করতে থাকে। তাদের সহায়তায় পাকবাহিনী স্বাধীনতাকামী লোকজনকে ধরে এনে হত্যা করত। রাজাকার-আলবদর বাহিনী আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। তারা বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ধরে এনে পাকসেনাদের সরবরাহ করত।

যুদ্ধকালীন বাহাদুরাবাদ ঘাটকে মৃত্যুপুরী বলা হতো। এখানে বর্বর পাকহানাদার বাহিনী অসংখ্য মানুষ ধরে এনে চোখ বেঁধে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়। এখানে কয়েকজন আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করা হয়। বদর-রাজাকারের হাতে ধৃত মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষক মঈনুল হক সাইফুল্লাহকে পাকবাহিনীরা বাহাদুরাবাদ ঘাটে নির্মম নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া, আওয়ামীলীগ কর্মী তোফেন আলীকে জনৈক বিহারি ট্রেনের ইঞ্জিনের বয়লারে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারে। এখানে রাজাকার কমান্ডার সুন্নত আলী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ কুখ্যাত রাজাকার পাকসেনাদের মনোরঞ্জনের জন্য নারী সরবরাহ করতো।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর দুটি বড় যুদ্ধ হয়। একটি বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাট যুদ্ধ, অন্যটি জিলবাংলা চিনিকল যুদ্ধ। বাহাদুরাবাদ

www.pathagar.com

ফেরিঘাট যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন জেড ফোর্সের তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর শাফায়াত জামিল। এই যুদ্ধে পুরো ব্যাটালিয়নের আলফা কোম্পানি, ডেলটা কোম্পানি, মর্টার প্লাটুন এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের সজ্জিত জনবলসহ মোট ৩৫০জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেয়। ৩১শে জুলাই ভোর পাঁচটার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও মেশিনগান ও মর্টারে পাল্টা প্রতিরোধ শুরু করে। দুপক্ষের মধ্যে তুমুল গোলাবর্ষণ হয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানিদের ৩টি চার্জ, ফেরিঘাট রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থানরত মালগাড়ির জেনারেটর, যাত্রাবাহী রেলগাড়ির ইঞ্জিন অকেজো করে দেয়া হয়। এছাড়া রেলওয়ে স্টেশন, অনেক রেলওয়ের বগি, ঘাটে অবস্থানরত মালগাড়ি বহনকারী স্টীমার এবং রেলওয়ে জেটির উপর হানাদার বাহিনীর বাংকার বিধ্বস্ত হয়। সেই সঙ্গে বহু সংখ্যক পাকসেনা হতাহত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে একমাত্র সুবেদার ভুলু মিয়া আহত হন। এছাড়া আর কেউ হতাহত হয়নি।

জিলবাংলা চিনিকল যুদ্ধেরও নেতৃত্বে দেন মেজর শাফায়াত জামিল। তাঁর নেতৃত্বে ডেলটা ও আলফা কোম্পানি দেওয়ানগঞ্জ শহরে অপারেশন চালায়। এফএফ কোম্পানির নাসির ও দেলোয়ার মাস্টার অপারেশন পরিচালনার জন্য গাইড ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে। ২রা আগস্ট ভোর ছয়টার দিকে আলফা কোম্পানির ২টি প্লাটুন এবং এফএফ কোম্পানির একটি প্লাটুন একসঙ্গে জিলবাংলা চিনিকলে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে চিনিকল এলাকায় অবস্থানরত বিহারি সৈন্য, রাজাকার ও বালুচ রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন প্রাথমিকভাবে মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর সাথে পেরে না ওঠে অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী জিলবাংলা চিনিকল এলাকায় ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এ আক্রমণে পাওয়ার হাউজের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। অন্যদিকে ডেলটা কোম্পানি আলিয়া মাদ্‌রাসায় অবস্থিত রাজাকারদের ক্যাম্প আক্রমণ করে। রাজাকার বাহিনী জোর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরাভূত হয়ে অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। ডেলটা কোম্পানির দুটি প্লাটুন বীরদর্পে দেওয়ানগঞ্জ শহর প্রদক্ষিণ করে। দেওয়ানগঞ্জ শহর অপারেশনে বহুসংখ্যক রাজাকার নিহত হয় ও ৫জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে এবং কয়েকজন পাকসেনা হতাহত হয়। ৫ই ডিসেম্বর দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা শত্রু মুক্ত হয়।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২৬৮জন। এর মধ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩জন; যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৫জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১জন– তাঁর নাম মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত হোসেন সুজা বীর প্রতীক। তিনি যুদ্ধে আহত হন। তিনি ১১নম্বর সেক্টরে সৈয়দ সাদরুজ্জামান হেলাল কোম্পানির নেতৃত্বে কামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ ও জামালপুর জেলার বিভিন্ন রণাঙ্গন অসম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন।

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জ উপজেলা

মাদারগঞ্জ উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ নেতৃত্বে ছিল স্থানীয় আওয়ামীলীগ। এ উপজেলার আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাদারগঞ্জ উপজেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন সৈয়দ করিমুজ্জামান তালুকদার এমএনএ। সদস্য ছিলেন– ডা. সৈয়দ জামান, দুদু চেয়ারম্যান, আশরাফ তালুকদার, আলাউদ্দিন বি.এসসি., রফিক উদ্দিন তালুকদার, আফজাল হোসেন খান প্রমুখ। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে জোরালো ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে নজরুল ইসলাম তালুকদার ও জিল্লুর রহমান সাদির নাম উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ করিমুজ্জামানের নেতৃত্বে এএইচজেড কলেজ মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আওয়ামীলীগ ও সংগ্রাম পরিষদের পরামর্শক্রমে এলাকার ছাত্র-যুবকেরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য শারীরিক কসরতসহ ড্যামি অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে।

২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এবং ২২শে এপ্রিল জামালপুর সদরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটন ও ক্যাম্পস্থাপনের পর মাদারগঞ্জবাসীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ২৪শে এপ্রিল ৬টি ট্রাক পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গুলি ও শেল নিক্ষেপ করতে করতে মাদারগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে। কিন্তু সেদিন তারা মাদারগঞ্জে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করেই জামালপুরে ফিরে যায়। মাদারগঞ্জে পাকবাহিনীরা কোনো স্থায়ী ক্যাম্পস্থাপন করতে পারেনি। তবে স্থানীয়ভাবে শান্তিকমিটি ও রাজাকার আলবদর বাহিনী গঠিত হয়; তারা মাদারগঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এলাকাবাসী ছিল অতিষ্ঠ। তারা হিন্দুদের বাড়িঘরে লুটপাট চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। তবে মাদারগঞ্জের অধিকাংশ এলাকায় তাদের তেমন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বলা যায়, যুদ্ধকালীন মাদারগঞ্জ প্রায় মুক্ত এলাকা ছিল।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সিধুলি ইউনিয়নে ঢুকে নৃশংস গণহত্যা চালায়। হানাদার বাহিনীর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণে এলাকার ১৫জন সাধারণ মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকবাহিনী আবার মাদারগঞ্জ আক্রমণ করে। এবার তাদের সঙ্গে রাজাকার-আলবদর বাহিনীও যোগ দেয়। ঐদিন পাকবাহিনী ভারি অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গানবোটে যমুনা নদীর নান্দিনার চর দিয়ে মাদারগঞ্জে ঢুকে। তারা যমুনা নদীর দুইপাড়ের গ্রামের উপর বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে। নাদাগাড়ি, নান্দিনার চর, বংচুতুলিয়া, বেপারীপাড়া, খানবাড়ি, ঝালুপাড়াসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে। ঐদিন বংচুতুলিয়া গ্রামের আনসার আলী ঠসাকে হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। সেপ্টেম্বর মাসেই শ্যামগঞ্জ কালীবাড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহিদ হন। বেশ কয়েকজন পাকসেনাও হতাহত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাকসেনারা ১১জন সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে।

www.pathagar.com

মাদারগঞ্জ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪০১জন। এর মধ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩জন; যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৭জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১জন– তাঁর নাম শহিদ মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান বীর প্রতীক। তিনি ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে হাবিবুর রহমান কোম্পানির নেতৃত্বে কামালপুর, বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জসহ জামালপুর জেলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তিনি জামালপুর রণাঙ্গনে শহিদ হন।

বকশীগঞ্জ উপজেলা

মুক্তিযুদ্ধের সময় বকশীগঞ্জ ছিল দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামীলীগ। এখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আর কোনো সংগঠন ছিল না। কোনো ছাত্র সংগঠনও ছিল না। জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে। এই ইউনিয়নেও স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এডভোকেট আশরাফ হোসেন এমপিএ। সদস্য ছিলেন– আব্দুল হামিদ মিয়া, আবদুল বারী, মফিজল হক খন্দকার, মির্জা বদরুল ইসলাম, ডা. সৈয়দুজ্জামান, আ. মমিন মাস্টার, নূর ইসলাম খান, বাল্টু মেম্বার, সৈয়দ মেম্বার, করিম মাস্টার, কালু দফাদার, জহির সরকার, জালাল মুক্তি, ডা. অমল কুমার সেন মন্টু, নূরুল ইসলাম, ইয়ার হোসেন বি.এসসি., নূর ইসলাম খলিফা প্রমুখ।

১৩ই এপ্রিল বকশীগঞ্জে আওয়ামীলীগের সভাপতি আবদুল হামিদ মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক আ. বারীর নেতৃত্বে মধ্যবাজারে আওয়ামীলীগ কার্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এখানে সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীরা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয়। এসময় স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা বাধা দিতে এলে দুপক্ষের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল বিবেচনা করে পাকিস্তানপন্থীরা সটকে পড়ে। ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিকামী জনতা বকশীগঞ্জকে নিজেদের দখলে রাখে।

২৬শে এপ্রিল পাকবাহিনীরা দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে। সেদিনই তারা বকশীগঞ্জেও প্রবেশ করে। বকশীগঞ্জে প্রবেশ করেই হানাদার বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে হত্যাযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ করে। বকশীগঞ্জ বাজারে মহাদেব পাল 'জয়বাংলা' স্লোগান দিলে হানাদার বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে নিয়ে গরুরহাটি পুকুরপাড়ে গুলি করে হত্যা করে। হানাদার বাহিনী বকশীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ ও উলফাতুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ে ক্যাম্পস্থাপন করে। এছাড়া ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা ধানুয়া কামালপুরে বিওপি ক্যাম্পে অবস্থান নেয়। পরবর্তী সময়ে বিওপি ক্যাম্প পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাটিতে পরিনত হয়। এই ঘাটিতে দেড় শতাধিক সৈন্য রোটিশনের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করত।

বকশীগঞ্জে পাকবাহিনীর প্রবেশের পর স্বাধীনতাবিরোধী চক্র আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

শান্তি কমিটি ও রাজাকার আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। তারা এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। কুখ্যাত দালাল মুসলিম লীগ নেতা মুফিজল হক তালুকদারের সহযোগিতায় পাকবাহিনী আওয়ামীলীগ সমর্থক কোব্বাদ আলী বেপারীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কোব্বাদ আলীকে হাত-পা বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারে। রাজাকার আলবদর বাহিনীর ভয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ সবসময় তটস্থ হয়ে থাকতো। তারা বহু বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে এবং বহু মানুষ ধরে এনে হত্যা করে। তারা পাকবাহিনীর সকল কাজে সহায়তা করতো। তাদের সহায়তায় পাকবাহিনীরা নয়াপাড়ার মোড়, চন্দ্রাবাজ, বাট্টাজোড় ও কামালপুরের কয়েকটি গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে। তারা পাকবাহিনীর মনোরঞ্জনের জন্য নারীও সরবরাহ করতো। বকশীগঞ্জে পাকবাহিনী বহু নারী নির্যাতন করে। পাকবাহিনীর নারী নির্যাতনের দুটি কেন্দ্র ছিল। একটি ছিল বর্তমান মাতৃসনদ ভবন, অন্যটি কামালপুর ক্যাম্পের ভিতরে। কামালপুর মুক্ত হলে ক্যাম্পের ভিতর থেকে ৭জন নির্যাতিত নারীর মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। পাকবাহিনীরা এনএম হাই স্কুলের উত্তর পাশে অসংখ্য মানুষ হত্যা করে পুঁতে রেখেছিল।

বকশীগঞ্জের কামালপুর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। কামালপুরে ছিল বিওপি ক্যাম্প পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাটি। কৌশলগত কারণে মুক্তিযুদ্ধে কামালপুর এলাকার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় রণকৌশলগত কারণে মুক্তিবাহিনী বারবার আক্রমণ করেছে হানাদার বাহিনীর এই ঘাঁটি। এই কামালপুর ঘাটির এক মাইল দূরে সীমান্তের ওপরে মাহেন্দ্রগঞ্জে ছিল ১১নম্বর সেক্টরের হেড কোয়ার্টার। ১২ই জুন সর্বপ্রথম ইপিআর-এর নায়েক সুবেদার সিরাজের নেতৃত্বে ১৪৮জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কামালপুর ঘাটি আক্রমণ করা হয়। কিন্তু এই আক্রমণে ঘাটির কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। এরপর ৩রা জুলাই ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজের নেতৃত্বে ডেলটা কোম্পানি ও ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ব্র্যাভো কোম্পানি কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করে। এই অভিযানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কামালপুর ঘাঁটি বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। অপরদিকে এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন মমতাজসহ ৬জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তিবাহিনী আরো দুবার হানাদার বাহিনীর এই ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু দুবারই তারা ঘাঁটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। এরপর মুক্তিবাহিনী কামালপুর ঘাঁটিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর ও বকশীগঞ্জের মাঝের সড়কটিতে প্রচুর এন্টি ট্যাংক মাইন স্থাপন করে। এই মাইন বিস্ফুরণে পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। আগস্ট মাসের শেষের দিকে মাইন বিস্ফুরণে পাকিস্তানিদের নয়টি সরবরাহ ট্রাক এবং সৈন্য বোঝাই ট্রাক ধ্বংস হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর মাঝরাতে মুক্তিবাহিনীর একটি দল কামালপুর বকশীগঞ্জ সড়কের উপর এ্যাম্বুশ পাতে। আরেকটি দল ৭ই সেপ্টেম্বর ভোর সকালে কামালপুর ঘাটি

www.pathagar.com

আক্রমণ করে। এই অভিযানে মুক্তিবাহিনী ঘাঁটির পূর্বাংশ দখল করলেও পশ্চিম অংশের বাংকার থেকে পাকসেনাদের মেশিনগানের গুলি ও মর্টারের গোলায় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে ২জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয় এবং ১৭জন আহত হয়। এদিকে এ্যাম্বুশকারী দলের পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফুরণে বকশীগঞ্জ থেকে আসা পাকিস্তানি সাহায্যকারী দলের একটি সৈন্য বোঝাই ট্রাক সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়। এই ট্রাকের পিছনে ছিল একটি জিপ ও একটি সৈন্য বোঝাই ট্রাক। শত্রু সেনারা ট্রাক থেকে নেমে এ্যাম্বুশকারী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। দুইপক্ষের গুলি বিনিময়ে বেশকিছু পাকসেনা হতাহত হয়। এই গোলাগুলির সময় কামালপুর ঘাঁটি থেকে একদল সৈন্য বকশীগঞ্জের দিকে আসে। তারা এ্যাম্বুশকারী মুক্তিবাহিনীর পিছনে অবস্থান নেয় এবং মুক্তিবাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ৬জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয় এবং ৪জন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ে। এ অবস্থায় এ্যাম্বুশকারী মুক্তিযোদ্ধাদের দল স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর খাসির গ্রামের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর আরেকটি সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। অন্যদিকে ২জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়।

১৩ই নভেম্বর কামালপুর ঘাঁটির উপর মুক্তিবাহিনী আরেকটি আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে সাদরুজ্জামান হেলাল কোম্পানি ও তার প্লাটুন এবং ব্রাদার্স কোম্পানি ও তার প্লাটুন অংশ নেয়। এই যুদ্ধে ১১নম্বর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু তাহেরও অংশ নেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। তবে এই যুদ্ধে শত্রুদের তেমন ক্ষতি করা যায়নি। কিন্তু এই যুদ্ধে কর্নেল তাহের শেলের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। যার পরিণতিতে তার একটি পা কেটে ফেলতে হয়। কর্নেল তাহের আহত হবার পর ১১নম্বর সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পান মানকাচরের সাবসেক্টর কমান্ডার বিমান বাহিনীর অফিসার এম হামিদুল্লাহ খান।

অবশেষে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে ২রা নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত চারিদিক দিয়ে কামালপুর ঘাটি অবরুদ্ধ করে রাখে। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর সদর দপ্তর জামালপুরের সাথে কামালপুরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর খাদ্য ও গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাদের মনোবলও ভেঙ্গে পড়ে। ৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আত্মসমর্পিত পাকসেনাদের সংখ্যা ছিল ১৬০জন। তাদেরকে মিত্রবাহিনী ১০টি ট্রাকে করে ভারতে নিয়ে যায়। কামালপুর ঘাঁটির পতনের মধ্যদিয়েই সূচিত হয় জামালপুরসহ ঢাকা বিজয়ের পথ। ৫ই ডিসেম্বর বকশীগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়।

বকশীগঞ্জ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৫৭জন। শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩জন; যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪জন– তাঁদের নাম মুক্তিযোদ্ধা বশীর আহমেদ বীর প্রতীক, মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল হক মুন্সী বীর প্রতীক, মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান বীর প্রতীক ও মুক্তিযোদ্ধা নূর ইসলাম বীর প্রতীক। মুক্তিযোদ্ধা বশীর আহমেদ ও মতিউর রহমান ১১নম্বর সেক্টরে সাদরুজ্জামান হেলাল

www.pathagar.com

কোম্পানির অধীনে কামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল হক মুন্সী ১১নম্বর সেক্টরের প্রথম কোম্পানি কমান্ডার গাজী নাসিরের অধীনে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধা নূর ইসলাম ১১নম্বর সেক্টরে প্রথমে সাদরুজ্জামান হেলাল কোম্পানির অধীনে পরে বদিউল আলম কোম্পানির অধীনে কামালপুর, কর্ণঝোরা, নকশীসহ জামালপুর শেরপুরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জামালপুরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক পল্লীকবি গায়ক ও কথক। বড় কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এঁরা শিক্ষা লাভ করেননি। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে জীবন-নৌকা বাইতে বাইতে হয়েছেন স্বশিক্ষিত। জীবন, জীবিকা, সমাজ, পরিবেশই এদের শিক্ষালয়, এঁদের জীবনবোধ তথা ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, দয়ামায়া, নিষ্ঠুরতা, অনুরাগ-বিরাগের উৎস। প্রকৃতির খেয়াল ও জীবনের অনিশ্চয়তা অন্যদিকে মানবিক অনুভূতি ভালবাসা-ঘৃণা ইত্যাদি বোধ এঁদেরকে করে তুলেছে জাতশিল্পী। নিজস্ব চেষ্টায় হয়েছেন তাঁদের সমাজের নয়নমণি এবং প্রাণের মানুষ। এঁরা স্বশিক্ষিত তবে এঁদেরও আছে শিক্ষাগুরু, উস্তাদ। এই শিক্ষাগুরুগণও ঐতিহ্যসূত্রে মাটির মানুষ, স্বস্ব সমাজে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। জামালপুরের এরকম কয়েকজন লোকশিল্পীদের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

খমেজ বয়াতি : খমেজ বয়াতি খম বয়াতি নামে পরিচিত। তাঁর জন্ম বিংশ শতাব্দীর প্রথমদশকে, মৃত্যু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমদশকের শেষদিকে। তাঁর আদিনিবাস ছিল মেলান্দহের শিরিঘাট-তেঘরিয়া গ্রাম, পরে মেলান্দহ বাজারে তারপরে বারই পাড়ার হনুমানতলা গ্রামে। এখানেই ছিল তাঁর আমৃত্যু বসবাস।

তাঁর পরিবার ছিল রক্ষণশীল। শৈশবে তাঁর বাবা তাঁকে পড়তে দিয়েছিল মাদ্রাসায়। কৈশোরকাল পর্যন্ত পড়েছেনও সেখানে। এর পরেই তিনি একজন বয়াতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে সেই বয়াতির সাথে চলে যান। ১০ বছর তিনি তারঁ কাছে গান শিখে বাড়ি ফিরেন। তাঁর ছিল দরাজ গলা, উচা-লম্বা-চওড়া শরীরের অধিকারী। গান শিখে ফিরে এসে এলাকায় এলাকায় উপহার দিতে থাকেন একের পর এক গানের আসর। তাঁর গাওয়া নও-খরিদার জারির অনেকগুলো পালার গান জনমনে ব্যাপক সাড়া ফেলে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সুনাম। তারপর জীবনের বহুবছর ছুটে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামে, হাটবাজার-গঞ্জ থেকে গঞ্জে। চলার পথে তাঁর জীবনে অনেক বিত্তবৈভব না এলেও এসেছে অনেক সুনাম, মানুষের অনেক ভালবাসা। তাঁর জীবনে অনেক নারীও এসেছে। ভালবেসে বিয়েও করেছেন একাধিক। কিন্তু এ সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে কষ্টও ভোগ করেছেন তিনি। যৌবনে গান গাইতেন, গান গেয়ে উপার্জিত পয়সায় দিন চলে যেত সচ্ছলভাবে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার জারিগানের চাহিদা কমে গেলে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে মেলান্দহ বাজারে চালের ব্যবসা করতেন।

www.pathagar.com

খম বয়াতি বিখ্যাত ছিলেন নৌ খরিদার জারির জন্য। অসম্ভব শক্তিমান পুরুষ হযরত আলীকে নিয়ে এই জারিগান। হযরত আলীর বীরত্বগাঁথার অনেকগুলো পালা তিনি গাইতেন। তার জারির দলে ৮ থেকে ১০ জন শিল্পী থাকত। বয়াতি ছাড়া দলের অন্য সবাই আসরের মাঝখানে গোল হয়ে বসতেন। বয়াতি এদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে জারি পরিবেশন করতেন। বয়াতির পরনে থাকত সাদা ধুতি, কোমরে বাধা থাকত রুমাল, গায়ে থাকত আয়না লাগানো গেঞ্জি, পায়ে থাকত ঘুঙুর। বয়াতি নেচে গেয়ে বর্ণনা করে পালাকে এগিয়ে নিতেন। বাকিরা সবাই বসে এক একজন বাদ্যযন্ত্র তবলা, ঢোল, খমক, সারিন্দা, দোতারা, জুড়ি, করতাল ইত্যাদি বাজাতেন এবং দিশা গাইতেন। বিচিত্র সুরের এই দিশা গানগুলি ছিল হৃদয়গ্রাহী। খুব চড়া সুরে গাওয়া হত এই দিশা গানগুলি। তার জারির একটা বড় আকর্ষণ ছিল টিয়রি। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর করে আরে ওরে বলে অত্যন্ত চড়াসুরে এই টিয়রি ছেড়ে গায়ের সাদা চাদর দুই হাতে পাখার মত বিস্তার করে যখন দিশা-দলের চারপাশে ঘুরান দিতে থাকতেন তখন তাঁকে মনে হতো কোথাও কোন কল্পলোকে পাখা-মেলা পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে উড়ে চলা রাজপুত্র।

জারিগানের এ রাজপুত্র দীর্ঘদিন হলো বিগত হয়েছেন। তাঁর অনেক শিষ্যও আর নেই এখন। কিন্তু তার কথা কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে লোকের মুখে মুখে। বর্তমানে তাঁর একজন শিষ্য বেঁচে আছেন তিনি হনুমানতলার নজি বয়াতি। বয়সের ভারগ্রস্ত হয়েও নৌখরিদার জারি গানে এখনও সে পারঙ্গম। নতুন প্রজন্ম এ জারি গানকে ভালবাসে কিন্তু কষ্ট স্বীকার করে এটা কেউ শিখতে আগ্রহী নয়। তাই আফসোসের বিষয় তাঁর পরে এ নও খরিদার জারি গান গাওয়ার মত মেলান্দহতে আর কেউ থাকবে না। প্রজন্মের পর প্রজন্মান্তর চলতে চলতে ভুলেই যাবে খম বয়াতির কথা।

কবি কোরবান আলী : জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং মৃত্যু ১৯৯৭। মেলান্দহের বাঘাডোবা গ্রামে তার জন্ম, বেড়ে উঠা, এবং আমৃত্যু বসবাস। বাল্যকাল থেকে দুরন্ত, ডানপিটে ও যাযাবর স্বভাবের এ পল্লীকবি দোতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন, অর্জন করতেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর কবিতা ও গানে প্রকাশ করেছেন। ৭০'র নির্বাচন, ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মানুষের অভাব-অনটন, নীতি-নৈতিকতা, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজের বৈষম্য, ৮৮'র বন্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি রচনা করেছেন কবিতা ও অসংখ্য গান। তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাবের সহজ-সরলতা, চটুলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর রচিত শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচিত গানের সুরের রেশ এখনও কানে বাজে—

"কবি কোরবান ভেবে বলে
কেমনে পালি বউ পুলারে
কবি কোরবান ভেবে বলে।
ভাই বন্ধুরা জারি শুন
কবির কথা মিথ্যা না।
কামাই কইরা কূল পাইছিনা

www.pathagar.com

অভাব কেন ঘরে ঘরে ।
কবি কোরবান ভেবে বলে ।"

স্বাধীনতা পরবর্তী মানুষের দুঃখ দুর্দশা লক্ষ করে গানটি গাইতেন। বঙ্গবন্ধু কে নিয়ে কবিতা লিখেছেন লোকমানুষের জন্য—

"আল্লাহর নামটি স্মরণ করি
দোয়া কইর নূরনবি
কলম ধরি কোরবান কবি
লিখব দেশের ঘটনা
শেখ মুজিবর কান্দে বসে
মানুষ পাইলাম না ।"

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে গিয়েছেন, ট্রেনিং নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের শিবিরে শিবিরে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কলকাতা বেতারে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান গেয়েছেন। যুদ্ধের সময় দেশে ফিরে অস্ত্র হাতে অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন সম্মুখ-যুদ্ধে। মুক্তিবাহিনীতে অংশ নেওয়ার অপরাধে পাকবাহিনীর লোকেরা তাঁর বাবা ও ছোট ভাইকে শহিদ করে দেয়। দেশের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁর যোগ্য পুরস্কার তিনি পাননি। শেষ জীবনে এ লোকমানুষের কবি বিভিন্ন রোগ-শোক, অভাব, পারিবারিক কলহ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে ১৯৯৭ সালে ইহজীবন ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর মেলান্দহের বিভিন্ন হাটে গান গেয়ে আসর জমিয়ে তিনি শান্তি কোহিনূর সালশা, সারিবদি সালশা ইত্যাদি কবিরাজি ঔষধ বিক্রি করতেন। কাঁধে দোতারা ঝুলিয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে দোতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। মাঝে গল্প বলতেন, মজার মজার কথা বলতেন। রেডিও'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্যারোডি পরিবেশন করতেন। মজা করে খবর পড়তেন। এসব রম্য-খবরের শেষে আবহাওয়া বার্তা বলতেন এভাবে, "আজকের আবহাওয়া বার্তা, বৃষ্টি হতেও পারে, নাও হতে পারে।" তিনি নিজে একটি মলম তৈরি করেছিলেন। এর নাম দিয়েছিলেন 'কবি-মলম'। লোকসমাজের মানুষেরা এই কবি-মলম ব্যবহার করে অনেক উপকৃত হতেন। জীবনের শেষ দিকে এগুলোর চাহিদা কমে গেলে জীবননির্বাহ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

বোহেমিয়ান স্বভাবের এ লোককবি বিভিন্ন নারীর প্রেমে পড়েছেন। বিয়েও করেছেন একাধিক। তাঁর কন্যা সন্তানই বেশি। ছেলে মাত্র একজন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কবির কবিত্বের উত্তরাধিকার কেউ পাননি। একজন মেয়ের নাম রোকসানা কোরবান, সে গাইতে পারে, গলার সুরও ভাল। কিন্তু সংসার, দারিদ্র্যের টানাপড়েন তাঁর প্রতিভা বিকশিত হতে পারেনি। উপরে উদ্ধৃত গানের লাইনগুলো তাঁর কাছেই শোনা।

এম.এস. হুদা : জামালপুর জেলার নাটকের ইতিহাসে, বিশেষত পঞ্চাশের দশকের বিবরণে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হবে তাঁর নাম এম.এস. হুদা। তিনি ছিলেন একজন নাটক অন্তঃপ্রাণ ব্যক্তিত্ব— একাধারে নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা

www.pathagar.com

এবং সর্বোপরি একজন নাট্য সংগঠক। নাটক লেখা, অভিনয় করা, নিয়মিত মহড়া দেওয়া, অন্যকে ধরে এনে অভিনয় করানো, নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করা— এসব নিয়েই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন। পেশায় তিনি শিক্ষক ছিলেন বটে, তবে সকলের কাছ থেকে নাট্যকার-অভিনেতা হিসেবেই তিনি সর্বদা সমীহ লাভ করেছেন।

এসএম হুদা

কিশোর জীবন থেকেই তাঁর মধ্যে নাটকের প্রতি গভীর আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। তিনি যখন জামালপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়েন, তখন 'দোনাচার্য' নাটকের 'একলব্য' চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীজীবনে এই নাটকই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। উল্লেখ্য, তাঁর কাছ থেকেই নাটকের অভিনয়ের প্রথম সবক লাভ করেন কিংবদন্তিতুল্য অভিনেতা আনোয়ার হোসেন এবং খ্যাতিমান অভিনেতা-নাট্যকার-চলচ্চিত্রকার আমজাদ হোসেন ও আবদুল্লাহ আল মামুন। আরও উল্লেখ্য, তিনিই প্রথম জামালপুরে নারী চরিত্রে নারী অভিনেত্রী দিয়েই নাটক মঞ্চস্থ করেন যা জামালপুরের প্রবীণ মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এম.এস. হুদার পুরো নাম মো. শামসুল হুদা আকন্দ। তবে তিনি এম.এস. হুদা নামেই পরিচিত। জামালপুর সদর উপজেলার শরীফপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে তিনি ১৯২৫ সালে মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইউনূছ আলী আকন্দ। পেশায় তিনি মোক্তার ছিলেন। তাঁর মাতার নাম হাবিবা খাতুন। পিতা পেশাগত কারণে জামালপুর শহরের কাচারিপাড়ায় বাস করতেন। এখানেই বেড়ে ওঠেন এম.এস. হুদা। ১৯৪০ সালে তিনি জামালপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ১৯৪২ সালে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর তিনি স্নাতক শ্রেণিতে পড়ার জন্য কলকাতায় যান। কিন্তু স্নাতক পাশ অসম্পূর্ণ রেখেই দেশে ফিরে আসেন (অবশ্য পরবর্তীতেকালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে তিনি স্নাতক হন) এবং জামালপুর সদর উপজেলাধীন নান্দিনায় 'মহারাণী হেমন্ত কুমারী হাই স্কুলে' শিক্ষকতার চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে শিক্ষকতা বাদ দিয়ে পুনরায় কলকতায় গিয়ে ফিসারি ডিপার্টমেন্টে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। কিন্তু ৪৭-এর দেশভাগের পর সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৮ সালে নান্দিনা পাইলট হাই স্কুলে পুনর্বার শিক্ষকতার চাকরিতে যোগদান করেন এবং এস্কুল থেকেই দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবন শেষ করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

নান্দিনা পাইলট হাই স্কুলে যোগদানের পর থেকেই তিনি প্রধান শিক্ষকের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় নাটক নিয়ে মেতে ওঠেন। ছাত্র-শিক্ষক এবং এলাকার উৎসাহী

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি নাটক মঞ্চায়ন শুরু করেন। প্রথম দিকে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের নাট্যরূপ দিতেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই নাটক লেখা শুরু করেন। তাঁর রচিত প্রথম নাটকের নাম 'এই যদি হয়'। লেখেন ১৯৫২ সালে। পরবর্তীকালে এই নাটকটি সারা দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়। এমনকি জামালপুরে নাটকটির রজতজয়ন্তী মঞ্চায়নও অনুষ্ঠিত হয়। এম.এস. হুদা ত্রিশটি নাটক রচনা করেছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। এর ভিতর তেরটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটকের নাম 'কার দোষে'। প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। তাঁর অধিকাংশ নাটকই বগুড়া সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার থেকে তাঁর দুটি নাটক প্রচারিত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচারিত হয়েছে সাতটি নাটক। তাঁর রচিত সব নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে এবং এগুলোতে তিনি অভিনয় করেছেন। তিনি একজন প্রশংসাধন্য সুঅভিনেতা ছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত নাটকগুলো হলো— কার দোষে (১৯৫৭, সাহিত্য কুটির, বগুড়া), নতুন দিনের আলো (১৯৬১, নান্দিনা পাইলট হাই স্কুল, জামালপুর), বই চোর (১৯৬১, সাহিত্য কুটির, বগুড়া), ১৪ই আগস্ট (১৯৬১, ঐ), কালোছায়া (১৯৬১, ঐ), জাগরণ (১৯৬৬, ঐ), দরবারে আম (১৯৬৬, ঐ), এই যদি হয় (১৯৬৭, নান্দিনা পাইলট হাই স্কুল, জামালপুর), তালেব মাস্টারের হালখাতা (?), আকালুর ছেলে (?), বাবা সম্মেলন (১৯৮৩, হুদা থিয়েটার্স, জামালপুর), এরই নাম নাটক (১৯৮৪, ঐ) এবং আজরাইল (১৯৮৫, ঐ)। তাঁর অপ্রকাশিত নাটকগুলো হল— পৃথিবী কাঁদে, নাটক নয়, আলোর নীচে অন্ধকার, যা হয়, রক্তস্নাত সূর্য, অন্তরীণ, অন্যদিগন্ত, চিঠি, জনতার দরবার, বোধোদয়, রেশমী রুমাল, ঝাড়ে বাঁশ নাই, শহিদমিনার, সংকেত, দেশের ডাকে, কাশ্মীরী মায়ের আত্মকাহিনি ও রেজভীর মা।

অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে জনপ্রিয় এম.এস. হুদার নাটক কেমন ছিল? এ প্রসংগে অধ্যাপক মো. মজিবর রহমান তাঁর 'স্মৃতির পাতায় নাট্যকার এম.এস. হুদা' প্রবন্ধে লিখেছেন— 'সমাজের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর নাটকের উপজীব্য বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভাষাই ছিল তাঁর চরিত্রের মুখের ভাষা।'

১৯৭৮ সালে তাঁর অনুরাগীরা জামালপুর সদরে তাঁর নামে 'হুদা থিয়েটার্স' গড়ে তুলেছে। এই নাট্য সংগঠনটি এম.এস. হুদার নাটক প্রকাশ ও মঞ্চায়ন করতে থাকে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৫ সালের ৩১শে জানুয়ারি 'হুদা থিয়েটার্স' বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমীর আমন্ত্রণে ঢাকায় এম.এস. হুদার 'বাবা সম্মেলন' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। যথারীতি সে নাটকেও ষাটোর্ধ এম.এস. হুদা অভিনয় করেন। নাটক মঞ্চায়নের পূর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এম.এস. হুদাকে কেন্দ্র করে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাতে বক্তব্য রাখেন শিল্পকলা একাডেমীর নাটক বিভাগের পরিচালক এস.এম. মহসীন, মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং অভিনেতা আনোয়ার হোসেন। ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

www.pathagar.com

তাঁর বক্তব্যে এম.এস. হুদাকে একজন নাট্যকার, নাট্যকর্মী ও নাট্যসংগঠক হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং শিল্পকর্মে জড়িত থেকে আনোয়ার হোসেন, আমজাদ হোসেন ও আবদুল্লাহ আল মামুনের মত স্রষ্টা ও শিল্পী গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

১৯৮৮ সালে জামালপুরে হুদা থিয়েটার্সের আয়োজনে 'এই যদি হয়' নাটকের রজতজয়ন্তী মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল তাঁর প্রদত্ত বাণীতে অভিনেতা নাট্যকার এম.এস. হুদা সম্পর্কে লিখেছেন— 'মফস্বলবাসী জনাব হুদা রাজধানীর প্রচার মাধ্যম ও প্রাদপ্রদীপের আর্শীবাদ বঞ্চিত হলেও প্রকৃত নাট্যপ্রেমীদের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল নন। জীবনের প্রায় সবটাই তিনি নাটকের সাধনায় নিবেদন করেছেন। তাঁর প্রেরণায় ও প্রশিক্ষণে লালিত নাট্যকর্মীদের অনেকেই এখন দেশব্যাপী খ্যাতি ও ঈর্ষণীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। আমাদের নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে তিনি অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'

এই গুণীশিল্পী ১৯৯৪ সালের ২১শে জুলাই ৬৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর জামালপুর পৌরসভার উদ্যোগে শহরের কাচারিপাড়ায় তাঁর নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে।

আনোয়ার হোসেন : বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষ, কিংবদন্তি অভিনেতা আনোয়ার হোসেন তৎকালীন জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত মেলান্দহ থানার দুর্মুঠ ইউনিয়নের সরুলিয়া গ্রামের মিয়াবাড়িতে ১৯৩১ সালের ৬ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এ.কে.এম. নাজির হোসেন ও মাতার নাম সাঈদা খাতুন। তাঁর দাদা আবুল হোসেন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন জামালপুর মহকুমার সাবরেজিস্টার। তিনি ছিলেন পিতা মাতার দুই মেয়ে ও তিন ছেলের মধ্যে তৃতীয় সন্তান এবং ভাইদের মধ্যে বড়।

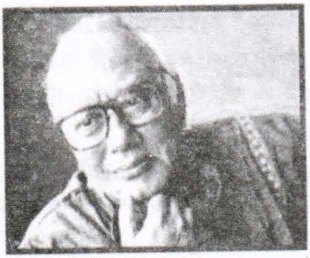
আনোয়ার হোসেন

বাবার বদলীর কারণে ১৯৪০ সালে তিনি দেওয়ানগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাবা সুসংদুর্গাপুরে বদলী হয়ে গেলে আনোয়ার হোসেনকে জামালপুর ফুফার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং জামালপুরে দ্বিতীয়বার প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করানো হয়। প্রাইমারি স্কুল থেকে পাশ করে আনোয়ার হোসেন জামালপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে (বর্তমানে জামালপুর জিলা স্কুল) ক্লাস সেভেনে ভর্তি হন। তাঁর শৈশবকাল গ্রামে কাটলেও কৈশোর ও তারুণ্যের দিনগুলো কেটেছে জামালপুর শহরেই।

১৯৫১ সালে তিনি জামালপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন ইন্টারমিডিয়েটে। কিন্তু ইন্টামিডিয়েটে প্রথম বর্ষে পরীক্ষা দেওয়ার পরই নাটকের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণে

www.pathagar.com

তাঁর লেখাপড়ার ইতি ঘটে। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে লেখাপড়া শেষ করে বড় চাকরি করবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হবার নয় বুঝতে পেরে তিনি ছেলেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন তাঁর বন্ধু আবদুল্লাহ খানের সেলকন ইঞ্জিনিয়ারিং নামের এক কনস্ট্রাকশন ফার্মে চাকরি করার জন্য। আনোয়ার হেসেন ঢাকায় এসে সেলকন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে সুপারভাইজার পদে যোগদান করেন। কিন্তু এ চাকরি তিনি বেশিদিন করেননি। অভিনয়ের টানে ১৯৬১ সালে তিনি কনস্ট্রাকশন ফার্মের চাকরি ছেড়ে দেন। শুরু হয় তাঁর অভিনয় জীবন।

স্কুলজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে নাটকের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি যখন জামালপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে নবম শ্রেণির ছাত্র, সে সময় স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রথম অভিনয় করেন। সে সময় তিনি স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে প্রথমবর্ষে পড়ার সময় আসকার ইবনে শাইখের লেখা 'পদক্ষেপ' নাটকে নায়কের ভূমিকায় প্রথম মঞ্চে অভিনয় করেন এবং অভিনেতা হিসেবে সকলের প্রশংসা লাভ করেন। তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয় নাটকের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। তিনি যখন বাবার নির্দেশক্রমে সেলকন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি নিয়ে ঢাকায় আসেন, তখন তিনি চাকরি করার পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঢাকার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় নাটকের রিহার্সেল দেখতে বেরুতেন। ১৯৫৯ সালে আনোয়ার হোসেন ননী দাসের পরিচালনায় 'এক টুকরো জমি' নাটকে ঢাকায় প্রথম অভিনয় করেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় মাহাবুব আলী ইন্সটিটিউটের মিলনায়তনে। ক্রমে তিনি ঢাকার বিভিন্ন নাটকের দল ও নাটকের লোকজনের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করতে থাকেন। এভাবে নাটকে অভিনয় করতে করতে ঢাকা বেতারের এক প্রযোজকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। রেডিও নাটকে অডিশন দিয়ে তিনি নির্বাচিত হন এবং 'নওফেল হাতেম' নাটকের একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেন। এটিই তার রেডিও-তে প্রথম অভিনীত নাটক। এ নাটকে অভিনয় করে তিনি ১৫ টাকা সম্মানী পান। তখনকার দিনে রেডিও ছিল ইলেকট্রিক মিডিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম।

এই রেডিও নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে আনোয়ার হোসেনের পরিচয় ঘটে চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্ব আবদুল জব্বার খান, মোহাম্মদ আনিস, হাবিবর রহমানের সঙ্গে। এ সময় তিনি পেশাদার নাট্য সংগঠন মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত হন। মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন বিনোদন মাসিক 'ঝিনুক'। এ পত্রিকার সম্পাদক আসিরুদ্দিন। মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ফতেহ লোহানী, সৈয়দ হাসান ইমাম, মেহফুজ, সুভাষ দত্ত, চিত্রা সিনহা প্রমুখ অভিনেতা। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম গ্রুপ থিয়েটার মিনার্ভা সম্মানীর বিনিময়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় নাটক মঞ্চায়ন করত। এ সময় আনোয়ার হোসেন প্রতি শো-তে সম্মানী পেতেন ১৫ টাকা।

১৯৬১ সালে জুন মাসে মোহাম্মদ আনিস তাঁকে পরিচালক মহিউদ্দিনের কাছে নিয়ে যান। মহিউদ্দিন পরিচালিত 'তোমার আমার' ছবিতে মাত্র ৩০০/- টাকা সম্মানীতে তিনি ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করেন। এটিই তাঁর অভিনীত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। এরপর তিনি সালাউদ্দিন পরিচালিত 'সূর্যস্নান' ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয়

www.pathagar.com

করেন। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬২ সালে। এ ছবিতে অভিনয় করে তিনি সম্মানী পান ১৫০০ টাকা। ছবিটিতে তাঁর অভিনয় দর্শকের প্রশংসা লাভ করে। এরপর তিনি একে একে অভিনয় করেন জোয়ার এলো (১৯৬২), কাচের দেয়াল (১৯৬৩), নাচঘর (১৯৬৩), বন্ধন (১৯৬৪), দুই দিগন্ত (১৯৬৪), সাত রং (১৯৬৫), এ কালের রূপকথা (১৯৬৫) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে। ১৯৬৬ সালে তিনি অভিনয় করেন উর্দু চলচ্চিত্র 'উজালা'য়। ১৯৬৭ সালে তিনি 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' চলচ্চিত্রে নবাবের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ছবিটি পরিচালনা করেন খান আতা। ছবিটি বাংলা ও উর্দু ভাষায় নির্মিত হয়। এই ছবিতে অভিনয় করে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং বাংলা চলচ্চিত্রে কিংবদন্তি অভিনেতায় পরিণত হন। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলার 'মুকুটহীন নবাব' উপাধিতে ভূষিত হন।

এর কারণও ছিল। 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' ছবিটির কাহিনি যেমন ছিল ঐতিহাসিক, তেমনি খান আতার এই ছবিটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বয়ে নিয়ে এসেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনমানসে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পর একদিকে যেমন– পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি জাতিসত্ত্বার ক্রম জাগরণের সূচনা ঘটেছিল, তেমনি ৬৬-র ছয় দফা আন্দোলনের পর এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্বাধিকার চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। দেশের সেই পটভূমিকায় 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' ছবিটি ছিল গভীর তাৎপর্যময়। আর এই তাৎপর্য দর্শকচিত্তে গভীরভাবে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অভিনেতা আনোয়ার হোসেন।

আনোয়ার হোসেন অভিনীত আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ছবি জহির রায়হান পরিচালিত 'জীবন থেকে নেয়া'। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭০ সালে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় নির্মিত এ ছবিতে বাঙালির স্বাধিকার চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছবিতে আনোয়ার হোসেন 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা'র মতই অসামান্য দক্ষ অভিনয় করেন। তাঁর চরিত্রটি ছিল সাংবাদিক এবং আদর্শবাদী একজন রাজনীতিবিদের। একটি পরিবারের বড় ভাই আনু কিভাবে দেশমাতৃকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, কারাবরণসহ নানা দুর্ভোগ সত্ত্বেও জনগণকে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন–তার সত্যিকার রূপায়ন যেন ছিল তাঁর অভিনয়। তাঁর শক্তিমান অভিনয় যেন আলোর ফুলকি হয়ে ফুটে উঠেছিল রূপালি পর্দায়। আজও এই চলচ্চিত্রটি তাঁর অভিনয়ের গুণে বাঙালির নানা আন্দোলনে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। আর এভাবেই আনোয়ার হোসেন তাঁর অভিনয়ের মধ্যদিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেন।

প্রায় পাঁচদশকব্যাপী অভিনয় জীবনে আনোয়ার হোসেন চারশতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হলো— নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৭), জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০), ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩), লাঠিয়াল (১৯৭৫), আলোর মিছিল, অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, পালঙ্ক (১৯৭৬), রূপালী সৈকতে (১৯৭৭), নয়ন মনি (১৯৭৭), গোলাপী এখন ট্রেনে (১৯৭৮), সূর্য সংগ্রাম, (১৯৭৯), তিতাস একটি নদীর নাম, ভাত দে (১৯৮৪), দায়ী কে (১৯৮৭) প্রভৃতি। এছাড়াও আরও কিছু ছবির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেসব ছবিতে তাঁর অভিনয় দক্ষতা

www.pathagar.com

অম্লান হয়ে আছে। যেমন–সূর্যস্নান, সুতরাং, এতটুকু আশা, দর্পচূর্ণ, দীপ নেভে নাই, রংবাজ, সাত ভাই চম্পা, ক,খ,গ,ঘ,ঙ, সুজন সখি, সূর্যগ্রহণ, ঘানি প্রভৃতি।

আনোয়ার হোসেন ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ, প্রাণবন্ত, নিষ্ঠাবান ও বহুমাত্রিক অভিনয়শিল্পী। তিনি অভিনয় করতেন অভিনয়কে ভালোবেসে। তিনি নিজেই ছিলেন নিজের তুলনা। বাংলা চলচ্চিত্রের সাদা-কালোর যুগ থেকে রূপালি পর্দায় বা মঞ্চে যতদিন অভিনয় করেছেন, দর্শকদের মোহিত করে রেখেছেন। তিনি যেমন একদিকে ঐতিহাসিক, সামাজিক, রূপকথাধর্মী ও রাজনৈতিক ছবিতে অভিনয় করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ভিলেন, নায়ক, নবাব, ছাত্রনেতা, সৎ পুলিশ অফিসার, শিক্ষক, লাঠিয়াল, চাকর, রিক্সাওয়ালা, ড্রাইভার, পোড়-খাওয়া বাবা, ত্যাগী বড় ভাই, পাইলট, মেথর, দাদু, চিকিৎসক–এরূপ অংসখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন। তিনি শহুরে বা গ্রামীণ সকল চরিত্রেই সাবলীল অভিনয় করতেন; চরিত্রের সাথে মিশে যেতেন। চরিত্রের গভীর গিয়ে তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর অসামান্য অভিনয় দক্ষতায়। তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রকার ও অভিনেতা আমজাদ হোসেন বলেছেন— 'যে কোনো চরিত্র নিজের মধ্যে ধারণের অপরিসীম দক্ষতা ছিল তাঁর। অভিনয় ছিল তাঁর অস্থি-মজ্জা আর রক্তে প্রবাহিত। তাই তাঁর অভিনীত প্রতিটি চরিত্র কালজয়ী হয়ে আছে। এদেশে চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবেন তিনি (বাংলাদেশ প্রতিদিন; ১৪.০৯.২০১৩; ঢাকা)। চলচ্চিত্রকার চাষী নজরুল ইসলাম মনে করেন— 'তাঁর মতো গুণী শিল্পী শতবর্ষেও একজন আসে না। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম সেরা অভিনেতা। এ উপমহাদেশের চার-পাঁচজন জাঁদরেল অভিনেতার নাম বললে তাঁরও নাম বলতে হবে' (বাংলাদেশ প্রতিদিন; ১৬.০৯.২০১৩; ঢাকা)।

আনোয়ার হোসেন ছিলেন সুঠামদেহী, সুদর্শন। তাঁর ছিল ভরাট দরদী কণ্ঠ। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সহজেই সনাক্ত করা যেত। তিনি ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর প্রিয় কবি ছিল রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। চলচ্চিত্রের জগতে তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রবল ব্যক্তিত্বময়। অন্যদিকে, ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন উদার, বন্ধুবৎসল, আবেগপ্রবণ, বিনয়ী সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ। তিনি বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা হয়েও সেলিব্রেটি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সকলের ভালোবাসার মানুষ, কাছের মানুষ। রূপালি পর্দার মানুষ হয়েও তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর মধ্যে কোনো অহংকারবোধ ছিল না। তিনি চলচ্চিত্রের জগতে আগামী প্রজন্মের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবেন।

আনোয়ার হোসেন তাঁর অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'সূর্যস্নান' (১৯৬২) ও 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৭) ছবিতে অভিনয়ের জন্য দুইবার পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক মানের 'নিগার পুরস্কার'; 'লাঠিয়াল' (১৯৭৫) ছবিতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ; 'পালঙ্ক' (১৯৭৬) ছবিতে অভিনয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার; 'গোলাপী এখন ট্রেনে' (১৯৭৮) ছবিতে অভিনয়ের জন্য পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার; 'পালঙ্ক' ও 'সূর্যসংগ্রাম' (১৯৭৯) ছবিতে অভিনয়ের জন্য

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে দুইবার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কার; 'দায়ী কে' (১৯৮৭) ছবিতে অভিনয়ের জন্য পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এছাড়া তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে অবদান রাখার জন্য ১৯৮৮ সালে একুশে পদক লাভ করেন। ২০০৯ সালে চ্যানেল আই চলচ্চিত্র মেলায় তাঁকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করে এবং ২০১০ সালে জাতীয় পুরস্কারে তাঁকে আজীবন সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়।

আনোয়ার হোসেন পারিবারিকভাবে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নাসিমা খানম। তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদের নাম– তাহের হোসেন, কামাল হোসেন, বশির হোসেন ও সাজ্জাদ হোসেন। মেয়ের নাম জিনাত। এই মহান অভিনয়শিল্পী ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

মোহাম্মদ ফজলুল হক : জন্ম. চরভবসুর গ্রাম, দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুর, ১৯৩৩। সংগীতশিল্পী। পিতা আইনজীবী ফসিহউদ্দীন সরকার, মাতা আবিদা খাতুন। বাল্যকাল থেকেই গানের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। পিতা ছিলেন তাঁর সংগীত-চর্চার বিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত শিক্ষায় পুত্রকে শিক্ষিত করে তুলতে। পারিবারিক বাধা উপেক্ষা করে ষোলো বছর বয়সে গান শেখার অভিপ্রায়ে পাটনায় গমন। সেখানে ওস্তাদ নুর মোহাম্মদ খানের কাছে গানের তালিমগ্রহণ। কলকাতায় গিয়ে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, বিনয় দাস, বিজন ভট্টাচার্য ও ওস্তাদ নিছার হোসেন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ। সংগীতজগতের প্রবাদপুরুষ মোহাম্মদ রফির সঙ্গে দিল্লিতে এক সংগীতানুষ্ঠানে মীর্জা গালিবের একটি গজল গেয়ে সংগীতরসিকদের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন। মোহাম্মদ ফজলুল হকের কণ্ঠের প্রশংসা করে মোহাম্মদ রফি বলেন, 'হামরা মাফিক একদম দোসরা আওয়াজ হায়'। ১৯৫৯-এ ঢাকায় আগমন। ঢাকা বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগদান। ঢাকার শাহীন স্কুল, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, নিক্কণ ললিতকলা একাডেমি (শান্তিনগর, ঢাকা) ও মীরপুর সাংস্কৃতিক একাডেমির উচ্চাঙ্গসংগীতের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। উচ্চাঙ্গসংগীত, নজরুল-গীতি, আধুনিক গান ও গজল গানের সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন। 'আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ', 'গা গারে গা নাম মোহাম্মদ' প্রভৃতি নজরুল-গীতি, 'আকাশের চাঁদ তুমি আকাশেই থাকো' প্রভৃতি আধুনিক গান, 'মাওলা মায়তো জোগান বানে তেরি ইয়াদ মে', 'চান্দা তুয়ো সেনা বোলেঙ্গে ম্যাঁ' প্রভৃতি গজল সুললিত কণ্ঠে পরিবেশন। গানের শিক্ষক হিসেবেও সুনাম অর্জন। নীনা হামিদ, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, আনজুমান আরা বেগম, জিনাত রেহানা, ফেরদৌস ওয়াহিদ প্রমুখ খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পীর সংগীত-গুরু। প্রতিভাবান গায়ক। তাঁর সুরের ব্যঞ্জনায় বাংলাগানের প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ। সংগীতে অবদান রাখায় একুশে পদক লাভ (১৯৯৩)। মৃত্যু. ঢাকা, ১৯৯৩।

মোহাম্মদ ফজলুল হক

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ আল মামুন : অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক, চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক আবদুল্লাহ আল মামুন জামালপুর সদর উপজেলার আমলাপাড়ায় ১২ই জুলাই ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল কুদ্দুস, তিনি জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ৫২'র ভাষা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মাতার নাম ফাতেমা খাতুন। তিনি ৪ ভাই বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন।

আবদুল্লাহ আল মামুন

জামালপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে (বর্তমান জামালপুর জিলা স্কুল) তাঁর লেখাপড়ার শুরু হয়। তবে ১৯৫৮ সালে কিশোরগঞ্জের আজিমউদ্দিন হাই স্কুল থেকে তিনি মেট্রিক পাস করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে ইতিহাসে স্নাতক ও ১৯৬৪ সালে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়, সাংবাদিকতা দিয়ে। তিনি কিছুদিন দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সহসম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে টেলিভিশনে যোগদান করেন। এখানেই তিনি সিনিয়র প্রযোজক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং পরিচালক (ফিল্ম ও ভিডিও ইউনিট) হিসেবে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে ২০০১ সালের মার্চ মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মহাপরিচালকের পদে দায়িত্ব পালন করেন।

স্কুলজীবন থেকেই আবদুল্লাহ আল মামুন অভিনয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এ সময় তিনি অভিনেতা-নাট্যকার এম.এস. হুদার সংস্পর্শে আসেন। তিনি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র সে সময়ই নাট্যকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ সময় তিনি 'ঋতুরাজ' নামে একটি কাব্যনাটক লেখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সংস্কৃতি সংসদের সাথে জড়িত হন। সংস্কৃতি সংসদের জন্য রচনা করেন প্রতীকী নাটক 'শপথ'। তাঁরই নির্দেশনায় নাটকটি বাংলা একাডেমির খোলা মাঠে মঞ্চস্থ করা হয়। এসময় তিনি ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। অভিনয় করেন শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' নাটকে। এসময়েই তিনি নাট্যকার-সাহিত্যিক অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সাথে পরিচিত হন। মুনীর চৌধুরীর রচিত ও নির্দেশনায় 'দণ্ডধর' ও মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অভিনয় করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'থিয়েটার' নামে একটি নাটকের দল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। থিয়েটার

www.pathagar.com

প্রযোজিত এ পর্যন্ত ৩৮টি নাটকের মধ্যে ২০টিই তাঁর লেখা এবং ২২টি নাটকের তিনি নির্দেশক ছিলেন। প্রতিটি নাটকেই তিনি অভিনয় করেন। তিনি একজন অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন। তিনি ৩৫টির মত মঞ্চনাটক লেখেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল– সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, সেনাপতি, এখনও ক্রীতদাস, তোমরাই, কোকিলারা, দ্যাশের মানুষ, স্পর্ধা, মেরাজ ফকিরের মা, তাহারা এখন, মেহেরজান আরেকবার, গোলাপ বাগান, জন্মদিন প্রভৃতি। মেহেরজান নাটকটি বিপুলভাবে প্রশংসিত হয় এবং নাটকটির শততম মঞ্চায়ন সম্পন্ন হয়। তাঁর কোকিলারা একটি নিরীক্ষামূলক এক চরিত্রের নাটক। বাংলাদেশের নাট্যরচনা ও প্রযোজনার ইতিহাসে এ নাটকটি একটি মাইলফলক হয়ে আছে। সমাজের নামে, ধর্মের নামে নারীরা কীভাবে নিগৃহীত হয় তাই তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে। ফেরদৌসী মজুমদারের অভিনয় দক্ষতায় নাটকটির প্রযোজনা দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে দর্শক প্রশংসিত হয়েছে।

তাঁর নাটকে দেশ, সময় ও সমাজ জোরালোভাবে উপস্থিত হয়েছে। সমাজের নানা অনাচার-অবিচারের চিত্র তুলে ধরে তিনি মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেশ, সমাজ ও দেশজ সংস্কৃতি বিকাশের একজন একনিষ্ঠ কলমযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর নাট্যকর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চেতনা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি শুধু নাট্য রচনা ও অভিনয়েই নয়, মঞ্চনাটক নির্দেশনাতেও অন্যন্য ছিলেন। তাঁর নির্দেশিত প্রায় সব নাটকেই দর্শকনন্দিত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকের নির্দেশনা দিয়ে তিনি সারাদেশে প্রবল আলোচনার সৃষ্টি করেন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পুরো বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভিনেতা-নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে তাঁর অবস্থান অনন্য। তাঁর সম্পর্কে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য— 'বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যশিল্পের অন্যতম কারিগর আবদুল্লাহ আল মামুন। তার শিল্পের হাত মুক্তিযুদ্ধ উত্তর সময়ে এদেশের নাট্যচর্চার নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এদেশের নাটক অনন্তকাল এই গৌরবগাথা বহন করবে' (দৈনিক যুগান্তর; ২২-০৮-২০০৮)। সৈয়দ শামসুল হক তাঁকে 'নাট্যপ্রাণ' অভিধায় ভূষিত করেছেন।

বাংলাদেশের টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘ সময়কাল এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। এদেশের টেলিভিশন মিডিয়ায় যুগান্তকারী নানা উদ্ভাবনের জন্য তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতা পূর্বকালে তিনিই প্রথম শহীদুল্লাহ কায়সারের বিখ্যাত উপন্যাস 'সংশপ্তক' অবলম্বনে টিভি সিরিয়াল নির্মাণ করেন যা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাধীনতার পর তিনিই প্রথম জোয়ারভাটা (২০০পর্ব) ও পরে এক জনমে (২৮৭ পর্ব) ধারাবাহিক নির্মাণ করেন। দুটি ধারাবাহিকই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তাঁকে বাংলাদেশের টিভি মেগাসিরিয়ালের জনক বলা হয়ে থাকে। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিকগুলো হলো : ঘরোয়া (৫২ পর্ব), আমি তুমি সে (২৬ পর্ব), পাথর সময় (১৩ পর্ব), বাবা (২০০ পর্ব), উত্তরাধিকার (২৪ পর্ব), শেষ বিকেলের মেয়ে (৭ পর্ব) প্রভৃতি। এছাড়া আশির দশকে তিনি সংশপ্তক (১৬ পর্ব) ধারাবাহিকটি

www.pathagar.com

পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি টেলিভিশনের জন্য দেড়শ নাটক লিখেছেন এবং সমান সংখ্যক নাটকে অভিনয়ও করেছেন।

আবদুল্লাহ আল মামুন বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণও করেছেন। তাঁর নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে– সারেং বউ, সখি তুমি তার, এখনই সময়, দুই জীবন, বিহঙ্গ, ফেরদৌসী মজুমদার জীবন ও অভিনয় (প্রামাণ্য) ও জনমদুখী। তিনি কয়েকটি ছবির চিত্রনাট্যও লিখেছেন। এর মধ্যে অশিক্ষিত, জীবন নিয়ে জুয়া, অঙ্গীকার ছবির চিত্রনাট্য লেখে প্রশংসা লাভ করেন।

তিনি নাটক, চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, আত্মজীবনী ও অভিনয় সংক্রান্ত বই লিখেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর ২৫টি নাটকের বই, ৭টি উপন্যাস, 'ম্যানহাটান' নামে একটি ভ্রমণকাহিনি, 'আমার আমি' নামে আত্মজীবনী ও অভিনয় (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী আবদুল্লাহ আল মামুন তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রথম জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (১৯৭৮), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯), অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে দুইবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে দুইবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, থিয়েটার প্রবর্তিত মুনীর চৌধুরী সম্মাননা (১৯৯১), চিত্রনাট্যকার ও কাহিনিকার হিসেবে বাংলাদেশ ফিল্ম জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন পুরস্কার, তারকালোক পদক, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার ও একুশে পদক (২০০০)। এই প্রতিভাবান নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, নির্দেশক ও অভিনয়শিল্পী ২১শে আগস্ট ২০০৮ সালে ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

নজরুল ইসলাম বাবু : স্বাধীনতা পরবর্তীকালের এক অসাধারণ গীতিকারের নাম নজরুল ইসলাম বাবু। দেশাত্মবোধক ও আধুনিক বাংলা গানের জগতে তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভা। 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না/ আমি গাইব গাইব বিজয়ের গান/ ওরা আসবে চুপি চুপি/ যারা এই দেশটাকে/ ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ' কিংবা 'ডাকে পাখি খোল আঁখি/ দেখো সোনালি আকাশ/ বহে ভোরের বাতাস'– এরূপ অসংখ্য বাণীসমৃদ্ধ দেশাত্মবোধক ও আধুনিক গানের রচয়িতা তিনি।

নজরুল ইসলাম বাবু

সত্তর দশকের এই বরেণ্য গীতিকারের জন্ম ১৯৪৯ সালের ১৭ই জুলাই জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার চরনগর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম বজলুল কাদের ও মাতার নাম রেজিয়া বেগম। তাঁরা উভয়েই শিক্ষক ছিলেন। নজরুল ইসলাম বাবু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন স্থানীয় মুজাআটা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন শ্যামগঞ্জ কালীবাড়ি উচ্চ

www.pathagar.com

বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন বরিশালের বিএম কলেজ থেকে। তাঁর বড় মামা বরিশালে চাকরি করতেন। বরিশাল থেকে ফিরে এসে বাবু ১৯৭০ সালে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে বি.এসসি.-তে ভর্তি হন। এসময় আইয়ুব বিরোধী রাজনীতির কারণে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। উল্লেখ্য, নজরুল ইসলাম বাবু স্কুলজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি ভারতে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করে ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে বাবু জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে বি.এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন। এসময়েই তিনি রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকায় গিয়ে প্রিন্টিং ব্যবসা শুরু করেন। উল্লেখ্য, নজরুল ইসলাম বাবু গান লেখার পাশাপাশি আধুনিক কবিতাও লিখতেন। বিশেষ করে স্বাধীনতার পর '৭১ সাল থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত জামালপুরে অবস্থানকালে তিনি প্রচুর কবিতা লিখেছেন। এ সময়কালে জামালপুর থেকে প্রকাশিত প্রায় সকল পত্র-পত্রিকায়, স্মরণিকা-সংকলনে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। এ সময় তিনি বিভিন্ন স্মরণিকা সংকলন সম্পাদনা করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'চিঠি' (১৯৭২), প্রহেলিকা সাহিত্য গোষ্ঠী থেকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'কাণ্ডারী' (১৯৭২) এবং সাইদুর রহমান হিমুর সাথে যৌথ সম্পাদনায় 'অবগাহন' (১৯৭২) সম্পাদনা করেন; এটিও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হয় (জামালপুর লিটন ম্যাগ চর্চা: আলী জহির; বাংলাদেশে লিটন ম্যাগাজিন চর্চা: অতীত ও বর্তমান; সম্পাদক; মিজান রহমান; ফেব্রুয়ারি ২০০৭, কথাপ্রকাশ বাংলা বাজার; ঢাকা)। এই সময়কালে নজরুল ইসলাম বাবু জামালপুরে একজন আধুনিক কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রকাশিত বিভিন্ন স্মরণিকামূলক ফোল্ডারে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিও ব্যবহার করা হত। তাঁর কবিতা যেমন ছিল আধুনিক ও রোমান্টিক, তেমনি ছিল দেশমাতৃকাসংলগ্ন ও উদ্দীপনামূলক। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি কবিতার পথে না গিয়ে গান রচনার দিকেই সম্পূর্ণ মনযোগী হন।

নজরুল ইসলাম বাবু জামালপুরে অবস্থানকালেই গীতিকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও, ঢাকায় যাওয়ার পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি সুরকার শেখ সাদী খানের সঙ্গে প্রথম চলচ্চিত্রে গান লিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি বহু চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখেছেন। তিনি 'বাংলাদেশ গীতিকবি সংসদের' প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদের (১৯৭৮-৭৯) সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

১৯৮৪ সালের ২৩শে নভেম্বর নজরুল ইসলাম বাবু তাঁর খালাত বোন শাহীন আখতারকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুটি কন্যা সন্তান। বড়জনের নাম নাজিয়া ইসলাম আর ছোটজনের নাম নাফিয়া ইসলাম। তার দুজনেই উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছে।

নজরুল ইসলাম বাবু প্রায় চার শতাধিক গান রচনা করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। আরও জানা যায়, তাঁর মধ্যে তাৎক্ষণিক ও ফরমায়েশি গান লেখার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কবি আল মাহমুদ তাঁর এই প্রতিভাকে বিদ্রোহী কবি কাজী

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামের সাথে তুলনা করেছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো এই গীতিকারও জীবনযাপনে ও সঙ্গীত রচনায় অনেকটাই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। সিগারেটের প্যাকেটের উল্টোপিঠে, ছেঁড়া-টুকরো কাগজে কিংবা অন্যের ডায়েরি খাতায় তিনি গান লেখতেন। ফলে পরবর্তীকালে তাঁর অনেক গানের হদিস পাওয়া যায় না। কাজী নজরুল ইসলাম পেয়েছিলেন অকাল কবি জীবন আর নজরুল ইসলাম বাবু হয়েছেন অকাল প্রয়াত। ১৯৯০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর এই প্রতিভাবান গীতিকার মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

নজরুল ইসলাম বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর কিছু বিশিষ্ট বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী 'নজরুল ইসলাম বাবু স্মৃতি পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন গীতিকার মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সুরকার শেখ সাদী খান। এই স্মৃতি পরিষদেরই পুনর্গঠিত (১৯৯৫ সালে) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি এস.এম. মজিবর রহমানের উদ্যোগে এবং তৎকালীন ভূমিমন্ত্রী রাশেদ মোশাররফের সহযোগিতায় ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় নজরুল ইসলাম বাবুর গানের সংকলন 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না'।

বইটিতে ১৬৯টি গান রয়েছে। এর মধ্যে দেশাত্মবোধক গান রয়েছে ১০৯টি, আধুনিক গান রয়েছে ৫১টি আর ধর্মীয় গান রয়েছে ৯টি। বইটির ভূমিকা লিখেছেন এদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। তবে এই বইটিতে নজরুল ইসলাম বাবুর অনেক জনপ্রিয় ও বাণীসমৃদ্ধ গান সংকলিত হয়নি।

'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না' গীতি গ্রন্থের ভূমিকায় কবি আল মাহমুদ নজরুল ইসলাম বাবুর দেশাত্মবোধক গানের শৈল্পিক মূল্যায়ন করেছেন এভাবে— 'বাবুর গানের মধ্যে স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতি ও চিত্রকল্পগুলো আহত সৈনিকের ক্ষতচিহ্নের মত বসে গিয়েছিল। তার অধিকাংশ গানে মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যকল্প অত্যন্ত সহজভাবে উঠে এসেছে।' প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলাম বাবুর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি ও মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অপার মমত্ববোধজনিত দেশাত্মবোধক গানগুলোর হৃদয়গ্রাহী আবেদন এদেশের মানুষের কাছে কখনই পুরনো হবে বলে মনে হয় না। তাঁর আধুনিক ও প্রেমমূলক গান সম্পর্কে কবি আল মাহমুদের মূল্যায়ন– 'তার প্রেমের গানে প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের যে মিশ্রণ বা যোজনা আছে তাকে আমি এক অসামান্য সৃজনক্ষমতা বলে মনে করি।'

নজরুল ইসলাম বাবুর আধুনিক ও দেশাত্মবোধক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন এদেশের ও উপমহাদেশের বিখ্যাত শিল্পীরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— রুনা লায়লা, শাহনাজ রহমতুল্লাহ, সাবিনা ইয়াসমিন, আশা ভোস্‌লে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফেরদৌসী রহমান, আব্দুল জব্বার, আবিদা সুলতানা, সুবীর নন্দী, শাম্মী আখতার, সৈয়দ আব্দুল হাদী, হৈমন্তী শুক্লা, রফিকুল আলম, দিলরুবা খান, কুমার বিশ্বজিৎ, নার্গিস পারভীন প্রমুখ খ্যাতনামা গায়ক-গায়িকা। বাবুর গানের সুরারোপও করেছেন এদেশের বিখ্যাত সুরকারগণ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন খন্দকার নুরুল আলম, শেখ সাদী খান, আলাউদ্দীন আলী, অজিত রায়, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, মোহাম্মদ রফিক, বশির আহমেদ প্রমুখ।

www.pathagar.com

এ রচনার শুরুতেই তাঁর দেশাত্মবোধক গানের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কালজয়ী দেশাত্মবোধক গানের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

১. আমায় গেঁথে দাওনা মাগো
একটা পলাশ ফুলের মালা
আমি জনম জনম রাখবো ধরে
ভাই হারানোর জ্বালা ॥

২. ও আমার আট কোটি ফুল
দেইখো গো মালী
শক্ত হাতে বাইন্ধো মালী লোহার জালি ॥

৩. উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম
সব নিয়ে এক ব্রহ্মচারী
চমকে তাকালো থমকে দাঁড়ালো
দেখলো দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম দেখা যায়
গ্রামটা ছুঁয়ে একটা নদী বয়ে যায়
ধীরে ধীরে ধীরে।

৪. একটি বাংলাদেশ
তুমি জাগ্রত জনতার
সারা বিশ্বের বিস্ময়
তুমি আমার অহংকার ॥

এ পর্যায়ে নজরুল ইসলাম বাবুর কয়েকটি জনপ্রিয় আধুনিক গানের উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো—

১. হাজার মনের কাছে প্রশ্ন রেখে
একটি কথাই শুধু জেনেছি আমি
পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই
প্রেম বলে কিছু নেই ॥

২. দুই ভবনের দুই বাসিন্দা
বন্ধু চিরকাল
রেললাইন বহে সমান্তরাল ॥

৩. মনে হয় হাজার বছর ধরে
দেখিনা তোমায়
উড়ছে শুধু স্মৃতির ধুলো
পথের হাওয়ায় হাওয়ায় ॥

৪. ময়ূরমহল শূন্য এখন
শূন্য ময়ূর সিংহাসন
অন্ধ স্মৃতির দুহাত ধরে
কাঁদছে আমার উদাস মন ॥

www.pathagar.com

এরকম অসংখ্য ও অনন্য জনপ্রিয় আধুনিক গানের উদাহরণ উল্লেখ করা সম্ভব যা কখনো পুরনো হবে বলে মনে হয় না।

নজরুল ইসলাম বাবু ১৯৯১ সালে 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে জাতীয় পুরস্কার ও বাংলাদেশ প্রযোজক সমিতির পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে 'সিপাহী' চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে বাংলাদেশ প্রযোজক সমিতির পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তাঁর স্মরণে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার পোড়োবাড়িতে এমপি মির্জা আজম ১৯৯৬ সালে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু উচ্চ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন।

বিশিষ্ট বাউল কোরবান আলী : বাউল কোরবান আলী ১৯৫০ সালে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ডাংধরা ইউনিয়নের নিমাইবাড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা সাহেদ আলী। তিনি ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামাজিক বাধা বিপত্তি ও শত অভাব অনটন সত্ত্বেও গান থেকে তিনি সরে দাঁড়াননি। বাউল কবি কোরবান আলী শতাধিক গান রচনা করেছেন। তার রচিত দেহতত্ত্ব, মারফতি, শরিয়তি ও মুর্শিদি গানে নিজেই সুর দিয়ে বিভিন্ন আসরে গেয়ে বেড়ান। তিনি সুললিত কণ্ঠে দর্শক শ্রোতার মন সহজেই জয় করে নিতে পারেন। তার দরদি কণ্ঠের বাউল গান উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। নিচে তার একটি গান দেওয়া হলো—

"একছিলিম তামাক খাইতে
এত কষ্ট সময় নষ্ট
একচল্লিশটি যোগান লাগে
একছিলিম তামাক খাইতে
লোহার একটা বাটাল লাগে
লাগে কাঠের তম্বুরে
মাটির একটা ঘটি লাগে
তামাকটারে ভিজাইতে ॥
পরিমাণে সাদা পাতা
লাগে মিকচার করিতে
একছিলিম তামাক খাইতে
এত কষ্ট সময় নষ্ট
একচল্লিশটি যোগান লাগে
একছিলিম তামাক খাইতে ॥
তিন কাটা আঠারও টিপে
নেয় গো তামাক ঠিক করে
লোহার একটা সিক লাগাইয়া
পুড়ে সুবা আগুনেতে
একছিলিম তামাক খাইতে
এত কষ্ট সময় নষ্ট

www.pathagar.com

একচল্লিশটি যোগান লাগে
একছিলিম তামাক খাইতে ॥

ইটের একটা টুকরা লাগে
কলকীর ছিদ্র বুজাইতে
কেউ দেখে ঘেন্নার চোখে
কেউবা বলে শয়তানে
কত কিছু বলে লোকে
জানে শুধু রাব্বানী ।
কাপড়ের একটা টুকরা লাগে
বাঁশিটাকে পেঁচাইতে
একছিলিম তামাক খাইতে
এত কষ্ট সময় নষ্ট
একচল্লিশটি যোগান লাগে
একছিলিম তামাক খাইতে ॥"

বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পী মনসুর আলী বয়াতি : শিল্পী মনসুর আলী বয়াতি ১৯২০ সালে বকশীগঞ্জের পাখিমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জিয়াউদ্দিন। বাল্য শিক্ষাপাঠ চুকিয়ে তিনি গানের জগতে ঢুকে পড়েন। গ্রাম-শহর-বন্দর ঘুরে গান, কিতাব, কিচ্ছা ও পুথির বইপত্র সম্পর্কে ধারণা নেন। তিনি সাতবছর বয়সে গান গাওয়া শুরু করেন। মনসুর বয়াতি আসরে সাদা ধুতি ও পায়ে ঘুঙুর পরে গান পরিবেশন করতেন। চরিত্রের প্রয়োজনে অভিনয় করে দেখাতেন। কখনো দুহাত তুলে একস্থান থেকে অন্য স্থানে লাফ দিয়ে গানের আসর জমিয়ে রাখত। তৎকালীন মনসুর বয়াতির গান শুনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে ভিড় করত। নিজ এলাকা ছাড়া বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নানা জয়গায় গান পরিবেশন করে অসংখ্য ভক্ত দর্শক-শ্রোতার ভালোবাসা পেয়েছেন। কেউ তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নগদ অর্থ পুরস্কৃত করেছেন। তার গানের কথা মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনাবলি প্রেম-বিরহ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না। মনসুর বয়াতি রচিত ও গীত অসংখ্য গান এলাকার মানুষের মুখে মুখে এখনো শোনা যায়। এ গুণী লোকসংগীত শিল্পী উদাসি, ঘাটু, মালসি, টপ্পা, জারি, সারি, থুব ও বারমাসি ইত্যাদি গান গেয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার দর্শক-শ্রোতাদের মন জয় করেন। ২০০৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লোকশিল্পী মনসুর আলী বয়াতির একটি গান তুলে ধরা হলো—

"হায়রে জোনাব আলী অধমে কে জিজ্ঞাসা করি
কি প্রকারে কাজ করি জানে না রসুল ॥
ও ভাইরে পরের ক্ষেতে আইল ভাঙ্গিয়া
মিথ্যে মামলার সাক্ষী দিয়া
ইমান আমান সব ডুবাইছো বাকি রাখছো কি ॥
হায়রে জোনাব আলী অধমেরে জিজ্ঞাস করি
কি প্রকারে কাজ করি জানে না রসূল ॥

www.pathagar.com

ও ভাই গেরাম নষ্ট মাতবরের গুণে
স্ত্রী নষ্ট পাইরে কংশ গুণে
মসজিদ নষ্ট মোল্লাগুণে ভাবে বুঝা যায়॥"

বিশিষ্ট বাউল লালমিয়া : ১৯৫২ সালে বকশীগঞ্জ মেষেরচরের নামাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ওমর শেখ ও মাতা কম্পবিবি। দ্বিতীয় শ্রেণির পর্যন্ত লেখাপড়ায় ইতি টেনে তিনি গান-বাজনার দিকে মনোনিবেশ করেন। আধ্যাত্মিক গান তার ধ্যান-জ্ঞান। গানের সাধনায় তিনি ভারতের আজমির শরিফসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মাজারে ১৬ বছর কাটিয়েছেন। বাউল লালমিয়া মুখে মুখেই গান রচনা করে গেয়ে বেড়ান। এ পর্যন্ত তিনি শতাধিক গান রচনা করেছেন। তিনি একধারে গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। তার গানে আল্লাহ ও প্রিয়নবি হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পথ অনুসরণের মর্মস্পর্শী কথা লিপিবদ্ধ। যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে মুগ্ধ ও সাধনায় মশগুল থাকে তারাই প্রকৃত মানুষ বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি সাধারণত দেহতত্ত্ব, শরিয়তি, মারফতি ও মুর্শিদি গান রচনা করে তাতে সুর দিয়ে নিজেই গেয়ে থাকেন। সাত বছর বয়স থেকে এখন পর্যন্ত অসংখ্য গান রচনা করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তার দুজন স্ত্রী, চার মেয়ে ও দু-ছেলে। শত বাধা-বিপত্তি ও আর্থিক দৈন্যতা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তিনি গানের জগতে বিচরণ করছেন। তাঁর একটি গান তুলে ধরা হলো—

"মেয়র হইল দেহের রাজা মানে না জ্ঞানের বিচার
দেহ রাষ্ট্র ইলেকশনে হয়ে গেছি ফেলুয়ার॥

জ্ঞান বাবু আর মন মহাজন
চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী দুজন
দশ আর ছয়ে এ ষোলোজন মেম্বার তার সেজেছে
দেহ রাষ্ট্র ইলেকশনে হয়ে গেছি ফেলুয়ার॥

ষোলোজনে যুক্তি করে
মন বাবুরে ভোট দিয়েছে
মন বাবু চেয়ারম্যান হয়ে চালায় দেশে অত্যাচার
দেহ রাষ্ট্র ইলেকশনে হয়ে গেছি ফেলুয়ার॥

মনে পাইল অধিকারী
তার হাতে ক্ষমতা ভারি
ছয়জন হইল সহচরী চলছে তরী নিজ ইচ্ছার
দেহ রাষ্ট্র ইলেকশনে হয়ে গেছি ফেলুয়ার ॥"

লোকশিল্পী আমজাদ আলী : লোকশিল্পী আমজাদ আলী ১৯৫২ সালে বকশীগঞ্জ উপজেলার সাধুরপাড়া ইউনিয়নের ধাতুয়াকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সিরাজুল হক। বড় ছেলে আমজাদ আলীকে লেখাপড়ার জন্য স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। পড়াশোনায় তার মন বসেনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে

www.pathagar.com

আমজাদ আলী গান-বাজনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে গানের আসরে রাত জেগে গান শুনতেন। তার পরিবারের লোকজন গান-বাজনা একদম পছন্দ করত না। ১৫ বছর বয়সে গ্রাম্য ওস্তাদ মকবুল সরকার (মক্কু)-এর কাছে প্রথম গানের তালিম নেন। ৪/৫ বছর ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে নিজেই গান গাওয়া শুরু করে। তার কণ্ঠ ও গায়কী ঢং গ্রামাঞ্চলের মানুষকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। পিতার ভয়ে প্রথম দিকে দূরে গিয়ে গানের আসর দিত। কিছুদিনের মধ্যে তার নাম-ডাক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু গান আর গান। আমজাদ আলী দিন-রাত শুধু গান বাজনা নিয়ে থাকেন। একদিন আমজাদ আলীর পিতা মাতা বোঝালেন, বাবা গান-বাজনা ভালো না। এ পথ থেকে সরে এসো। কিন্তু আমজাদ আলীর মন-প্রাণ গানের মধ্যে ডুবে গেছে। সেখান থেকে আর কিছুতে বেরোতে পারে না।

জাত লোকশিল্পী আমজাদ আলী চরম আর্থিক দৈন্যতার মধ্যেও গান থেকে দূরে থাকতে পারেনি। কারণ তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে গান নাকি তার রক্ত-মাংস মন-প্রাণে মিশে আছে। দোতারা ও কয়েকজন দোহার নিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা জামালপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে গান গেয়ে হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে গান ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। শেষ পর্যন্ত গানকেই পেশা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। জানা যায়, প্রায় একশত পালাগান তার মুখস্থ ছিল। তিনি অসংখ্য গান রচনা করে গেছেন। তিনি একাধারে একজন গীতিকার, সুরকার ও উঁচু মানের কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। জীবদ্দশায় তার পালাগানের কয়েকটি ক্যাসেট প্রচার হয়। এখনো বাজারে তার ক্যাসেট পাওয়া যায়। তিনি ৩১শে মার্চ ২০০০ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার রচিত একটি গান এখানে তুলে ধরা হলো-

"কাম কাম করিয়া সর্বনাশ
তবুও না মিটিল কামের আশ
কার বা কোলে জন্মনিয়া হইলাম গাহুইয়া ॥
ওরে পাপী দোতরা তুই বানাইলি মোক
দুনিয়ার পাগেলা ॥

যেদিন শিখিলাম দোতরার গান
হাল গিরস্তি ছাড়িলাম কাম
দেশের বাহির সেদিন হইলাম
ওরে পাপী দোতরা তুই বানাইলি মোক
দুনিয়ার মাওরিয়া ॥

বাপো ভায়ে নিষেধ করে
গান গাইলে সংসার না চলে
বাপো ভাইয়ের নিষেধ না মানিয়ে
ওরে পাপী দোতরা তুই বানাইল মোক
পরার খাওইয়া ॥"

www.pathagar.com

লোকশিল্পী মুকুল শেখ : বাউল মুকুল ১৯৫৩ সালে বকশীগঞ্জ সদর উপজেলার মিয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মুজিবুর রহমান ও মাতা-ফুলেছা বেগম। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার ইতি টেনে গান-বাজনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সাংসারিক নানা অভাব অনটন সত্ত্বেও ত্রিশ বছর ধরে গানের জগতে বিচরণ করছেন। আল্লাহ রাসূলের স্বরূপ সন্ধানে রচিত তার গানে নিজেই সুর দিয়ে পরিবেশন করেন। তিনি সাধারণত শরিয়তি, মারফতি ও মুর্শিদি গান রচনা করে থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনে বাউল মুকুল শেখ বিবাহিত ও তিন সন্তানের জনক। তার একটি মুর্শিদি গান নিচে দেওয়া হলো—

ওরে মুর্শিদ আমায় আর পুড়িও না
ধরি তোমায় পায়
তোমার প্রেমে এত জ্বালা
সহে না আমার গায়
ওরে মুর্শিদ আমায় আর পুড়িও না
ধরি তোমায় পায়॥

মুর্শিদ তোমার ইচ্ছা মত
আর আমারে পুড়বে কত
আমি দোষী হইলাম যত শত
তোমার প্রেমে পড়িয়া
ধরি তোমার পায়॥
মুর্শিদ প্রেমের এত জ্বালা
সর্ব অঙ্গ হয়রে কালা
তোমার প্রেমে এত জ্বালা
সহে না আমার গায়
ধরি তোমার পায়॥
তাই মুকুলে করে মানা
মুর্শিদ কি তুমি শোন না
শুনলে কি আর এত জ্বালা
দিতে আমার গায়
ধরি তোমার পায়॥

জবেদ বাউল : জবেদ বাউল জামালপুর সদর উপজেলায় ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মো. জবেদ আলী বাউল। তাঁর পিতার নাম আজিজ উদ্দিন শেখ। তিনিও একজন বাউল ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে ৮/৯ বছর থেকেই জবেদ বাউল গান গাওয়া শুরু করেন। তাঁর ওস্তাদ ছিলেন মহিরউদ্দিন গায়েন। কবিগান, বিচার গান, দেহতত্ত্ব, কিচ্ছা (পালা) ইত্যাদি গানে জবেদ বাউলের সমান দখল ছিল। তবে তিনি প্রধানত পালাগানের গায়েন ছিলেন। গানকে একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান মেনে সারাজীবন আর্থিক অনটনে ভুগেছেন, তবুও গানে ছেড়ে দেননি। এক সময় পেটের

www.pathagar.com

তাগিদে গান গেয়ে ঔষধ বিক্রি করেছেন। বলা যায়, গান ছিল তার দেহ ও মনের খোরাক। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি বেশ কিছু দেহতত্ত্বের গান রচনা করেন। এ গানের মাধ্যমেই তিনি আজীবন সৃষ্টিতত্ত্বের ঘোর রহস্য ও স্রষ্টাকে খুঁজেছেন। তিনি জামালপুর রেলস্টেশনের কাছে শাহাপুর পাড়ায় সপরিবারে বসবাস করতেন। তিনি সুঠাম দেহ ও ঝাকড়া চুলের অধিকারী ছিলেন। সংসারজীবনে ৬ সন্তানের জনক জবেদ বাউল অভিভাবক হিসেবে পরিবারের সবার কাছে ছিলেন আদর্শবান। তিনি ২০শে অক্টোবর ২০০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৬২ বৎসর।

জবেদ বাউল

মো. চান মিয়া বয়াতি : মো. চান মিয়া বয়াতি উরফে চান বয়াতি, পিতার নাম আজিম উদ্দিন মণ্ডল। মেলান্দহের চরপলিশা গ্রামে ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃহারা হলে তাঁর দাদি তাকে লালন পালন করেন। বিমাতার সংসারে তাঁর কষ্টের সীমা ছিল না। তাঁর দাদি তাঁকে আগলে রেখেছেন। কারণ তাঁর দাদির কাছে তিনি ছিলেন সত্যিকারের সোনার চান।

তিনি পড়াশুনা করেছেন ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। তিনি শৈশব থেকে যে কোন গানের সুরকে ভালবাসতেন। যেখানেই গান হত সেখানেই ছুটে যেতেন। গানের শিল্পীদের পিছনে ঘুর ঘুর করতেন, কোন গানের জন্য অথবা কোন গানের সুরের জন্য। বাল্যকাল থেকেই শান্ত সুবোধ ছেলেটি নিমগ্ন থাকতেন সুরের সাধনায়। সুরের জন্য তিনি সাধনা করতেন দিনে-রাতে, উঠতে-বসতে, শয়নে-স্বপনে। বাল্যকাল থেকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন এই সুর। সুর থেকে তিনি আবিষ্কার করতেন সুধা, জ্ঞান, নানা তত্ত্ব, নানা ভাব। যে কোন সুরকে সহজে আত্মস্থ করতে পারতেন তিনি।

প্রথমে তিনি পিরের উরস শরিফে ভক্তিমূলক, মুর্শিদি ও মারফতি গান গাইতেন। তাঁর গানের সুরের ইন্দ্রজাল, ভাবের সহজ-সরলতা ও হৃদয়গ্রাহিতার জন্য লোকসমাজে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৭ সালে তার গ্রামের একটি ঘটনায় বাড়িপোড়ার মিথ্যা মামলার আসামি হয়ে জেলে যান। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৭৮ সালে 'জেলখানার ঘটনা' শিরোনামে একটি জারি গান বাঁধেন। এ জারি গানের মাধ্যমে মেলান্দহসহ সারাদেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এই জারিগানটি তাঁর সৃষ্টিশীলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মোজাদ্দেদীয়া তরিকতপন্থী বলে এ শিল্পীর অধিকাংশ গান ধর্মবিষয়ক। ৪০ বছর ধরে গান করে চলেছেন। ৬৫ বছরের এই শিল্পী এখনও গান গেয়ে মানুষের মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছেন। তিনি কয়েক হাজার গান রচনা করেন এবং সেগুলো নিজেই সুর করেন। এসব গানের মধ্যে আছে বাউল, মারফতি, মুর্শিদি ও জীবনী গান। জীবনী গানের মধ্যে আছে, মনসুর হাল্লাজের জীবনী, ফাতেমার জীবনী, নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, শাহজালাল (র.) এর ইসলাম প্রচার, নবীর জীবনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ধর্মের বাইরে একটি গান রয়েছে সেটি তার 'জেলখানার জারি'। এসব গানের অডিও

www.pathagar.com

ক্যাসেট সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এগুলো স্থানীয়ভাবে এখনো ব্যবহৃত হয়। তবে সিডি ভিসিডি আসায় অডিও ক্যাসেটের ব্যবহার কমে গেছে। জেলখানার জারি নামে একটি ভিডিও সিডি বাজারে রয়েছে। জেলখানার জারি'র কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হলো—

"মেজিস্ট্রেট শামসুল হক জামিন দিল না
আমারে মেজিস্ট্রেট শামসুল হক জামিন দিল না।
বাড়িত আমিত লাগাই নাই আগুন গো
লাগাইছে ওরা ছয়জনা
মেজিস্ট্রেট শামসুল হক জামিন দিল না
আমারে মেজিস্ট্রেট শামসুল হক জামিন দিল না।
নিজেরাই ঘর পুড়িল
থানায় মিথ্যা কেস করিল
আমারে আসামি দিল
হায়রে আজব কারখানা।
আরে জমি বেচে টাকা দিল গো
পুলিশ আমায় ধরতে পারল না।
মেজিস্ট্রেট শামসুল হক জামিন দিল না
আমারে মেজিস্ট্রেট শামসুল হক জামিন দিল না।
...অধম চান্দের এই মিনতি
কেউ কইর না পরের ক্ষতি
পরের অন্যায় কইরা কেউ
জেলখানাতে যাইও না
আরে জেলখানাতে যাইয়া দেখি গো
আল্লার আলদা একটা দুনিয়া
মেজিস্ট্রেট শামসুল হক জামিন দিল না
আমারে মেজিস্ট্রেট শামসুল হক জামিন দিল না।"

তথ্যসূত্র : ১. ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, কেদারনাথ মজুমদার, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫
২. জামালপুরের পাবলিক মেলা ও কৃষক অভ্যুত্থান (প্রবন্ধ)- মু. আজিজুর রহমান, জামালপুর জেলার রজতজয়ন্তী স্মরণিকা, প্রকাশ ২০০৩
৩. নাগবংশের ইতিহাস, বিজয় চন্দ্র নাগ, প্রকাশ ১৯১৯
৪. শেরপুরের ইতিবৃত্ত, অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, প্রকাশ ১৯৬৯
৫. জামালপুরের গণইতিবৃত্ত, গোলাম মোহাম্মদ, প্রকাশ ১৯৫৪
৬. আমার দেশ আমার জীবন, অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুস সাত্তার, ডিসেম্বর ১৯৯৫
৭. বাংলাদেশের লোকগীতি, আব্দুল ওয়াহাব সরকার, বাংলা একাডেমী, প্রকাশ ১৯৯৫

www.pathagar.com

৮. অমর, জামালপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে (১৯২০-১৯৫২), প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সংবর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে সৈয়দ আব্দুস সাত্তার ও দিদারুল আলম (খুররম) কর্তৃক ২৭/০৪/৯০ তারিখে প্রকাশিত এবং যন্ত্রলেখা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত শীর্ষক পুস্তিকা

৯. আমাদের মাদারগঞ্জ, জাহাঙ্গীর আলম জিন্নাহ, মাদারগঞ্জ থেকে প্রকাশিত

১০. জামালপুরের পালাগান, আব্দুল জলিল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১১. মেলান্দহের ইতিবৃত্ত, নূর-ই-আজম, ধূমকেতু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মেলান্দহ, জামালপুর। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

১২. বাংলা একাডেমির চরিতাভিধান, ঢাকা।

১৩. শ্যামল চন্দ্র দাস, যুগ্ম সম্পাদক, দয়াময়ী মন্দির পরিচালনা পরিষদ, জামালপুর।

১৪. কর্ণঝোরা, সাহিত্য-সংস্কৃতির কাগজ; সম্পাদক, মুহাম্মদ হায়দার; নাট্যকার এমএস হুদা সংখ্যা; ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা; সেপ্টেম্বর ২০০৯; জামালপুর।

১৫. থিয়েটার, নাট্য ত্রৈমাসিক; সম্পাদক, রামেন্দু মজুমদার; আবদুল্লাহ আল মামুন স্মারক সংখ্যা; ৩৭ বর্ষ ২ সংখ্যা; ডিসেম্বর, ২০০৮; ঢাকা।

১৬. পাক্ষিক আনন্দ আলো; আনোয়ার হোসেন সংখ্যা; ৯বর্ষ ১০ সংখ্যা; ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩; ঢাকা।

১৭. সবক'টা জানালা খুলে দাও না, নজরুল ইসলাম বাবু; প্রকাশিকা; শাহীন আখতার; নভেম্বর ১৯৯২; ঢাকা।

১৮. ৭১-এ জামালপুর (প্রবন্ধ), সুশান্ত কানু; সাপ্তাহিক জনদ্বীপ; ২৬ মার্চ ২০০৮; জামালপুর।

১৯. ১১ নং সেক্টর মুক্তিযোদ্ধা পুনর্মিলনী ২০০৪ (প্রবন্ধ), হারুন হাবিব; ঢাকা।

২০. সাক্ষাৎকার, সফিকুল ইসলাম খোকা; মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি; জামালপুর।

২১. সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক; সাবেক এমপিএ; সরিষাবাড়ি।

২২. সাক্ষাৎকার, এডভোকেট আশরাফ হোসেন; সাবেক এমপিএ ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক; বকশীগঞ্জ।

২৩. একাত্তরে উত্তর রণাঙ্গন, এম হামিদুল্লাহ খান; প্রকাশ: ২০০৫; ঢাকা।

২৪. অপারেশন দেওয়ানগঞ্জ (প্রবন্ধ), এসআইএম নূরন্নবী; দৈনিক যুগান্তর: ১৩.১২.২০০৮।

২৫. সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা আবদুল করিম; মেলান্দহ।

২৬. সাক্ষাৎকর, মুক্তিযোদ্ধা বশীর আহমেদ বীর প্রতীক; বকশীগঞ্জ।

২৭. জয় বাংলা; সম্পাদনা, এমআর আখতার মুকুল; প্রকাশ: ১৯৯১; ঢাকা।

২৮. বিজয়ী হয়ে ফিরবো নইলে ফিরবোই না, কামরুল হাসান ভূইয়া; প্রকাশ: ২০০৭; ঢাকা।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা

গল্প বলা ও শোনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আবহমানকাল ধরে মানুষ তার অভিজ্ঞতা, সুখ- দুঃখ, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের কথা গল্পের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে চায়। লোকায়ত মানুষের জীবনসংগ্রাম, মুক্তির স্বপ্ন, ভয় সংশয়, সুখ- দুঃখ আনন্দ বেদনার অভিজ্ঞতা মৌখিকভাবে প্রকাশ করার গল্পই লোককাহিনি। লোককাহিনি স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর। লোকমুখে প্রচারিত লোককাহিনির রচয়িতা অজ্ঞাত থেকে যায়। পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত লোককাহিনির স্রোত প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বায়নের যুগেও মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করে চলেছে। লোককাহিনির আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে আকৃতি সাধারণত ছোট্টগল্পের মত ইঙ্গিত বহন করে। কারণ লোককাহিনির মধ্যে সময় ঘটনার কথা প্রস্ফুটিত হয়। একজন কথক গল্পগুলো পরিবেশন করে, এক বা একাধিক শ্রোতা থাকে। কোনো আসর বৈঠক উৎসব অনুষ্ঠানে গল্প বা কিস্‌সা-কাহিনি বলার প্রবৃত্তি বাঙালি জাতির আবহমানকালের। বর্ণিত গল্পটি শিক্ষণীয় বা নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্যই হতে পারে। গল্পকাহিনি বাস্তব কিংবা অবাস্তব, লৌকিক অলৌকিক কল্পনাপ্রসূন হলেও মানুষ প্রচুর আনন্দ পায় এবং কল্পনাশক্তি বাড়ায়। গ্রামের কৃষক, জেলে, মজুর, তাঁতি, কুমার, কামার কিংবা মা-খালা, দাদা-দাদি ও নানা-নানির মুখে মুখে এসব গল্পকাহিনি শোনা যায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গল্পের রূপান্তর ঘটে। কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু একই থাকে। জামালপুরের আঞ্চলিক ভাষায় কিছু গল্প এখানে দেওয়া হলো।

হর-কামের বাদশা জবর মণ্ডল

একে একে বাদশা দুইডা বিয়ে করল। বড় রানির হইল চারটা সন্তান আর ছোট রানির নয় মাসের গর্ভধারী যখন, তখন উজিরকে হুকুম দিল, 'তুমি' যাও সেই ব্রাহ্মণপাড়া। ব্রাহ্মণপাড়ায় যতগুলো ছোটবড় ব্রাহ্মণ আছে, সমস্ত ব্রাহ্মণকে ডাইহে নিয়ে আইসে খাওয়ার আয়োজন করো। তোও এইডা না শুইনা যত ব্রাহ্মণ আছে, সবাইকে ডাইকা নিয়া আইসা জড়ো করল। আর ব্রাহ্মণেরা কওয়া শুরু করল, মহারাজ, হাল সনের আমাদের খাজনা দেওয়া আছে। এক সনেরও খাজনা বাকি নাই। তো হরকামের বাদশা জবর মণ্ডল কইল, 'তোমাদের খাজনার জন্য আমি ডাইহি নাই। ডাইহি এই জন্যে যে, আমার ছোট রানির নয় মাসের গর্ভধারী। এইডার গর্ভে সুসন্তান, না কুসন্তান, তোমরা গণনা করে দেহো।' তো সমস্ত ব্রাহ্মণেরা গণনা করে দেহে, একটা কুসন্তান গর্ভে তার। ব্রাহ্মণেরা বলল, মহারাজ ভয়ে কবো, না নির্ভয়ে কবো? মহারাজ কয়, নির্ভয়ে কও। তারা তহন কয়, মহারাজ, ছোট রানির গর্ভে ছেলেসন্তান, সেটা একটা কুসন্তান। এ রহম কুসন্তান যে, ছেলেডা যহন ভূমিষ্ট হবো, ছেলেডা

www.pathagar.com

আপনে দেখবেন আর আপনের চইখ অন্ধ হয়ে যাইব। আর আপনে চিক্কুর পারবেন, চোখের ব্যথায়।

বাদশা হুকুম করল কুতুয়ালকে, 'এই কুতুয়াল, ছোট রানির হস্ত বন্ধন কইরা নিয়ে যাও কুরকাব বনে। নিয়ে যায়া বনবাস দেও।' তো কুতুয়াল হুকুম শুইনা রানিকে নিয়া গেল গা বনবাসে। এরমধ্যে একটা দাসির খুব মাইয়া হইল। হে ভাবল যে, 'যার এত দিন নুন-জল খাইছি তার সাথে আমি যাই। রানির মরণ হইলে আমারও হইব। তাই ওই দাসিডেও গেল রানিও গেল বনবাসে। যহন কুতুয়াল বনবাস দিয়া থুইয়া আইসে, তহন রানি বিনয়ভাবে ডাকল। কইল, 'দেখ রে কুতুয়াল, ধর্মের বাপ তুই। ধর্মের কাজ কইরা যা তুই।' কুতুয়াল কইল, 'রানি মাগো কি কও তুমি।' আমাকে সুন্দর কইরা একটা ঝুপড়ি বানাইয়া দিয়া যা। আমাক সুন্দর কইরা একটা ডেরা বাইন্ধা দিয়া যা। তো কুতুয়াল কিছু জঙ্গল-টঙ্গল কাইটা সুন্দর একটা ডেরা বাইন্ধা থুইয়া গেল। তো দাসি গই-গেরামে যায়। যা-ই খুত-কুড়া মানুষের কাছ থেকা নিয়ে আইসে, সে নিজেও খায়, রানিকেও খাওয়ায়। এবো করতে করতে আল্লাহর কাম দশ মাস দশ দিন পুইরা গেল গা। প্রসব বেদনা দেখা দিল। তহন রানি ডাক দিয়া কুয় দাসিকে, দেহো দাসি, তুই আমার যেন কেমন ঠেকতেছে।

রানি বলছে, 'আল্লার হুকুম হইছে। এই যে প্রসব বেদনা উঠছে।' এবো করতে করতে আল্লার কাম সন্তানটা ভূমিষ্ঠ হইয়া গেলা গা। সন্তান যহন ভূমিষ্ঠ হইয়া গেল গা, তহন রানি চাইয়ে দেহে যে, আককাশের এডা চান খইসে পড়ছে তার ঘরো। রানির মনের যত দুঃখ আসিল নিবারণ হইয়া গেল গা। তো নারি-নুরি কাইটা ধুয়াইয়ে-টুয়াইয়ে সাইরে ডাক দেয় রানি দাসিকে, 'দাসি, এডা নাম রাখো তুমি।' আর দাসি কবার লাগছে, না রানি মা, তুমিই এডা নাম রাইখো। রানি বলে, 'আমি হুকুম দিছি তুই এডা নাম রাখ।' রানি কইল, আমি এডা নাম রাখমু ঠিক করছি। কিন্তু তুমি পছন্দ করই কিনা করো... ।' রানি কইল, কী? দাসি কইল, হরকামের বাদশা জবর মণ্ডল, তার বেডার নাম আইহে দিলাম তাজের মণ্ডল। রানি কইল, 'তোর নামডা আমার পছন্দ হইল।' দাসি পত্যেক দিন গই-গেরামে যায়। আর যা-ই পায় তা-ই নিয়ে আহে। দাসিও খায়, রানিও খায়। এবো এবো করতে করতে ছেলেডা ধাবাইলে হইয়ে গেছে গা।

আর এই দিকে হরকামের বাদশা জবর মণ্ডল একদিন উজিরকে ডাইহে কয়, আমি কুরকাব বনে হরিণ শিকার করবের যামু। এর জন্যে ১২ হাজার লোক তুমি মিছিল করো। এই কতা শুইনে উজির ১২ হাজার সৈন্য হাতি-ঘোড়া মিছিল করল। আর হরকামের বাদশা গোলাপ জল দিয়া গোসল করল আর সুগন্ধী তেল মাখল মাথার মধ্যে আর হরিণের চামড়ার তৈরি পোশাক পরল। রাজমুকুট মাথায় দিয়া হরিণ শিকারে বাইর হইল রাজা। যাইতে যাইতে ১২ হাজার লোক দিয়া রাজা কুরকাব বনডা ঘিরে নিল্ল। ঘিইরা না নিয়া রাজা আর উজির বনের জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া দিছে ছাইড়া হরিণ ধরব বইলে। ওই সময় রানি তার ছইলডারে পাতাল কোলত নিয়া চুমা-চাপ্টা খাবান নাগছে আর। আর ছইলের দিক চাইয়া রানি ফ্যাক ফ্যাক কইরে হাসতেছিল। এমন সময় রাজা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ছইলডার দিকে চইখ পইরছে। অমনি হরকামের

www.pathagar.com

বাদশার চইখ দুইডা অন্ধ হইয়া গেল গা। আর সে ঘোড়ার নাহাল চিহির পারা শুরু করল। কীসের হরিণ শিকার! কীসের কী! রাজা তখন ১২ হাজার লোক নিয়ে বাড়িত ফিরে আইল। এভাবে থাকতে জবর মণ্ডল উজিরকে একদিন হুকুম দিল, য্যা উজির তুমি ব্রাহ্মণপাড়ায় গিয়ে সমস্ত ব্রাহ্মণকে ডাইকায় আনো। ব্রাহ্মণরা আসার পর রাজা কইল, ওরে ব্রাহ্মণ, আমার চইখ দুইডা কি ভালা হবো? ব্রাহ্মণরা গণনা কইরে কইল, মহারাজ, সে-ই চক্ষু ভালা হবো। 'পরিস্থান শহরে যে বাকুলের রাজার পুরি আছে আর শ্রীমতি দাসি আছে আর সপ্তমণি বাগান আছে। ওই বাগানে দুইডা সপ্তমণি পুষ্প আছে। রাইতে জোনাকির নাখলা জিলিক পারতাছে। ওই পুষ্প ভাইঙ্গে নিয়ে আইসে যদি চক্ষু-বাও দিবের পান, তাইলে চইখ ভালা হবো। তা নাহলে চইখ ভালা হবো না।'

গল্পের কথক ফকির আলী, সঙ্গে সংগ্রাহক ইসমাইল হোসেন সাদী

উজিররে কইল, 'দেশের মধ্যে ঢোল পিটাইয়া দেও। যে পরিস্থান শহর হইতে ওই ফুল আইনা আমার চক্ষু ভালা কইরা দিব, তারে আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়া দিমু।' এইকথা শুইনা রাজার বড় বউয়ের চার বেডা আইসা উজিররে কইল, 'চাচা আমাহের সয়-সম্পত্তি মাইনষে নিয়া যাইব তার চাইতে আমরাই চাইর ভাই যামু। সেই পরির সাথে যুদ্ধ কইরা সপ্তমণি পুষ্প নিয়া বাপের চক্ষু ভালা করমু।' যেই কথা সেই কাজ। উজিরের নির্দেশে রাজার চার বেডার জন্য চাইরটা নৌকা সোনা-জহরত-টাকা-পয়সা নিয়ে জাহাজে করে তারা রওনা হইল পরিস্থান শহরে। ছয় মাসে তারা রোম শহরে পৌঁছল। সেখানে যায়া দেহে একটা সানুবান্দা ঘাট আছে। সেইডা রোমের বাদশার রাজপ্রাসাদের কাছে। সেখানে তারা দেহে যে একটা যুবতি কইন্যা খাড়াইয়ে আছে। চাইর ভাই কইল আগে এই যুবতী কইন্যাক বিয়ে করমু। তারপরে যামু পরিস্থান শহরে। চৌদ্দ ডিঙা মালামাল ঘাটে রাইখা কাছে যাইয়ে দেহে ওইটা পিত্তলের একটা মূর্তি। সাথে সাইনবোর্ডে লেখা আছে, কোনো রসিক পুরুষ, কোনো বিদেশি পুরুষ যদি আমাকে বিয়ে করবের চাও, তাইলে আমার সাথে পাশা খেলায় জিততে হইব। আর তা নাহলে আমি জেলখানায় রাখমু। তা নাহলে তারে জবো করুমু আমি। এরা ভাবল

www.pathagar.com

সোনা-মানিক-হিরে তো কম আনি নাই। মোটা মোটা দান ধরমু। চাইরটা জাহাজ বোঝাই।

তো চাইর ভাই গেল রাজার কাছে। রাজা কইল, মেয়ে আমারে শর্ত দিছে তার নিজের বিয়ে সে নিজেই করবে। রাজা দেখাইয়ে দিল যে ওই বালাখানা ঘর আছে আর পিতলের ডাঙা আছে। ডাঙাত যায়ে পিটন দেও। তাইলে সাতজন দাসি আইসপো। সাতজন দাসির সাথে কথা কও। চাইর ভাই যায়ে ডাঙাত এমন জোরে পিটন মারল, যে কন্যার বুকটা মনে হয় ভাইঙা চুরমার হইয়া গেল গা। দাসিরা পিটনের শব্দ শুইনা ছুইটা আইল। আর জিজ্ঞেস করল, কী চাও তোমরা। এরা কইল, আমরা কইন্যাকে বিয়ে করার জন্য আইছি। তহন দাসিরা পাশা খেলার জন্য তামার পাত্রে লেহাপড়া (চুক্তিনামা) করবের কইল। আর কইল পূবের বেল যহন পশ্চিমে যাব তখন আহন লাগব। সারারাত কইন্যা পাশা খেলব। আর খেলায় জিতপের না পাইলে সহাল বেলা জবো করব, না হইলে জেলে পাঠাব। চাইর ভাই তহন নেহাপড়া কইরা বাইর হইল আর পূবের বেলা পশ্চিমে গেলে আবার আইল। কইন্যা ইন্দুরের মাথায় ফানুসের বাতি দিয়ে বেলুয়ারি কাঠের তক্তার মধ্যে পাশার গুটি নিয়ে বইসে পড়ল। দেহা গেল যেই দান ধরে খালি কইন্যাই মাইরা নেয়। এবো করতে করতে এক জাহাজ মাইরা নিল। এইরহম কইরে চাইর রাইতে চাইর জাহাজের সবই মাইরে নিল। আর তো কিছুই নাই। কইন্যা তাগর মাইরা আর ফেলাইল না। তাগর জেলখানায় ভর্তি করল।

এদিকে তাজের মণ্ডল বড় হইতে লাগল। স্কুলে যাওয়া শুরু কইরছে। একদিন স্কুলের ছাত্ররা তাজের মণ্ডলরে কইছে, তুই তো পুঙ্গা (জারজ)। তোর তো বাপ নাই। তাজের মণ্ডল স্কুল তনে আইসে মায়ের সাথে ঠিকমতো কথা কয় না। মায়ে জিজ্ঞেস করে তোর কী হইছে বাবা খাস না কেন। তোক কেডা মারছে ক দেহি। তহন, তাজের মণ্ডল কয়, আমার মাথাত কিরে কাইটা কও, আমি পুঙ্গা, না আমার বাপ আছে? ছোট রানি দুই চইক্ষের পানি ঢাইলে ফালাইয়া কইল হরকামের বাদশা জবর মণ্ডল তাই বেটা তুই তাজের মণ্ডল। তারপর সমস্ত ঘটনা ছোট রানি খুইলা কইল। আরও কইল যে তোরে দেইখাই তোর বাপ অন্ধ হইয়ে গেছে গা। আত-দিন ঘোড়ার নাখলা চিহির পারবেন নাগছে। তাজের মণ্ডল কইল আমি বাপের সাথে দেখা না কইরা ছাড়মু না। রানি কয়, না আমি তা যাবার দিমু না। গেলে এক কোপে তোর কাল্লাডা কাইটা ফেলাব। শিয়েন ছেলে মায়ে ধইরে রাইখপের পাইলেছেন। ছেলে উইঠা মারল এডা দৌড়। দৌড় পারতে পারতে তাজের মণ্ডল হরকামের বাদশা জবর মণ্ডলের রাজ দরবারের বইসা বিচার-আচার কইরবে নাগছে–এমন সোময় যাইয়া খাড়া হইল। রাজা কইল তুই কেরা বাবা আমি তো চইহ দেহিনে। তাজের মণ্ডল কইল, 'আব্বা আমি আপনের ছোট রানির ঘরের ছেলে তাজের মণ্ডল।' অমনি রাজা ওর কাল্লাডা কাইটপের নাইগে দাও নিয়ে আইল। আর উজিরে কইল, মহারাজ রাহেন রাহেন। ছেলে কী কয়, সেইডা আগে শুনি। উজিররে যাইয়ে তাজের মণ্ডল কইল, আমার বাপের চক্ষু ভালা হবো না? তহন উজির কইল পরিস্থান শহরের সপ্তমণি পুষ্পের কথা বলল, ওই সপ্তমণি পুষ্প আইনে দিলে রাজার চক্ষু ভালা হইব।

www.pathagar.com

তাজের মণ্ডল কইল, আমারে তাইলে একটা ঘোড়া দেন। আমি যামু পরিস্থান শহরে। আর সপ্তমণি পুষ্প আইনে বাপের চক্ষু ভালা কইরা দিমু। তো উজির লেংড়া এডা ঘোড়া দিল। ওই ঘোড়া দাবড়াইতে দাবড়াইতে ছয় মাসে পৌঁছল রোম শহরে। আর দেখল সানুবান্ধা ঘাটে পিতলের মূর্তি–তাতে লেহা আছে ওই কন্যার কথা। তারে বিয়ে করতে তার সাথে পাশা খেইলে জিতা লাগব। নইল মৃত্যুদণ্ড, নইলে জেলখানা। তাজের মণ্ডলও আগের চাইর ভাইয়ের মতো পাশা খেলার জন্য দাসিগরে ডাহার জন্য তামার ঘণ্টাত পিটন দিল। সাত দাসি আইসে হাজির হইল আর কইল কী চাও। তাজের মণ্ডলেরে দেইখে দাসির খুব পছন্দ হইল। দাসি বিনা খেলাতেই কাজের মণ্ডলরে বিয়া করবের কইল কন্যার কাছে যাইয়া। কীসের পাশা খেলা কীসের কী। এবাহা খুবসুরতের পুরুষ আর জীবনে দেখি নাই। কিন্তু কইন্য রাজি হইল না। পাশা খেলা ছাড়া কইন্যা বিয়েতে রাজি না। তাই তামার পাত্র মইধ্যে নেহাপড়া হইল। আর পাশা খেলতে পূর্বের বেলা যহন পশ্চিমে গেল, তহন তাজের মণ্ডল পাশা খেলাইতে আইল। কইন্যা আগের ইন্দুরের মাথায় ফানুসের বাতি দিয়ে বেলুয়ারি কাঠের তক্তার ওপরে পাশা খেলতে বসল। এর তো পুঞ্জি বেশি না। তাই এক পয়সা দুই পয়সা করে ধরল। কিন্তু যাই ধরে তাই মাইরা নেয়। তহন তাজের মণ্ডল দেখল, এই কইন্যার সাথে তো পাওয়া যাব না। রাত যহন অর্ধেক হইল, তহন তাজের মণ্ডল কইল আজ আমি আর খেলমু না। কাল খেলমু তোমার সাথে আর মোটা মোটা দাইন ধরমু। এই কথা না কইয়ে তাজের মণ্ডল ওখান থেকে ভাগল। হাঁটতে হাঁটতে ফজর নামাজের আজানের আগে পৌঁছল কইন্যার ফুলের বাগানে। বাগানে যাইয়া দেহে একটা মাইলেনির (ফুলের বাগানের পরিচর্যাকারী) ঘর আছে। ঘরের গেইটে যাইয়া তাজের মণ্ডল ডাক দিল মাসি মা বলে। ডাক শুইনা মাইলেনি ধুসমুছ (তাড়াতাড়ি) কইরা চেতন পাইয়া উঠল আর ভাবল আমার তো কোনো বইন পুত নাই। গেইটে আইসা দেহে একটা সোনার পুতুলের মতো খাড়াইয়া আছে। দেইখে মাইলেনি বলে, বাবা, আমার তো কোনো বইন পুত নাই। মাসি মাসি কইরা আমাক ডাহো। এইকথা শুইনা তাজের কইল, আমার মা যহন মইরা যায়, আমারে কইয়ে গেছিল যে অমুক দেশে আমার এক বইন আছে দেখপের যাইস। আজ চাইরটা ভাত লাগব বইলা তুমি কইতাছ, আমার কোনো বইন পুত নাই? মাইলেনি ভাবল, মামাত-ফুফাত বইন মেলা আছিল। এর মধ্যে এডা হইতেও পারে। তহন মাইলেনি কইল তোর তো খিদে লাগছে। ওই পাতিলের মধ্যে তিন দিনের বাসি পান্তা আছে, খাগা যা।

তাজের মণ্ডল কইল মাসি মা গো আমি এডা কথা কবার চাই। আমি বুদ্ধি হবার পরতনে আমি নিজের ভাত নিজের রাইনধে খাইছি। তহন মাইলেনি কইল তাইলে চাইল-ডাইল আছে, যা তুই পাক কইরে খা। পাক কইরে খাইল আর কইল মাসি মা তোমার জন্যও রাখলাম তুমিও খাইও। মাইলেনিও খুব আয়েশ কইরে তাজের মণ্ডলের হাতের রান্ধা খাবার খাইল আর কইল তোর হাতের খাবার আমি আর খামু না। যেইডা খাই ওইডাই ভালা নাগে। আমি তো এতো ভালা খাইনে। এবো করে দিন যাইতে যাইতে একদিন তাজের মণ্ডল জিজ্ঞেস করল, মাসি মাগো এডা কথা জিজ্ঞেস কইরবের চাই, কথাডার উত্তর দেওয়া লাগব। কইল, কইন্যার সাথে যে পাশা খেলায় পাওয়া যায় না, এর কারণ কী ? মাইলেনি কইল, তা কমু না আমি। তাজের মণ্ডল কইল তোমার

www.pathagar.com

নিজের পেটের বেটা যদি হইলামনি, তাইলে, তো ঠিহি কইলানি। না তুই তো মাইনষেক কইয়ে দিবি। তাজের মণ্ডল কইল, আমি যদি মাইনষেক কইয়ে দেই তাইলে তোর চোহের মাথা খাই, শক্ত কিরে কাটলাম আমি। ঠিক আছে তোর কিরেটা খুব শক্ত হইছে। তহন মাইলেনি কইল, এন্দুরের মাথায় থাহে ফানুসের বাতি। আর এন্দুরের গলায় লাগানো আছে সুইতে। সুইতে আবার কইন্যার পায়ের বুইড়ে আঙুলের সাথে বান্ধা আছে। আর বালিয়ারি তক্তার মধ্যে পাশার গুটি নিয়ে বইসে। যহন তোরা দান দেস, তহন পায়ের ওই সুইতে ধরে টান মারার সাথে সাথে এন্দুর মারে দৌড়। তহন বাতিটা পইরে যায়। তহন কইন্যা পাশার গুটিটা উলটায়ে রাহে। তাজের মণ্ডল কইল এরে বজ্জাত, তোর আসল গুমোর পাইলাম আমি। এবো করতে করতে মাইলেনি বাজার-সদাই করে আর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুইরা বেড়াইতে থাকল। একদিন হঠাৎ একটা বেজির বাচ্চা ধইরা আনল। আর বাচ্চাডারে তাজের মণ্ডল পালতে লাগল। বাজার থেকে আনা দুধ কলা খাওয়াতে খাওয়াতে বেজির বাচ্চাডা পুষ মানতে মানতে থাকল। তাজের মণ্ডল যেইডে ইশারা করে বেজি এহন সেইডেই করে। একদিন তাজের মণ্ডল মাইলেনিরে কইল, মাসি মাগো এই রোম শহরে রূপবান গান হইতাছে। আমি এল্লা গান শুইনবের যামু। মাইলেনি কইল, না আমি যাবার দিমু না। তাজের কইল, আমি যামু আর আসমু। এই কথা না কইয়ে বেজিডে নিয়ে তাজের ছুটিল কইন্যার সাথে পাশা খেলার জইন্যে। যাইয়ে দেহে কইন্যা বইসেই আছে পাশার গুটি নিয়ে। তাজের যাইয়ে এমন একটা ইশার দিল, বেজি যাইয়া এন্দুরের ওই গাতের মধ্যে যাইয়া হা কইরে থাকল। এন্দুর তো ডরে আর কোনোদিক যায় না। এবো করতে কইরে পাশার যেই দানই ধরে সেই দানই তাজের মাইরে নিতে নিতে থাকল। এক সোময় কইন্যার বারোআনা চালান যহন মাইরা নিল। তহন কইন্যা এমন জোরে সুইতেডা টান মারছে এন্দুরের কাল্লা গেল ছিঁড়ে। তহন বেজি যাইয়া গারাস (গ্রাস) দিয়ে ওই কাল্লা ধইরল পাইরে (জাপটে)। তহন কইন্যা কইল, ধন্য বাপে তোক জন্ম দিছে আর ধন্য মায়ে তোক গর্ভ ধরছে। আমি এই চালাহি করি, আর তুই বেজির বাচ্চা কহন দিছস আমি টের পাই নাই। কইন্যা চুল দিয়ে পা দুইডে মুইছে দিল আর মালাডা গলায় পরায়ে দিল। আর রাজারে যাইয়া কইল, বাবা, এর মতো খেমতাবান পুরুষ আমি আর দেহি নাই। এর সাথেই দেও আমাক বিয়ে। বিয়ে হইল।

কিছুদিন থাহার পর তাজের মণ্ডল কইল, আমি যে যামু পরিস্থান শহরে। বাকুলের রাজার ওখানে শ্রীমতি দাসির আছে সপ্তপদী বাগান। সেখান থেকে সপ্তমনি ফুল চুরি কইরবের যামু আমি। কইন্যা পায়ের মধ্যে পইরে গেল আর কইল, কও কী স্বামী? সেখানে যাওয়ার জইন্যে সাতটি বড় বড় গেট আছে। সেই গেটগুলোতে আছে সাতটা দেও (দানব)। তুমি গেটগুলো পার হতে গেলেই ওরা তোমারে মাইরে ফেলাব। তাই আমি তোমাক পরিস্থান শহরে যাবার দিমু না। তাজের মণ্ডল কইল, পরিস্থান শহরে আমাক যাওয়াই লাগব। তারপর একটা ঘোড়া নিয়ে তাজের মণ্ডল রওনা দিল পরিস্থান শহরের দিকে। পতিডে দেওই তাজের মণ্ডলের চেহারা দেখে তাজ্জব লাইগা যায় গা। আর দুই-একটা কইরে প্রশ্ন করে। কিন্তু তাজের মণ্ডলেক আটকাবের পায় না। এর মধ্যে সপ্তপদী বাগানের কাছাকাছি যাওয়ার পর এক দেওয়ের সাথে তাজের মণ্ডলের

www.pathagar.com

মেলা খাতির হইয়ে গেল গা। তাজের মণ্ডল কইল যে আমাক সপ্তপদী বাগানে পৌছয়ে দেওয়া লাগব। ওখানে শ্রীমতি দাসি আছে। সেহান তনে সপ্তমনি ফুল দুইডে চুরি করন নাগব। ওই দেও তহন হুকুম দিল অন্য দেওগের যে, এহান তনে সপ্তপদী বাগান পর্যন্ত মাটির তল দিয়ে একটা সড়ক বানাও যাতে একটা দেও দৌড়ায়ে যাইতে-আসতে কোনো সমস্যা না হয়। দেওয়ের হুকুমে এক রাতে ওই সড়ক খোড়া হইয়া গেল গা। পরের রাতে দেওয়ের সাথে যাইয়া দেহে শ্রীমতি দাসি ঘুমাইতে ছিল। তহন তাজের মণ্ডল এডা চিঠি লেখল :

না লেখলাম উত্তর, না লেখলাম দক্ষিণ
আর না লেখলাম আমি পশ্চিম।
লেখলাম আমি পুব।
তোমার সপ্তমনি পুষ্প চুরি করল
বাদশাহ তাজের মুল্লুক।

এই রহম কইরে যহন পুষ্প দুইডা নিয়ে রোম শহরে আসল। তাজের মণ্ডল এক রাইতে স্বপ্নে দেহে, এডা গাভি বান্ধা। গাভি পাছা ঘুরাইতেছে বাছুরেক দুধ দিব। কিন্তু বাছুর দুধ খাবার পায়, পায় না–এই রহম অবস্থা। স্বপ্ন দেহে কাইন্দে উঠল তাজের মণ্ডল। ভাবল, আমার মাও জননী তো এই রহম কইরেই ছটফট কইরবেন নাগছে। তাজের মণ্ডল তার বউ মাহুদাকে কইল, আমি ইনু আর থাকমু না। আমি মায়ের কাছে যামু। অমনি রওনা দিল। যাইতে যাইতে সেই কুরকাবের বনের মধ্যে যায়ে দেহে, তার মাও শুকাইতে শুকাইতে শরীলের চামড়া হাড্ডির সাথে ঠেকছে। আর কান্দিতে কান্দিতে চক্ষু দুইডা তার ঘাও হইয়ে গেছে গা। তার জীবন যেন আহে আর যায়। কোনো রকম খালি শব্দ হইতেছে আমার বাবা তাজের মণ্ডল কোঠাই, আমার বাবা তাজের মণ্ডল কোঠাই। এমন সময়কালে তাজের মণ্ডল তার মারে পাঞ্জা সাপটে (জড়িয়ে ধরা) ধরল।

তারপর তাজের মণ্ডল তার মায়েক সাথে করে নিয়ে হরকামের বাদশাহ জবর মণ্ডলের রাজ দরবারে নিয়ে গেল। সপ্তমণি পুষ্প-বাও দিয়ে রাজার চোখ ভালা হইল। হরকামের বাদশা ছোট রানিক ঘরে তুলে নিল। আর রোম শহরের রাজার মেয়ে তাজের সৎ ভাইগের পরিচয় পাইয়ে তাদের ছাইড়া দিল। আর রাজা মাইনে নিল তাজের মণ্ডলের বউরে। তহন তাজের মণ্ডল সংসার শুরু করল। তাজের মণ্ডলের পুরস্কার হিসেবে রাজা দিয়ে দিল তার অর্ধেক রাজত্ব।

কথক : ফকির আলী (বয়স : ৭০)

রাজার ছেলে ও রাখাল

এক ছিল রাজার ছেলে আর ছিল রাখাল ছেলে। রাজার ছেলে বাঁশি বাজাতে পারে না। রাখাল ছেলে বাঁশি বাজাতে পারে। কিন্তু রাজার ছেলে বাঁশি শুনতে খুব পছন্দ করে। রাখাল মাঠে যায়ে যখন বাঁশি বাজায়, রাজার ছেলে বাঁশি শোনার জন্য মাঠে যায় আর খুব আদর স্নেহ করে। রাজার ছেলে একদিন বলল, আমি প্রতিদিন আসমু আর তুমি খালি বাঁশি বাজাবা। এভাবে দুইজনের মধ্যে এমন খাতির হয়ে গেল যে রাজার ছেলে একদিন ওয়াদা-অঙ্গীকার করল, 'আমগর আব্বা মারা গেলে যখন আমি সিংহাসনে

www.pathagar.com

বসমু, তখন তোমাক উজির বানামু। আমি শুধু নামে রাজা থাকমু। আর তোমাকই বেশি অধিকার দিমু।' এভাবে সময় গড়াতে গড়াতে রাজার ছেলে বিয়ের সময় হইল। রাজার ছেলে বিয়ে কইরে বউ নিয়ে আসল। রাখাল মনে করল যাই তাইলে রাজার ছেলে বউডা দেইহে আহিগে। কিন্তু বউ তো দেখতে পারেইনি। উল্টো রাজার ছেলে রাখালকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বাইর কইরে দিছে। রাখাল খুব দুঃখ পাইল। এই দুঃখ আর দুনিয়াত ধরে না। দুঃখ-কষ্টে সে তহন দেশ ছাইড়া বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাহাড়-পর্বতে বনে-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সে মেলা কোবরেজি শিখে গেল গা। এর মধ্যে সে আর তার দাড়ি-মুচ কিছুই কাটে নাই।

এদিকে বিয়ের পর রাখাল ছেলেকে বাড়ি থেকে বাইর করে দেওনের পর থেকেই রাজার ছেলের সারা গতরে সুঁই বাইর হইল। মাথার চুল যেমন ঘন, সে সুঁই ছিল তেমনই ঘন। চোখ-মুখের ভেতর কোনো জায়গাই বাদ থাকল না সুঁই বাইর হইতে। এই সুঁইয়ের যন্ত্রণায় রাজার ছেলে শুয়েই থাকপের পারে না। মুখে সুঁই নিয়ে খাবারও খায় না। চইখের মইধ্যে সুঁই চইখ খুলবের পায় না। গলার মধ্যে সুঁই গিলবের পায় না।

রাজার ছেলে তত দিনে রাজা হয়ে গেছে। রাজার বউয়ের নাম কাঁকন বালা। আর তার কামকরণি (গৃহপরিচারিকা) আছিল, নাম কাঞ্চন বালা। কাঞ্চন বালা সারা দিন কাম-কাজ করে। আর রানি কাঁকন বালা খালি রাজার বসে বইসে থাকে আর চিন্তাভাবনা করে, এইডা কী হইল–বিয়ে হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত মেলামেশাই করবের পারলাম না, রাজা চইখই খুলবের পায় না। এইসব নিয়ে রানি শুধু চিন্তা-ভাবনা করে। এই রহম করে ভাবতে ভাবতে কাঁকন বালা এক্কেবারে শুকায়ে গেল গা। এই অবস্থায় কাঞ্চন বালা করে কী, রানিরে কয়, আসেন আপনারে গোসল করায়ে দেই, খাওয়া-দাওয়াও করেন না ঠিকমতো, গোসল-টোসলও বাদ দিলেন। আপনার তো শরীল খারাপ করব। রানি মনে করল, আমারে আদর কইরেই গোসল করায়ে দিবের চাইতেছে। এই কথা কইয়ে রানিরে কাঞ্চন নিয়ে যায় পুকুর ঘাটে। পুকুর ঘাটে নিয়ে কাঞ্চন কয়, আপনের শরীলের যত গয়না-গাট্টি আছে সব খুইলে পানিতে নামেন। তাইলে আপনের গতর কচলায়ে দিতে সুবিধা হবো। তাছাড়া গয়নাগুলি তো ঢিলা হয়ে গেছে গা, পানির মইধ্যে হারায়েও যাইতে পারে। রানি তহন তার শরীলের সব গয়না খুইলে যেই পানিতে নামছে, অমনি কাঞ্চন বালা গয়না গুইল্লে পইরে রানিরে কয়, এই কাঁকন বালা তাড়াতাড়ি গোসল কইরে বাড়িত আহো আমার রাজা একলা একলা কী মেন (যেন) করতাছে। এই কতা কয়ে কাঞ্চন রাজার পাশে বসল। রানি তহন হইল দাসি আর দাসি হইল রানি। রানি তো আরো চিন্তায় পইরে গেল গা। কিছুই করার নেই। যে স্বামী, সে তো আর দেখবের পায় না। বিচারের কোনো মানুষ নেই। আর রাজার নতুন বউকে তহনও তো বাইরের কেউ দেহে নাই।

এভাবে দিন যাইতে যাইতে একদিন বাড়ির পুকুর ঘাটে গেছে পানি আনবের। পানি আনবের যায়ে কাঁকন বালা দেখল, পুকুর পাশে একটা গাছের তলে লম্বা দাড়ি-মুচওয়ালা একটা ফকির পাগলের মতো বসে আছে। ফকিরেক যায়ে কাঁকন জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করল, তুমি কী পারো, কী করো। তহন ফকির কইল, আমি ওষুধপাতি দেই আর কোবরেজি করি। তহন কাঁকন বালা কইল এহানকার শরীল সুদ্ধে যে মাথার চুলের মতো সুঁই বাইর হইছে। সে তো খাইতেও পারে না, চইখও খুলবের পায় না। নড়তে-চড়তে কিছুই পারে না। জীবনডা কোনো রহম বাঁইচে আছে। তারপর রানি কয়, এহানে আরেকটা কাহিনি ঘটছে। ফকির জিজ্ঞেস করে, কী কাহিনি। তহন কাঁকন বালা কাঞ্চন বালার চালাকির ঘটনাটা খুইলে বলে। ফকির বলে, ঠিক আছে। আমি আগে যাই, তার পর দেখমু। আমি তো জানি নে, কী ঘটছে না ঘটছে।

ফকির রাজ দরবারে ঢুইকে রাজার চিকিস্‌সা করা বাদ দিয়ে ওগের প্রমাণ আগে করা শুরু করল। তহন ফকির পরতম কইল, আপনার দুইজনে দুই ঘর গোছাবেন। কেরা কী রহম ঘর গোছাইতে পারেন সেইডা দেখমু। ঘর গোছানোর পর ফকির দেহে, কাঁকন বালা যে ঘর গোছাইছে, সেইডে খালি দেখপের ইচ্ছে করে। আর কাঞ্চন বালা যে ঘর গোছাইছে, সেডা আদামাদা (বিশ্রী) হইছে। ফকির ঘর দেহার পর কয়, দুইজনে আমারে পিঠে বানায়ে খাওয়ান। দুইজনেই পিঠে বানানোর পর পর দেহা গেল কাঁকন বালার পিঠে বেজায় সরেশ। সে বিভিন্ন ধরনের পিঠে বানাইছে। আর কাঞ্চন বালার পিঠে মুহই দেয়া যায় না। ফকির দেখল, আসলে কাঁকন বালাই রাজার আসল বউ। কাঞ্চন বালা না। তারপর একদিন ফকির কয়, আমি তো সবই বুঝবের পাইতেছি, তো আপনেরা আমার জন্য আজকে কিছু রান্না-বান্না কইরে আমারে খাওয়াবেন। তহন দুইজনেই রান্না-বান্না কইরে আনল। ফকির খাইয়ে দেহে, কাঞ্চন যেইডে রানছে, ওইডা মুখে দেউন যায় না। আর কাকনের রান্না খুব ভালা হইছে। তহন ফকির আরও নিচ্চিত হইল যে, আমার যে দুঃখের কতা কইছে কাঁকন বালা, সেইডা আসলে ঠিকই। কাঁকনই আসলে রাজার বউ, কাঞ্চন না। তহন ফকির তার পুটলা-পাটলি বাইর করছে আর মুন্তর কওয়া ধরছে। মুন্তর কইতে কইতে ফকির কয় :

শুতন শুতন কার পুটলা যার
যদি শুতন সইত্য হস রাজার শরীলের
সমস্ত সুঁই খইসে পর।

এইকথা কওয়ার পর রাজার শরীলের সমস্ত সুঁই ঝর ঝর করে খসে পড়ছে। তহন ফকির আবার কয় :

শুতন শুতন কার পুটলা যার
যদি শুতন সইত্য হস
তাইলে সুঁইগুলো কাঞ্চন বালার
শরীলে যায়ে ধর।

তহন সুঁইগুলো সমস্ত যায়ে কাঞ্চন বালার গতরে বিনদে পড়ল। কাঞ্চন তো ফান্দ পইরেই গেল গা। পরে রাজা চইখ মেলাইল আর ভালা হয়া গেল গা। রাজা-রানির মিলন হইল। তারা আনন্দের কান্না করল গলাগলি ধইরে। তারপর রাজা তার সিংহাসন দিয়ে দিল ফকিরকে। আর কইল, তুমি রাজা থাকবা আমি শুধু রাজার ছেলে হয়ে তোমার পাশে থাকমু।

কথক : আয়েশা খাতুন (বয়স : ৬৫)

www.pathagar.com

শাহ্ আলম ও জানে আলম

শাহ আলম আর জানে আলম দুই বন্ধু। তারা এমন পরানের বন্ধু যে ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হইছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া উঠা-বসা সব একসাথে। এমনকি পেশাব-পায়খানা গেলেও একজন বাইরে দাঁড়ায়ে থাকে। এমন কইরে যহন বড় হইল, তহন তারা একবার বিভিন্ন দেশে বেড়াবার জন্য বাইর হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে একবার এক বড় লোকের বাড়িত গেল মেহমান হয়ে। সেই বাড়িওয়ালা বড়ই ভালা মানুষ। খুব ভালা করে শাহ আলম আর জানে আলমকে আদর-আপ্যায়ন করল। রাতে থাকবের দিল। রাতে একবার খোঁজ নিবেরও গেল। যায়ে বিভিন্ন গপ্পো-সপ্পো করল।

এই বাড়িওয়ালার ছিল এক মেয়ে। নাম মালেকা সুন্দরি। মালেকা সুন্দরি তার বাপেক একদিন কইল, বাবা আপনের তো ধনসম্পত্তির অভাব নাই। আমি নিজেই ছেলে পছন্দ কইরে বিয়ে বসমু। ছেলের ধনসম্পত্তি কিছউ দেখমু না। ওদিকে শাহ আলম আর জানে আলম কয়েকদিন থাকলে বাড়িওয়ালার সাথে বিভিন্ন কথাবার্তা হইল। এরমধ্যে আচার-আচরণে শাহ্ আলমকে পাত্র হিসেবে বাড়িওয়ালার পছন্দ হয়ে গেল গা। শাহ আলমকে এই কথা বাড়িওয়ালা কইল, আমার মেয়ে ঘরসংসার কিছুই দেখপো না। শুধু ছেলের আচার-আচরণ দেখপো। তোমার ব্যবহার আমার ভালা লাগছে। আমার মেয়ে যদি তোমাক পছন্দ করে, তাইলে তোমাক আমি মেয়ের জামাই বানাবার চাই। এইকথা কইয়ে শাহ্ আলমকে বাড়ির ভেতর ডেকে নিয়ে মালেকা সুন্দরিকে কইল, মা তোমার জন্য এই ছেলেডাক আমার পছন্দ হইছে। তুমি দেহো তোমার পছন্দ হয় কিনা। মালেকা সুন্দরি কইল, আপনের পছন্দ হইছে। আমারও পছন্দ হইছে। আপনে বিয়ের আয়োজন করেন। তারপর শাহ্ আলম আর মালেকা সুন্দরির বিয়ে হইল। কয়েক দিন থাকার পর জানে আলম রাগ আর অভিমান নিয়ে দেশে চলে আইল। দেশে আসার পর তার মানে রাগ-হিংসা বাড়তে থাকল। অনেক কিছুই মনে মনে ভাবল। এতদিন ভালা আছিলাম আর আমাকে খালি হাতে দেশে বাড়িত পাঠাইল। এর মইধ্যে শাহ আলমের শ্বশুর তাকে একটা মুন্তর শিখেইল। মুন্তরটা এই রহম যে, পাখি মাইরে নিজের জীবনডা মরা পাখির ভেতর দিয়ে নিজের ধর সুন্দর করে থুয়ে যেহানে খুশি সেহানে যাবার পাব। আবার দরকার হইলে নিজের ধরের (মরদেহ) মইধ্যে জীবনডা ঢুকাবার পায় আর তহন মরা পাখিডা ফালাইয়ে দেয়। এই মুন্তর অনেক দিন ধরেই শাহ আলম শিখছে।

একদিন জানে আলমের মনে হইল, শাহ্ আলমের সাথে শত্রুতা না করে আমি শান্তি পামু না। তাই সে একদিন গেল শাহ্ আলমের শ্বশুরবাড়িতে। আইসে থাকছে, খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে। এই রহম করতে করতে একদিন শাহ্ আলম জানে আলমকে কইল, বন্ধু। আমি বিয়ে কইরে এহানে থাইকেই গেলাম। তোমাক তো কিছু করবের পাইলাম না। তো আমি এডা মুন্তর শিখছি, তোমাক মুন্তরটা শিখেমু। তারপর মুন্তরডা শিখলে কী কী করবের পাবো সেডা কইল। জানে আলম মুন্তরডা শিখার পর মনে ভাবল, এহন আমি শাহ আলমকে ঘায়েল করবের পামু। একদিন জানে আলম কইল, চলো বন্ধু বনে যাই। কেমন মুন্তর শিখলাম আমরা বনে যাইয়ে পরখ কইরে আসি। জঙ্গলের কাছে জানে আলম শাহ আলমকে কয়, বন্ধু এডা বানর ধইরে তোমার বানরের জীবনডা

www.pathagar.com

বানরের ঢুকাও আমি দেহি আবার আমি বানরের মইধ্যে ঢুকমু তুমি দেখপা। শাহ আলম তো বুঝবের পারে নাই যে জানে আলম তার শেখানো মুন্তর দিয়ে ওরা সাথে চালাহি করতাছে। তো জানে আলমের কতা শুইনেই শাহ আলম এডা ধইরে সেইডের মাইরে, নিজের ধরডা থুয়ে জীবনডা বানরের ধরের মধ্যে ঢুইকে গেল। তহন জানে আলম নিজের জীবনডা শাহ আলমের ধরের মইধ্যে ঢুকায়ে নিজের ধরডা টুকরা টুকরা কাইটা ফেলাইল আর নদীতে ভাসাইয়ে দিল। আর শাহ আলমের শ্বশুরবাড়িত ফিরে আইল জানে আলম শাহ আলম হয়ে। মালেকা সুন্দরি বুঝবের পারে শাহ আলমের আচার-ব্যবহার আলাদা। যতই দিন যায় আচার-ব্যবহার পাল্টাইতে থাকে। মালেকা সুন্দরি ভাবে, হয়তো বয়স হয়ে যাইতেছে, পুরানা হইতেছে। এই জন্যেই ব্যবহারও বদলাইতেছে। ছয় মাস যাবার পর একদিন ওই বানর খুঁইজে খুঁইজে মালেকা সুন্দরির বাড়িত আইল। আয়ে গাছে উইঠে মালেকা সুন্দরিক দেখে আর বলে :

শশশের মুন্তর দোস্তেক দিয়ে বানর হইছি আমি জনমের লাগি
ও মালেকা সুন্দরি, মুখের ঘোমটা খোলো তুমি নয়ন ভইরে দেখি
মুখের ঘোমটা খোলো তুমি পরান ভইরে দেখি আমি
ছয় মাস ধরে খাইনে আমি মানুষের আহার।

তহন মালেকা সুন্দরির মনে হইল এই জন্যেই তো এই অবস্থা। আমার ঘরে যে আছে, সে তো আসলে শাহ আলম না। সে আসলে জানে আলম। তহন মালেকা সুন্দরি চুপি চুপি বানরডাক নামায়ে আইনে কইল। তোমাক আমি খাবার-টাবার দিমু। তুমি চুপি চুপি আমার ঘরের এক কোণে বইসে থাকপা। দেহি আমি তোমাক উদ্ধার কইরবের পাই নাহি। বানর চুপি চুপি ঘরের এক কোণে থাকতে থাকল। মালেকা সুন্দরিও জানে আলমের সঙ্গে ভালা ব্যবহারই করতে থাকল। নইলে তো স্বামীকে উদ্ধার কইরবের পারব না। একদিন মালেকা সুন্দরি জানে আলমকে (শাহ আলমের সুরতধারী) কয়, আপনি যে আমার বাপের মুন্তর শিখছেন শুনলাম, তা আমাক তো কিছু দেহাইলেন না। কী মুন্তর শিখলেন একদিন এল্লা দেহান। এইকথা শুনার পর শাহ আলমের সুরতধারী জানে আলম কইল, কী দেইখপের চাও কও। তহন মালেকা সুন্দরি কইল আমার ইচ্চে, আপনে একদিন কুত্তা (কুকুর) হয়ে দেহান। বেজি, ওয়াপ (বন বিড়াল), গুল (গুঁইসাপ) খুব জ্বালাইতেছে আমাক। মুরগিগুইল্লে ধইরে নিয়ে যায়। কুত্তা হয়ে আপনে এগলেক এল্লা শায়েস্তা (শাস্তি) কইরে দেন আমি এল্লা তামশা দেখমু। এদিকে বানরেক মালেকা সুন্দরি বইলে রাখল যে, আমি তো ওরে নিয়ে গুল-বেজি দাবড়াবার যামু। তোমার কাম (কাজ) যা করার কইরো। কুত্তা হওয়ার কথা শুইনে খুশি মনে জানে আলম কুত্তা হইল। আর বেজি ওয়াপ দাবড়ায়ে রাইখে আইল। আইয়ে দেখে, মরা বানর পইরে রইছে আর শাহ আলম জীবিত হইছে। তহন কুত্তেক শাহ আলম কইল আমি এই কাজ করলামনি নে। তুমি যদি তোমার ধরডা রাখলানি। আমি এহন আর কী করমু। কিছুই করার নাই। কুত্তা সাজা জানে আলমকে তহন গুয়াত (পাছায়) পিটন দিয়ে তাড়াইয়ে দিল। জানে আলম কুত্তাই থাইকা গেল, কারণ ওর তো ধর নাই।

কথক : আয়েশা খাতুন

www.pathagar.com

রাজা ও তাঁর সাত বউ

এক রাজার ছিল সাতটা বউ। কারোরই পোলাপান হয় না। পোলাপান না হওয়ার কারণেই একে একে রাজা সাতটা বিয়ে করল। আগের ছয়জনের গর্ভে সন্তান হয় নাই–সবাই বাঞ্জা (বন্ধ্যা)। তাই সাত নম্বর বিয়ে করে রাজা। রাজা ভাবে, এই সাত নম্বর বউয়ের গর্ভে হয়তো তার সন্তান হবে। সেই রাজা ছোট বউকে বেশি আদর করে। ছোটডাক রাজায় বেশি আদর করে, তাই অন্য ছয়জন ওইডারে দেখবের পায় না। কিন্তু কারোরই যখন সন্তান হইল না, তখন সবাই রাজ্যের সব ডাক্তার কোবরেজ দিয়ে কাম (কাজ) হইল না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ফকির আহে রাজদরবারের ভিক্ষে করার জন্য। প্রত্যেক ফকিরকেই জিজ্ঞেস করে, তোমরা সন্তান হওয়ানের জন্য কোনো কিছু জানো কি নে? একদিন এক ফকির কইল, হ্যাঁ জানি। তহন ফকিল একটা আম পইরে দিল আর কইল, এই আমডা সাতজনে ভাগ কইরে খাবেন। খাওয়ার আগে গোসল করতে হবে। বড় ছয়জন যুক্তি করল, যাতে ছোট রানি কোনোভাবে এই আম না খাইতে পারে। তো বড় রানিরা আগে-ভাগে গোসল কইরে আইসে আম ভাগ কইরে খাইয়ে ফেলাইল। ছোট রানি গোসল কইরে আইসে দেহে, ওরা আম খাইয়ে ফেলাইছে। তহন ছোট রানি কইল, আমের ভাগ কই? তহন সবাই একসঙ্গে কইল, হায় হায় আমগের তো মনে আছিল না। হায় হায়রে এহন কী হবো। ছোট রানির মন ভুলনোর জন্য এসব কইতে থাকল। কিন্তু ছোট রানি কইল, আমের চোচাডা (চামড়া) কই? তহন ওরা কইল, চামড়া তো ছাইয়ের কাড়ির তলে ফালাই দিছি। তহন ছোট রানি ছাইয়ের কাড়ির তলে তনে (থেকে) আমের চোচাই ধুয়ে পাটাত ছেইচে রস কইরে খাইল। কিছুদিন পর দেখা গেল ওদের কারোরই গর্ভে সন্তান হইল না। কিন্তু ছোট রানির গর্ভবতী হইল। তহন ওরা ছয়জন মিলে ষড়যন্ত্র করতে থাকল যে এমনিতেই অক (ছোটটাকে) বেশি আদর-যত্ন করে, এরপর আবার যদি সন্তান হয় তাইলে আমাগোরে রাজা দেখপেরই পাব না। তাই ওরা পরামর্শ কইরে ঠিক হইলে যে বাচ্চা হওয়ার আগে এডা কাঠের পুতুল কিনে আনব। আর দাইকে টাকা দিয়ে ঠিক করল যে বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে কওয়া লাগব যে ছোট রানির পেটে তনে মানুষের বাচ্চা হয় নাই, কাঠের পুতুল হইছে। আর ছোট রানিক সতিনেরা বোঝাইল যে, পয়লে পয়লে বাচ্চা হবো তোর। মেলা কষ্ট পাবি। এই জন্য বাচ্চা হওয়ার সময় সাত পরল (সাত প্যাঁচ) কাপড় দিয়ে চোখ-মুখ ঢাইকে দিওন লাগব। এইভাবে একদিন বাচ্চা হওয়ার দিন হয়ে গেল গা। হইল এক অপূর্ব সুন্দর ছেলে। কথামতো দাই আইল আর বাচ্চা হওয়ার পর ছোট রানিরে দেখান হইল যে ওর পেট তনে কাঠের·পুতুল হইছে। ওদিকে বাচ্চাডাক একটা পাতিলের মইধ্যে তুইলে ভাসায়ে দেওয়া হইছে। আর এইদিকে রাজারে অন্য রানিরা কইল যে, ছোট রানির গর্ভে যে কাঠের পুতুল আছিল। আপনের মান-ইজ্জত তো থাকব না। আপনে কীভাবে সহ্য করবেন, এই কুলক্ষী বউডাক। ওরে বনবাসে দিয়ে দেন। পরে রাজা ছোট রানিকে বনবাসে দিল।

ওদিকে পাতিলডে ভাসতে ভাসতে এক কিনারে ঠেকছে। ওই সময় নদীর কিনার দিয়ে যাচ্ছিল এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বউয়েরও সন্তানাদি নাই। কোনো সন্তান হয় নাই। এই বাচ্চাডারে পাইয়ে ঘরে নিয়ে গেল। আর একদিন ব্রাহ্মণ একটা কুত্তা মাইরে বাচ্চা

www.pathagar.com

বাচ্চার গতরে রক্ত মাখিয়ে আশপাশের মানুষকে বোঝাইল যে তার বউয়ের বাচ্চা হইছে। এদিকে বাচ্চা বড় হইতে থাকল। আর ওইদিকে রাজার ছোট রানি বাচ্চার দুঃখে বন থাইকে পাগলের মতো বাইর হইয়ে গেছে গা। ভিক্ষে-টিক্ষে কইরে খায় আর সারাদিন জপে, আমার সোনার মনোহর কই গেল।

আর লোকজন বলাবলি করে ব্রাহ্মণের বাচ্চা তো ব্রাহ্মণের মতোই হয় নাই, ব্রাহ্মণের বউয়ের মতোও হয় নাই। তাইলে তো এইডে ব্রাহ্মণের সন্তান না। এইডে একদিন টের পাইয়ে বাচ্চাডা। সেই বুঝমান হওয়ার এসব কতা শুনতে শুনতে বিরক্ত হইয়ে গেছে গা। ছেলেডা সিদ্ধান্ত নিল রাজার কাছে বিচের দিব। সে ভাবল, রাজার কাছে যাইয়ে কবো, 'ব্রাহ্মণ এইভাবে আমাক নিয়ে কলঙ্ক তৈয়ার করছে। আমি এর বিচের চাই।' এর মইধ্যে একদিন ইস্কুল তনে আসতাছে। রাস্তায় দেহে একজন পাগুনি (পাগলিনী) ছেলেডাক দেহে কইতাছে, এইডেই মেন আমার সুন্দর মনোহর। ছেলেডা এইকথা শুইনে পাগুনির দিকে চাইল। চাওয়ার পর কেমন যেন্ দরদ হইল। এইভাবে প্রতিদিনই ইস্কুলে যাইতে যাইতে পাগুনিডাকে দেহে। আর দেখলে পরেই ওর মনে মইধ্যে মহব্বত জাগে। পাগুনি ওর দিক যহন চায়, পাগুনিরও মহব্বত হয়।

এদিকে দেশের সব মানুষই কয় ওইডা তো ব্রাহ্মণের ছেলে না। কোটতনে (কোথায় থেকে) যেন কুড়ায় নিয়াইছে। একদিন ওই পাগুনীক ছেলেডা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনে সোনার মনোহর কইরে খালি প্রতিদিন জপেন, আপনের হইছেডা কী? তহন পাগুনি সবকতা খুইলে কয় ছেলেডার কাছে।

একদিন এই ছেলেডা রাজার দরবারে এডা কাঠের পুতুল নিয়ে যায়ে জোরে জোরে চিৎকার করে আর কয়, 'এই পুতুল পানি খা। এই পতুল পানি খা।' রাজার উজির এই কাণ্ড দেইখে ছেলেডাকে পিটায়ে রাজার কাছে নিয়ে যায়। রাজার কাছে উজির নালিশ কইরে কয়, এই পোলাডা কাঠের পুতুলেক পানি খাওয়াবের চায়। আর চিৎকার করে। তহন রাজায় কয়, এই ছেলে কাঠের পুতুলে কোনোদিন পানি খায়? তহন ছেলেডা কয়, কাঠের পুতুল পানি খায় না, মানুষের পেট তনে কিবেই কাঠের পুতুল হয়? আপনে যে এইকতা কইয়ে আপনের ছোট রানিক বনবাসে দিছেন। তহন রাজার চেতনা ফিরছে যে হায় হায় আমি তো এই অন্যায়ডা করছি। তহন ওই পাগুনিডাক ডাইকে নিয়ে আইসে দেহে, ছেলেডার চেহারা রাজা আর ওই পাগুনির সাথে মিল আছে। তিনজনের চেহারারই একটা মিল আছে। এইভাবে পরে প্রমাণ হইল যে রাজার ছোট রানি জন্ম দিছিল খুব সুন্দর একটা ছেলে। এভাহে রাজা হলো ছেলে আর ছোট রানিক ঘরে তুইলে নিল। আর ওই ছয় রানিক একটা গর্ত খুইড়ে তার মধ্যে কাঁটা রাইখে ধাক্কা দিয়ে মাইরা ফেলাই দিল। ওরা ওর মধ্যে মইরা গেল গা।

কথক : আয়েশা খাতুন

এক বীর

এক দেশে আছিল এক বীর। তার বীরত্বের দাপটে দেশের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত। রাজাও ভীত। সেই বীর চায়, তার দেশে আর কোনো বীর না থাকুক। একদিন শোনে

www.pathagar.com

তার দেশে অন্য এক এলাকায় এক বীর আছে। এই কথা শুইনে সে এই বীরের বাড়িতে গেল মল্লযুদ্ধ করার জন্য। গিয়ে দেখে বীর বাড়িত নাই। এক ছোট মেয়ে বের হয়ে আসল। মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাকে চান। বীর বলল, আমি তোমার বাপের কাছে আসছি। তোমার বাপ কোথায় গেছে? মেয়েটি বলল, আমার বাবা তো বনে গেছে রান্নার খড়ি আনতে। আর বলে গেছে খড়ি আর কী আনমু। একটা পাহাড় কাইটে মাথায় করে আনমু।

এই কথা শুইনে বীর খানিকটা ভীত হইল। বীর উঠানের দিকে তাকায়ে দেখে, একটা বড় তালগাছ। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, এই তালগাছটা কি তোমরা বেচপা? মেয়েটি বলল, এই তালগাছ নিয়ে তো বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া হইতেছে। এইডা কেমনে বেচপো? বীর জিজ্ঞেস করল, কেন ঝগড়া হইতেছে ? মেয়েটি বলে, মা বলে তালগাছটা দিয়ে আমি শাক নাড়া নাকড়ি বানামু। আর বাবা বলে, আমি তালগাছটা দিয়ে দাঁত খোঁচানো খিলাল বানামু। এই কথা শুইনে ওই বীর তৎক্ষণাৎ পালায়ে চইলে গেল।

কথক : আবদুল মান্নান, পেশা : শিক্ষকতা, বয়স : ৫৫

ভ্রমণপ্রিয় একজন

এক লোক দেশে দেশে ঘুইরে বেড়ানো তার অভ্যাস। একদিন তার এলাকা ছাইড়ে অন্য এলাকায় গেল। পথের মধ্যে রাইত হইয়ে গেল। রাস্তার ধারে এক বাড়ি উঠবে বলে ভাবল। আরও ভাবল অপরিচিত মানুষের বাড়িতে রাতে থাকমু, তাইলে কিছু কিনেকাটা করে নিয়ে যাই। তো সে একটা মুরগি কিনে ওই বাড়িতে উঠল। আর বলল, আমি তো এক পথিক। আজ রাতে আপনাদের বাড়িত অথিতি থাকবের চাই। পথ যাইতে যাইতেই রাত হয়ে গেছে গা তাই। রাতে আমার খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি একটা মুরগি কিনে আনছি। মুরগির মাংস দিয়ে ভাত দিলেই চলব।

বাড়িওয়াল ছিল অত্যন্ত চালাক এবং লোভী। সে মুরগিটা বাড়ির ভিতর নিয়ে যায়ে তাকে মুরগির মাংস না দিয়ে শুধু ডাল দিয়ে তাকে খাবার দিছে। তো পথিক জিজ্ঞেস করল, আপনে শুধুমাত্র ডাল দিয়ে ভাত খাইতে দিলেন। আমি মুরগি নিয়েই এসেছি। তখন বাড়িওয়ালা বলল, আমাদের দেশের একটা নিয়ম আছে। অতিথি জিজ্ঞেস করল, কী সে নিয়মটা। বাড়িওয়ালা বলল :

যে দেশের যে চাল, দিয়ে মোরগ হয়ে ডাল।

মোরগ পাক করলে সেটা ডাল হয়ে যায়। অতিথি ভাবল, বাড়ির মালিক তো তাকে ঠকাইল। যাই হোক বাড়ির মালিক এক ফাঁকে আরও কিছু খাবার আনতে যেই বাড়ির ভিতরে গেছে। এই ফাঁকে তাকে দেওয়া কাঁসার থাল আর বাটিটা সে ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে তার কাছে থাকা মাটির থাল বের করে ওর মধ্যে ভাত-তরকারি রেখে খাওয়া শুরু করল। ভিতর থেকে মালিক আইসে বলল, ব্যাপার কী? আমি আপনাকে দিলাম কাঁসার থাল আর আপনি মাটির থালে করে ভাত খাচ্ছেন? কাঁসার থাল আপনি কোথায় রাখলেন আর মাটির থালই বা আপনি কোথায় পাইলেন? তখন অতিথি বলল :

www.pathagar.com

যে দেশের যে ভাও
রাখলে খানা কাঁসার বাটি
হয়ে যায় মাটির খুটি ।

কথক : আবদুল মান্নান

এক দেশের এক ঠক

এক দেশে ছিল এক ঠক। ওই ঠকের কাছে তাঁর বউ বায়না ধরছে যে তুমি আইজ বাজার থেকে আমার জন্যে কিছু সন্দেশ আনবা। টাকাও নাই তার কাছে অথচ বউ সন্দেশ আনবের কইছে। কেমনে কী করে, চিন্তা করতে করতে ঠক ওই লোক বাজারে গেল। বাজারে মিষ্টির দোকানে যাইয়ে বলতেছে, ভাই তুমি আমারে এক কেজি রসগোল্লা দেও। মিষ্টির দোকানদার তারে এক কেজি রসগোল্লা মাইপে দিছে। রসগোল্লা দেওয়ার পর ঠক ওই লোক বলতেছে, ভাই আমি রসগোল্লা নিমু না। এই রসগোল্লা বদলায়ে এক কেজি সন্দেশ দেও। তো সন্দেশ নিয়ে সে দোকান থেকে বের হয়ে যাইতেছে। দোকানদার বলল, ভাই সন্দেশের দাম দেও। ঠক তহন বলতেছে, আমি তো রসগোল্লা দিয়ে সন্দেশ নিলাম। দোকানদার তহন বলতেছে, তাইলে রসগোল্লার দাম দেও। ঠক কইতেছে, আমি রসগোল্লা কিনিই নাই !

কথক : আবদুল মান্নান

তিন বন্ধু

তিন বন্ধু একসঙ্গে রাস্তায় হাইটে হাইটে ঘুরতে বের হইছে। রাস্তায় ক্ষুধা লাগতে পারে, এইজন্য সামান্য কিছু খাবার নিছে। খাবারের পরিমাণ এতই কম যে তিনজন ভাগাভাগি করে খাইলে তিনজনের কারোরই হবো না। তিন বন্ধু যাইতে যাইতে মাথায় বুদ্ধি আটল, রাস্তায়ই তো আজকে রাইত হবো। আমরা চল একগাছের নিচে রাইত কাটামু। তো যাইতে যাইতে এক নদীর ধারে এক বটগাছের নিচে যহন গেল, তহনই রাত হইল। ওরা ভাবল, তাইলে এই গাছের নিচেই আমরা ঘুমাই। একজন কইল, ক্ষিদেও তো লাগছে রে। তহন একজন কইল, খাবার আছে একজনের। তিনজনে খাইলে তো হবো না। চল সবাই ঘুমাই, যে আইজ রাইতে ঘুমের মধ্যে ভালা স্বপ্ন দেখপো, সে-ই খাবারটা খাব। তহন তিনজনেই ঘুমাইল। এরমধ্যে একজন আছে বেশি চালাক–ধূর্ত। সে রাইতে উইঠে খাবারটা খাইয়ে আবার ঘুমাইয়ে পড়ল। সকালে উইঠে সবাই স্বপ্ন কওয়া শুরু করল। যে খাবারটা খাইছে সে কইল, আগে তোরা দুইজন বল, আমি পরে কমু।

প্রথম জন কইল : আমি স্বপ্নে দেহি যে, আমি মইরে গেছি। মরার পর আমি বেহেসতে গেছি গে। আর সমস্ত হুর-পরিরে আমারে আদর-যত্ন করতেছে।

দ্বিতীয় বন্ধু : আমি স্বপ্নে দেহি, বাংলাদেশের সরকার আমারে এডা ফিরি (ফ্রি) বিমান দিছে। বিমান দিয়ে কইছে, তুমি এই বিমান দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুইরে বেড়াবা। তো সুযোগ পাইয়ে আমি লন্ডন, টোকিও, সিঙ্গাপুর, চীন গেলাম।

তৃতীয় বন্ধু কইল : তোরা একজন যহন বেহেসতে গেলি আর একজন যহন বিমানে কইরে উড়তেছিলি আর ঘুইরে ঘুইরে বেড়াইতেছিলি তহন আমি এহানে

www.pathagar.com

একলা। তহন নদীর মইধ্যে থেকে বিশাল এক দানব আইসে আমারে কইতেছে, তুই এহনি এই খাবারডা খায়, তা না হইলে কিন্তু তোক নদীর মইধ্যে টাইনে নিয়ে আমি খাইয়ে ফালামু। তহন ভাই, আমি ডরে-ভয়ে খাবারডা খাইয়ে ফেলাইছি।

কথক : আবদুল মান্নান

দাউদঅলা, চোখ ওঠা আর টাকঅলা তিন বন্ধু

জষ্ঠি (জ্যৈষ্ঠ) মাসের খরারৌদ্র। রৌদ্রের তাপে মাটি ফাইটে যায় গা, এমন রৌদ্র। তিন বন্ধু জামালপুর থেকে বগুড়া যাব। মাঝখানে যমুনা নদী। যমুনা নদী পাড়ি তো বিরাট পাড়ি। চার-পাঁচ মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে নদীর মইধ্যে দিয়ে। তিন বন্ধুর কারো কাচেই টাকা নাই। তিনজনই যায়ে ঘাটের মালিককে বলতেছে, আমগোর কারো কাছেই তো টাকা নাই। আমগোরে দয়া কইরে বিনে পয়সাতেই পার কইরে দেওন লাগব। ঘাটের মালিক খুব রসিক লোক। সে দেহে, তিন বন্ধু তিন ধরনের। একজনের পিঠে দাউদ (দাদ) রোগ আছে। একজনের চোখ উঠছে। সারা চোখে পেচুর। আরেকজনের সারা মাথায় টাক। মাথায় একটা চুলও নাই।

ঘাটের মালিক কইল, আমি তিনজনকেই মাগনা পার করমু কিন্তু তিনজনেক তিনডে শর্ত মানা লাগব। যতক্ষণ নদী পার হবা, ততক্ষণ দাউদঅলা ভাই পিঠে হাত দিয়ে চুলকাবের পাবা না। চোইখ ওঠা ভাই এর মইধ্যে চোইখো হাত দিবের পাবা না। আর টাকঅলা ভাই নদী পার হবার সময় তুমি মাথায় হাত দিবের পাবা না। তিনজনেই শর্ত মাইনে নিল। কিন্তু নদীর মাঝপথে যহন নাও গেল, তহন এই জইষ্ঠি মাসের রোদে সবারই যার যার অসুখের জায়গাত চুলকানি শুরু হইল। তহন দিশকুল (উপায়) না দেহে, দাউদঅলা ঘাটের মালিককে কইল, তা এতক্ষণ আমরা এট্টু গল্প-গুজব না করলে হয়? শুনেন এট্টা গপ্প করি।

দাউদঅলা : আমাগোর দাদার একটা বলদ আছিল। এই বলদটা ছাড়া পাইলেই গাছ হইক, খেড়ের (খড়) পাল্লা হইক, বেড়া হইক ঘাড়ডা বাজায়ে (কোনোকিছুর সঙ্গে লাগানো) খালি ঘষা দিত। এই কথা বইলে দাউদঅলা নওয়ের গলুইয়ের সাথে পিঠটা ঘষা দিয়ে তার পিঠের চুলকানি থামাইল।

এইবার বাকি দুইজন ভাবতে লাগল, ওতো আরাম ঠিক পাইল চালাহি কইরে। এহন আমরা কী করুম। চোখ ওঠা তহন এট্টা বুদ্ধি বাইর করল।

চোখ ওঠা : ধুর তোর দাদার আর কী বলদ আছিল। আমার দাদার এক বলদ আছিল, সেইডে দেখলে তুই আশ্চর্য হয়ে যাবি। সেইডের শিঙ্গে দুইটে ছিল দেখপের মতো। মাথার দুইদিক তনে শিঙ্গে দুইটে বাইর হয়ে সেইডে আবার চোখের মইধ্যে মোচড় দিয়ে ঢুইকে আবার মাথার পিছন দিয়ে বাইর হয়ে গেছে (পুরো বিষয়টি সে হাত দিয়ে দেখাল।)। সে শিঙ্গে দেখাবার ধইরে এমনভাবে চোখ হাত দিল যে এর মইধ্যেই সে চোখ কচলায়ে ফেলাইল। তাতে তারও চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল।

এরপর বাকি থাকল টাকঅলা। সে ভাবতে থাকল, ওরা তো চালাহি কইরে পার পাইল। আমি তাইলে কী করমু। সেও এট্টা ফন্দি বাইর করল।

www.pathagar.com

টাকঅলা : তোগের দুইজনের গপ্প আমার ভালা লাগছে। আমি তো কোনো গপ্প জানিনে। কিন্তু তোগের দুইজনের গপ্পই আমি মাথায় তুইলে রাখলাম। এই কথা বইলে, দাউদঅলার দিক চাইয়ে একবার একচউল (এক আঁচলা পানি) পানি মাথায় দিল আর কইল, এই তোর গপ্প মাথায় তুইলে রাখলাম। আবার চোইখ ওঠার দিক চাইয়ে একবার কয়, এই যে তোর গপ্পও মাথায় থুইলাম। এই কথা কইয়ে আরও এক চউল পানি মাথায় দিল। আমি কিন্তু তোগের দুইজনের গপ্পই মাথায় থুইলাম।

কথক : আবদুল মান্নান

দুই বন্ধু আর কাঁঠাল

দুই বন্ধু একটা কাঁঠল কিনল। কাঁঠলডা নিয়ে একগাছের নিচে নিয়ে কইল, চল্ এহানেই কাঁঠলডা এহানেই ভাঙ্গে খাই। দুইজনেই বইল কাঁঠাল খাওয়ার জন্য। এর মইদ্যে একজন একটু বেশি চালাক। সে ভাবল দুইজন যদি একসাথে খাই, তাইলে আমি বেশি খাইতে পারমু না। সে তহন কাঁঠল ভাঙ্গে একটা বুদ্ধি বাইর করল যে ওরে এট্টা কাজে যদি ব্যস্ত রাখা যায়, তাইলে আমি বেশি পরিমাণ কাঠল খাইতে পারমু। তহন চালাকডা ওই বন্ধুরে কইল, আচ্ছা তোর বাপ যে মারা গেল, কেমনে মারা গেল। একবারে অসুখের শুরু তনে কছেন দেহি। কতদিন বিছনায় পইড়েছিল? কীভাবে তোরা সেবা-টেবা করলি।

এই কথা শুনবের চাইয়ে চালাক বন্ধুডা গারাসে গারাসে (গোগ্রাসে) কাঠল খাওয়া শুরু করল। আর ওই বন্ধুডা কইল, প্রথমে পেরালাইসিস হইছিল। জামালপুর নিয়ে গেলাম। সেহান তনে ময়মনসিং নিয়ে গেলাম। সেহানেও কিছু হইল না। পরে ঢাহাত (ঢাকায়) নিয়ে গেলাম। ওহানে চিকিৎসা করাইয়ে বাড়িত কিছুদিন থাকার পর মারা গেছে। এসব সে কইতেছে আর এট্টু এট্টু করে খাইতেছিল। আর চালাক বন্ধুডা খালি খাইতেই আছে। ওর গপ্প করা যহন শ্যাষ তহন সে টের পাইল যে, আসলে গল্প শুনবের চাইয়ে তো আমার সাথে চালাহি করতেছে। সে তো খালি কাঁঠলই খাইতেছে। এহনও কিছু কাঁঠল আছে, এডা তো খাওয়া লাগব। তাইলে ওর কাছে গপ্প শুনবের চাইল। তহন চালাকটারে জিজ্ঞেস করল, এইবার তুই ক দেহি তোর বাপ কী হয়ে মারা গেল। চালাকটা তহন কইল যে, আমার বাপ পড়ছে আর মরছে।

কথক : আকালু মোল্লা (বয়স ৮৩)

সাপ ব্যাঙ আর কাছিম

এক সাপ, এক ব্যাঙ আর এক কাছিম–তিন বন্ধু। তিন বন্ধু খুব সুখে-শান্তিতেই এক বনে বসবাস করত। একবার বনে লাগছে আগুন। আগুন লাগার পর সাপ গাছ বেয়ে বেয়ে অনেকে উপরে উঠে গেছে। ওদিকে আগুনের শিখাও উপরে ওঠে। একপর্যায়ে সাপের আর উপরে ওঠার জায়গা থাকল না। আর ব্যাঙটা বনের মধ্যে এক ডোবা আছিল, ওর মধ্যে দিছে ঝাপ। বাকি থাকল কাছিম। কাছিমটা করছে কী, পাতা আর মাটি খামচায়ে খামচায়ে ওরই নিচে আত্মগোপন করছে। আগুন নেভার পর দেখা গেল, সাপটা আগুনে পুইড়ে

www.pathagar.com

নড়বড় নড়বড় করছে। আর কাছিমের পিঠের চামড়া পোড়া গেছে। আর ব্যাঙটা ডোবার মধ্যে ঝাপ দিয়ে বেঁচে গেছে।

এই জন্য বলা হয়, বড় বুদ্ধি যার নড়বড়ে তার। কম বুদ্ধি যার পিঠ পোড়া গেল তার। আর যে নির্বোধ, সে ঝুপ্লুত। তার মানে এই তিন প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙের বুদ্ধিই সবেচেয়ে কম। এই কারণে শুধু সে-ই ভালোভাবে বেঁচে গেছে।

কথক : হযরত আলী (বয়স : ষাটোর্ধ্ব, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)

চতুর

এক লোক খুব চতুর। গেছে মেলান্দহ (মাদারগঞ্জের পাশের উপজেলা) হাটে। অন্যান্য কাজ-বাজ সেরে গেছে কাঁঠল কিনতে। গিয়ে কাঁঠলওয়ালাকে বলছে, যদি কাঁঠলের রোয়া (কোষ) যদি ভালো হয়, তাইলে টাকা বেশি দিব। আর তা না হইলে টাকা কম দিব। এই কথা বইলে ওই লোক কাঁঠল খাওয়া শুরু করেছে। চালাকি করে সে কাঁঠলের বিচিসহ খাওয়া শুরু করেছে। মাঝেমধ্যে দু-একটা বিচি ফেলছে কিন্তু বেশির ভাগ বিচিই সে খেয়ে ফেলেছে। কারণ তাকে দেখাতে হবে কাঁঠলে রোয়া অনেক কম ছিল। কম টাকা দাম দিতে হবে তাকে। এদিকে বিচিসহ কাঁঠল খাওয়ায় বাড়ি আসতে আসতে তার ব্যথা শুরু হয়েছে। বাড়ি আসার পর প্রচণ্ড বৃষ্টি। রাতে যখন পায়খানা যাওয়ার তাড়া শুরু হয়েছে, তখন সে দূরে আর কোথাও না গিয়ে ঘরের দরজাতেই কাজ সেরেছে। সকালে উঠে সে যথারীতি লাঙল নিয়ে গেছে জমি চাষ করতে। সকালে খাওয়ার সময় হলে তার বউ দেখে, ভাত খাওয়ার তেমন কোনো তরকারি নেই। কিন্তু লক্ষ করল যে তার ঘরের দরজার খুব কাছেই ঝকঝকে কাঁঠলে বিচি পড়ে আছে। তখন সেগুলো সেদ্ধ করে তার স্বামীর জন্য ভর্তা করে মাঠে ভাত পাঠিয়ে দেয় মেয়ের কাছে। তার স্বামীও কাঁঠলের বিচির ভর্তা দিয়ে ভালোই মজা করে সকালের ভাত খাওয়া কাজ সেরে ফেলে। খুব ক্ষুধা লেগেছিল, তাই খাওয়ার সময় আর কোনোকিছু জিজ্ঞেস করে নাই। খাওয়ার পর মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, কী রে কাঁঠলের বিচি কই পাইল তোর মাও? তখন, মেয়ে বলে, কই আর পাবো, ঘরের দরজার কাছেই পইড়ে আছিল কাঁঠলের বিচি। সুন্দর ঝকঝকা বিচিগুইলে দেখে মা তোমার জন্য ভর্তা কইরে দিছে। তখন সে নিজেই এই উক্তিটা কইরে বসে :

যত চতুর তত ফতুর
বিচিগুণে কড়ি।
বিধাতা খাওয়াইলে বিষ্ঠা
কী করিতে পারি?

কথক : হযরত আলী

ঘোড়াওয়ালা

গুনারের সাথে ঘর। ঘরের মেজেয় দুহুসুম সোয়ামি ভাত খাইতাছে। নয়া বৌ সোয়ামিক কয়, তহারি কিবে হইছে? সোয়ামি উত্তর না দিতেই গুনার থনে ঘোড়াওয়ালা বেডা কয় খুব ভালা হইছে। এই কথা শুইনি সোয়ামি হাইলে পেণ্টি নিয়ে

www.pathagar.com

ঘোড়াওয়ালাকে মারতে যায়। অবস্থা বেগতিক দেহি ঘোড়াওয়ালা বেডা ঘোড়াত থনে ধানের বস্তা ফেলাইয়ে দিয়ে কয় ভালা হইছে না, খুব ভালা হইছে। বেডা ঘোড়াওয়ালার কাছে আইসে রাগ থেমে যায়। দেহে ঘোড়াত থনে ধানের বস্তা পইরে গেছে গা। নিজের ভুল বুঝবের পায়ে চইলা যাইতে ধরছে। তহন ঘোড়াওয়ালা বেডাডারে কয়, ভাই দয়া করে যদি ধানের বস্তাডা ঘোড়ার পিঠে তুইলে দেন, খুব ভালা হয়।

শব্দার্থ : গুনার-রাস্তা, মেজে-মেঝে, দুহুসুম-দুপুর, সোয়ামি-স্বামী, তহারি-তরকারি, কিবে-কেমন, থনে-হতে, দেহি-দেখে, আইসে-এসে, পইরে-পড়ে, বুঝবের-বুঝতে, চইলা-চলে যাওয়া, তহন-তখন।

চাইলাম পানি দিল দুধ

এক ফহির বেডা এক বাড়িতে যায়ে হাক ছাড়ে। চাড্ডে ভিক্ষে দিবেন গো ? বাড়িত থনে এক কামকন্যি আয়ে ভিক্ষে দেয়। ফহির বেডা কয় মা বড় পানি তিলেস নাগছে। এক গিলেস পানি খিলেও তো ? কামকন্যি ছেড়িডে কিছুক্ষণ পরে এক গিলেস পানি ও এক গিলেস দুধ আনি ফহির বেডারে দেয়। ফহির বেডা খুশি হয়ে দুধ ও পানি খায়। ফহির বেডা কামকন্যি ছেরিডের মাথায় হাত বুলায়ে দোয়া করে। মাইগো তোমার যেন আজ পুত্তরের সাতে বিয়ে হয়। চাইলাম পানি দিলে দুধ। আল্লা যেন তোমাক ভালা করে। তহন ছেরিডে কয় আপনের আর কতা। পাকঘরে পানি আনবের গিয়ে দেহি বিলেই দুধ খাইতাছে। ভাবলাম বিলেই খাওয়া দুধ ফেলায়ে দিবে। তাই এক গিলেস আপনেক দিলাম। ফহির বেডা মাথায় হাত, এডে কি কয় !

শব্দার্থ : ফহির-ফকির, বেডা-লোক, চাড্ডে-সামান্য, কামকন্যি-কাজের বেটি, আয়ে-এসে, তিলেস-পিপাসা, গিলেস-গ্লাস, আজপুত্তুর-রাজপুত্র, কতা-কথা, পাকঘর-রান্নঘর, আনবের-আনতে, আপনেক-আপনাকে, এডে - এটা।

কাবুলিওয়ালা ঋণ শোধ

এক গ্রামে এক টাউড লোক আছিল। লোকটা এক কাবলিওয়ালা কাছে থনে সুদের পর টেহা নিছিল। কাবলিওয়ালা এক মাস অন্তর অন্তর বেডার বাড়িত আহি সুদের টেহা নিয়ে যায়। গরিব বেডা সুদের টেহা দিবের পায় না। কাবলিওয়ালা ধুমকি ধামকী দিয়ে পরের মাসে টেহা দিতে কয়। একদিন কাবলিওয়ালা বেডার বাড়ি সুদের টেহার জন্য আহে। তহন চালাক বেডা তার আন্দন ঘরে আগুন ধরায়ে দিয়ে কাবলিওয়ালার দোষ দেয়। গ্রামের লোকজনকে ডাইকে বেডা কয়, কাবলিওয়ালা টেহার কান্নে আমার ঘরে আগুন নাগাইছে। কাবলিওয়ালা কিছুতেই বুঝাইতে পারে না যে, আগুন নাগাই নাই। গ্রামবাসী কাবলিওয়ালাকে জরিমানা স্বরূপ ঐ বেডার আসল টাকাসহ সুদের টেহা মাফ কইরা দিতে বাধ্য করে। কাবলিওয়ালা অবস্থা বেগতিক দেহি গ্রাম্য সালিশি মানি নিয়ে জান বাঁচায়।

শব্দার্থ : টাউড-টাউট, আছিল-ছিল, থনে-থেকে, টেহা-টাকা, নিছিল-নিয়েছিল, অন্তর অন্তর-পরপর, দিবের-দিতে, আহে-আসে, আন্দনঘর-রান্নাঘর, ডাইকে-ডেকে, কান্নে-জন্যে, নাগাইছে-লাগাইছে, দেহি-দেখি, মানি- মেনে নেওয়া।

www.pathagar.com

খ. কিংবদন্তি

রাজা হরিশ্চন্দ্রের দিঘি : জামালপুর জেলাসদর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের নাম চন্দ্রা ও রশিদপুর। এই দুই গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে এক ঐতিহাসিক দিঘি– যার নাম রাজা হরিশ্চন্দ্রের দিঘি। বর্তমানে স্থানটি দেওরপাড় চন্দ্রা বা দিঘির পাড় নামে পরিচিত।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের দিঘি

চন্দ্রা নামক গ্রামটি একটি সুপ্রাচীন গ্রাম। এ গ্রামে এক সময় দেববংশীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। জামালপুর শহর পত্তনের আগে ঝিনাই নদীর পাড়ে এই এলাকাটি ছিল এক জনসরগম বাণিজ্যকেন্দ্র। তখন প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবারে এখানে বিশাল হাট বসত। হাট সংলগ্ন ঝিনাই নদীতে ছিল ফেরিঘাট। হাটে দেশীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অসম্ভব বেচাকেনা হত। এখানে নীলকর সি.ব্রডির নীলকুঠি ছিল। এরই একটু পশ্চিমে হরিশ্চন্দ্রের দিঘির অবস্থান। অবশ্য বর্তমানে নীলকুঠির কোনো অবশিষ্ট নেই।

হরিশ্চন্দ্র ছিলেন সুবা বাংলার (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ান। মুর্শিদকুলী খাঁ সুবা বাংলার নবাব ছিলেন ১৭০১ সালে। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ তারই দেওয়া নাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৭২৫ সালে। যদি সেই সময়কালের মধ্যে দেওয়ান হরিশ্চন্দ্র এই দিঘি খনন করিয়ে থাকেন, তাহলে সে-হিসেবে এই দিঘির বয়স প্রায় তিনশ বছর। তবে পববর্তীকালে দেওয়ান হরিশ্চন্দ্র কিভাবে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন এবং দিঘিটি "রাজা হরিশ্চন্দ্রের দিঘি" নামে পরিচিতি লাভ করে সে সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এই দিঘিটির পাড়সহ আয়তন স্থানীয় হিসাবে ২৭ পাখি। পাড়ছাড়া দিঘির ভিতরের আয়তন ১৬ পাখি বা ১ খাদা। স্থানীয় হিসাব মতে ১ পাখি সমান ৫২ শতাংশ। সে হিসাবে দিঘিটির পাড়সহ আয়তন ১৪ একর ৪ শতাংশ এবং দিঘির ভিতরের আয়তন ৮ একর ৩২ শতাংশ। ইংরেজ আমলের শেষের দিকে গ্রাম সরকার বা প্রেসিডেন্ট নওয়াব আলী চৌধুরী দিঘিটির পত্তন নেন। পরবর্তীকালে নওয়াব আলী চৌধুরীর নিকট থেকে জামালপুর শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সাংবাদিক মীর্জা আশরাফ উদ্দীন হায়দার দিঘিটি খরিদ করেন। বর্তমানে আশরাফ উদ্দীন হায়দারের উত্তরাধিকারীরা এই দিঘির মালিক।

www.pathagar.com

এই দিঘিটিকে ঘিরে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। এর মধ্যে স্থানীয়ভাবে বহুল প্রচলিত একটি কিংবদন্তি হলো এ রকম: রাজা হরিশ্চন্দ্র এই বৃহৎ দিঘিটি এক রাতের মধ্যে খনন করান। কিন্তু দিঘিতে পানি ওঠে না। দিঘির ভিতরটায় আরও খনন করানো হয়, তবুও পানি ওঠে না। রাতে হরিশ্চন্দ্র স্বপ্ন দেখেন যে তার স্ত্রী কমলাকে দিঘির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তাহলে পানি উঠবে। পরদিন হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী কমলা দিঘির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র দিঘিতে পানি উঠতে থাকে এবং দিঘি কানায়-কানায় ভরে যায়। কিন্তু কমলা আর দিঘি থেকে উঠে আসতে পারেনি। তিনি দিঘির জলের অতলে হারিয়ে যান। এখানেই এই কিংবদন্তির শেষ নয়। এই দিঘির মাঝখানে মাঝে-মধ্যেই বিভিন্ন তৈজসপত্র যেমন- থালা-বাসন-ডেকচি ভেসে থাকতে দেখা যেত আবার তা দিঘির জলে অন্তর্হিত হত। স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের জন্য দিঘির কাছে থালা-বাসন ডেকচি যাচ্ঞা করত। তখন প্রয়োজনীয় থালা-বাসন-ডেকচি দিঘির জলে ভেসে উঠত এবং ভাসতে ভাসতে পাড়ে এসে ঠেকত। লোকজন তা নিয়ে ব্যবহার করত এবং ব্যবহার শেষে আবার তা দিঘির জলে ভাসিয়ে দিত। সেগুলো ভাসতে ভাসতে দিঘির মাঝখানে গিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যেত। এভাবেই চলছিল। কিন্তু একবার এক লোভী ব্যক্তি প্রয়োজন শেষে একটি বাসন রেখে দেয়। ফলে দিঘি রুষ্ট হয় এবং এরপর থেকে আর দিঘিতে থালা-বাসন-ডেকচি ভেসে উঠতে দেখা যায়নি। আর সেই লোভী ব্যক্তিটিও সর্বস্বান্ত হয়।

এই দিঘিকে ঘিরে অপর কিংবদন্তির উপজীব্য বিষয় নরনারীর চিরন্তন প্রেম। চন্দ্রা ও রশিদপুর গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের মুখে-মুখে ছড়ানো জনশ্রুতি এরূপ: চন্দ্রা গ্রামের কোনো এক দেবপরিরারে এক পরমা সুন্দরি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যার নাম রাখা হয় চন্দ্রা। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে চন্দ্রবতী যৌবনে পদার্পণ করে। সে রাজা হরিশ্চন্দ্রের দিঘির শানবান্ধা ঘাটে স্নান করতে যেত এবং স্নান সেরে পিতলের কলসি কাঁধে জল নিয়ে তাল-তমাল আর আম-কাঁঠালের ছায়াঘেরা পথ ধরে বাড়ি ফিরে আসত। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর একদল সৈন্যের আগমন ঘটে এখানে। তারা সেই দিঘির কাছেই সাময়িক ছাউনি ফেলে। দৈবক্রমে একদিন চন্দ্রবতীর সঙ্গে আব্দুর রশীদ নামে এক তরুণ সেনানীর সাক্ষাৎ ঘটে। সংগোপনে তাদের হয় হৃদয় বিনিময়। কিন্তু ধর্মের পার্থক্য ওদের নীড় বাঁধার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। নানা চড়াৎ-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে ওরা উভয়েই আত্মহুতি দেয় হরিশ্চন্দ্রের দিঘির অতল সলিলে। কিংবদন্তি এরূপ যে, চন্দ্রা ও রশীদের এ প্রেম কাহিনিকে অমর করে রাখার জন্যই পাশাপাশি দুটো গ্রামের নামকরণ করা হয় চন্দ্রা ও রশীদপুর। উল্লেখ্য, চন্দ্রা ও রশীদের কিংবদন্তিতুল্য প্রেমকাহিনি নিয়ে 'চন্দ্রাবতী' নামে একটি নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে।

গ. লোকছড়া

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা ছড়া শুধু প্রাচীনতমই নয়, জনপ্রিয়ও বটে। মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ছড়ার সৃষ্টি করেছে। লৌকিকছড়া শিশু কিশোর তরুণ যুবক সকল শ্রেণির জন্য রচিত। লৌকিকছড়ায় মানুষের সুখ-দুঃখ, অবসাদ, আনন্দ-বেদনা,

www.pathagar.com

হাস্য-কৌতুক রসের আলেখ্য কাহিনির সংক্ষিপ্তরূপ প্রকাশ পায়। যা আমাদের যাপিত জীবনের কখনো কখনো হীরক জ্যোতির মত জ্বলে উঠে। পদ্যের অন্তমিলযোগে স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত ছড়া দুটি থেকে আট-দশ-চরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে ব্রত, খেলা, ছাদ পিটানো, ভারবস্তু টানা, ধানকাটা কিংবা নৌকাবাইচের ছড়াগুলোর চরণ সংখ্যা বেশি হয়। জামালপুর ছড়ায় সমৃদ্ধ। এখানে ক্রীড়া, নৈসর্গিক ও ছেলে ভুলানো ছড়াই সমধিক। ঐন্দ্রজালিক ছড়া গানের মধ্যে সাপের মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, বৃষ্টির ছড়া, ধানকাটা ও নৌকাবাইচের ছড়া কিছু পরিমাণ লক্ষ্য করা য়ায়। এখানে প্রচলিত ছড়া দেওয়া হলো।

১.

হুক্কু হুক্কু নাড়িয়ে
বইসে মারা খাটিয়ে
বইসেরি তলে বারো বাতি জ্বলে
রাম শালিক ফাক্কা বেল
ফুরুত কইরা উইড়া গেল।

২.

আয় চাঁদ আয় না
গায়ে কত গয়না
দুই হাতে বালা দিব
দুই কানে দুল দিব
গলায় দিব হার
তোরে কত দিব আর।
ঘুঙুর দিব পায়
আয় চাঁদ আয়
খুকুর কাছে আয়।

৩.

আলকি যাবে পালকি দিয়ে
সইজল যাবে ঘোড়া দিয়ে।

৪.

ঢুলে ঢুলে
ঢোল কদমের তলে
একটা কদম পড়ে
গেল্লির টুনা ভরে।

৫.

লতা পাতা কিসের পাতা ?
আমের পাতা।
লতা পাতা কিসের পাতা ?
জামের পাতা।

www.pathagar.com

লতা পাতা কিসের পাতা ?
কাঁঠালের পাতা।

৬.

হাঁসি হাঁসি ভাই কই যাও,
পেক খাই গদগদাই বালুরচর।
একটা হাঁস দিয়ে যাও,
পাছেরটা নিয়ে যাও।

৭.

এই ছেরা তোর নাম কি ?
নাম দিয়ে কাম কি ?
এই চাড্ডে ভাত খাবি ?
বাঘ দেখবের যাবি ?
বাঘ দেহিবেন ডরাস ?
না না না।

৮.

আব্বু ডাব্বু ঢাকনি মালা,
ওজন ছিল পাল্লা।
জোড় জোড় বাট্টাজোড়,
শীতে কাটে কটাসুম।
এল হাত বেল হাত,
তুলি ফেলাই সোনা মিয়ের হাত।

৯.

জামাই মাগো খাড না,
হলদি জিরে বাড না।
লতা পাতার ঝিঙের বাইত,
জামাই আইল নিশির রাইত।
সাধলে জামাই খায় না,
ভেদা মারলেও যায় না।

১০.

হীরা গাছের মোতি ফুল,
দেখতে গেলে হয় না ভুল।
ফুলের তরে তেপান্তর,
তেপান্তরের রাঙা বউ।
রাঙা বউয়ের ভাঙ্গা ঠ্যাঙ,
লাফ দিয়ে উঠে তিনটে ব্যাঙ।

১১.

মামা আইল ঘামিয়ে,
ছাতা ধর টানিয়ে।

www.pathagar.com

ছাতির মধ্যে গামছা,
তিন মামির তামশা।
বড় মামি রান্ধে বাড়ে,
ছোট মামি খায়।
মেজ মামি গাল ফুলিয়ে,
বাপের বাড়ি যায়।

১২.

হাইটে পায় না বুড়ি,
ছেচা গুয়ে খায়।
দব্‌রি দব্‌রি বুড়ি,
ভাতার বাড়ি যায়।

১৩.

এই ছেরিরে ধর,
কল্লে বিরেন কর।
কল্লের মধ্যে গুমা সাপ,
নেংগুর ধইরে মারলাম পাক।

১৪.

জর নাই জারি নাই,
খাপ্‌সে হইল কাবু।
টাকা নাই পয়সে নাই,
কালু হইল বাবু।

১৫.

আমিনা নাগালো কলা,
লক্ষণে মারলো পাক।
পাকিস না ফুলিস না কলা,
জখম হয়ে থাক।

১৬.

আমার নাম আইনে
ধর বড়শি টাইনে
বড়শি দিলাম ঢিল
কাইত কইরা গিল।

১৭.

ফুল বড়শি মালুক কলা,
টপ্‌টপি গিলে ফেলা।
ছোট্টা ছারি বড্ডা ধর,
নাইলে পাতা ভর কর
টাপুর টুপুর তল কর।

www.pathagar.com

এক মাছ কানা,
হাজার মাছ বিল থনে
ডাক দিয়ে আনা।

১৮.

আহারে তালের পাতা,
গরমকালে দিও দেখা।
সোহাগ করে দিলাম রুমাল,
যত্ন করে রেখ।
আমার কথা মনে হলে,
রুমাল খুলে দেখো।

১৯.

ভালবাসার লেখা কাগজ
চিঠি আমার এই,
উড়ে উড়ে চলে যাবে
প্রিয়তম নেই।
লেখা শেষে আছে স্মৃতি,
টেনে দিলাম এবার ইতি।

২০.

প্রাণ প্রিয় সখি আমার,
যাচ্ছ চলে দূরে।
স্বামীর সোহাগ পেয়ে কিন্তু
যেয়ো নাকো ভুলে।

২১.

ইটের উপর ইট
তুমি বন্ধু চলে গেলে
মনে লাগে হিট।

২২.

কোকিল ডিম পাড়ে কাকের বাসায়,
আমি শুধু চেয়ে থাকি তোমার আশায়।
যে ফুল দিয়ে গাঁথা মালা আশা ছিল মনে,
সে ফুল হারায়ে আজ ঘুরচি বনে বনে।
ফুল তুমি ফুটবে না আসিয়াছ কেন?
ভাল তুমি বাসবে না ফুটিয়াছে কেন?

২৩.

ঘরের পিছে মাগুর মাছ
ধরতে পারলাম না
মনের মত বন্ধু পাইলে
ছাইর্যা দিতাম না।

www.pathagar.com

২৪.
পাকের ঘরে রান্না করে
চোখে লাগে ধুয়া
বিদেশ থেকে বন্ধু এসে
গালে দিবে চুমা।

২৫.
আম পাতা, জামা পাতা, ধানের পাতা শিষ
তুমি বন্ধু চলে গেলে খাব আমি বিষ।

২৬.
লেবুর পাতা তেনা তেনা
লাউয়ের পাতা নরম
বাড়ির কাছে প্রেম করলে পাব আমি শরম।

২৭.
ঘরে পাশে নারিকেল গাছ
বাদাই বাদাই টিয়া
তুমি বন্ধু ছেড়ে গেলে
কে করিবে বিয়া।

২৮.
আম গাছের পাখি গুলো
জাম গাছে যায়
তাই দেখে শফিকুল
পাগল হয়ে যায়।

২৯.
হাতে নাই আউটি
মনে নাই শান্তি
বালিশের সাথে গোলাপ ফুল
স্বামী ছাড়া থাকা ভুল।

৩০.
পুকুরেতে পানি নাই পানা কেন ভাসে
যার সাথে দেখা নাই সে কেন হাসে।

৩১.
আম পাকে জাম পাকে, পাকে কচি ডাব
বন্ধুর সাথে হল না বন্ধুর ভাব।

৩২.
আলু বেগুন তরকারি
জরিনার প্রেম সরকারি।

www.pathagar.com

৩৩.
পুকুরঘাটে গোসল করে লাক্স সাবান দিয়া
বন্ধুর কথা মনে হলে যায় সাবান হারাইয়া ।

৩৪.
আকাশের শোভা চাঁদ আর তারা
বাগানে শোভা বাড়ি
নদীর শোভা নায়ের বাদাম
পুরুষের শোভা নারী ।

৩৫.
৮টার সময় রান্না করি ৯টার সময় খাই
বন্ধুর কতা মনে হলে রাস্তার দিকে চাই ।

৩৬.
আকাশেতে ঝরকা ধরে
নিচে হয় ছায়া
ভালবাসা ভেঙে গেলে
থাকে শুধু মায়া ।

৩৭.
যতই পড় আই.এ.বি.এ. যতই পড় এম.এ.
নামাজ না পড়িলে যাবে জাহান্নামে ।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ৩৭ পর্যন্ত ছড়াগুলোর কথক : ছামিউল ইসলাম রিপন, বয়স ২০, পারপাড়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

৩৮.
পুকুরেতে ভেসে যায় কচি কচি পানা
তোমার সনে প্রেম করিতে কে করিবে মানা ।

৩৯.
আম মিষ্টি, জাম মিষ্টি, আরও মিষ্টি কলা
তার চাইতেও বেশি মিষ্টি বন্ধুর হাতের নলা ।

৪০.
কচু গাছ বড় হলে বেড়ে যায় লতা
বন্ধুর কতা মনে হলে প্রাণে লাগে ব্যথা ।

৪১
ছেলে জাত বেঈমান চতুর দিক তাকায়
মেয়েদের আশা দিয়ে সাগরে ভাসায় ।

৪২.
আকাশের তারা, বাগানের ফুল
ছাত্রজীবনে প্রেম করাটা ভুল ।

www.pathagar.com

৪৩.
আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছের মউ
তুমি চলে গেলে আমায় কে করিবে বউ ।
৪৪.
টেবিলের উপর দুইটি গোলাপ, একটি গোলাপ লাল
তোমার আমার ভালবাসা থাকবে চিরকাল ।
৪৫.
তেতুল পাতা, তেতুল পাতা, তেতুল বড় টক
তোমার সাথে প্রেম করিতে আমার বড় শখ ।
৪৬.
কপালেতে লাল টিপ, হাত ভরা চুরি
বন্ধুর কথা মনে হলে বনে বনে ঘুরি ।
৪৭.
আষাঢ় মাসে ভাসা পানি, সঙ্গে ভাসে ফেনা
বন্ধুর সাথে প্রেম করিতে কে করিবে মানা ।
৪৮.
হাঁস পালি, মুরগি পালি, আরও পালি টিয়া
গতরাতে স্বপ্নে দেখি তোমার আমার বিয়া ।
৪৯.
মরিচের গাছে সাদা ফুল
আমার লেখায় অনেক ভুল ।
লেখা দেঁখে হেসো না
আমায় ভুলে যেও না ।
৫০.
দিলাম একটা উপহার
করিবেন ব্যবহার ।
মুছিবেন মুখের ঘাম
মনে রাখবেন আমার নাম ।
৫১.
. টমেটো লাল, কাঁচা মরিচ ঝাল
সবচেয়ে ভাল লাগে মেয়েদের গাল ।

৫২.
প্রেমের আনন্দ স্বল্প ক্ষণ
প্রেমের বেদনা থাকে দীর্ঘক্ষণ ।
৫৩.
পাকা বেল মাটির ঢেল

www.pathagar.com

তোমার মত ছেলের গালে
আমার পায়ের স্যানডেল।

৫৪.
ঘরের পাশে কাবারি
সাদা বউটা আমারি।

৫৫.
পানতা ভাতে কাঁচা মরিচ গরম ভাতে ঘি
তোমার আমার ভালবাসা লোকে বলার কী?

৫৬.
ঘরের পাছে কাঁঠাল গাছ
কাঁচা কাঁচা মুছি
তুমি বন্ধু চলে গেলে
চখের পানি পুছি।

৫৭.
চেলা মাছ খেলা করে
নতুন পানিতে,
তোমার আমার খেলা হবে
বাসর ঘরেতে।

৫৮.
গোলাপ ফুল তুলতে গেলে কাটা খেতে হয়
মেয়েদের ভালবাসা পাইতে হলে মন দিতে হয়।

৫৯.
সোনার গাছে রূপার পাতা
আমায় তুমি ভুইল না
টাকা পয়সা কয়েকদিন
ভালবাসা চিরদিন।

তথ্যসূত্র : ৩৮ থেকে ৫৯ পর্যন্ত ছড়াগুলোর কথক : মো. জাকারিয়া, বয়স ২২, মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

৬০.
কালো গায়ের দুধ
ধলা গায়ের দুধ।
আম কাঁঠাল পাকে
কায়ে কুলি ডাকে
ওর বাঁশি বাজে না
আমার বাঁশি বাজে
টন্নস টন্নস।

www.pathagar.com

৬১.
আংগরে গেল্লি কান্দে না
কান্দে গলা ভাংগেনা
গেল্লিরে বিয়ে দিমু কই ?
হুক্কুমালা দেশে।
আম কাঁঠালের বাগান দিমু
ছেমায় ছেমায় যাবে
সঙ্গে দিমু কালা গাই
জামাই বসে খাবে।

৬২.
অপেন টু বাসকু
নাইন টেন টাসকু
সুলতানা বিবি আনা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
পান সুপারি খাইতে
মামার বাড়ি যাইতে
ইস্কুল ঘরে চাবি আটা
যার নাম রেনুবালা।

৬৩.
অপু ইচ্ছা বিচ্ছা
চাম চিক্কা চামের এলো শূর
এলো বাতি শঙ্খ এলো
গফুর বরই চোর।

৬৪.
নুনতা বলরে
একও হলোরে।
আমার ঘরে কেডা রে ?
কি খাস? লবণ খাই।
লবন খায়ে টেহা দিবিনে ?
নাত্তি আর গুরি।
তোরা কয়শ ভাইবোন ?
এডা বোন দিবি ?
ধরতে পারলে নিবি।

৬৫.
কুমির ভাই কুমির ভাই
কি করো ? কাপড় ধুই।
কিসের মধ্যে? পিঁড়ের মধ্যে।

www.pathagar.com

এটাতো পিঁড়ে না, কুমির।
কুমির তোমার পানিত নামছি।

৬৬.

এলটি বেলটি টেবিলের আঁশ
টেবুল আমাক নিবের আস।
রেলগাড়ি ঝুমার ঝুম
পায়ে বৃষ্টি পড়ার সুম
ফুল একটি গোলাপ ফুল।

৬৭.

একে ঋতু
দুই এ ডাবল টু
তিনে ঘোড়ায় চড়ি
চারে চাড্ডে পাতা ধিনান ধিন
পাঁচে সিলিপ কাটা
ছয় এ ছকা
সাতে আসেন তো দুলাভাই
বসেন তো চেয়ারে।

৬৮.

পুলিশ পুলিশ দারো গা
আণ্ডা পাড়ে বারোটা
এক আণ্ডা নষ্ট
পুলিশের বইয়ের কষ্ট।

৬৯.

টুনটুনি পাখি
নাচো তো দেখি
নারে বাবা নাচব না
পড়ে গেলে বাঁচব না
বড় আপুর বিয়ে
লাক্স সাবান দিয়ে
লাক্স সাবান ভালো না
আপুর বিয়ে হলো না।

৭০.

আদিকালের বুড়ি
বয়স হইছে কুড়ি
বিয়ে দিবের নও
বিয়ে যদি না দও
ঘরের খুঁটি দিয়ে থও।

www.pathagar.com

৭১.
বউ গো বউ উঠ
চোখের পানি মুছ
কি খাও? চুক্কা।
ফেলে দাও কি ? ময়লা।
কাকে চাও? তোমাকে।

৭২.
ন্যাংটা ভূতুনি
কলা খাবিনি
ন্যাংটা জামাই আইলে
পরে বিয়ে দিমুনি।

৭৩.
আম খাইও জাম খইও
তেঁতুল খাইও না ,
তেঁতুল খাইলে হব পোলা
বাব ডাকব না।

৭৪.
ছেরি ঝম ঝম কয়লা
জামা কাপড় ময়লা।

৭৫.
পুকুরেতে পানি নেই পানা কেন ভাসে
যার সাথে কথা নেই সে কেন হাসে।

৭৬.
গোলাপ ফুলটি লাল
তোমার আমার ভালবাসা থাকবে চিরকাল।

৭৭.
গরিবের মেয়ে বলে পান্তা ভাত খাই
তাই বুঝি ভালবাসা নাই।

৭৮.
নদীর সঙ্গে সঙ্গে গড়া
তোমার জীবন লেখাপড়া

৭৯.
ছোট ছোট গাছপালা
কচি কচি মন
সবচেয়ে ভাল লাগে
ছাত্রজীবন।

www.pathagar.com

৮০.
ঘরের পিছে লেবু গাছ লেবু ধরে ভাই
বন্ধুর কথা মনে হলে খাওয়া দাওয়া নাই ।

৮১.
ঘরের পিছে পেঁপে গাছ পেঁপে ধরে না
বন্ধুর কাছে শুইতে গেলে বালিশ লাগে না ।

৮২.
রান্না ঘরে রান্না করি চালে উঠে ধূমা
বিদেশ থেকে বন্ধু এসে গালে দিবে চুমা ।

৮৩.
ফুলের সাথি প্রজাপতি চাঁদের সাথি তারা
আমার সাথি কেউ হবে না লেখাপড়া ছাড়া ।

৮৪.
হাতে নাই আংটি মনে নাই শান্তি
বারে বারে মনে হয় তোমার ঐ নামটি ।

৮৫.
ফুল তুমি ফুটবে না কলি হলে কেন?
ভাল তুমি বাসবে না কথা দিলে কেন?

৮৬.
ফুলকে ভালবেসে ফেলে দিও না
মানুষকে ভালোবেসে ভুলে যেও না ।

৮৭.
ভাতের সাথে চিনি খেয়ে মুখ হয় মিষ্টি
বাসররাতে কথা বললে প্রেম হবে সৃষ্টি ।

৮৮.
আকাশের তারা বাগানের ফুল
ছাত্রছাত্রীর জীবনে ভালবাসা ভুল ।

৮৯.
ফুল অনেক আছে গোলাপের মত নয়
প্রেমিকও অনেক আছে তোমার মত নয় ।

৯০.
খস খসে পাতা ডগডগে ফুল
সবচেয়ে ভাল লাগে মেয়েদের চুল ।

তথ্যসূত্র : ৬০ থেকে ৯০ পর্যন্ত ছড়াগুলোর কথক : রাজিয়া সুলতানা কণা, বয়স : ২১, কাঁঠারবিল, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর

৯১.
একে রিতা মাথায় ফিতা
কানের দুল ভালবাসার ফুল

www.pathagar.com

আব্বা তোমার পায়ে পড়ি
পুতুর এনে দাও খেলা করি
পুতুলের মাথায় কুকরা চুল
বেঁধে দিব গোলাপ ফুল।
গোলাপ ফুলের বুটা
জামাই বাবু মোটা।

৯২.

এক ঘ্যাগ দুই ঘ্যাগ বার ঘেগের মেলা
হাছেন সরকার বইস্যা আছে
হাতেম মুণ্ডল চেলা।
আব্দুল মুণ্ডল বইস্যা আছে
গুইল্যার মত প্যাট
তাই দেইখ্যা জসীম সরকার
মাথা করে হেট।
উত্তর পাড়ার সাখাওয়াত কেন
দক্ষিণ পাড়ায় ঘুরে।
মিছা কথার ছালা নিয়া
কদ্দুস ভাংগী ঘুরে।

৯৩.

চাঁদ মামা চাঁদ মামা দূরে থাইক না
খুকুর চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়া যা
চিড়া দিবো মুড়ি দিব বসতে দিব পিঁড়ে
ময়নার জন্য ঘুম নিয়ে আসা যদি ঘরে।

৯৪.

সাতে আমরা দুজনে টাউন বাজারে
সাপ সেইখা ভয় করি আমার দুজনে।
আটে আটআনা চারআনা
দাদু তুমি খুঁজলা না
টাঙ্গাইল থেকে ঘুইরা আইলাম
টাং পাইলাম না।

৯৫.

মেন্দি তুলব্যার গেছিলাম
ডাল ভাইংগা পরছিলাম
আলে তোর গালে কি?
টকটকা সুপারি।
তোর মা কোনে গেছে
কুমার পাড়া
তোর খালা কোনে গেছে

www.pathagar.com

ভাত রান্দিতাছে।
এত ভাত খাব ক্যাড়া
দুলাভাই শালা।

তথ্যসূত্র : ৯১ থেকে ৯৫ পর্যন্ত ছড়াগুলোর কথক : মো. শহীদুল্লাহ, সহকারি শিক্ষক, তেলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেলান্দহ, জামালপুর

ঘ. লোককবিতা

বাউল লালমিয়ার লোককবিতা

১.

কত অন্ধ পেল চোখের জ্যোতি
পাগল লোকে পেল জ্ঞান
করিয়া ঐ মুর্শিদের ধিয়েন ॥

ঐ মুর্শিদের ধিয়েনেতে বিপদে হয় আসান
মুর্দা দেহ পাইল কত পূর্ণ জীবন দান ।
মুর্শিদের নামটি মুখে লয়ে
কত পাপী যাচ্ছে তরে গো
হিসাব ছাড়া পার হইতেছে
পুলসিরাত হাশর মিজান ॥

আকাফে আওলিয়া বাবা নায়েবে রাসূল,
মারফতের এমনি ধারা তৌহিদেরই মূল ।
এনায়েতপুরের নামের বলে
শুকনা নদী উজান চলে গো
মরা কাষ্ঠে কথা বলে
খুলিয়া মুখের জবান ॥
এক মুখেতে কী গাহিব বাবার গুণগান,
যার তাওজু ঢেউ খেলতাছে জমিন ও আসমান ।
আছেন যারা আশেক ভাবুক
যে যা ভাবে তাই সে ভাবুক গো
তোরা পাইতে চাইলে আল্লাহ রাসূল
গাও রে মুর্শিদের গুণগান ॥

একবার যদি চাইতে বাবা খুলিয়া নয়ন ,
জুলমাত দেহ হয় তো আমার নূরের রওশন ।
লাল পাগলের কপাল মন্দ
চোখ থাকিতে হইল অন্ধ
আমজাদ করল অপছন্দ
জ্ঞান নয়ন করল না দান ॥

www.pathagar.com

আব্দুস সালামের লোককবিতা

১.

আমি ডাকি যে তোমায়
আমি একলা নৌকায় হাইল নাহি তায় ৷৷
তোমারি আশায় চড়েছি নৌকায়
তুমি দয়া না করিলে নাইকো উপায় ৷৷

দয়া করে পার করে দেও গো আমায়
তোমার দয়া বিনে আমার না হবে উপায় ।
এই অনাথের জীবন সকল সময়
বিপদেরকালে দেখিবে হায়
এ জীবন চলে যায় গো তোমারি আশায় ৷৷

তুমি না আসিলে যে প্রাণ কি করে হায়
প্রাণ যাওয়ার কালে কান্দি তোমারি আশায় ৷৷
আহা এ দুঃখে আমার প্রাণ চলে যায়
আমি বলিব কাহারে আমার বুক ফেটে যায় ৷৷

২.

কিবা রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া
মজলি মজলি মজলিরে
মরণের তরে কি ভাবনা ওরে
করিলি করিলি করিলিরে ৷৷

জানে নারে মন এরূপ কখন
রবে না রবে না রবে নারে
জানিয়ে শোনিয়ে কেন মগ্ন হয়ে
রহিলি রহিলি রহিলিরে ৷৷

ইহাতে তোমার ভব নদী
পার হবে না হবে না হবে নারে
দরবার যাহার গুণে এসেছে
এ ভুবনে তাহার নাম
স্মরণ কেন রাখো না রাখো না রাখো নারে ৷৷

উদাসী মনে তাঁর রূপ কেন
দেখ না দেখ না দেখ নারে
তুলনা যাহার কভু নাহি আর
নাহি নাহি নাহি যার উপমারে ৷৷

www.pathagar.com

হায় হায় কেন ওরে মোর
মন তাঁর নাম কেন
লওনা লওনা লওনা লওনারে
সেরূপ ভাবিয়া পাগল হইয়া
কেন রওনা রওনা হওনারে ॥

৬. পুথিসাহিত্য

জামালপুর জেলা একসময় পুথিসাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জামালপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকজন পুথিকার পুথিসাহিত্য রচনা করেন। তাঁদের অনেকের জন্ম আঠার শতকের শেষার্ধে। তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন। তাঁরা প্রধানত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়কে তাঁদের পুথির উপজীব্য করেছেন। ধারণা করা যায়, মুসলিম তমদ্দুনকে ধর্মবিষয়ে আরো আগ্রহান্বিত করা, সেই সঙ্গে সাহিত্যরস পিপাসু ব্যক্তিদের রস-পিপাসার নিবৃত্তি সাধন করাই ছিল তাঁদের পুথি রচনার উদ্দেশ্য। তবে কেউ কেউ ভিন্ন বিষয় নিয়েও পুথি রচনা করেছেন। সেই সময় পুথিসাহিত্যে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছিলেন এরকম পাঁচজন পুথিকারের নাম উল্লেখ করা হলো— ১. মৌলবি সৈয়দ আবদুর রহমান ২. সৈয়দ তজাম্মল হোসেন ৩. মুন্সী মোহাম্মদ তাহেরউদ্দিন ৪. শাহ হামিদ আলী ফকির ও ৫. হাজি মীর্জা জাফর আলী। উল্লেখিত পুথিকার ও তাঁদের পুথি সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। বর্তমানকালে তাঁদের পুথিও দুস্প্রাপ্য। নিম্নে উল্লেখিত পুথিকার এবং তাঁদের পুথি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১. পুথিকার মৌলবি আবদুর রহমান জামালপুর জেলার জোকারপুর গ্রামে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইতিহাসকার গোলাম মোহাম্মদ তাঁর 'জামালপুরের গণইতিবৃত্ত' গ্রন্থে তাঁকে জামালপুর থানাধীন ভটবাড়ি নিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। মৌলবি আবদুর রহমান 'উমদাতুল মোছায়েল' ও 'এনায়েত রহমান' নামে দুটি পুথি রচনা করেন। 'উমদাতুল মোছায়েল' পুথিটি ১৩১৩ বঙ্গাব্দে এবং 'এনায়েত রহমান' পুথিটি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

২. পুঁথিকার সৈয়দ তজাম্মল হোসেন ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫-৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 'দেলমোহিত' নামে একটি পুথি রচনা করেন। পুথিটি ১৯২৫-৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকবে। পুথিকার পুথিটিতে হানিফি জামাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং মোহাম্মদি জামাতের নিন্দা করেন। ফলে পুথিটি প্রকাশিত হওয়ার পর মোহাম্মদি জামাতের পক্ষ থেকে মানহানিকর মোকাদ্দমা দায়ের করা হয়। ময়মনসিংহের এডিশনাল ম্যাজিস্টেটের কোর্টে মোকদ্দমাটি দীর্ঘদিন ধরে শুনানী চলে। ময়মনসিংহের খ্যাতনামা আইনজীবীগণ এই মোকদ্দমার পক্ষ সমর্থন করেন। ব্যারিস্টার কে.সি.নাগ, এডভোকেট বাবু সারদাচরণ ঘোষ (রায়বাহাদুর), খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, মৌলবি আব্দুল খালেক ও রায়বাহাদুর ক্ষিতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ আইনজীবী এই মোকদ্দমার শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। কলকাতার দেওবন্দ মাদরাসা থেকে আল্লামা মোহাম্মদ

www.pathagar.com

সাহেবকে ধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। এই মোকদ্দমার শুনানি শোনার জন্য কোর্টে প্রচুর লোকের সমাগম হতো। অবশ্য পরে এই মোকদ্দমাটি ডিসমিস হয়ে যায়।

৩. পুথিকার মুন্সী মোহাম্মদ তাহের উদ্দিন জামালপুর জেলাধীন বকশীগঞ্জ উপজেলার নিলক্ষিয়া গ্রামে আনুমানিক ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 'আফতাবে হেদায়েত' নামে একটি পুথি রচনা করেন।

৪. পুথিকার শাহ হামিদ আলী ফকির জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার চারিয়া গ্রামে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 'রোজহাসর' ও 'রাখাল রাজার বিচার' নামে দুটি পুথি রচনা করেন। দুটি পুথিই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রচিত বলে ধারণা করা যায়।

৫. পুথিকার হাজি মীর্জা জাফর আলী জামালপুর জেলাধীন মাদারগঞ্জ উপজেলার সুখনগরী গ্রামে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 'বুরহানে হক' ও 'কৃষক সহায়' নামে দুটি পুথি রচনা করেন। 'কৃষক সহায়' একটি ব্যতিক্রমী বিষয় সম্পর্কিত পুথি। পুথিটিতে কৃষিকাজ সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

তথ্যসূত্র : ১. জামালপুরের গণইতিবৃত্ত, গোলাম মোহাম্মদ; প্রকাশকাল: ১৯৫৪; আমিনা প্রেস জামালপুর

২. ময়মনসিংহের চরিতাভিধান, দরজি আবদুল ওয়াহাব; প্রকাশকাল: ১৯৮৯; জেলা প্রশাসন; ময়মনসিংহ

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

লোকশিল্প সাধারণ মানুষের সৃষ্টিকর্ম। অতি সহজ সরল এ সৃষ্টিকর্ম অমূল্য ঐতিহ্যের স্মারক। নকশা, মটিফ, প্রতীক, রূপকল্প প্রভৃতি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে লোকশিল্প উপস্থাপিত হয়। লোকশিল্প কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়: একটা সুসংহত গ্রামীণ সমাজের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল। লোকশিল্পে লোক-ঐতিহ্যের লক্ষণ থাকতে হয়। বস্তুগত লোকশিল্পের অন্যতম ধারা চারুশিল্প ও কারুশিল্প। এখানে চারুশিল্পের নিদর্শন না থাকলেও কারুশিল্পের নিদর্শন আছে। এগুলোর মধ্যে নকশি কাঁথা, মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, বাঁশের কাজ, হাতপাখা, পাটেরশিকা, মাটিরপুতুল ইত্যাদি। জামালপুর জেলায় বাঁশের কাজ, হাতপাখা, নকশিকাঁথা ও নকশিপাখার জন্য বিখ্যাত। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

১. কাঁসাশিল্প

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা কাঁসাশিল্পের জন্য দেশবিখ্যাত। অতীতে ইসলামপুরের কাঁসাশিল্পের সুখ্যাতি অবিভক্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামপুরে যারা কাঁসাশিল্পের সঙ্গে জড়িত তাদের বংশগত উপাধি কর্মকার। ইসলামপুরের দরিয়াবাদের কর্মকারগণ সকলেই হিন্দু। তবে বিশ শতকের প্রথমদিকে এখানে একঘর মুসলমান কর্মকার ছিল বলে জানা যায়।

ঐতিহ্যবাহী কাঁসাশিল্প

একসময় ইসলামপুরের কর্মকাররা নানা আকৃতি প্রকৃতির কাঁসার থালা, ঘটি, বাটি, গ্লাস, রেকাবী, পানের বাটা, সুরমাদানি, আতরদানি, দীপাধার, ধূপাধার, খাট-পালঙ্কের খুরা, কলসি, জগ, ঘণ্টা, ছুরি-তরবারির বাট ইত্যাদি প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত ছিল। এ প্রসংগে কিংবদন্তি আছে যে, ইসলামপুরি মসৃণ গ্লাসে-থাকা মিষ্টি খাবার জন্য গ্লাসের চারকানি দিয়ে পিঁপড়াও উপরে উঠতে পারে না। সে সময় ইসলামপুরের জগচ্চন্দ্র কর্মকার, শীতল কর্মকার, মথুর কর্মকার, মাখন কর্মকার, শ্রীমন্ত কাঁসারী, রামানন্দ কাঁসারী, শ্যামচরণ কাঁসারী, লালমোহন কর্মকার, মনোমোহন কর্মকার প্রমুখ কাঁসাশিল্পের কলানৈপুন্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

www.pathagar.com

কাঁসাশিল্পের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির অতীত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। একটা সময় ছিল যখন বাংলার ঘরে-ঘরে কাঁসার থালা, গ্লাস, ঘটি, বাটির প্রচলন ছিল। তাছাড়া বাঙালির জীবনে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানে কাঁসাশিল্প সামগ্রীর বহুল ব্যবহার ছিল। বিয়ে, সুন্নতে খৎনা, থেকে শুরু করে সকল আচার-অনুষ্ঠানে উপহার সামগ্রী হিসেবে কাঁসার সামগ্রী বেছে নেয়া হতো। বর্তমানে কাঁসাশিল্প সামগ্রী নানা কারণে আগের মতো আর ব্যবহার হয় না। তবে সনাতন হিন্দু ধর্মবলম্বীরা পূজা-অর্চনা থেকে শুরু করে ধর্মীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজো কাঁসা সামগ্রী ব্যবহার করে থাকে। বলা যায় বর্তমানে তারাই এই শিল্পকে অনেকাংশে টিকিয়ে রেখেছে ।

রাং ও তামার মিশ্রণে কাঁসা হয়। কাঁসা সামগ্রী প্রস্তুত করার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। কাঁসা ধাতু উত্তাপে গলিয়ে মাটি ও মোমের ছাঁচের মাধ্যমে ও পাত পিটিয়ে কারিগররা বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করে থাকে। কাঁসাশিল্প সামগ্রীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক সামগ্রী: যেমন- দেবদেবীর মূর্তি।
খ. গৃহসামগ্রী: যেমন- থালা, গ্লাস, বাটি ইত্যাদি।

ঐতিহ্যবাহী এই কাঁসাশিল্প বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় অনেক কাঁসারু দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়েও অনেক কাঁসারু দেশত্যাগ করে। বর্তমানে ইসলামপুরে ২০/২৫ ঘর কাঁসারু আছে। আর ৭টি কারখানা চালু আছে। অনেকে আধুনিক শিক্ষা লাভ করে পেশা পরিবর্তন করে ফেলেছে। তাছাড়া কাঁসা তৈরির কাঁচামালের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন এটি সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অন্যদিকে বাজারে প্লাস্টিক ও এ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় কাঁসাশিল্প সামগ্রীর ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে। ফলে অনেকেই ভিন্ন পেশায় চলে গেছে।

জানা যায়, ৪৭ সালের দিকেও কাঁসা সামগ্রীর সের ছিল ১০/১২ টাকা। বর্তমানে কাঁসা সামগ্রীর সের ষোলশ টাকা। আগে কাঁসা তৈরির কাঁচামাল আসতো কলকাতা থেকে। এখন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আনা ভাঙ্গাচুরা কাঁসা গলিয়ে নতুন করে বানানো হয়। যারা এখনও এই ধাতবশিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে, তারা কাঁচামাল, পুঁজি ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন। ফলে ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পটি আজ ধ্বংসের পথে।

২. বাঁশ ও কারুশিল্প

বাঁশ দিয়ে নানা কারুকাজ-সম্পন্ন নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করা নতুন কিছু নয়। তবে মাদারগঞ্জে স্থানীয়ভাবে গৃহস্থালি জিনিসপত্র তৈরি হয়, যা অন্য কোনো এলাকায় হয়তো হয়ই না। বাঁশ দিয়ে আগেকার দিনে ঘরের সমস্ত কাঠামো তৈরি করা হতো। নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা যখন অনেক কম ছিল, তখন বাঁশই তাদের ঘর তৈরির একমাত্র। খুঁটি, ধরনা থেকে শুরু করে ঘরের কাঠামো বানানো যাবতীয় কাজ করা হতো বাঁশ দিয়ে। সে সময় ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করা হতো ছন বা গমের খড় বা কাঁশবন--যার স্থানীয় নাম আশশা প্রভৃতি। আর ঘরের চারপাশে বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা হতো পাটখড়ি বাঁশের তৈরি চাটাই।

www.pathagar.com

বাঁশের তৈরি চাটাই, ধারাই, এবং খাঁচা

ঘর তৈরি কাজ ছাড়াও বাঁশ দিয়ে বাড়ির চারপাশে বিশেষ বেড়া নির্মাণ করা হতো, যা বাঁও-বেড়া বা আইঠে বেড়া হিসেবে পরিচিত। এখন অবশ্য মানুষ এমন বেড়া বানানোর ক্ষেত্রে টিন ব্যবহার করে অথবা ইট দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করে। একসময় বাঁশ দিয়ে ঘর বা বেড়া নির্মাণের কাজ করা হলেও বর্তমানে বাঁশের ব্যবহার টিকে আছে স্থানীয়ভাবে তৈরি কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালি-সামগ্রী নির্মাণের ক্ষেত্রে। যেমন— মাদারগঞ্জের মানুষের মধ্যে এখনও টিনের ঘর চৌকেরি ঘর বানানোর প্রবণতা বেশি। এ ঘরগুলোর বিশেষত্ব হলো ওপরে চারটি চালা থাকবে আর পাশে থাকবে টিনের বেড়া। এইবার ঘরের ভেতর থেকে যাতে টিনের চাল না দেখা যায়, সে জন্য ধরনার ওপর দিয়ে বা ধরনার নিচ দিয়ে বাঁশ দিয়ে খুব চমৎকার করে তৈরি আঁড়া দেওয়া হয়। যাতে ভেতর থেকে ওই ঘরের সৌন্দর্য বেড়ে যায় অনেকখানি। সেই আঁড়ার বেড়া বা চাটাইতে নানা রঙের বাহারি নকশা করা হয়, যাতে সেটার চমৎকারিত্ব বেড়ে যায় বহুগুণ। এই আঁড়া যে শুধু টিনের তৈরি ঘরেই ব্যবহার করা হয়, তা নয়। এগুলো ব্যবহার করা হয়–মাদারগঞ্জে পাকাবাড়ি বলতে যা বোঝায়, টিনশেড বিল্ডিংগুলোতেও। মাদারগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় টিনশেড বিল্ডিংকে বলা হয় হাফ-বিল্ডিং। এই হাফ-বিল্ডিংয়ের ভেতরের সৌন্দর্যের জন্যও বাঁশের আঁড়া ব্যবহার করা হয়। এই আঁড়া তৈরির জন্য আছেন বিশেষ কারিগর, যাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় বলা 'নৈলে'।

নৈলেরা বাঁশ দিয়ে আরো অনেক কিছুই তৈরি করে, সেগুলো হাটবাজারের বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁদের বানানো অন্য জিনিসপত্রের মধ্যে বেশির ভাগই গৃহস্থালি কাজের সুবিধার জন্য করা হয়। যেমন— হোছা (ধান, চাল থেকে শুরু করে বা অন্যান্য কৃষিপণ্য আনা-নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়), ডালি (ধান বা ধান-চালজাতীয় পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়), ডোল (বিভিন্ন শস্য, যেমন— ধান, সরিষা, গম প্রভৃতি অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়), খাঁচা (হাঁস-মুরগী ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়), কোলা (সবাই জানে ধান-চালের ভেতরে ধুলোবালি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা হয়), ধারাই বা চাটাই (বিভিন্ন খাদ্যশস্য বাতাসে

www.pathagar.com

ওড়ানোর তুলনামূলক অপরিষ্কার জায়গাতে বিছিয়ে তার ওপর ধান বা গম রেখো ময়লা পরিষ্কার করা হয়), যা অনেক সময় কৃষকেরা চৌকিতে বিছিয়ে তার ওপর তোশক বা অন্য কিছুর বিছিয়ে থাকার জন্য বিছানা তৈরি করা হয়ে থাকে। ক্ষেতে আল দিয়ে গরু নিয়ে যেতে যেতে যাতে সে অন্যের ক্ষেতের ফসল না খেতে পারে, সেজন্য তৈরি ঠোনা, হাঁস-মুরগি পালন করার জন্য খাঁচা, মাছ ধরার জন্য পলো, নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরে তা রাখার জন্য খালৈ, কবুতর পালন করার পিঞ্জিরা, মাঠ থেকে ঘাস সংগ্রহ করে আনার জন্য পাঁচ-চোখে, মাটি কাটার জন্য টুপরি, লাঙল-জোঁয়াল প্রভৃতি। এ ছাড়া হাঁড়ি-পাতিল রাখার জন্য কটা, বই-পুস্তক রাখার বইয়ের শেলফ বানান নৈলেরা। এমনকি তাঁর কাপড় রাখার জন্য আলনা বনিয়েও বিক্রি করে থাকেন। ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধির ফলে এবং বাঁশের তৈরি জিনিসের মতো প্রায় প্রতিটি জিনিসের মতো প্লাস্টিকে পণ্য তৈরি শুরু হওয়ায় মানুষ এখন আর আগের মতো বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করতে চায় না। নিতান্তই অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া মানুষ আর বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করে না। তাই বাপ-দাদার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নৈলে পেশার লোকজন আর এ পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছে না। মাদারগঞ্জের এক সময়কার ঐতিহ্য মৃৎশিল্পের মতোই এ বাঁশ-শিল্পও ধ্বংসের মুখে। অথচ গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে এমনকি পরিবেশবান্ধব এসব পণ্য বাইরে রপ্তানির সুযোগ করে দিয়ে এ পেশার মানুষকে, সর্বোপরি এই শিল্পটাকে বাঁচানোর জন্য দরকার সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ।

প্রবাদে আছে, বটবৃক্ষ বাঁশের তল/শ্যামা নারী ইন্দ্রের জল। চৈত্রের কাঠফাটা রোদ্দুরে বটবৃক্ষের ছাঁয়ায় বসে পথচারির ক্লান্ত দেহমন জুরিয়ে যায়। তেমনি বাঁশবাগানের শীতল বাতাসে ক্লান্তি মুছে যায়। এতো গেল দেহ মনের বিষয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাঁশের ব্যবহার লক্ষণীয়। বাঁশ কারুশিল্পের অন্যতম প্রধান উপকরণ গ্রামাঞ্চলের কৃষি কাজ থেকে শুরু করে, মাছ শিকারের কাজ, নির্মাণ উপকরণ, ঘরের খুঁটি, চাল, আসবাবপত্র, ফুলচাঙ্গি, মাচ্চাঙ্গি, মাঁচা, দর্‌মা, ভেল্‌কি, দেওরি বা বেরা, মই, বান্‌কে, চাটাই ও হস্তশিল্প তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হয়। এমন কি, জনজীবনে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। বকশীগঞ্জে প্রচুর বাঁশ জন্মে। এখানে ২৫টি পরিবার বাঁশের কাজের সাথে জড়িত। এ কারুশিল্পীরা বাঁশের তৈরি শিল্পকর্ম তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বকশীগঞ্জে পেশাদার কারুশিল্পীরা তৈরি করে ডুল, ডালা, খুচি, খাঁচা, কুলা, চালুন, চাটাই বা ধারাই, দরমা ইত্যাদি। মাছ শিকারের জন্য বুরুং, পলু, হেংঙ্গা, খালুই ছাড়াও নানা খেলনা তৈরি করে। এখানকার বাঁশের তৈরি পণ্য সামগ্রী শহরের লোকজনও ব্যবহার করছে। যেমন—রেহাল, মোড়া, কলমদানি, ছাইদানি, ঝুড়ি ও ফুলদানি উল্লেখযোগ্য। বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি দরমার গায়ে ফুল, লতাপাতা, পাখি ইত্যাদি ডিজাইন করা হয়। সৌখিন গেহস্থের ঘরে ধানের মাঁচা সুদৃশ্য দরমা ব্যবহার করা হয়। ঘরের পার্টিশন হিসাবেও দরমার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ঢেঁকি ধান ভানা বা শস্য কোটার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। কাঠ দিয়ে সুন্দর নকশা করে এই অঞ্চলের মানুষ ঢেঁকি বানায়।

www.pathagar.com

বাঁশ ফালি ও বাঁশ দিয়ে তৈরি এক ধরণের মাটা বিশেষ। এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ও পুকুর পাড়ে এবং রাস্তার ধারে বেশি দেখা যায়। এছাড়া টং দোকান বলে ছোট কিছু দোকানকে বুঝায় যেগুলো রাস্তার পাশে অস্থায়ী দোকান হিসেবে ব্যবহার হয়। অত্যন্ত সুন্দর ও কারুকার্য করে গ্রামে মানুষ টং তৈরি করে।

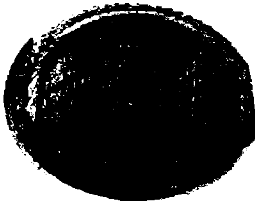

বাঁশ ও কাঠের তৈরি চাক

মাদারগঞ্জের স্থানীয় লোকশিল্প আমাদের দেশের কিছু ঐতিহ্যকে ধারণ করে। যেমন– গ্রাম্য নারীদের তৈরি নকশিকাঁথা। মাদারগঞ্জের নকশিকাঁথা সারা দেশেই পরিচিত। জামালপুর শহর ও শহরের আশপাশের এলাকার নারীরা বর্তমানে নকশিকাঁথা তৈরিকে বাণিজ্যিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। সেই মাদারগঞ্জের নারীরা এ কাজটি করে যাচ্ছেন নীরবে-নিভৃতে। তাঁরা নকশিকাঁথা তৈরিকে জামালপুরের শহরের নারীদের মতো বাণিজ্যিকভাবে বা জীবিকার একমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য না করলেও তাঁদের নকশিকাঁথাও শিল্পমানও বেশ উন্নত। কারো কারো কাজের মান উন্নত হওয়ায় জামালপুরের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের নকশিকাঁথাও দেশ-বিদেশে নিয়মিতই রপ্তানি হচ্ছে। নকশিকাঁথার মতো আরো কিছু হস্তশিল্পের কাজও মাদারগঞ্জে হয়। অনেকে সরকারি সাহায্য নিয়ে ও ব্যাংকঋণ নিয়ে হস্তশিল্পের মতো কাজগুলো করেই বেকারত্ব মোচন করেছেন। নকশিকাঁথা ছাড়াও নকশিকাঁথা-জাতীয় পণ্য যেমন থ্রিপিস, পাঞ্জাবি, টি-শার্ট, মেয়েদের পাঞ্জাবি, বালিশের কভার, শাড়ির পাইর, ওড়না মাথার ব্যান্ড, মানিব্যাগ, ওয়ালম্যাট প্রভৃতি পণ্যসামগ্রীও জামালপুর শহরের পাশাপাশি মাদারগঞ্জেও এখন নিয়মিতভাবেই তৈরি হয়ে সেগুলো বাজারজাত করানো হচ্ছে।

৩. নকশি পাখা

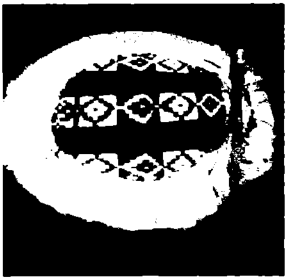

নকশি পাখা

www.pathagar.com

গ্রাম্য নারীর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় লালিত নকশিপাখা। এখানে অবসরে নারীরা মনের মাধুরি মিশিয়ে পাখার গায়ে নানা ডিজাইনে নকশা ও আলপনা চিত্রিত করে। নীল, লাল, হলুদ, সবুজ নানা রঙের কাপড় ও সুতা দিয়ে পাখা তৈরি করা হয়। ছন, বাঁশ, তালপাতা ও খেজুর পাতা দিয়ে হাতপাখা তৈরির প্রচলন আছে। সুতার তৈরি পাখার নাম যেমন-তারাফুল, সজ্খলতা, ছিটাফুল, মালা, লাভচিহ্ন, হাতিঘোড়া, ফুল লতাপাতা ইত্যাদি সুচিতে অংকিত করা হয়। আবার কিছু পাখায় লতাপতার জ্যামিতিক নকশা, মানুষ, পশুপাখি, চাঁদতারা, মাছ, গাছগাছালি চিত্রিত থাকে। কাপড় বা রঙিন সুতার বুননে পাখায় ঝালর লাগানো হয়। এখানকার উৎসব-মেলা ও হাট বাজারে কিছু পেশাদার পাখা শিল্পীদের নকশি পাখা বিক্রি করতে দেখা যায়। সেগুলির কোন কোনটি দৃষ্টিনন্দন।

৪. নকশি শিকা

নকশিশিকা পাট দিয়ে শিকা তৈরি করা হয়। বকশীগঞ্জে দুধরনের শিকার প্রচলন আছে। ১. গৃহসজ্জা শিকা ২. গৃহস্থালির শিকা। গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত রঙিন শিকা সাধারণ মহিলারা পাট দিয়ে তৈরি করে। বিশেষ কৌশলে পাটের চিকন দড়ি পেঁচিয়ে শিকা তৈরি করা হয়। গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত এসব নকশি শিকায় গ্রাম্য নারীর শৈল্পিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পাটের তৈরি শিকা বিভিন্ন রঙ দিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। আগেরকার দিনে দইমুড়ি, চিড়া, নাড়ু, মাটির পাতিল ও কলসিতে রাখা হত। পাটের শিকার ভিতরে মাটির পাতিল বা কলসি ঘরের ধর্নার সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হত। নকশি শিকার প্রচলন এখানে অনেকাংশে কমে গেছে। এখানে গ্রাম্যচাষি ও বেপারি লম্বা পাটের শিকা ব্যবহার করে। এ শিকা সাদামাটা হয়ে থাকে। সাধারণত গ্রামের লোকজন বান্‌কার দুমাথায় শিকা বেঁধে নিয়ে মালামাল বহন করে। এখানে গৃহস্থালি কাজে এধরনের লম্বা শিকার প্রচলন আছে।

৫. নকশি কাঁথা

নকশি কাঁথা

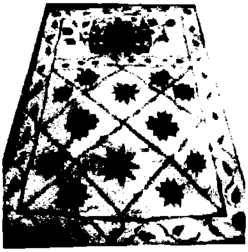

জায়নামাজ

নকশি কাঁথা সুতা ও পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। সাধারণত ফসল উঠে যাওয়ার পরে গ্রামীণ নারী সমাজ কাঁথা সেলাই করে। আমাদের এলাকায় ব্যবহারের দিক থেকে কাঁথার বিভিন্ন নাম আছে। যেমন- লেপকাঁথা, সুজনিকাঁথা, শিশুরকাঁথা,

www.pathagar.com

জায়নামাজ, দস্তরখানা, পানদানি ইত্যাদি। নিজের বা প্রিয়জনের ব্যবহারের জন্য কাঁথা তৈরি করা হয়। এখানকার কাঁথার জমিনে চিত্রিত দেখা যায়-ফুলপাখি, লতাপাতা, গাছ, মাছ, চাঁদতারা, পান ইতাদি। নকশি কাঁথা নারী হৃদয়ের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম বিরহের নান্দনিক শিল্পকর্ম বলা যায়। কারণ স্নেহ মমতাময়ী নারীর মনের ছাপ প্রতিটি কাঁথার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠে। ছোট বেলায় দেখেছি বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এলে দস্তরখানা বিছেয়ে খাবার পরিবেশন করা হত।

মক্কা মদিনা আঁকা জায়নামাজ এখন আর চোখে পড়ে না। দাদি নানীর নকশি পানদানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোরান শরিফ ও আয়না চিরুনী রাখার জন্য এক ধরনের নকশি কাঁথার ব্যবহার দেখেছি। এখানে পালকি ও সোয়ারিতে নকশি কাঁথার প্রচলন ছিল। একটি কাঁথা সেলাই করতে গ্রাম্য মহিলাদের অনেক দিন লেগে যায়। এখানে আশির দশকেও বিছানায় নকশি কাঁথার প্রচলন ছিল। এখানে গ্রাম্য মেয়েদের বিয়ে শাদিতে এখনো কাঁথা দেওয়ার প্রচলন আছে।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

জামালপুর জেলার মানুষের পরিহিতি পোশাক-আশাকের সঙ্গে অন্য জেলার মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে তেমন কোনো পার্থক্য বা বৈচিত্র্য নেই। এখানে বাসা-বাড়িতে থাকা অবস্থায় সব শ্রেণির মানুষ প্রায় একই ধরনের পোশাক পরে থাকে। পুরুষেরা সাধারণত বাড়িতে থাকা অবস্থায় লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে আর বাইরে বের হলে ভিন্ন পোশাক পরে। যেমন— একজন কৃষক যদি হাট-বাজারে যান, তবে বেশির ভাগ সময় তাঁর পোশাক হয় লুঙ্গি-পাঞ্জাবি গলায় একটা গামছা। একজন শিক্ষক যদি বাজারে যান, সচরাচর তাঁর পরেন লুঙ্গি-শার্ট বা শার্ট-প্যান্ট। আর স্কুল-কলেজ বা অন্যান্য অফিসে কর্মরত ব্যক্তিরা সচরাচর শার্ট-প্যান্ট পরেই অফিস করে থাকেন। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেলে পোশাকে-আশাকে আরেকটু বাড়তি বৈচিত্র্য যুক্ত হয়। তার মানে হলো এখানকার লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। বয়স্করা সাধারণত পাঞ্জাবি পরে থাকে। আর নারীদের পোশাকে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। নারীরা ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই শাড়ি পরে থাকে। তবে তরুণীরা বিয়ের আগ পর্যন্ত সচরাচর সালোয়ার কামিজই পরে থাকে। শীত মৌসুমে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো মাদারগঞ্জের নারীপুরুষ-শিশু-তরুণ-তরুণী-বৃদ্ধ-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে আসে বৈচিত্র্য। তবে সার্বিকভাবে এখানে শিক্ষিত-চাকরিজীবী মানুষের মধ্যেও নিজেদের আধুনিক হিসেবে প্রকাশ করতে স্যুট-টাইয়ের ব্যবহার অনেক কম। তাঁরা সাধারণত শার্ট-প্যান্টের মধ্যে নিজেদের আভিজাত্য প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

আর রাখালদের কথা বলি, তবে বলতে হয় যে তারা গরু চড়াতে গেলে লুঙ্গি পরে খালি গা আর ঘাড়ে একটা গামছা আবশ্যিক হিসেবে নিয়ে যায়। যেসব কৃষক গরু আর লাঙল দিয়ে জমি চাষ করেন, তাঁরাও বেশির ভাগ সময় লুঙ্গি পরে খালি গায়ে গলায় একটা গামছা আবশ্যিকরূপে নিয়েই চাষবাসের কাজ করে থাকেন। আর মাথায় বাঁশের তৈরি একধরনের 'মাথাল' দিয়ে তাঁরা রোদ-বৃষ্টির তীব্রতা মোকাবিলা করেন। এখন আর তেমন মাথালের ব্যবহার নেই। কালেভদ্রেও চোখে পড়ে না।

এই অঞ্চলের জনগণ সহজ সরল জীবন যাপন করে। পোশাকের কোন বাহুল্য নেই। জানা যায়, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সকল হিন্দু এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান ধুতি ব্যববহার করত। পুরুষরা ধুতি ও মহিলারা শাড়ি ব্যবহার করত। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান পায়জামা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি ব্যবহার করত। বর্তমানে মুসলমানরা লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট, ফতুয়া ও গেঞ্জি ব্যবহার করে। কিছু সংখ্যক হিন্দু পুরুষ ধুতি ব্যবহার করলেও অধিকাংশই লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট, ফতুয়া ও গেঞ্জি ব্যবহার করে। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা শাড়ির পাশাপাশি সালোয়ার কামিজ ও ম্যাক্সি

www.pathagar.com

ব্যবহার করে থাকে। ইদানিং কিছু সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের নানা রঙের বোরখা ব্যবহার করতে দেখা যায়। ঈদ উৎসবে মুসলমানদের বাহারি পাঞ্জাবি ও টুপি ব্যবহার লক্ষণীয়। শীতকালে গরম পোশাক যেমন-মাফলার, উলের টুপি, জাম্পার, সোয়েটার, জ্যাকেট ও চাদর ব্যবহার করে হিন্দু মুসলিম সবাই। তবে মেয়েরা চিকন মাফলার, সোয়েটার ও চাদর ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ করে রঙিন চাদরই মেয়েদের বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক কোর্টপ্যান্ট, ব্ল্যাজার ও সেরওয়ানি ব্যবহার করে। সত্যি কথা বলতে কী, পোশাক শুধু শরীর ঢাকে না; শৈল্পিক ও মার্জিত পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

যমুনা ব্রহ্মপুত্র বিধৌত উর্বর পলি মাটির এই অঞ্চলের মানুষ খুবই সহজ সরল। গ্রামে গ্রামে কবিগান, জারি, সারি, পালাগান, নাটক, যাত্রাপালা ইত্যাদি ছিল এ অঞ্চলের মানুষের চিত্তবিনোদনের প্রধান উপকরণ। ইসলামপুরের ঘাটুগান, মাদারগঞ্জের পালাগান, বকশীগঞ্জের জারি, মেলান্দহের কবিগান জামালপুর অঞ্চলসহ সারাদেশে সমাদৃত ছিল।

ক. মাজারের গান

মাজার শরিফে যে সমস্ত গান গাওয়া হয় সেগুলিই মাজারের গান। সাধারণত মাজারে পির মুর্শিদ আশেকান ভক্তরা শরিয়তি, মুর্শিদি, মারফতিসহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গান পরিবেশন করে। এখানে মাজারে আল্লাহ রসুলের পাশাপাশি পির মুর্শিদের গুণ-কীর্তনের কথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সাধারণত গানগুলো পির মুর্শিদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। পিরবাদ চার তরিকায় বিভক্ত– চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া। ভক্ত আশেকানরা পির মুর্শিদকে ভব নদীর কাণ্ডারি হিসেবে বিশ্বাস করে। বকশীগঞ্জ উপজেলার ঘাসিরপাড়ায় শহিদ খাজার মাজারে রজব মাসের ৬ই ও ১২ই তারিখে উরস হয়। এখানে গান গাইবার সময় একতালা ঢাক ঢোল বাজানো হয়। সাধুরপাড়া মুসলিমনগর মাজারে ২৫শে চৈত্র ও ১৮ই ফাল্গুন মাসে উরস অনুষ্ঠিত হয়। এখানে গান পরিবেশনায় একতারা, খমক, ডুগি, জুরি, দফ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ দুটি মাজারের উরসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আশেকান ভক্তরা আসে। তাছাড়া স্থানীয় ভক্ত প্রেমিক তো রয়েছেই। নিচে বকশীগঞ্জ উপজেলায় প্রচলিত মাজারের গান দেওয়া হলো।

খাজা বশিরের গান

১.

দয়া কর দয়া কর দয়াল বাবা জানরে ॥
তোমার দয়ায় হবে দয়াল জগত রৌশনরে ॥
তুমি আজমেরি দয়াভারি জাহাজ পাঠাওরে ॥
বুজুর্গ ব্যক্তির গিবত গাই পাপ লই মাথেরে॥
নিজের পাপ দেখতে বুঝি চক্ষু হয় কানারে ॥
অন্যের পাপ প্রকাশ করি গলায় দেই টানারে ॥
দয়া করে এই জগত উদ্ধার করিয়া নেওরে ॥
তোমার দয়া বিনে উপায় নাহি হবেরে ॥

www.pathagar.com

২.

এই ভবেতে প্রেম সাগরে ফুল দেখিল কে ?
ফুল দেখিবার ইচ্ছে হলে যাও আজমিরে ॥
রাস্তার ধারে ফুল দেখিয়া গন্ধ যদি পায়
টান দিয়ে তুলে তারে পকেটে উঠায়॥
আজমিরির ফুল দেখিলে কান্দে কান্দে চাও
বুকে মিশায়ে তারে, মুখে চুমা দিয়ে তারে প্রাণে রাইখা দাও ॥
আজমিরির ন্যায় দয়াল নাই গো সংসারে ॥
দুনিয়ার পচা গলা যত, যদি ফেল সাগরে
তবুও সাগর জল নাপাক নাহি হবেরে ॥
যত গোনাগার দেনাদার আরো যত বিমারি আছে জগতে
ভক্তিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে যাও আজমিরে
সাগরের জলের ন্যায় হয়ে আশা পূর্ণ হবেরে ॥

৩.

ঢোল তোর নাম রাখিল কে ! কে বাজাইলরে
কাঠের চাড়া-চামের ছাউনি ভাবের টুনি ॥
থাপড় দিলে প্রাণটি শীতল হইয়া যায়রে
বাজনা বাজায় কে ! এক বাজাবে খাজা বশির
আর বাজাবে কে ॥
কোথা থেকে আইলিরে বাজনা কোথায় তোর ঘর
তোর শব্দে খাজা প্রেমিক হয়রে পাগল
কেমন করে আইলিরে বাজনা খাজা বশিরের ঘরে
তোরে দিয়া খাজা বশির জগত উদ্ধার করেরে ॥
বাজনা বাজায় কে ! এক বাজাবে খাজা বশির
আর বাজাবে কে ॥
একটি গাছের চারটি ফুল, কোন ফুলেতে কে আছেরে
কোন ফুলেতে হযরত নবি, নূর নিশান উড়াইলোরে ।
কোন ফুলেতে আউলিয়ার গান
কোন ফুলেতে নবিজির কালাম
কোন ফুলেতে ইমামের বাজনা বাজে মধুর সুরেরে
হায়রে বাজনা কে বাজাইলোরে
এক বাজাইলো খাজা বশির আর বাজাইলো কে ॥

৪.

আহা আমার মনের বেদনা, তুমি বিনে অন্যে জানে না ॥
আমি কি রূপেতে, কি ভাবেতে
কি করিব উপায় দেখি না ॥

www.pathagar.com

আমি দিবানিশি কি ভাবিব কি কহিব করি জপনা
কেন্দে কেন্দে ডাকি আমি তুমি দয়া করে কেন শোন না ॥
কে দিল এই ভাবনা, কে দিল এই যাতনা
আমি কিছু জানি না ॥
যে জানে মনের বেদনা সে দয়া না করিলে
অন্যে করবে না ॥

বাউল লালমিয়ার গান

১.

তোরা বল গো সখিগণ
আর কি মানুষ আসবে ভবে নবিজির মতোন ॥

ও সখি গো তোরা মানুষ ধর, মানুষ ভজ মানুষ গুরুজন
মানুষের পায়ে ভক্তি দিলে মিলবে গুরুজন
আয়াত সুরা তজবির মালা যতো জপ মন
মানুষ করে মানুষের সেবা আর সব অকারণ ॥

ও সখি গো ঐ মানুষের চরণেতে যে করলো ভজন
লোহা যেমন হয় গো স্বর্ণ পেয়ে পরশের বদন
তেমনি পাপী হয় গো ছফি পেয়ে গুণির গুণ
ছহবতে পাইতে পারে নূরের সিংহাসন ॥

ও সখি গো কেউ যদি এই জগতে আসে গো কখন
মেলে যদি তার হস্তপদ, মিলবে না নয়ন
লালমিয়া কয় আমজাদ তুমি দিও চরণ ধুল
তোমার মাঝে পাইলাম আমি রাসূলের গুণ ॥

২.

মুর্শিদের দরবারে চল মন
মুর্শিদ আমার জিন্দা কাবা
হাজারও কাবার সমান ॥
কুল্লেশাহিন কুদরত উল্লাহ
সেই কাবাতে বাইতুল্লাহ
বাহিরে মারিয়া তালা
খেলছে খেলা প্রাণভুবন ॥

পিরের রওজা করলে তওয়াব
পাবে তুমি হাজার সওয়াব
সঙ্গে সঙ্গে পাবে জওয়াব
সই হয়েছে যাহার মন ॥

www.pathagar.com

পিরের পায়ে চুমা দিলে
মাফ হবে তোর পিছের গোনাহ
হেজরাতুল আসুয়া যায় না
ভক্তি কর দুই চরণ ॥

৩.

রহমানির রাহিম গো তোমার নাম
আমি অপরাধী রহমানির রাহিম গো তোমার নাম ॥
করো না সাবানের গোলা রহমতের এই দরিয়া,
ধুইলে ঝংকার হয় পরিষ্কার পাপ কাম যায় মুছিয়া।
আর কতকাল রাখবে সুখে আবার যদি হয় বদনাম ॥

তোমার হাতে গড়া তরি দাঁড় বেটা সব দাঁড়ি মাঝি,
কেউ তালে আজ কেউ বেতালে কেউ রাজি কেউ বেরাজি।
সকল কাজে হারাইয়া পুঁজি রইল না এক আনার দাম ॥

সুপথে চালাও গো তরি সুপথে আমায় করাও গো কাম
সর্বকাজের কাজি গো দয়াল তুমি মনিব আমি গোলাম।
লাল পাগলের এই মিনতি তোমার কাছে করে গেলাম ॥

ডাক্তার নাসিরের গান

১.

নারী গাছে প্রেমের দেশে
কী চমৎকার ফুল ফুইটাছে
ডাল ছাড়া ফুল ঝুলিতেছে
আচানক বেশে ॥

ঐ ফুলেতে নাই গো বোঁটা
রস পড়ে তিন ফোটা
তাঁতে হরফ যায় গো লেখা
ঐ কোরানে আছে ॥

নারীর ফুল সামান্য নয়
সোনার একটা মহর হয়।
তাঁর ভিতরে স্বয়ং আল্লাহ
যায় আর আসে ॥
সেই ফুলেতে দুইটি ছেফত
শরিয়তের মধ্যে মারফত
আলেমরা তার জানল না ভেদ
কী জবাব দেবে হাশরে ॥

www.pathagar.com

যার আছে মদন জ্বালা
সে যাইওনা ফুলতলা
মারিলে সিংগী গালা
মরিবে বিষে ॥

২

আমারে কেউ চিনতে গেল
সোজা রাস্তা হয় যে বাঁকা
বয়সে খুদ খোদার বড়
নামটি তাহার নিচে লেখা ॥

একক দশক শতক হাজার
ঐ চুরাশি লাখের চান্দের বাজার
সব ঘরেতে রয় দোকানদার
আমি শুধু রই একেলা ॥

মুন্সি আর মৌলানা কাজি
আমি সবার নায়ের মাঝি
অন্ত না পায় হাদিস ফেকাহ ॥

সেই নামেরই সন্ধান করি
কত মানুষ জংগলবাসী
ওরে দিয়েছে কেউ প্রেমের ফাঁসি
বসত করে কেউ গাছতলা ॥

হামজা মিয়ার গান

১.

ধরি তোমার পায় সজনী ধরি তোমার পায়
চরণ তলে ছায়া দিয়ে রাখো না আমায় পায় সজনী ॥
কিবা তোমার ঠোঁটের বাহার যেন জবাময় সজনী ॥
কি জিনিসে তৈয়ারি তুমি বুঝা নাহি যায় সজনী ॥
কিবা খুশবু আছে তোমার মেছ্ক অম্বরময় সজনী ॥
এয়াকুতের দুখান জুতা আছে তোমার পায় সজনী ॥
জমরূদের কাপড়খানি আছে তোমার গায় সজনী ॥
চক্ষুখুলি কথা বলি বাঁচাও আমায় সজনী ॥
নতুন প্রেমের বাহার তুমি দেখতে শোভাময় সজনী ॥
আউলাইয়া মাথার কেশ দেখাও আমায় সজনী ॥
কিবা রূপের বাহার তোমার যেন শোভাময় সজনী ॥
তোমার সঙ্গে জীবন আমার এখন বুঝি যায় সজনী ॥

www.pathagar.com

জীবন ভর রাখবো তোমায় আমার কলিজায় সজনী ॥
হাত দুইখানা তোমার ফিরাও আমার গায় সজনী ॥
ঝলকিয়া উঠে রূপ চন্দ্রময় সজনী ॥
প্রেম ভিক্ষা দিয়া তুমি বাঁচাও আমায় সজনী ॥

২.

কুদরেতেরি শান গো বাবার কুদরেতেরি শান
ডাক ছাড়িলে দয়া করি হয় আগুয়ান ॥
যার দয়ায় মজিয়াছে তামাম জাহান
নামের গুণে জ্বলে বাতি চান্দের সমান ॥
কতজনে তার প্রেমে হয়েছে উচাটন
তুমি কেন ওরে মন আছো অচেতন ॥
এই ভবেতে তুমি বাবা প্রেমের মহাজন
হিন্দু মুসলমান দিয়া নাহি প্রয়োজন ॥
যেমন নাম তেমন কাম ভাবিয়া হয়রান,
সকলের পরে বাবা আছেন মেহেরবান ॥
ভাবিলে না পাবে তুমি প্রেমের মহাজন
প্রাণের বশিরের কাছে আছে খাজার রতন ॥

মুকুল শেখের গান

১.

আমি কী যে এলাম কী যে হইলাম
আরো কী যে হই ওগো প্রাণো সই
এখন আমি আমার কথা কই ॥

ছিলাম যখন শিশুবেলা
খাইলাম কত দুধকলা
আমার সময় গেল খেলাধুলা
পিছের কথা ভাবলাম কই ॥

এর পরেতে যৌবন পেলাম
রং তামাশায় মেতে রইলাম
আমি লাভের আশায় ভাইবা দেখি
লোকসান আমি খাইলাম সই ॥

এর পরেতে বুড়া হইলাম
মরণ ফাঁদে পড়ে গেলাম
অধম মুকুল ভেবে বলে
দয়াল বিনে উপায় নাই
এখন আমি আমার কথা কই ॥

www.pathagar.com

২.

গরিব আমায় করছে মওলা
তাতে আমার দুঃখ নাই
নবিজির আদর্শ মতে
চলতে যেন পাই ॥

গরিব হলেন দ্বিনের নবি
তাঁর ভিতরে সবুর খুবই
উনি হলেন নূরের নবি
দলিলেতে শোনতে পাই ॥

গরিব হলেন আবু বক্কর
পরলেন উনি চটের কাপড়
যাহা আমি শোনতে পাই ॥

গরিব মওলার অতি প্রিয়
তুমি গরিবের মত হয়ো
কামেল পিরের চরণ ধরো
মুর্শিদ রূপে বিরাজ সাঁই ॥

অধম মুকুল ভেবে বলে
আমার দয়ালেরি দয়া হলে
আমার সেই নিদানকালে
মুর্শিদ পাশে থাইকো তাই ॥

খ. মর্সিয়া
মেলান্দহ উপজেলার মর্সিয়া (মহররম বিষয়ক)

১.

হাই আলে লাখ সালাম
দুইঅং সালাম মুহাম্মদ
সৈয়দ সালাম আসমান জমিন
তিনং সালাম পাইল যতন

চার কিতাব সালাম মেলা
সালাম হয় হযরত ইমাম
মক্কা মদিনা সালাম
যেইখানে আল্লাজির বাইরম ।

www.pathagar.com

২.

ঐ আহারে মহররমের চাঁন
তুই কেনে উদয় হইলি (২)
একবার হইয়া উদয়
ডুবাইছস নবির পুরি।
হইও না হইও না উদয়
ওরে চান নিষেধ করি
তরে দেখিলে মায়ের
ঝুরে দুই আংখির পানি। (২)

৩.

বাগিচাতে ফুলের শোভা
রাতের শোভা চন্দনে। (২)
ঘরেতে প্রদীপের শোভা
নারীর শোভা সোয়ামী।

দুনিয়াতে ভাইয়ের শোভা
পুত্রের শোভা জননী।
দিয়া ধন কারিয়া নইল্যা
হায় গো আল্লা আপনি। (২)

৪.

যখন ইমামের জহর পিলাইল সরেবান
কলিজা ফাটিয়া লহু ভূমে পইল একধার। (২)

একধার পানির নাগিয়া
নিকলিয়া যায়রে জান
আংখি ঠারিয়া চায় গো পানি
না সরে জবান। (২)

এমন নিদানের কালে
হায় হোসেন দরদের ভাই
মওতকালে কর দেখা ভাই
দুনিয়া ছাড়িয়া যাই। (২)

৫.

কলমা পড় কলমা পড় ভাইরে ইমান (২)
কলমা পড়লে তবে হবা মুসলমান (২)
যেই না জানে নবির কলমা পড়িতে
তার জাগা রাইখাছে আল্লা দোজখে। (২)

www.pathagar.com

হায় গো আল্লা নিদারুণ খবর আইল
ঘোড়ার পিঠে জিন পালঙ তৈয়ার হইল। (২)
এতই নিষেধ করলাম কাসেম না রইল
যা ছিল নসিবের লেখা তাই হইল। (২)

৬.

কোলে আয় গো ইমাম হোসেন
আর তো তোমার ভরসা নাই
যেই দেশেতে নাইরে এজিদ
সেই দেশেতে চলিয়া যাই। (২)

আজগা স্বপনে দেইখাছি
কারবালায় আমার মরণ
কালি কলমে লেখছে আল্লা
যা লেইখাছে নিরঞ্জন। (২)

ওঠ হোসেন পড় নমাজ
অক্ত যায় গো চলিয়া
খোদার নমাজ কায়জা করিয়া
কেন রইলা বেতাল হইয়ে। (২)

মক্কার যত আউলিয়াগণ
সবাই রইল চাহিয়ে
তুমি গেলে পড়ব নমাজ
আবতলাতে বসিয়ে। (২)

৭.

উইর‍্যাল দিল জোড় কবুতর
আসমানের উপরে
হোসেনজিকে না পাইয়া
জমিনে আইল নামিয়ে। (২)

কাইন্দে কাইন্দে কয় কবুতর
ঐ আল্লা রসুলের ঠাঁই
আমার মায়ের কেহ নাই গো
হোসেনজির তাল্লাসে যাই। (২)

৮.

ডালে ডালে ফিরে পাখি
জমিনে আহার করে

www.pathagar.com

সেই পাখি মারিতে কাদের
ফান নইছ গুটায়ে । (২)
সেই ফান্দে বাজিয়া পাখি
বলছে আল্লা হায়রে হায় ।
ছাইর‍্যা দেও মোর হস্তের বান্দন
সাথি মোর ছাড়িয়্যা যায় ।
যাইয়্যা খবর দিও
সেথায় আমার বাবাজান । (২)

সেই ফান্দে বাজিয়্যা পাখি
বলছে আল্লা হায়রে হায়
হায় গো আমার সঙ্গের সাথি
ছাড়িয়্যা যাইও না ফান ।
যাইয়্যা খবর দিও সেথায়
আমার বাবাজান । (২)

৯.

আওলিয়্যা মাতার কেশ গো
কান্দে বিবি সখিন্যা । (২)
ঐ পালংকেতে ছিলা পতি
এখন কেনে দেখিন্যা । (২)
খালি পালং দেইখ্যা হায়রে
বিবি করে করুইন্যা । (২)
ছাইর‍্যা গেছে প্রাণের পতি
আন্দার কইর‍্যা মদিন্যা । (২)

আওলিয়্যা মাতার কেশ গো
কান্দে বিবি সখিন্যা । (২)
এইখানেতে ছিলা পতি
এখন কেনে দেখিন্যা । (২)

১০.

ওরে ঘোড়া তোর বদনে
কাইল দেইখাছি খুনের চিন । (২)
কোথায়ে ছাপায়ে আইলা
ওরে ঘোড়া হোসেনজির । (২)
ঘোড়ায় কাইন্দ্যা বলছে মাও গো
শোন ত্বরা হোসেনজির খবর

www.pathagar.com

কালক্যা হইয়াছে শহিদ
বেলা তহন সোয়াপর। (২)

ঘোড়ায় কাইন্দ্যা বলছে মাও গো
খোদার দোস্ত পয়গাম্বর
হোসেন যখন হইছে শহিদ
বেলা তখন সোয়াপর। (২)

১১.

কান্দেরে মুসলিমের বাল্লগ
এই শহর কুফের সাজে
নিকলিতে নাইরে পর্ত
দুন ভাই বইসে কান্দে।
তারপরজ হারিজা পাপী
দুন ভাইকে বান্দিল।
বান্দনের চোটে তনু
জার জার হইল।

বান্দিলে কী পাথারে
পাপী নইয়া চল বাজারে।
বাজারে বেচিলেরে পাপী
বহুত ধন পাইবে।
তারপরজ হারিজা পাপী
দুন ভাইকে কাটিল।
বাটায়ে ভরিয়্যা শিরগো
এজিদের কুফায় হুজুর।

নেহ নেহ নেওহ শিরগো
আইনাছি তোমার হুজুর।
তারপরজ হারিজা পাপী
বাটার খুঞ্জি খুলিল
দেখিয়া দুই বাল্লগের রূপ গো
শিরে পাথর মারিল।

১২.

মাইনসের নামে খুদবা জারি
কোরানেতে শোনতে পারি।
মাইনসের নামে খুদবা জারি (২)
না হবে কখন।

www.pathagar.com

বাদশা রোজা কর নমাজ পড়
হরদম বাবারে।

১৩.

কান্দে ময়না পাখি জার জার
শোকে জান আর বাঁচে না।
বার বরুজ চৌদ্দ কামান
জানে বান্দা মুসলমান।
আন্দার হইল খোদার দুনিয়া
হইয়া আইল নিরসন।
হোসেনজীর বদলে কাফের
ময়নার শির কেন কাট না। (২)

১৪.

যেদিন আইল মোর বিয়ের জরনি
মসজিদে কোরান পড়ে
মসজিদের চুইড়া ভাঙিয়া
পাষাণেতে হইল গুইর‍্যা। (২)

বিয়ের রাত মোর হইল আরি
জাইন্যা পাইলাম কোরানে
কিবা নাজে কব কতা
বাপ মায়ের সাক্ষাতে। (২)

১৫.

শুইনাছি মা হজ কিতাবে
এই সুরুজের বারমুখ
বারমুখ রবির তাপে
তনু যাবে জ্বলিয়া।
তখনি কান্দিব্যান নবি
উম্মত উম্মত বলিয়া। (২)
শুইনাছি মা হজ কিতাবে
এই সুরুজের বারমুখ
বারমুখ রবির তাপে
তনু যাবে জ্বলিয়া ।

আহারে নবিজির উম্মত
এহি দ্বারে আদালত।
বন হইল দরিয়ার হাওয়া
বাদাম নাহি খাটে আর

www.pathagar.com

ভাঙিল জাহাজের মস্তুল
ছিড়িল গুইন্যার তার। (২)

১৬

আজরইলে বানাইছে পিঞ্জিরা
জান পয়দা করছেন খোদায়। (২)

বহুত যতনে ময়না
পিঞ্জিরা করছেন কবুল।
সেই পিঞ্জিরায় বইসে ময়না
নাম জপে আল্লাহ রসুল।

১৭.

আরসের কাংকইন্যা ধরিয়্যা
ফাতেমা মাতাম করে। (২)
কী গুইন্যা কইর‍্যাছি আমরা
ঐ আল্লাজির দরবারে। (২)
খালি পৃষ্ঠে লহুধারা
আল্লা বুঝি বাম হইলো
আজ বুঝি মওতের নিশানা
কারবালায় ঘিরা আইল। (২)

১৮.

ঘোড়ার ন্যাগাম হস্তে ধরিয়্যা
কান্দে বিবি সকিন্যা। (২)
কি হইলো কোথায় রইল
পৃষ্ঠের সোয়ার কেন দিখিন্যা। (২)
খালি পৃষ্ঠে লহু ধারা
আল্লা বুঝি বাম হইলো
আজ বুঝি মওতের নিশানা
মদিনাতে ফিরে আইলো। (২)

১৯.

ওরে ঘোড়া বুদ্ধি থোড়া
আয়রে কাছে বলেদে। (২)
কোথায় ছাপায়ে আইল্যা
ওরে ঘোড়া হোসেনকে? (২)
ঘোড়ায় কাইন্দ্যা বলে মাওগো
শোন তরা হোসেনজির

www.pathagar.com

কালকে হইয়াছে শহিদ
কারবালায় পানির কারণ। (২)

ওরে ঘোড়া বুদ্ধি খোড়া
পশুর জীবন তোর। (২)
হোসেন যখন হইছে শহিদ
বেলা তখন কতেকপর। (২)

ঘোড়ায়ে কাইন্দ্যা বলছে মাও গো
খোদার দোস্ত পেগাম্বর
হোসেন যখন হইছে শহিদ
বেলা তখন সোয়াপর। (২)

২০.

খাকি বলে মা ফয়তেমা
এখন আইসা করলা কী ?
যখন তোমায় মা ডাইকাছি
তখন কোথায় ছিলা তুমি ? (২)

আমার কোলে বইসা কাফের
গলায় খঞ্জর দেয় তুলে।
শির জুদা হইয়া হোসেন
তবু ডাকছে মা বইল্যা। (২)

২১.

কোলে লইয়া বলছে খাকি
আমার ভরসা কইরো না
আজ হতে সপিলাম যাদুরে
খাকি হবে তোমার মা । (২)
কোলে নিয়ে বলছে খাকি
ও যাদু তুমি কাইন্দো না।
আপন মা ছাড়িয়া গেলেরে
আমি তো ছাড়িব না।
কোলে লইয়া বলছে খাকি
ও যাদু তুমি কাইন্দো না
আপন মা ছাড়িয়া গেলেরে
আমি তোমায় ছাড়ব না।

২২.

উঠ হোসেন পড় নমাজ
উক্ত যায় গো বসিয়া। (২)

www.pathagar.com

আল্লার নমাজ কায়জা করিয়্যা
কেন রইলা বেতাল হইয়্যা। (২)
মক্কার যত আউলিয়াগণ
সবাই রইল চাহিয়্যা
তুমি গেলে পড়বে নমাজ
আবতলাতে বসিয়া। (২)

২৩.

ফয়তেমা মাতাম করে
ফুলের বাগের মাঝে। (২)
গুলিস্তা ফেরেশতা আসিয়্যা
ছায়া ধরে মায়ের শিরে। (২)
কেনরে পবন করলি বাতাস
ফয়তেমা কয় কান্দিয়া
ইমাম শোক মায়ের অনল
বাতাসে কি হয় শীতল। (২)

২৪.

আহারে মহররমের চান
তুই কেন উদয় হইলি (২)
একবার হইয়া উদয়
ডুবাইছস নবির পুরি। (২)

হইও না হইও না উদয়
ওরে চান নিষেধ করি
তরে দেখিলে মায়ের
ঝুরে দুই আংখির পানি। (২)

২৫.

যখন ইমামে মাগে পানি
আপনার মায়ের কাছে।
মহল ডুলিয়া মায়ে
মহলেতে নাই পানি।
একধার দেওহো পানি
সাহেব আল্লা নিরঞ্জন
দুধের বাল্লগে কান্দে
হায় আল্লা পানির কারণ।

২৬.

সকিন্যা বলেন গো আল্লা
কেনে রাত মোর পোসাইল। (২)

www.pathagar.com

আমার বিয়ের কলমা
কোন মলনায় পরাইল।
মহর বান্দিব্যার কালে
নিষেধ ক্যানে না দিল। (২)
বিয়ের রাতে হবো আরি
জাইন্যা পাইলাম কোরানে
কিবা নাজে কব কতা
বাপ মায়ের সাক্ষাতে। (২)

২৭.

কান্দে গো সখিন্যা বিবি
ধারা বয় দুই নয়নে। (২)
পালংকেতে ছিল পতি
এখন কেনে দেখিন্যা। (২)
খালি পালং দেইখ্যা বিবি
বিবি করে করুইন্যা
ছাইর‍্যা গেছে প্রাণ পতি
আন্ধার কইর‍্যা মদিনা। (২)

২৮.

কিয়ামতের কালে আল্লা
সুরুজে মুখ ফিরাবে
এহি তো সুরুজের তাপে
তনু যাবেন জ্বলিয়্যা।
তখনি কান্দিব্যান নবি
উম্মত উম্মত বলিয়্যা।
আহা গো নবিজির উম্মত
এহি দ্বারে আদালত।
বন হইল দরিয়ার হাওয়া
বাদাম নাহি খাটে আর।
ভাঙিল জাহাজের মাস্তুল
ছিড়িল গুইন্যার তার। (২)

২৯.

অই হে কাশম চান মহররম
পাইল যতন পরোয়া সালাম। (২)
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
শির জমিন পরোয়া সালাম।

www.pathagar.com

আসমান জমিন বৃক্ষের পবন
চান সভায় পরোয়া সালাম।
কারবালাতে দেখু মামু
গোল হইয়াছে ঐ ইসলাম। (২)

৩০.

জিবরইলে পুছেন তো ছেঠায়াল
শোন গো ইয়া রসুল। (২)
কোন খানে খাকির ছায়া
কোনখানে খাকির লহু।
আল্লাজির কুদরতে আসমান পয়দা
জমিন পয়দা কী অস্তে
কওহে মুমিন সেই খবর
কয়লাখ তারা আসমানে।

৩১.

শহিদের সুময়ে নবি
কোরান লইছেন খুলিয়্যা
দুই নাতির লইয়া নবি
করিতেছে তার বয়ান। (২)
নবির কান্দনে কান্দে
ঐ আল্লাজীর সিংহাসন
আসমান কান্দে জমিন কান্দে
আরো কান্দে পশুগণ।
দুনিয়ার ঝড় বৃষ্টি
দুনিয়াতে রইয়্যা যায়
তাও তো দয়াল নবি
কোন জিনিস চাহিয়া না নেয়।

৩২.

কান্দিয়া ফয়তেমা বলে
শোন ঘোড়া সুমাচার
চল ঘোড়া চল ফোরাত নদী
তথায় আব খাইবার।
হোসেনজির নইয়্যা ঘোড়া
আব দইর‍্যার কিনারে যায়।
ঘোড়াকে দেখিয়া আবগো
অমনি মিলায়ে যায়
ঘোড়া বলছে ওরে পানি
তরে আমি কলব কী

www.pathagar.com

মওতের পেয়ালা বুঝি
পাঠায়েছে এলাহি।

৩৩.

যখন ইমাম ভূমে পইল
শিংগা হারে এজিদপুর
বুকেতে পায়াণ দিয়্যা
যেন ইমাম গোলাপের ফুল।

মুসুরি কাটা মানিক ঝুরে
আরো ঝুরে কেওয়াক্কা ফুল
রণের মাঝে ইমাম নড়ে
যেন ইমাম গোলাপের ফুল।

৩৪.

জয়নাল আবেদীন পড়ছে বন্দি
গরকুফরে এজিদপুরে।
আমায়গরে বাপ গো চাচা
নাই দুনিয়ার মাঝারে।
শুইনাছি আছেন তো চাচা
ঐ আম্বাজ শহরপুরে
হায় গো চাচা মুহম্মদ হানিফ
নেও চাচা উদ্ধার করে। (২)

৩৫.

যাও হে দুলদুল মদিনাতে
জননী মায়ের আগে
ওরে যাইয়্যা কও সখিনারে
আমার জন্যে যেন না কান্দে।

আজ মরণ কাল মরণ কাল,
কারো সঙ্গে কেউ তো যাবে না।
আমার মওতের খবর
মা জননী যেন শুনে না।
মওত কথা শোনলে মাগো
কান্দিবে জননী মা,
সেই দুঃখে আল্লাজির ঘরে
কেউ তো জায়গা পাবা না।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ৩৫ পর্যন্ত, শিল্পী- আ. জলিল প্রামাণিক, বয়স : ৭০, ইন্তাজ, বয়স : ৬৫, ওমর আলী, বয়স : ৭৫, গ্রাম - দেউলাবাড়ি, থানা- মেলান্দহ, জেলা- জামালপুর, সময় : রাত ৮ : ২০, তারিখ : ১০/১২/১১ খ্রি.

www.pathagar.com

৩৬.

সালাম করিতে আইলাম
হযরত নবির কাছে
তার শেষে করিলাম সালাম
যেইখানে ইমাম আছে ।
চার কলেমা চার কলসি
ভরিলাম সবের আগে ।
সালাম দিয়া দিলাম ওযে
যার যার মত নিবেন যে ।

৩৭.

আহারে মহররমের চান
কান্দিয়া সখিনা বলে
কেনে রাত মোর পুসাইল
আমার বিয়ের কলেমা
কোন মলানায় পরাইল ।
কলেমা পড়াবার কালে
কেউ না নিষেধ করিল ।

৩৮.

নাকের বেশর সিথের সিন্দূর
আজ কেনে খইসা পইল !
পরভাতে উঠিয়া কাসম
কহে না সখিনার ঠায়
বিদায় দেও সখিনা বিবি
যাব রণ করিবার ।

এতরাতে কার বা পতি
যায়রে বাসর ছাড়িয়া
শুয়ে কোলে বইস্যা আমার
পরান নেয়রে কাড়িয়া ।

৩৯.

আহারে দুলদুল ঘোড়া
ও ঘোড়া ফির‍্যা যা তুই মদিনা
আমার মওতের খবর
ও ঘোড়া বাবাজনকে কইও না ।
মওত খবর পরে ।
ও ঘোড়া কান্দিবেন জননী

www.pathagar.com

কান্দিলে জননী মাওগো
ও ঘোড়া বেহেশতে জাগা আল্লা দিব না।

আজ মরণ কাল মরণ কাল
কার সনে কেউ যাবে না
কইও মোর সখিনা রে
ও ঘোড়া আমার জন্য যেন কান্দে না।

৪০.

যখনি ইমামের জহর
পিলাইল একবার
কলিজা ফাটিয়া লহু
ভূমে পইল একধার।
এমন নিদানের কালে
ভাই হোসেন দরদের ভাই
মওতকালে কর দেখা ভাই
দুনিয়া ছারিয়্যা যাই।

৪১.

শহিদের সুময়ে নবি
খুলিয়া লইলেন কোরান
দুই নাতিকে লইয়া কোলে
করিলেন তাহার বয়ান।
নবিজির কান্দনে
ঐ আল্লাহর সিংহাসন
আসমান জমিন কান্দে
আরো কান্দে পশুগণ।

৪২.

কান্দে জয়নাল অভাগী গো
হায় আল্লা মালেক সুবান
আমাকে ছারিয়া বাবা
করবলায় করলা মোকাম।
চান্দু দোলে গগণেতে
হইয়া আইল নিবাসন।
নমাজের উক্ত আইল
না আইল বাবা ইমাম।

৪৩.

ঘোড়ার নাগাম হস্তে ধরিয়া
কান্দে বিবি সখিন্যা

www.pathagar.com

কি হইল তোর পিঠের সোয়ার
কোথায় আইলা ঢালিয়া
খালি পিষ্ঠে লৌহের ধারা
আল্লা বুঝি বাম হইল
আজ বুঝি মওতের নিশানা
করবলাতে ঘুইর‍্যা আইল ।

৪৪.

জয়নাল আবেদিন পরছে বন্দি
গর কুফা এজিদপুরে
আমাগরে বাপ গো চাচা
নাই দুনিয়ার মাঝারে ।
সভাতে শুইনাছি চাচা
আম্বাজ শহরে ঘর ।
হায় গো চাচা মোহাম্মদ হানিফ
নেও চাচা উদ্ধার কইলে ।

৪৫.

শোন গো তোরা করবালাতে
আজ কেন ডঙ্কা বাজে । (২)
এমন ডঙ্কা শুনি নাই গো
আসিয়া কারাগারে ।
কয়দভানু বলছে জয়নাল
তেরা নসিব খুইলাছে
আইসাছে তর হানিফ চাচা
দিনের ডঙ্কা বাইযাছে ।

৪৬.

উইর‍্যা যায়রে জোড় কবিতর
আসমানের উপর
হোসেনজির কা হাল দেখিয়া
নাইম্যা আইল জমিনে ।
কাইন্দ্যে কাইন্দে কয় কবুতর
আজ আমার কেহ নাই
ভাইয়ের তল্লাসে যাই ।
ভাইয়ের কতা মর্মব্যথা
ভাইয়ের সমান কেহ নাই ।
আহা খোদা কলজে জুদা
জোড় কেনে ভাঙ্গিলে সাঁই ।

www.pathagar.com

৪৭.

কান্দে জার জার ময়নাপাখি
শোকে জান আর বাঁচে না। (২)
বার বুরুজ চৌদ্দ কামান
জানে বান্দা মুসলমান
আন্দার হইল খোদার দুনিয়া
ঘোর হইল মদিনা।
আন্দার হইয়া আইল
ঐ আল্লার বেহেশতখানা
হোসেনজির বদলে কাফের
ময়নার শির কেন কাট না।

৪৮.

আরসের কাংকইনা ধরিয়া
ফয়তেমা ফইর‍্যাদ করে।
কি গুইন্যা কইরেছি আমরা
হায় আল্লাজির দরবারে।
কে চুরি করিল করিল আমার
সোনার মদিনার চান
একবার মা বল বলরে যাদু
জুড়াইক তোর মায়ের পরান।

৪৯.

ফয়তেমা মাতাম করে
বসিয়্যা ফুলে বাগে
নূরের চান ফেরেশতা আসিয়া
ছায়া ধরে ভাইয়ের গায়
কেনরে পবন করলি বাতাস
ফাতেমার হুজুরে
ইমাম শোক তাপের অনল
বাতাসে কি হয় শীতল ?

৫০.

কিয়ামতের কালে আল্লাহ
সুরুজের দিরাবে মুখ।
এহি তো সুরুজের তাপে
তনু যাবে জলিয়া।
তখনি নবিজি কান্দে উম্মত উম্মত বলিয়া।
শোনে হে নবিজির উম্মত

www.pathagar.com

এহি দ্বারে আদালত
জীবনে বয়সেরকালে
উইজ্যানি ভাইট্যানি টান
বন্‌দ হইল দরিয়ার হাওয়া
বাদাম নাহি ঘাটে আর
ভাঙিল জাহাজের মস্তুল
ছিড়িল গুইনের তার ।

৫১.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
শির জমিন পরোয়া সালাম
কারবালাতে দেখ মানুষ
গোল হইয়াছে ঐ ইসলাম ।
আসমান জমিন বিরিখ বরে
চান সভায় পরোয়া সালাম ।
অই হে কসম চান মহররম
পাইন যতন পরোয়া সালাম ।

তথ্যসূত্র : ৩৬ থেকে ৫১ পর্যন্ত, শিল্পী- সালাম, বয়স : ৭০, ঘুতু, বয়স : ৬৮, সিকান্দর, বয়স : ৮০, গ্রাম : দেউলাবাড়ি নটারকুড়া, থানা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর । তারিখ : ১৩/১২/১১

গ. ধর্মীয় সংগীত

মেলান্দহ উপজেলার ধর্মীয় সংগীত

১.

আল্লা তোমার তরে গড়িয়াছ মোরে
তবে কেন দোষী কর আমারে আল্লা ।

দিয়ে নূরের খণ্ড গড়িয়াছ ভূমণ্ডল
বানাইয়াছ রাজদণ্ড করিতে বিচার ।
স্বর্গে কি নরকে পাঠাইবা মানুষকে
দোষী করবে কাহাকে সবই যে তোমার
তোমার তরে গড়িয়াছ মোরে
তবে কেন দোষী কর আমারে আল্লা ।

মানুষ বানাইয়াছ সবই তো দিয়াছ
তার ভিতরে লুকাইয়াছ জলিল জব্বার
মানুষ দিলে আগুনে তুমি থাকবে কোনখানে
মানুষের কলবেতে আসন তোমার

www.pathagar.com

তোমার তরে গড়িয়াছ মোরে
তবে কেন দোষী কর আমারে আল্লা ।

আমি খাইলে তুমি খাও চলিতে চলাও
বলিতে বলাও হুকুম তোমার
মানুষ সাধনার ধন কর তারে যতন
তবে জিগায় অধম আনোয়ারে ।
তোমার তরে গড়িয়াছ মোরে
তবে কেন দোষী কর আমারে আল্লা ।

ও তুমি খেলিতে খেলা রঙের মেলা
বানাইয়াছ আল্লাহ তামাম সংসার
তোমার তরে গড়িয়াছ মোরে
তবে কেন দোষী কর আমারে আল্লা ।

২.

ওরে জসবা হালে চোখের জল ফেলে
আশেক আর মাশুকের খেলা খেলে কত ঢঙে ।
পাগলের নাচে রঙ্গে রঙ্গেরে
পাগলেরা নাচে রঙ্গে ॥
কোরানে প্রমাণ আছে হেজবাতুল্লা
আল্লার রঙ্গে রঙ মিশাইয়া কর প্রেম খেলা
আরশ ছাড়িয়া আসবে খোদা নামিয়া
রহমতের ফেরেশতারা থাকবে খোদার সঙ্গে
পাগলের নাচে রঙ্গে রঙ্গেরে
পাগলেরা নাচে রঙ্গে ॥

ফাজকুরুনি আজকুরুকুম লেখা আছে কোরানে
ডাকের জবাব দিবেন আল্লা বলেছেন নিজ জবানে ।
অধম আনোয়ারে বলে জেকেরেরই তালে
অধম আনোয়ারে বলে জেকেরেরই তালে
আল্লাহ নামের ধুলা মাখ সর্বঅঙ্গে ।
পাগলের নাচে রঙ্গে রঙ্গেরে
পাগলেরা নাচে রঙ্গে ॥

তথ্যসূত্র : শিল্পী এয়াকুব বয়াতি, গ্রাম : ঝাউগড়া, থানা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর, বয়াতির নান্দিনা বাজারে একটি বিড়ির বিজ্ঞাপন প্রচারকালে গান দুটি সংগৃহীত হয়েছে। সংগ্রহের তারিখ : ০২-০৭-২০১২, স্থান : নান্দিনা বাজার, জামালপুর

www.pathagar.com

ঘ. আওয়াজ

মাদারগঞ্জ উপজেলার আওয়াজ

১.

আল্লা রসুলের নাম আল্লা নিরবধি উঠছে মনে
হক্ক সাহেবের নাম আল্লা নিরবধি উঠছো মনে।
পাগল সাহেবের নাম আল্লা নিরবধি উঠছো মনে।

আল্লা এই না ভবে কি না হবে আমি তাই ভাবি মনে মনে
এই দুনিয়া গায়েব হবে পিঞ্জিরা খাইবো ঘুণে।

আল্লা কলিতে কাগার ডরে ফেচা খোড়লেতে বাসা করে
ময়ুরকে নিন্দা করে যায়রে ফেচা পেখম মেলে।

আল্লা ভাল মানুষ নিন্দে বাঁশে নিন্দে ঝাড়ি
জিনাই পোকা মানিক নিন্দে এই না দুঃখে মরি আমি।

আল্লা পাইলরে কলির কাল কাগার গলায় ফুলের হার
কুইত্তের কানে দিয়ে সোনা বিলাই টিপে তসবি দানা।

আল্লা পাইলরে কলির জ্বালা পুতে ডাকে বাপরে শালা
মায়ে ঝিয়ে চুলোচুলি বেটি ডাকে মায়েরে সতীন।
আল্লা পাইলরে অকালের ঘটা সের হব ট্যাকা ট্যাকা
কাঠা হব বড় বড় জল খাইয়ে পান ভাসব কত।
আল্লা এমন এক জামানা আসবে সবার হাতে জোলা নিবে
বারজাতি এক হইয়া নঙ্গর খানা খাওয়াইবে।

আল্লা আইবো রে পশ্চিমের বান ক্ষেতের খাব পাকা ধান
মানুষের মাথা মাইনসে খাব কলার মুতা যাত্রা করব।

২.

করিম করতা তোমার নাম
আল্লা হক্ক সাহেব তোমার নাম গো
আল্লাজী করিম রহিম।

আল্লা আগে আল্লা আপে খুদ
আপে হয় মোহাম্মদ রসুল
আপে হইল জমিন আসমান
আল্লা হইল ঢাল তলোয়ার গো
আল্লাজী করিম রহিম।

www.pathagar.com

আল্লা তুমি তো আলমের কাজি
নেকির ভাঘে আছ গো রাজি
পাপী বান্দার কী হবে উপায় গো
আল্লাজী করিম রহিম ।
আল্লা তুমি আলমের পানা
আরসে তোমার থানা
নীলঙ্গ সাগরে তোমার ঘর
আল্লা নীলঙ্গ সাগরে তোমার ঘর গো
আল্লাজী করিম রহিম ।

আল্লা তুমি তো আলমের পানা
দুনিয়ায় পাইতাছ গো মায়া
তুমি প্রভু জীবনের জীবন গো
আল্লাজী করিম রহিম ।

আল্লা ছাইয়া নাই কায়া নাই
নাম ধরছ কানাই
খুঁটি নাই খরম রাঙা পাও
আল্লা খুঁটি নাই খরম রাঙা পাও গো
আল্লাজী করিম রহিম ।

আল্লা আংখির উপরে থাক
জীবেকে উদ্ধার কর
জীব হইয়া জীব নিতে চাও
আল্লা জীব হইয়া জীব নিতে চাও গো
আল্লাজী করিম রহিম ।

আল্লা দেহের মদ্দে নিরঞ্জন
যে জনে গইড়াছ তন
আল্লা মুখ দিয়া কইরাছ দেহুর অংশন
আল্লা মুখ দিয়া কইরাছ দেহুর অংশন গো
আল্লাজী করিম রহিম ।

৩.

সিদ্দিক আমলের লীলা দেইখা চমৎকার
কী অপরূপ লীলা হায়রে জগৎ মাঝার ।

শামদেশের পরে আমার আল্লা আছে কাজি
সুন্নি দেশের পরে আমার রসুল হব রাজি ।
খাড়া দরজাল আমলে আসপে ধরাধামে

www.pathagar.com

আজগুবি এক আগুন উইঠ্যা দুনাই মারা যায়।
কী অপরূপ লীলা হায়রে জগৎ মাঝার।

ইয়াদমুনি আসিবে যখন সফরা নূরির সাথে হইবে মিলন।
সাদ্দাতের বেশটি, সলেমানি তকতি
নুহুনবির জাহাজখানা আবার সওয়ার
কী অপরূপ লীলা হায়রে জগৎ মাঝার।

৪.

আল্লা মন গো কোথায় তোমার বাড়িঘর
আল্লা কোথায় তনে দেও পরিচয়।
আল্লা নাহক দরিয়ায় গো ভাসিয়া বেড়াও গো
আল্লা তবুতো না পাইলাম পরিচয় গো ।
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই।

আল্লা মন গো জন্মের উপর গো ফলের বসতি গো
তারি না উপরে কর্পুর ঘর গো
তারি মাঝে কালিয়ার বসতি গো
আল্লা তারে না কেউ তোমরা চিন গো
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই।

আল্লা মন গো জলের উপর গো স্থলের বসতি গো
তারি উপর ঘুরঘুর ভাঙ্গা ঘর।
আল্লা ইন্যা মেঘে গো না উশিল ঘর গো
ও মন সিটানেতে ভিজল ঘরের মাইজেল গো
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই।
আল্লা মন গো খাকির খাম্বা খাকির ঘর
খাকির তৈয়ারি গো
বন্ধন দিছ রগের ওকিপনি আল্লা বেড়িয়া নিয়াছ গো
কামের সাওনি গো
ও মন গঠিয়া কামেলা হইছো বন্দি গো
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই।
আল্লা মন গো কুকাষ্ঠা শিমুলের গাছ
তাহার উপর শতেক ডাল
শতেক ডালে বগিলার বাসা গো আল্লা আহারের কারণে গো

www.pathagar.com

নাইমাছে জমিনে গো
ও মন প্রেমের ফাঁস লাগল বগের গলায় গো
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই ।

আল্লা মন গো উইজানি শাহুদের গোলা
নাইয়ার বাইছা দুই পোলা
দুই ভাইয়ে খিচয় নায়ের গুন
আল্লা গুনদড়ি ছিড়িয়া গো
গোমেন ভরা ভাঙব গো
ও মন কাণ্ডারি হইয়া যাব ধন্ধ গো ।
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই ।

আল্লা মন গো কাঞ্চা বাঁশের ঘর ঘুণে করল জরাজর
ছাইড়া দিব বত্রিশ বান্দের জোড়া
আল্লা দিনে দিনে খসপোগো এ ঘরের বান্দন গো
ও মন রাজায় লুটিয়া নিবো ধন হো
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই ।

আল্লা মনগো পুবাইলা পশ্চিমা বাও উড়ায় বৈঠা কানুর নাও
ঝলকে ঝলকে উঠে পানি
আল্লা কইও মোর মুর্শিদের ঠাঁই এ নৌকার ভরসা নাই
ও মন কখন জানি জলে ডুইবা মরি গো
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই ।
আল্লা মন গো নাতারি পাতারি শাক
বিয়াল্লিশ গুণ্ডা শাকের আট
সিঅ শাক বাছিতে বসিলায় দুয়ারে
আল্লা পুইবেলা বাতাসে গো শাক গাছি উড়াইয়া নিবই গো
ও মন মুখে চাদর দিয়ে প্রভু আস গো
আল্লা নাহক দরিয়ার মাঝে আল্লা আমার মন মইজাছে গো ভাই
আল্লা আমার দেশের কথা কিছুই মনে নাই ।

৫.

হে জ্ঞানযুগী শুধু মানবলীলা দেখতে পাই
মানুষের তুল্য ভবে আর তো কিছুই নাই ॥

www.pathagar.com

আমি মক্কায় গিয়াছিলাম কাশিতে বাস করিলাম
ধর্ম মানুষের ঠাঁই।
জুম্বের ঘরে নেল্লা দেয়
মানুষ ছাড়া কেউ নারে খায়।
কালীর ঘরে ভোগ সাজাইয়া দেয়
মানুষ ছাড়া কেউ নারে খায়।
তীর্থ ধর্ম জ্ঞানে করে
মানুষ ছাড়া আর তো জায়গা নাই।
আমার পাপীলিমে ডাইক্যা কয়
শোনরে পাষাণ মন ধর্ম মানুষের ঠাঁই।
আমার টিপু চান্দে ডাইক্যা কয়
শোনরে পাষাণ মন ধর্ম মানুষের ঠাঁই।
মানুষেতে গুরু হয় খিদ্যায় হলফল করে
ধর্ম মানুষের ঠাঁই
আবার সেই ফান্দেতে বন্দি হইল
নদের কালাচান।

তথ্যসূত্র : মো. আব্দুল আজিজ, বয়স : ৫৫, পিতা : মুহম্মদ মণ্ডল, গ্রাম : ছবিলাপুর, থানা : মাদারগঞ্জ, জেলা : জামালপুর। তারিখ : ১১/০৪/২০১২, আব্দুল আজিজ টিপুপাগলের একজন অনুসারী। টিপু পাগলের অনুসারীদের ধর্মীয় সংগীতকে আওয়াজ বলা হয়

ঙ. ধুয়া

মেলান্দহ উপজেলার ধুয়া

১.

হোসেনজী শহিদের কতা শোনেন দশজনে
ওরে রণ করিতে যায়রে হোসেন
কারবালার ময়দানে।
কাটিয়া কাফেরের নস্কর
হুতাসে যায়রে জীবন
পানি কোতায় গেলে মিলে।
ওরে পাইকরেতে রাখছে পানি
লোহার জালে ঘিরিয়ে।
পানি খাইতে গেলে
দিলেতে দ্বন্দ্ব লাগে।
ফিরে আইলাম ময়দানে।
ওরে সে সুময় কাফেরের নস্কর
হোসেনেরে নেয় ঘিরে
কথা না মানিল কথা না শোনিল
খঞ্জর দেয় গলে।

www.pathagar.com

২.

ছোয়ালধর্মী ধুয়া
আর আমি অধম বিদ্যা নাই ধরে
বইলা যাই চান সভাতে
আরেকটা ছোয়াল দিয়ে গেলাম তরে।
ওরে আল্লা যেদিন কাজি হইয়া
বসব বান্দার হিসাবে
হারে আরসের বামপাশে
কোনজনা মেন খারাই আছে
ভাইরে ভাই জাইন্যা শুইন্যা
হাদিস দেইখা জবাব দেও মোরে।
দুনিয়াতে আর এক গাছ আছে
ফল খায় মোমিন কাফেরে
আরে আখেরাতে কোনজনায় খাবে।
কিবা নাম হয় ফলেরই ভাই
ভাইঙ্গ্যা বল সভাতে।
মুসা নামে এক পেয়গাম্বর ছিল
কুহুতর পাহাড়ে গেল
ভাইরে ভাই কয়জন উম্মত সঙ্গে নিয়ে ?
মুসা সাক্ষাৎ কইরাছে ?

৩.

সোয়ালের জবাব
যে ছোয়ালডা ও বোয়াইতি করলা জিজ্ঞাস
ওরে যে ছোয়ালডা ও বোয়াইতি করলা জিজ্ঞাস।
আমি বলি সভাতে
আরসের বামপাশেতে
হযরত রসুল খাড়া আছে
আমি কই দশের কাছে
হযরত রসুল কানতে গো আছে
উম্মতের লাইগে।
আমি বলি সভাতে
মুসা গেল পাহাড়েতে
খোদার সঙ্গে দিদার করতে
বারজন উম্মত সঙ্গে নিয়া
মুসা সাক্ষাৎ কইরাছে।
আমি বলি সভাতে
ওরে কোন পেগাম্বর মায়ের গর্ভে

www.pathagar.com

বাবা চল্লিশ বছর হয় ?
এও কতাডা বুয়াইতি
দেও না পরিচয় ।
আমি বলি সভাতে
ওরে চার অঙ্গ হইয়া হাওয়া
আইল ভবের পর
ফাতেমা বেহেশতের দরজায়
কার সাথে আছে ?
আমি বলি সভাতে
ওরে জবে জবে জব মিলাইয়া
গাও ধুইমা জারি
ফাতেমা বেহেশতের দরজায়
কার সাথে আছে ?

৪.

জয়নালে ডাইকে বলে মা
আমি রইলাম জেলখানাতে চাচা এল না ।
ওরে খুড় শহিদার কাছে গেল সেও তো এল না ।
পাঁচশ আওলাদ বন্দি কইরা
রাখছে এজিদ জেলখানায়
নলিতে প্রাণ বাঁচে না ।
এজিদ হইয়াছ রাজা
চাচা আমার দেশে আইলে করিব সাজা ।
ওরে ওমর আলি তালেব আলি আক্কেল আলি পালোয়ান
মোহাম্মদ হানিফার চাচা মোসলেম কাকা পালোয়ান
এরা ছয়জন দেশে আইলে
পাজি তোর টাইনে ছিড়ব কান ।
এজিদ হইছ বলমান
চাচা আমার দেশে আইলে
মলব দুটি কান ।

৫.

আল্লা বলে দিলাম গো মেলা
কারবালার মাঠে
জলের ঘাটে হইল গো দেখা
এজিদার সনে ।
কোন শহরে থাকরে ছাইল্যা
কোন শহরে ঘর

www.pathagar.com

কিবা নামটি মাতা গো পিতার
কিবা নামটি তোমার।
বাগ শহরে থাকি গো আমি
মদিনাতে ঘর
পিতার নামটি আলি গো শাহা
মা হয় ফয়তেমা।

৬.

ভবের হাট ভাঙ্গিল দোকান খোলরে ভাই
ডুইবে আইল বেলা
ওরে পানি পানি বইলে ইমাম গেল
কদভানুর ঘরে।
ওরে পানি বইলে জহর গুইলে
হারে দেয় ইমামের কাছে
ওরে পানি বইলেরে ইমাম খায়
জহর গুইলে।
ওরে পানি খাইয়ে পইল ডুইলে
জবান না সরে।
ওরে কোথায় আছ কাসম বাবা
দেখ না আইসে।

৭.

কাল সকালে দিছেন গো বিয়ে
ওমা জননী
আজকে কেনে খসাও গো গয়না
তাই বল শোনি।
তোমার পতি গেছে গো মারা
কারবালার রণে
সেই জন্যেতে খসাই গো গয়না
তুইলে থুই ঘরে।
যাবার কালে বল্লেন না পতি
সেই রণের খবর
হরি কালীর দুল দুল গো ঘোড়া
সাজাইতাম তখন।
ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া
ঢাল তলোয়ার হস্তে
কাফের কাটতাম হাজার গো হাজার
যাইতাম পতির তাল্লাসে।
যাবার কালে বল্লেন পতি

www.pathagar.com

চানমুখের কথা
তোমার মনটি আমার গো মনটি
এক সুতায় গাঁথা।
মাও আরি ঝিও গো আরি আরি সখিনা
এক ঘরেতে তিনজন গো আরি
সোনার মদিনা।

৮.

আগে কি জানতামরে ভাই
আমার বৃদ্ধকাল হবে
আমি কার লাইগে করলাম এত
দুইন্যাদারির প্রেমে মইজে
এখন আমার পরকাল গেল।
লোহার কারণ ঘুইরা বেড়াই কামারের বাড়ি
কোনখানে তাহার বাড়ি
নাগুল পাইলে শিখে রাখতাম
সুইতার কেমনে করে কাম।
সুইতার এমনি গুণমান
ওসে একা করে ভবের কাম
নৈকাখান গড়াইয়া সুইতার
সুইতার উপর তলাতে।
নৌকার ৬৪ জোড়া
তক্তাতে যার নাই পোড়া
বিনি পুড়ায় সাইর মিলাইছে
সুইতার লা শরিকালাহ।
নৈকা শুকনাতে চলে
পানিতে গেলে ভুরে
মনমাঝি তোর হাইল ধইরাছে
নৈকা শুকনাতেও চলে।

৯.

কলের নৈকা শুকনায় চলে হে
ওরে তাও কি বান্দা জান না।
চারখান বইঠা কলেরে জোগায়
পবন টানছে গুণ।
নৌকার মাঝি ছিল
নৌকার ছিল ভোলারাম বেপারি

www.pathagar.com

নৌকার চরণদার ছিল জানমামুন
যেদিন কাজি আইস্যা হিসাব নিব হে
নৌকার মাঝি যাবে পলাইয়া।
আহারে সোনাররে জাহাজ
শুকনায় তল হবে।
কূল ধর কূল ধররে বইলা
কানছে সর্বজন।

১০.

জগৎ মাতা পরওয়ার দেগার
দ্বিন দুনিয়ার চানসুরুজ
আল্লা কইরাছেন তৈয়ার
মক্কাতে খোদার ঘর।
যে দিন ছিলা পিতার মস্তকে
হাওয়ার সনে লইছে জনম
মায়ের উদরে
কুরকাফ সে শহরে।
ওরে মায়ের উদরে জন্ম লইয়ারে
পইরা রইলা ঘুমিয়ে
নয় দরজা আঠার মোকাম
বান্দা শরীরে
আছে ভাই কোরানে।
কোরানেরই চারটি কতা
তোমায় করি জিজ্ঞাসা
তুমি কোন কোরানের মুজাহির
এই ছওয়ালের জব না দিলে
দেখব বয়াতি কতেক বুদ্ধিমান।
তুই যেদিন যাবি গো গোরে
ভাই ভাতিজা ইষ্টি-কুটুম সব আছে পাশে
পরিবার পৈতানে
ও উঠ উঠ প্রাণ পতি হে
চক্ষু মেইলা কও কতা
জাহান্নমের মতো গেলারে ছাইর‍্যা
বইসে মার কোলে
পান দেই তোর মুখে।

তথ্যসূত্র : আব্দুল জলিল প্রামাণিক, বয়স : ৭০, গ্রাম : দেউলাবাড়ি, থানা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর, সংগ্রহের তারিখ : ১০-১২-১১

www.pathagar.com

চ. মালসি গান

মেলান্দহ উপজেলার মালসি গান:

১.

শসা কলা কমলা নয় হে ২
আমি ছিড়িয়া ছিড়িয়া হাতে দিব গো
একেলাই পরান।
আমি কয়জনের মন রাখিব গো
একেলাই পরান।
চাবি নয় হে ছুরানি নয় হে
আমি অঞ্চলে বাধিব গো
একেলাই পরান।
আমি কয়জনের মন রাখিব গো
একেলাই পরান ।
ইলিশ মাছের পেটি নয় হে
আমি কাটিয়া কাটিয়া ভাগ বসাব
একেলাই পরান।
আমি কয়জনের মন রাখিব গো
একেলাই পরান।
সোনা নয় হে রূপা নয় হে
আমি সিন্ধুকে ভরিব গো
একেলাই পরান
আমি কয়জনের মন রাখিব গো
একেলাই পরান।
শসা কলা কমলা নয় হে ২
আমি ছিড়িয়া ছিড়িয়া হাতে দিব গো
একেলাই পরান।

২.

আমি কি দেখলাম কি দেখলাম প্রাণসখি
যারে দেখিলাম আমি সে দিল ফাঁকি।
কলার গাছে যেমন বাঁদুর ঝোলে
অই মত দুলব আমি বন্ধুর গলে।
আমি কি দেখলাম কি দেখলাম প্রাণসখি
যারে দেখিলাম আমি সে দিল ফাঁকি।
শ্যামরার ডালে যেমন ঘুঘুর বাসা
অই মত করব আমি বন্ধুর আশা।
আমি কি দেখলাম কি দেখলাম প্রাণসখি
যারে দেখিলাম আমি সে দিল ফাঁকি।

www.pathagar.com

তালের গাছে যেমন বাউই বাসা
অই মত করব আমি বন্ধুর আশা।
আমি কি দেখলাম কি দেখলাম প্রাণসখি
যারে দেখিলাম আমি সে দিল ফাঁকি।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ২ পর্যন্ত গায়ক মোহাম্মদ সলিম উদ্দিন, বয়স : ৪০, পিতা : মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রামাণিক, গ্রাম : ঘুঘুমারি, থানা : মাদারগঞ্জ, জামালপুর। তারিখ: ১১-০৪-২০১২, সময় : রাত ৮-৪০

৩.

নদীর পাড়ে আমার হাওয়া কেনে নাগে না
কি বলিব ওগো সোনা
আমায় কেন বল না।
কি বলিব ওগো সোনাই
আমায় কেন বল না
চিকন করে সুত কাটিও আমি বন্ধুর গড়াব ধুতি।
চিকন করে সুত কাটিও আমি বন্ধুর বুইনেব ধুতি।
কি বলিব ওগো সোনাই আমায় কেন বল না।
বন্ধুর গায়ে হাওয়ার চাদর আমার পরনে ধুতি
কি বলিব ওগো সোনাই আমায় কেন বল না।
আমায় কেনে বল না গো সোনাই
আমায় কেনে বল না।
কি বলিব ওগো সোনাই
আমায় কেন বল না।

৪.

কোন ঘাটে চান কর হে কানইয়া
গামছা কোথায় হারাইলি।
হাঁটু পানি নাইমেরে গামছা
হাঁটু পানি নামাইলি।
কোন ঘাটে চান কর হে কানইয়া
গামছা কোথায় হারাইলি।
উইর‍্যাত পানি নাইমেরে গামছা
কোমর পানি নামাইলি।
কোন ঘাটে চান কর হে কানইয়া
গামছা কোথায় হারাইলি।
কোমর পানি নাইমেরে গামছা
ছাতি পানি নামাইলি।
কোন ঘাটে চান কর হে কানইয়া
গামছা কোথায় হারাইলি।

www.pathagar.com

ছাতি পানি নাইমেরে গামছা
কান পানি নামাইলি ।
কোন ঘাটে চান কর হে কানইয়া
গামছা কোথায় হারাইলি ।
মাথা পানি নাইমেরে গামছা
মাথা পানি নামাইলি ।
কোন ঘাটে চান কর হে কানইয়া
গামছা কোথায় হারাইলি ।

৫.

ওলো চুল বাইন্ধা দে
ওলো ননন্দি নাইয়র যাব মার বাড়ি
নাইয়র যাব মার বাড়ি গো
কত ভাজব চিড়া মুড়ি ।
চুল বাইন্ধা দে
ওলো ননন্দি নাইয়র যাব মার বাড়ি ।
ছোট বইনের বিয়েলো ননন্দি
কত ভাজব চিড়ামুড়ি ।
চুল বাইন্ধা দে
ওলো ননন্দি নাইয়র যাব মার বাড়ি ।
ছোট ভাইয়ের বিয়েলো ননন্দি
কত ভাজব চিড়ামুড়ি
চুল বাইন্ধা দে
ওলো ননন্দি নাইয়র যাব মার বাড়ি ।
ভাসুর আমার নিতে গো আইল
ছোট দেওরার মনভারি ।
চুল বাইন্ধা দে
ওলো ননন্দি নাইয়র যাব মার বাড়ি ।

৬.

যতদিন বাঁচি গো সোনা তুমি আমার
তুমি আমার গো সোনা আমি তোমার
যতদিন বাঁচি গো সোনা তুমি আমার ।
হে এ বাণিজ্যেতে যাবা তুমি
ভাত রাইন্ধে দিব আমি
সন্ধ্যা নাগলে ওজুর পানি
যোগাইব আমি ।
যতদিন বাঁচি গো সোনা তুমি আমার ।
তুমি আমার গো সোনা আমি তোমার
যতদিন বাঁচি গো সোনা তুমি আমার ॥

www.pathagar.com

৭.

আমায় কে দিল পিরিতের বায়না
কলার বাগানে।
বন্ধুর বাড়ি আমার গো বাড়ি
মধ্যে খিরল নদী।
আমায় কে দিল পিরিতের বায়না
কলার বাগানে।
হাতে হাতে পান দিতে
দেখল দেওর ছেরা।
আমায় কে দিল পিরিতের বায়না
কলার বাগানে।
বন্ধুর ভিজল ঘাড়ের গামছা
আমার ভিজল শাড়ি
আমায় কে দিল পিরিতের বায়না
কলার বাগানে।
বিন্নি ধানের খই গো দিব
গামছা বান্ধা দইও
আমায় কে দিল পিরিতের বায়না
কলার বাগানে।

৮.

শ্যামের বাঁশরি বাজেলো কমলা
আমরা জলে যাই।
আমরা জলে যাই গো কমলা
আমরা জলে যাই গো কমলা
আমরা জলে যাই।
শ্যামের বাঁশরি বাজেলো কমলা
আমরা জলে যাই।
কেহ নিল নোটা কলসি
কেউ বা নিল ঝারিলো কমলা।
আমরা জলে যাই।
শ্যামের বাঁশরি বাজেলো কমলা
আমরা জলে যাই।
কেউ বা নিল নাল নীল
কেউ বা নিল সাদালো কমলা
আমরা জলে যাই।
শ্যামের বাঁশরি বাজেলো কমলা
আমরা জলে যাই।

www.pathagar.com

বন্ধু আমার নীল ভোমরা
ফুলের মধু খাও
ফুলের মধু শুকাইয়া গেলে
আর না ফিরে চাও লো কমলা
আমরা জলে যাই ।
শ্যামের বাঁশরি বাজেলো কমলা
আমরা জলে যাই ।

৯.

কালা বন্দে যাইও না
ও কালা বন্দে যাইও না
ওরে আষাইঢ়ে দেওয়া ভাঙব বিচি
কালা পরানে মানব না ।
ছেরা কোষ্টার বেপারি
ও ছেরা কোষ্টার বেপারি
কোষ্টা বেচিয়া কিনে আনব
ফুলতোলা শাড়ি ।
কালা বন্দে যাইও না
ও কালা বন্দে যাইও না
ওরে আষাইঢ়ে দেওয়া ভাঙব বিচি
কালা পরানে মানব না ।
ছেরি নাইলে শাক তুলে
ও ছেরি পাটের শাক তুলে
নাইলে ক্ষেতের উল্লা আইসে
ছেরির গাল কামড়াইছে ।
কালা বন্দে যাইও না
ও কালা বন্দে যাইও না
ওরে আষাইঢ়ে দেওয়া ভাঙব বিচি
কালা পরানে মানব না ।
ছেরা বগিলা মারিয়া দে
ও ছেরা বগিলা মারিয়া দে
বালুর চরে ফান পাতিয়া ছেরা
বগিলা মারিয়া দে ।
কালা বন্দে যাইও না
ও কালা বন্দে যাইও না
ওরে আষাইঢ়ে দেওয়া ভাঙব বিচি
কালা পরানে মানব না ।
ছেরা ঘরে কি করে

www.pathagar.com

ও ছেরা ঘরে কি করে
চাউল ভাজার জন্যে ছেরা
ছেরির পাও ধরে।
কালা বন্দে যাইও না
ও কালা বন্দে যাইও না
ওরে আষাইঢ়ে দেওয়া ভাঙব বিচি
কালা পরানে মানব না।

১০.

তারায় করে ঝিকিমিকি বন্ধু চান্দে দেয় আলো
অই না পাড়ার চেংরা বন্ধু হায়রে প্রেম জানে ভালো।
শিমুল কাঠের দরজাখানি ভাই নাড়াইলে নড়ে
সমঝে সমঝে মারিও টোকা হায়রে বাপজানি জাগে।
তারায় করে ঝিকিমিকি বন্ধু চান্দে দেয় আলো
অই না পাড়ার চেংরা বন্ধু হায়রে প্রেম জানে ভালো।
শিমুল কাঠের দরজাখানি ভাই নড়াইলে নড়ে
আস্তে সওজে মাইর টোকা হায়রে ননন্দি জাগে।
তারায় করে ঝিকিমিকি বন্ধু চান্দে দেয় আলো
অই না পাড়ার চেংরা বন্ধু হায়রে প্রেম জানে ভালো।

তথ্যসূত্র : ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত গায়ক মো. আলতাফুর রহমান মোল্লা, বয়স : ৫৫, গ্রাম : ঘুঘুমারি, থানা : মাদারগঞ্জ, জামালপুর। তারিখ : ১১-০৪-২০১২, সময় : রাত ৮-৪০

সংগৃহীত মালসি গান

১.

এখন আর তারে চোখে দেখি না
শুধু বাঁশি শুইনাছি (২)
এখন আর।

ও শুইনাছি শুইনাছি তার গেল
তারে না দেখা ভাল
তারে না দেখা ভাল।
এখন আর তারে চোখে দেখি না
শুধু বাঁশি শুইনাছি (২)
এখন আর।

নিরবধি সই বয়ে বয়ে রই
আংখি মেলিতে ভয়ে সারা হই
যৌবনের কলি বিকশিতে যায়

www.pathagar.com

কদম্বতলে কালা বাঁশরি বাজায়।
এখন আর তারে চোখে দেখি না
শুধু বাঁশি শুইনাছি (২)
এখন আর।

অই বল সখি যমুনাতে
জল আনিতে যাব কি
নিশি স্বপনে এসেছিল সে
নয়ন কূলে চাইয়া গেল সে
এখন আর তারে চোখে দেখি না
শুধু বাঁশি শুইনাছি (২)
এখন আর।

২.

যত ভালবাসা জানা গেলো প্রাণনাথ
নিশি হল শুক্কুরবার এলো না। (২)
এ জীবনের তরে যার লাগিয়া
সহিছে বার বার বেদন।
যত ভালবাসা জানা গেলো প্রাণনাথ
নিশি হল শুক্কুরবার এলো না।
আগে যদি জানতাম
তবে কি আর মজিতাম
রাখালের প্রেমে
মজিতাম না।
যত ভালবাসা জানা গেলো প্রাণনাথ
নিশি হল শুক্কুরবার এলো না।

৩.

কালা যা ভেবেছো তাই বটে
বাবলা গাছে বেলি ফুল ফুটে।

কালার মাতায় কাঁঠালি কাটা চুল
ছেড়ির দাঁতে আওলা মেসির ফুল
কদমের ফুল।
কালা যা ভেবেছো তাই বটে
বাবলা গাছে বেলি ফুল ফুটে।

৪.

হাট কর বাজার কররে
আমার একটিরে কতা

www.pathagar.com

আমার নাইগ্যা কিন্যা আইনরে
মুখে খাওয়ার পাতা
কার নাইগ্যা রাইখাছ
রসের যৌবনরে।

হাট কর বাজার কররে
কিন্যা আইনরে চুন
বাপ মায়ের আদরের নারীর
আস্তে খাইও রে মধু
দয়াল কার নাইগ্যা রাইখাছ
রসের যৌবনরে।
ও কালঠের বসন্তকালেরে
দয়াল ঝরে পড়েরে মুছি
নদীর বসন্তকালেরে
ভাইঙ্গ্যা নামায় মাটিরে
দয়াল কার নাইগা রাইখাছ
রসের যৌবনরে।

ও মাছের বসন্তকালেরে
নদীর উজানে বাটে
নদীর বসন্তকালেরে
দয়াল হাতে মোহন বাঁশিরে
দয়াল কার নাইগ্যা রাইখাছ
রসের যৌবনরে।

আমের পাতা চিরল চিরলরে
দয়াল বাঁশের পাতা সরু
বাইছ্যা বাইছ্যা কইর পীরিতরে
দয়াল যার মাজ্ঞা সরু
দয়াল কার নাইগ্যা রাইখাছ
রসের যৌবনরে।

ছ. উদাসী গান
বকশীগঞ্জ উপজেলার উদাসী গান

উদাসী কৃষি শ্রমিকদের সমবেত কণ্ঠের গান। এখানকার কৃষি শ্রমিক মাঠে দলবদ্ধভাবে কৃষি কাজ করার সময় গান গায়। এ শ্রেণির গানই উদাসী গান নামে পরিচিত। ধান কাটা পাট কাটা ও নিড়ানোর সময় এ গানের তালে তাল মিলিয়ে শ্রম লাঘবের চেষ্টা করা হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের দুপুরের রৌদ্রে কৃষি শ্রমিকের সমবেত কণ্ঠের উদাসী গান যখন দূরের মাঠ থেকে ভেসে আসে তখন মন প্রাণ উদাসভাবে সিক্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বিলম্বিত লয়ের এ গান ভাটিয়ালি থেকে স্বতন্ত্র। কারণ কাজের মধ্যদিয়ে এ গানের তাল প্রকাশ পায়। উদাসী গানের বিষয়বস্তু প্রেমবিরহ। উদাসী গানে প্রেমিক মনের আবেগ অনুভূতি সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত হয়। বন্ধুকে কাছে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, না পাওয়ার বিরহ যাতনা এ গানের মধ্যে ধরা পড়ে।

আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যে সমস্ত গান গাওয় হয় তার অধিকাংশ Working song বা কর্মসঙ্গীত বলে। সে অর্থে উদাসী গানকে কর্মসঙ্গীত বলা হয়। এ গানের কথা কিছুটা অশ্লীল হলেও সুললিত সুর সহজে সবার মন কেড়ে নিতে পারে। বকশীগঞ্জে ধানক্ষেত ও পাটক্ষেত নিড়াইতে কৃষি শ্রমিকদের উদাসী গান গাইতে শোনা যায়। উদাসভাবের এমন মধুর সুরের গান সারা মাঠ জুড়ে অন্য রকম পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১.

ও সোনা বন্ধুরে বইসে বইসে করো ভাবনা
আমারে শোনাইয়া কও কথারে ॥

আমার বাড়ির উপর দিয়া
অন্য বাড়ির আসা যাওয়া
বিধাতার কলমের লেখা
তোমার সাথে হবে দেখা
ও সোনা বন্ধুরে... ॥ ঐ

যে ধনের কাঙ্গাল তুমি
সে ধনের ব্যাপারি আমি
যার জন্য ডরাইছো তুমি
ছয় মাস ধরে মরছে স্বামী
ও সোনা বন্ধুরে... ॥ ঐ

ও সোনা বন্ধু রে বাপ মায়ে দেয় না বিয়ে
সাধের যৌবন বিলাই কারে
এসো বন্ধু প্রাণের বন্ধু
এসো আমার কাছে
তোমার সাথে করমু আলাপ
বসিয়া নিরালারে... ॥

২.

ওরে ইনির মজা চিনি সাধুরে
রোদে মজা ছেমা
তার চেয়ে অধিক মজা অল্প বয়সা নারী ॥

হাল বাও হালিয়ে ভাই গো কালা বলদ ডানে
এইখান থেকে যাইতে দেখছ অল্প বয়সা নারী

www.pathagar.com

দেখছি দেখছি দেখছি ভাই গো গেছে বহু দূরে
আজকের পরে ফিরিয়া যাও গো দেওগা পানের দোকান ॥

জাল মারো জালিয়ে ভাই গো দেহি তোল পানি
এইখান থেকে যাইতে দেখছ অল্প বয়সা নারী
দেখছি দেখছি দেখছি ভাই গো গেছে বহু দূরে
আজকের পরে ফিরিয়া যাও গো দেওগা পানের দোকান ॥
গরু রাখো রাখাল ভাই গো দিঘল বালুর চরে
এইখান থেকে যাইতে দেখছ অল্প বয়সা নারী
দেখছি দেখছি দেখছি ভাই গো গেছে বহু দূরে
আজকের পরে ফিরিয়া যাও গো দেওগা পানের দোকান ॥

তথ্যসূত্র : ১. বয়াতি কুবের শেখ, বয়স-৫৭, গ্রাম-নিলাক্ষিয়া, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

২. কৃষি শ্রমিক আকবর আলী, বয়স- ৫২, গ্রাম-মেষেরচর, ইউনিয়ন-বকশীগঞ্জ, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার উদাসী গান

১.

ও চিলেহারি ইরিমিরি বাতাসরে
ওরে চিলেই গায়ের চাদর উড়াইলিরে
ও চেংরা বন্ধু দেখালে সর্বঅঙ্গ গাওরে ॥

ও চিলেহারি একবন্ধু হালিয়েরে
আরেক বন্ধু জালিয়েরে
আরেক বন্ধু যাচে বাটার পান
ওরে তোমার চাইনে বাটার পান
ওরে চিলেই চাইনে তোমার যৌবন দানরে ॥

ওরে চিলেই আমার স্বামী মরিছে গো
দারুণ সেল মোর কলিজায় গো
চাই তোমার বাটার পান
চাইনে তোমার পিরীতি
ওরে চিলেই চাইনে তোমার
ভিনদেশী পিরীতির দানরে ॥

ও ভিনদেশের পিরীতি রে মাটির কলসিরে
ও চিলেই ভাঙ্গে গেলে না নেয়
মাটির কলসি জোড়ারে
আপন দেশের পিরীতি রে তামার কলসিরে
ভাঙ্গে না নেয় জোড়া তালিরে ॥

www.pathagar.com

২.

প্রাণের বইদররে...
ওপার থেকে বাজাও বাঁশি
এপার থেকে শোনি
বাজাও বাঁশি নানান রঙ্গ ছলে
আমি কি আর কমু
প্রাণের বইদররে... ॥

বাঁশির সুরে উড়ে আমার মন
বিধাতার কলমের লেখা
নদীর ঘাটে হইল দেখা
মন কয় গাঙে দেই সাঁতার
নারী হয়ে দিমু সাঁতার
সাঁতার দিয়ে ধরমু তোমার গলারে
প্রাণের বইদররে... ॥

নাও নষ্ট গুদেরা ঘাটে
নারী নষ্ট নদীর ঘাটে
পুরুষ নষ্ট হয়রে শহরে বাজারে ॥
এসো এসো প্রাণের বন্ধু
এসো আমার কাছে
তোমার জন্য পাগল আমি
এসো আমার কাছে
তোমার জন্য পাগল আমি
এসো থাকব তোমার কাছেরে
প্রাণের বইদররে... ॥

তথ্যসূত্র : ১. কৃষি শ্রমিক সাবেদ আলী, বয়স- ৪৮. গ্রাম- কালিকাপুর, ইউনিয়ন- দেওয়ানগঞ্জ, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা- জামালপুর

২. কৃষি শ্রমিক নাজিম মিয়া,বয়স- ৪১, গ্রাম- বরখালি, ইউনিয়ন- চুকাইবাড়ি, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা- জামালপুর

জ. মেয়েলি গীত
বকশীগঞ্জ উপজেলার মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত। বকশীগঞ্জে বিয়েরগীত ছাড়া অন্য কোন গীতের সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রাম বাংলার মেয়েরা বিয়ের অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে গীত পরিবেশন করে। এ কারণে বিয়েরগীতকে আনুষ্ঠানিক গীত বলা হয়। মেয়েলি গীতগুলো আবহমানকালধরে নারী সমাজের মুখে মুখে রচিত এবং প্রচারিত.। গীতগুলো

www.pathagar.com

নারীর মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে রচিত। গীতগুলোর ভাব ও বিষয়বস্তুতে গ্রামীণ বাঙালি নারী হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংক্ষা, আনন্দ-বেদনার কথা প্রকাশিত হয়। কিছু গীতের মধ্যে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বকশীগঞ্জের কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বিয়েরগীতের সামাজিক স্বীকৃতি আছে। বিয়ের উৎসবে মেয়েরা নেচে গেয়ে বিয়ে বাড়ি আমোদপ্রমোদে মাতিয়ে তোলে। মেয়েলি গীতের অবয়ব সহজ সরল নারীর মন থেকে উৎসারিত। গীতগুলো অবয়বে পুনরাবৃত্তির মুদ্রাদোষ থাকলেও বিষয় ও ভাবের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। মেয়েরা দলগতভাবে সমবেত কণ্ঠে বিয়েরগীত পরিবেশন করে। কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না। মেয়েরাই গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। কনে সাজানো ও বধূবরণ শেষে বাসরঘর পর্যন্ত রয়েছে নানা লোকাচার ও নানা রকম গীত। বিয়ের পূর্ববর্তী গীত, গায়ে হলুদের গীত, বাসরঘরের গীত, কনে সাজানো গীত, কনে তোলে দেওয়া বা কনে বিদায়ের গীত, কনে বিদায় পরবর্তী গীত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বকশীগঞ্জে প্রচলিত কিছু বিয়ের গীত নিচে দেওয়া হলো।

১. বিয়ে পূর্ববর্তী গীত

বিয়ে করবের যাও ভাইজান গো নবীন শ্বশুর বাড়ি
শুধিয়ে যাও ভাইজান গো আম্মার কোলের ধারও ॥
দোয়া কর আম্মা গো আল্লাহ দিকে চাইয়ে
আসিয়ে শুধিমু আম্মা গো তোমার দুধের ধারও ॥

বিয়ে করবের যাও ভাইজান গো নবীন শ্বশুর বাড়ি
শুধিয়ে যাও ভাই জান গো আব্বার পিঠের ধারও ॥
দোয়া কর আব্বার গো আল্লাহ দিকে চাইয়ে
আসিয়ে শুধিমু আব্বার গো তোমার পিঠের ধারও ॥

বিয়ে করবের যাও ভাইজান গো নবীন শ্বশুর বাড়ি
শুধিয়ে যাও ভাইজান গো বুবুর কোলের ধারও ॥
দোয়া কর বুবু গো আল্লাহ দিকে চাইয়ে
আসিয়ে শুধিমু বুবু গো তোমার কোলের ধারও ॥

শব্দার্থ : শুধিমু-শোধ করব, চায়ে- স্মরণ করা, দুধের ধার- দুগ্ধ ঋণ।

২. গায়েহলুদের গীত

এই না নদীর কিনারে গো হলদি আলার বাড়ি
আনো তো হলদি হোক গো বালির বিয়ে।
অই হলদি আলা না দেয় ভাও ছাড়িয়ে
কনের মায়েক দিয়ে আনোতো হলদি
হোক গো বালির বিয়ে ॥
এই না নদীর কিনারে গো ডুমুরের বাড়ি

www.pathagar.com

আনোতো চালুন হোক গো বালির বিয়ে
অই ডুমুর না দেয় ভাও ছাড়িয়ে
কনের বোনেক দিয়ে আনোতো চালুন
হোক গো বালির বিয়ে ॥
এই না নদীর কিনারে গো মেন্দি আলার বাড়ি
আনোতো মেন্দি হোক গো বালির বিয়ে
কনের ফুফুক দিয়ে আনোতো মেন্দি
হোক গো বালির বিয়ে ॥

শব্দার্থ : বালি-কনে, ডুমুর বাড়ি-কারু শিল্পীর বাড়ি, মায়েক-মাকে, বোনেক-বোনকে, মেন্দি-মেহেদি, ফুফুক-ফুফু ।

৩. বিয়েরগীত

ঢোল বাজে খোল বাজে গো বানা
সানাই বাজে ধীরে ধীরে গো বানা ।
একলাই যামু না পরের দেশেরে বানা
ভাবী জানেক সঙ্গে নিমু গো
তেইসেন যামু গো পরের দেশেরে বানা ॥
একলাই যামু না পরের দেশেরে বানা
মসলা বাটিতে হবে ভালারে বানা

একলাই যামু না পরের দেশেরে বানা
বুবু জানেক সঙ্গে নিমু গো
রান্না করিতে হবে গো বানা
তেইসেন যামু গো পরের দেশেরে বানা ॥

স্বামীকে বুঝাইতে হবে ভালারে বানা
নানী জানেক সঙ্গে নিমু গো
বিছনা পাড়িতে হবে ভালারে বানা
তেইসেন যামু গো পরের দেশেরে বানা ॥

শব্দর্থ : যামু-যাব, নিমু - নেবো, তেইসেন - তাহলে ।

৪. কনে সাজানো গীত

আসমানে গুটি গুটি তারা
মেঝেত দামান আসি খাড়া
কিরে রঙিলে দামান
শোধ বছর করেছিস কামাই
তোর ভাবীর মেয়ে ডাংগরি হয় নাই
বিয়েরকালে তোর শাড়ির টাকা হয় নাই ।

www.pathagar.com

আসমানে গুটি গুটি তারা
মেঝেত দামান আসি খাড়া
কিরে রঙিলে দামান
শোধ বছর করেছিস কামাই
তোর বুবুর মেয়ে ডাংগরি হয় নাই
বিয়েরকালে তোর মাকরির টাকা হয় নাই।

আসমানে গুটি গুটি তারা
মেঝেত দামান আসি খাড়া
কিরে রঙিলে দামান
শোধ বছর করেছিস কামাই
তোর ফুফুর মেয়ে ডাংগরি হয় নাই
বিয়েরকালে তোর আংটি টাকা হয় নাই।

শব্দার্থ : মেঝেত-মেঝে, দামান-স্বামী, শোধ বছর-সারাবছর, কামাই-আয় রোজগার, ডাংগরি-যুবতী, খাড়া-দাঁড়ানো, মাকরি-কানের দুল।

৫. কনে তোলে দেওয়া গীত

ঘরের শোভা গো টাইটে ভেলকি
মেঝের শোভা বেটি
এতোদিন পালিলাম গো ময়না
ঠোঁটের আধার দিয়ে
যাইবার কালে গেলা গো ময়না
শূন্যে উড়াল দিয়ে ॥

ঘর ভরা মানুষ গো থাকিতে
ময়নাক করলো চুরি
বাড্ডেক ভরা মানুষ গো থাকতে
ময়নাক করলো চুরি

ঘরের শোভা গো টাইটে ভেলকি
মেঝের শোভা বেটি
এতোদিন পালিলাম গো ময়না
ঠোঁটের আধার দিয়ে
যাইবার কালে গেলা গো ময়না
শূন্যে উড়াল দিয়ে ॥

শব্দার্থ : পালিলাম- লালন পালন করলাম, ময়নাক-ময়নাকে, বেটি-মেয়ে, বাড্ডেক-বাড়ির সম্মুখে খোলা জায়গা।

www.pathagar.com

বকশীগঞ্জ উপজেলায় প্রচলিত অন্যান্য গীত

১.

মইচের গাছে হেলাঞ্চি দিয়ে কান্দে মরিচমতি
জৈব্বা বেটি ঘরে থুইয়ে মইচের ব্যবসা করে ॥
লজ্জা নাইকে শরম নাইকে তোরি বাপের চক্ষে
এমন শরম দিমু তোরে ভরিন সভার মধ্যে
মচের গাছে হেলাঞ্চি দিয়ে কান্দে মরিচমতি
জৈব্বা বেটি ঘরে থুইয়ে মইচের ব্যবসা করে ॥
ভাইর ঘরের দিয়েরে গো তরু তুনকের গাছে
সিও তরই তুলিয়ে গো রান্ধিলাম হিরে জিরে দিয়ে ॥
মচের গাছে হেলাঞ্চি দিয়ে কান্দে মরিচমতি
জৈব্বা বেটি ঘরে থুইয়ে মইচের ব্যবসা করে ॥
ওগো সাধু মইচ দিবের মনে নাই
তোমার শল্লে না সইলে গো সাধু
তুমি দিও দশটা বারি
ওগো সাধু জাতি তোলা গালি দিওনারে ॥
মচের গাছে হেলাঞ্চি দিয়ে কান্দে মরিচমতি
জৈব্বা বেটি ঘরে থুইয়ে মইচের ব্যবসা করে ॥

শব্দার্থ : হেলাঞ্চি-হেলান দেওয়া, থুইয়ে-রেখে, জৈব্বা-যুবতী, ভরিন-ভরা, দিয়ের-দরজা, তরুতুনকে-তরকারি গাছ, শল্লে-শরীরে।

২.

শাক তুলিতে গেলাম আমি কুড়িবিলের বাতায়রে
মোর কী হইলোরে ॥

মোর কী হইলোরে
কী হইলো মোর কী হইলো মোর
আদিমনের পেটের মধ্যে কী হইলোরে ॥

আদিমনের পেটের মধ্যে শইল মাছও সান্দাইছেরে
মোর কী হইলোরে ॥
শইল মাছও পেটের মধ্যে কেক্কর বেক্কর করেরে
মোর কী হইলোরে
শাক তুলিতে গেলাম আমি কুড়িবিলের বাতায়রে
মোর কী হইলোরে ॥

শব্দার্থ : আদিমন-জনৈক মহিলা, বাতায়-পাড়ে, সান্দাইছে-ঢুকেছে।

www.pathagar.com

৩.

ফুলের আলং ফুলের পালং
ফুলের সিংরে সিংরে হে ফতুয়া ॥

কি কানে গেছিলাম আমি ছোট ভাইয়ের বিয়েতে হে ফতুয়া ॥
ফতুয়া খেলাতে আমার ভাঙ্গিল নাকের বেসর হে ফতুয়া ॥
সোয়ামি শুনিলে আমাক মারব বেতের বারি হে ফতুয়া
শ্বশুরে শুনিলে আমাক করব বাড়ির বাহির হে ফতুয়া ॥
ফুলের আলং ফুলের পালং
ফুলের সিংরে সিংরে হে ফতুয়া ॥

সোয়ামিক বুজেমু আমি কোলের যৌবন দিয়ে হে ফতুয়া ॥
শ্বশুরেক বুজেমু আমি পানের বাটা দিয়ে হে ফতুয়া ॥
ফুলের আলং ফুলের পালং
ফুলের সিংরে সিংরে হে ফতুয়া ॥

শব্দার্থ : বেসর-নোলক বা নাকফুল, বুজেমু-বুঝাব, শ্বশুরেক-শ্বশুরকে।

৪.

ডালিমের গাছে ডালিম ধরে
ডালিমের ভরে হালিয়ে পড়ে।
ওকি হায় হায় শেফালি নায়র যাইতাম ॥
শেফালির ভাসুর নিবের আইছে
ছোট্ট দেহি থুয়ে গেছে
ওকি হায় হায় শেফালি নায়র যাইতাম ॥

শেফালির শ্বশুর নিবের আইছে
কান্দন দেহি থুয়ে গেছে
ওকি হায় হায় শেফালি নায়র যাইতাম ॥

আয়নার মধ্যে ময়না পাখি
সোয়ামিক আমি ভালবাসি
ওকি হায় হায় শেফালি নায়র যাইতাম ॥
টেম্পুর নাহাল নায়ের আগা
শোন সোয়ামি দুঃখের কথা
ওকি হায় হায় শেফালি নায়র যাইতাম ॥

বাড়ির পাছে খেড়ের পাল্লা
সোয়ামি আমার গলার মালা
ওকি হায় হায় শেফালি নায়র যাইতাম ॥

শব্দার্থ : থুয়ে-রেখে যাওয়া, নায়র-নাইয়র, খেরের পাল্লা-খড়ের পালুই।

www.pathagar.com

৫.

ই ঘরে না যাইতে ও ঘর থনে আইতে
মধ্যে কামরাংগার গাছও ॥
কামরাঙা পাড়িয়ে ঢাকি ভরায়ে
নিয়ে যাও সাধু বকশীগঞ্জের হাটে ॥

কামরাঙা বেচিয়ে হাতে টেহা নিয়ে
আনিয়ে সাধু আমার নাকের বেসরও
বেসর পরিয়ে আয়না ধরিয়ে
দেখ সাধু আমার নাকের তামশা ॥

ই ঘরে না যাইতে ও ঘর থনে আইতে
মধ্যে কামরাঙার গাছও
কামরাঙা পাড়িয়ে ঢাকি ভরায়ে
নিয়ে যাও সাধু জামালপুরের হাটে ॥

কামরাঙা বেচিয়ে হাতে টেহা নিয়ে
কিনিও সাধু আমার সিতির সিঁন্দূর
সিঁন্দূর পরিয়ে আয়না ধরিয়ে
দেখ সাধু আমার সিতির তামশা ॥

শব্দার্থ : থনে-থেকে, ঢাকি-বাঁশের তৈরি কারুপণ্য, টেহা-টাকা, বেসর-নাকফুল, সিতির-সিঁথির, সিঁন্দূর-সিঁদুর।

তথ্যসূত্র : ১. জাহানারা পারভীন, বয়স - ৪২, স্বামী - তাঁরা মিয়া, গ্রাম - সীমারপাড়, ইউনিয়ন - বকশীগঞ্জ উপজেলা - বকশীগঞ্জ, জেলা - জামালপুর
২. সখিনা বেগম, বয়স-৫২, স্বামী-মৃত আজাদ মিয়া, গ্রাম-মাঝগেদরা, ইউনিয়ন-কামালপুর, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর
৩. পানফুল বেগম, বয়স- ৫৩, স্বামী- মৃত আ. খালেক, গ্রাম-দত্তেরচর,. ইউনিয়ন-বাট্টাজোড়, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর
৪. ফাহিমা বেগম, বয়স-৩৮, স্বামী- হারুন অর-রশিদ, গ্রাম-সীমারপাড় তালতলা, ইউনিয়ন-বকশীগঞ্জ, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর
৫. সাধনা বেগম, বয়স-২৮, পিতা- শাহ আলম, গ্রাম-দাশপাড়া, ইউনিয়ন-সাধুরপাড়া, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

মেলান্দহ উপজেলার মেয়েলি গীত

১.

আমি নিমু ভাবী গো ভাইয়ের জাংলার নাইঅ
জাংলার পার বুবু যাইও না জাংলার নাই বুবু ছিইড়ো না

www.pathagar.com

তোমার ভাইধন বুবু মানা করিয়েই গেছে ॥
না দিলি তর জাংলার নাই না দিলি তর জাংলার নাই
আমি নিমু ভাবী গো ভাইয়ের কুইয়্যার পানি।
কুইয়্যার পার বুবু যাইও না কুইয়্যার পানি বুবু তুলিও না
তোমার ভাইধন বুবু মানা করিয়েই গেছে ॥

না দিলি তর কুইয়্যার পানি না দিলি তর কুইয়্যার পানি
আমি নিমু ভাবী গো ভাইয়ের কুইল্যার খুদ।
ঢেঁকির পার বুবু যাইও না কুইল্যার খুদ বুবু খাইও না
তোমার ভাইধন বুবু কবুতর নাগাইয়্যাই থুইছে ॥

না দিলি তর কুইল্যার খুদ না দিলি তর কুইল্যার খুদ
আমি খামু ভাবী গো ভাইয়ের পাতিলের ভাত।২
পাতিলের গুর বুবু যাইও না পাতিলের ভাত বুবু খাইও না
তোমার ভাইধন বুবু আন্দিতে দেখিয়েই গেছে ॥২
না দিলি তর পাতিলের ভাত না দিলি তর পাতিলের ভাত
আমি খামু ভাবী গো ভাইয়ের বাটার পান।
বাটার গুর বুবু যাইও না বাটার পান বুবু খাইও না
তোমার ভাইধন বুবু চিরিয়্যা থুইয়্যাই গেছে ॥

না দিলি তর বাটার পান না দিলি তর বাটার পান
আমি নিমু ভাবী গো ভাইয়ের কোলের যইদর।
ন্যাপা ঘরে বুবু যাইও না ঘুমের ছইলেক বুবু তুলিও না
তোমার ভাইধন বুবু ঘুমে থুইয়্যাই গেছে ॥

না দিলি তর কোলের যইদর না দিলি তর কোলের যইদর
আমি দেখমু ভাবী গো বাপ মায়ের কব্বর।
কব্বরের পার বুবু যাইও না হাউসের কান্দন বুবু কাইন্দোনা
তোমার ভাইধন বুবু মানা করিয়েই গেছে ॥

২.

ডান হাতে নারিকল বামহাতে ছিরিকল
ওগো রায়ো দুইহস্তে ঢাল গঙ্গার জল গো।
ও কত্তই পানি ঢালতাছ ভাউজি গো
সউজে ঢাইলো পানি। (২)
মায়েরইন্য আদরের বেটা গো
জারে পাইতাছে শাস্তি
মায়েরইন্যা কোলের যইদর গো
খিদেয় পাইতাছে শাস্তি ॥

www.pathagar.com

ডান হাতে নারিকল বামহাতে ছিরিকল
ওগো রায়ো দুইহস্তে ঢাল গঙ্গার জল গো।
ও কত্তই পানি ঢালতাছ ভাউজি গো
সউজে ঢাইলো পানি। (২)
বাপেরইন্য আদরের যইদর গো
জারে পাইতাছে শান্তি
বাপেরইন্যা কোলের বেটা গো
খিদেয় পাইতাছে শান্তি ॥

ডান হাতে নারিকল বামহাতে ছিরিকল
ওগো রায়ো দুইহস্তে ঢাল গঙ্গার জল গো।
ও কত্তই পানি ঢালতাছ ভাউজি গো
সউজে ঢাইলো পানি। (২)
বইনেরইন্যা আদরের ভাই-ই গো
খিদেয় পাইতাছে শান্তি
দাদিরইন্যা আদরের নাতি গো
জারে পাইতাছে শান্তি ॥

৩.

নির্মল আউলে বাউলে ফেলায়অ পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল মায়ের কান্দনে না ওঠে পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল থমকে থমকে ফেলায়অ পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল বাপের কান্দনে না ওঠে পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল আস্তে ধীরে ফেলায়অ পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল বইনের কান্দনে না ওঠে পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল থমকে থমকে ফেলায়অ পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল ভাইয়ের কান্দনে না ওঠে পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল আস্তে ধীরে ফেলায়অ পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ।
নির্মল জ্যাঠার কান্দনে না ওঠে পাও

www.pathagar.com

নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ ।
নির্মল থমকে থমকে ফেলায়অ পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ ।
নির্মল জেঠির কান্দনে না ওঠে পাও
নির্মল যায়রে শ্বশুর দেশ ।

৪.

হাতে দেখি বালির হাত খালি
কানে দেখি বালির কানের বালা গো ।
বালা যায় মোর আপন শ্বশুর দেশে গো ।
বালা যায় মোর আপন শ্বশুর দেশে গো ।

অর্ধেক পথ যাইয়্যা বালাগো
তখন বালার মনে হইল গো
ছাড়িয়্যা আইলাম সাধুর বিছেনের খ্যাতাগো
ছাড়িয়্যা আইলাম সাধুর বিছেনের খ্যাতাগো ।
যখন সাধু শুতিব্যার যাব গো
তখন দিব বিষের গালি গো
তখন পড়িবো সোনার চোক্কের পানি গো
তখন পড়িবো মানিক চোক্কের পানি গো ।

হাতে দেখি বালির হাত খালি
কানে দেখি বালির কানের পাশা গো ।
বালা যায় মোর আপন শ্বশুর দেশে গো ।
বালা যায় মোর আপন শ্বশুর দেশে ।

অর্ধেক পন্থ যাইয়্যা বালাগো
তখন বালার মনে হইল গো
ছাড়িয়্যা আইলাম সাধুর সিতেনের বালিশ গো
ছাড়িয়্যা আইলাম সাধুর সিতেনের বালিশ গো ।
যখন সাধু শুতিব্যার যাব গো
তখন দিব বিষের গালি গো
তখন ঝরিবো সোনার চোক্কের পানি গো
তখন ঝরিবো মানিক চোক্কের পানি গো ।

৫.

ভাল কইর‍্যা বাইন্দো পির‍্যা
দামান আসিবো ঘরে
দামান আসিবো ঘরে ।

www.pathagar.com

পঞ্চফুলের বালি ঘামিয়্যাই পড়ে।
বালির নাইগ্যা আনছে গো সিতি
সিতি আনিছে চাইয়্যা
সিতি আনিছে চাইয়্যা
পঞ্চফুলের বালি ঘামিয়্যাই পড়ে।

ভাল কইর‍্যা বাইন্দো পির‍্যা
দামান আসিবো ঘরে
দামান আসিবো ঘরে।
পঞ্চফুলের বালি ঘামিয়্যাই পড়ে।
দামান হইল কাঙ্গালের ছেলে
সিথি আনিছে চাইয়্যা
সিথি আনিছে চাইয়্যা
পঞ্চফুলের বালি ঘামিয়্যাই পড়ে।
বালি হইছে জমিদারের মেয়ে
সিথি মারিছে ফিক্যা
সিথি মারিছে ফিক্যা
পঞ্চফুলের বালি ঘামিয়্যাই পড়ে।
দামান হইল কাঙ্গালের ছেলে
সিথি তুলিল খুইট্যা
সিথি তুলিল খুইট্যা
পঞ্চফুলের বালি ঘামিয়্যাই পড়ে।

৬.

অফুইল্যা শিমুলের গাছ গো
জোড়ায় জোড়ায় মাটি
সিন্তি বিছাইলাম মাও গো
সবরঙ্গের পাটি।
সিন্তি বিছাইলাম মাও গো
সবরঙ্গের পাটি।
পাটিন্যা তুলিয়্যা মাওগো
মাইজেল করিলেন খালি।
কেনেরে মজুরের বেটারা
করলি এত রাত্রি।
অফুইল্যা শিমুলের গাছ গো
জোড়ায় জোড়ায় মাটি
সিন্তি বিছাইলাম মাও গো
শ্যাম রঙ্গের পাটি।
সিন্তি বিছাইলাম মাও গো

www.pathagar.com

শ্যাম রঙ্গের পাটি।
পাটিন্যা তুলিয়্যা মাও গো
বাসর করিলেন খালি।
কেনেরে মজুরের ছেলেরা
করলি এত রাত্রি।
গালি ন্যা দিলিলো বালি
বাপ মাও তুইল্যা।
তোরই শাড়িরই জইন্যে
হইল এত রাত্রি।

মায়েরইন্যা জলের গো মদে
লক্ষ ট্যাকার শাড়ি।
মায়েকে এজাইতে বুজাইতে
হইল এত রাত্রি।

৭.

শ্বশুরে আইনাছে চানমনি
পবন বাতাসীর মাছ।
আরে শ্বশুরে আইনাছে চানমনি
পবন বাতাসির মাছ।

শাশুড়ি কহিছে চানমনি পবনমাছ
ঘরে বসিয়্যাই কুট।
যায়ে কহিছে চানমনি পবনমাছ
উসুরায় বসিয়্যা কুট।
আরে যায়ে কহিছে চানমনি পবনমাছ
উসুরায় বসিয়্যা কুট।
দুষমনি ননন্দে কহিছে পবনমাছ
উইঠ্যানে বসিয়্যাই কুট।
আরে দুষমনি ননন্দে কহিছে পবনমাছ
উইঠ্যানে বসিয়্যাই কুট।
আসমানের দুপুনি চিল গো
হাতে মারিছে থাপড়া
আরে আসমানের দুপুনি চিল গো
হাতে মারিছে থাপড়া
শির্যার সোয়ামি আইয়্যা চাইছে
ঠাণ্ডা সাগরের পানি
আরে শির্যার সোয়ামি আইয়্যা চাইছে
ঠাণ্ডা সাগরের পানি।

www.pathagar.com

পানি তুলিতে চানমনি
হাতে পড়িল নজর
আরে পানি তুলিতে চানমনি
হাতে পড়িল নজর ।
তোমার হাতে গো চানমনি
কিসের আচড় নাগছে
আরে তোমার হাতে গো চানমনি
কিসের আচড় নাগছে ।
শ্বশুরে আইনাছে সাধু গো
পবন বাতাসির মাছ
আরে শ্বশুরে আইনাছে সাধু গো
পবন বাতাসির মাছ ।
শাশুড়ি কহিছে সাধু গো পবনমাছ
ঘরে বসিয়্যাই কুট
আরে শাশুড়ি কহিছে সাধু গো পবনমাছ
ঘরে বসিয়্যাই কুট ।
যায়ে কহিছে সাধু গো পবনমাছ
উসুরায় বসিয়্যা কুট ।
আরে যায়ে কহিছে সাধু গো পবনমাছ
উসুরায় বসিয়্যা কুট ।
দুষমনি ননন্দে কহিছে সাধু গো পবনমাছ
উইঠ্যানে বসিয়্যাই কুট ।
আরে দুষমনি ননন্দে কহিছে সাধু গো পবনমাছ
উইঠ্যানে বসিয়্যাই কুট ।
আসমানের দুপুনি চিল গো
হাতে মারিছে থাপড়া
আরে আসমানের দুপুনি চিল গো
হাতে মারিছে থাপড়া ।
থাক থাক গো বালি
আল্লার দিকি চাইয়্যা ।
আরে থাক থাক গো চানমনি
মাটির দিকি চাইয়্যা ।
মায়েরে দিমু গো চানমনি
ফুল পালঙ্কের বিছন্যা
আরে মায়েক দিমু গো চানমনি
ফুল পালঙ্কের বিছন্যা ।
ভাইবউয়েক দিমু গো চানমনি
আলাদা বাড়ি কইর‍্যা

www.pathagar.com

আরে ভাইবউয়েক দিমু গো চানমনি
আলাদা বাড়ি কইর‍্যা।
বুবুরে দিমু গো চানমনি
দূরদেশে বিয়্যা
আরে বুবুরে দিমু গো চানমনি
দূরদেশে বিয়্যা।
আমরা করমু গো বালি
সুখের অনা সংসার
আরে আমরা করমু গো চানমনি
সুখের অনা সংসার।

৮.

আগন্যা সুরিতে সুরিতে ধুলায় অন্ধকার হইল গো
আগন্যা সুরিতে সুরিতে ধুলায় অন্ধকার হইল।
তারই মদে আইল মায়ের পেটের ভাইধন গো
তারই মদে আইল মায়ের পেটের ভাইধন।

বসেন বসেন ভাইধন বাদামি টৌলের উপর গো
বসেন বসেন ভাইধন বাদামি টৌলের উপর।
শুনেন শুনেন ভাইধন আমার দুঃখের কথা গো
শুনেন শুনেন ভাইধন আমার দুঃখের কথা।
আমারে যে দিছেন বিয়্যা বান্দি দেন নাই সঙ্গে গো
আমারে যে দিছেন বিয়্যা বান্দি দেন নাই সঙ্গে।
যান যান ভাইধন জামালপুরের হাটে গো
যান যান ভাইধন সইরস্যাবাড়ির হাটে।
আগের হাটে ঘুরিয়্যা কিনব্যান ভাইধন
আগন্যা সুরিব্যার দাসী গো।
মইদের হাটে ঘুরিয়্যা কিনবেন ভাইধন
মসলা বাটনের দাসী।
শেষের হাটি ঘুরিয়্যা কিনবেন ভাইধন
কাপড় খচনের দাসী গো
শেষের হাটি ঘুরিয়্যা কিনবেন ভাইধন
কাপড় খচনের দাসী।
আগের হাটি ঘুরিয়্যা কিনছে ভাইধন
রাজার একটি রাণী গো
মইদের হাটি ঘুরিয়্যা কিনছে ভাইধন
রাজার একটি মেয়ে।
শেষের হাটি ঘুরিয়্যা কিনছে ভাইধন

www.pathagar.com

রাজার একটি মাও গো
শেষের হাটি ঘুরিয়্যা কিনছে ভাইধন
রাজার একটি মাও।

আনবের কইছি ভাইধনরে আগন্যা সুরনের দাসী গো
আইন্যা দিছে ভাইধন আমারে ভাত বারনের দাসী।
আনবের কইছি ভাইধনেরে মসলা বাটনের দাসী গো
আইন্যা দিছে ভাইধন আমারে ভাত বারনের দাসী।
আনবের কইছি ভাইধনেরে কাপড় খচনের দাসী গো
আইন্যা দিছে ভাইধন আমারে কাপড় ধোয়ানের দাসী।

মায়ের পেটের ভাইধন হইয়্যা ঘরে তুলিল সতীন গো
মায়ের পেটের ভাইধন হইয়্যা ঘরে তুলিল সতীন।
আগন্যা সুরিতে সুরিতে ধুলায় অন্ধকার হইল গো
আগন্যা সুরিতে সুরিতে ধুলায় অন্ধকার হইল।

৯.

ছোট বড় কড়ি কড়ি অঞ্চলে বান্ধিলাম
সিঅ কড়ি নিয়্যা বাবা যায় বগুড়ার হাটে
বগুড়ার হাট যাইয়্যা বাবা শাড়ি দাম করে
শাড়ি আলা বলে চাচা চোখে কেন পানি
বড় বেটির বিয়্যা চাচা তাই চোক্কে পানি।

ছোট বড় কড়ি কড়ি অঞ্চলে বান্ধিলাম
সিঅ কড়ি নিয়্যা জেঠ যায় মেলান্দর হাটে
মেলান্দর হাট যাইয়্যা জেঠ পাটি দাম করে
শাড়ি আলা বলে জেঠ চোক্কে কেন পানি
মাইজল্যা ভাস্তির বিয়্যা জেঠ তাই চোক্কে পানি।

ছোট বড় কড়ি কড়ি অঞ্চলে বান্ধিলাম
সিঅ কড়ি নিয়্যা চাচা যায় ইসলামপুরের হাটে
ইসলামপুরের হাট যাইয়্যা বাবা শাড়ি দাম করে
শাড়ি আলা বলে চাচা চোখে কেন পানি
বড় বেটির বিয়্যা চাচা তাই চোক্কে পানি।
ছোট বড় কড়ি কড়ি অঞ্চলে বান্ধিলাম।

১০.

ছোট বড় কারাঙ্গাখানি
মেলিল পঞ্চডাল।
এত সুন্দর বিবি গো তুমি

www.pathagar.com

কেশ কোথায় পাইছ
মায়ের গর্ভে থাকিতে সাধু
মায়ের ঘর আছিল ছোনের
সেই গতিকে চুল আমার
ছোনের মুতন হইছে।

ছোট বড় কারাঙ্গাখানি
মেলিল পঞ্চডাল
এত সুন্দর বিবিগো তুমি
চোখখান কোথায় পাইছ
মায়ের গর্ভে থাকিতে সাধু
মায়ের ঘরে আছিল তারা
সেই গতিকে চোখখান আমার
তারার মুতন হইছে।
ছোট বড় কারাঙ্গাখানি
মেলিল পঞ্চডাল।
এত সুন্দর বিবিগো তুমি
মুখখান কোথায় পাইছ
মায়ের গর্ভে থাকিতে সাধু
মায়ের ঘরে আছিল চান
সেই গতিকে মুখখান আমার
চান্দের মুতন হইছে।

১১.

চত্তুর মির‍্যা বেতের গো আরা
মদে আইমন খাড়া
কোতায় গেলা আইমলের বাপ গো
আইমল পরদেশ মাগে।
কালই দেখলাম দুধের গো বাল্যগ
আজই পরদেশ মাগে।
চত্তুর মির‍্যা বেতের গো আরা
মদে আইমল খেলে।
কোতায় গেলা আইমলের জেঠি গো
আইমল পরদেশ মাগে।
কোতায় গেলা আইমলের চাচী গো
আইমল পরদেশ মাগে।

কালই দেখলাম দুধের গো বাল্যগ
আজই পরদেশ মাগে।

www.pathagar.com

চত্তুর মিরয়া বেতের গো আরা
মদে আইমল খেলে ।

১২.

উত্তরে তনে আইল নওশা মিয়া
লালঘোড়া দাবড়াইয়্যা
বান্দ বান্দ ঘোড়া
নওশা মিয়া বকুল বিরিখের তলে ।
কি কি সদাই আনছ
নওশা মিয়া ব্রিফকেস খুল তো দেখি ।
সব সদাই আনছি
বালিলো নাকের বেসর ছাড়ছি ।
ঘুরিয়্যা ফিরিয়্যা যাইয়্যা
নওশা মিয়া তোর বইনেক করগা বিয়্যা ।
ঘুরিয়্যা ফিরিয়্যা যাইয়্যা
নওশা মিয়া তোর বইনেক করগা বিয়্যা ।
উত্তরে তনে আইল নওশা মিয়া
নীলঘোড়া দাবড়াইয়্যা
বান্দ বান্দ ঘোড়া
নওশা মিয়া বকুল বিরিখের তলে ।
কি কি সদাই আনছ
নওশা মিয়া ল্যাদার খুলছেন দেখি ।
সব সদাই আনছি
বালির হার ফেলাইয়্যা আইছি ।
ঘুরিয়্যা ফিরিয়্যা যাইয়্যা
নওশা মিয়া তোর বইনেক করগা বিয়্যা ।
ঘুরিয়্যা ফিরিয়্যা যাইয়্যা
নওশা মিয়া তোর নানীক করগা বিয়্যা ।

উত্তরতনে আইল
নওশা মিয়া লালঘোড়া সাজাইয়্যা
কি কি সদাই আনছ
নওশা মিয়্যা সুটকেস খুলছেন দেখি
সব সদাই আনছি
বালির পেটিকোট ফেলাইয়্যা থুয়াইছি ।
সব সদাই আনছি
বালির ব্লাউজ ফেলাইয়্যা আইছি ।
ঘুরিয়্যা ফিরিয়্যা যাইয়্যা

www.pathagar.com

নওশা মিয়া তোর দাদিক করগা বিয়্যা।
ঘুরিয়্যা ফিরিয়্যা যাইয়্যা
নওশা মিয়া তোর ভাবীক করগা বিয়্যা।

১৩.

পালকি না হেলে পালকি না ডুলে
কেনেরে পালকি এত ভারি নাগে।
পালকিরই দরজা খুলিয়্যা দেখি
নওশার বইন্ত্যা আইছে কি সংগে
আইছে গো আইছে ভালই গো হইছে
গবর ফেলানের জয়ডাঙ্গা হইছে।

পালকি না হেলে পালকি না ডুলে
কেনেরে পালকি এত ভারি নাগে।
পালকিরই দরজা খুলিয়্যা দেখি
নওশার চাচা আইছে কি সংগে
আইছে গো আইছে ভালই গো হইছে
বাড়ি সুরনে ফেলানের জয়ডাঙ্গা হইছে।
আগন্যা সুরনে জয়ডাঙ্গা হইছে।

১৪.

সীমার স্বামী গেছে চাকরি করিতে
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না
চাকরি করিয়া সীমার শাড়ি কিনে পাঠাবে
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।

শাড়ি পইর‌্যা আমি কার কাছে ডুলাব
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।
শাড়ি পইর‌্যা তুমি শ্বশুর শ্বশুর ডুলাব্যা
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।

সীমার ভাসুর গেছে চাকরি করিতে
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।
চাকরি করিয়্যা সীমার সিথি কিনিয়্যা পাঠাবে
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।
সিতি পইর‌্যা আমি কার কাছে ডুলাব
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।
সিথি পইর‌্যা তুমি ভাসুর ভাসুর ডুলাব্যা
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।

www.pathagar.com

সীমার দেবর গেছে চাকরি করিতে
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।
চাকরি করিয়্যা সীমার গয়না কিনিয়্যা পাঠাবে
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।
গয়না পইর‍্যা আমি কার কাছে ভুলাব
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।
গয়না পইর‍্যা তুমি দেবর দেবর ভুলাব্যা
আল্লাদের সীমা তুমি কান্দিয়ো না।

১৫.

বালির নাকের উপুর জুর জুর ছবি কাটে যে
হায় বাঁশি বাজে।
শ্বশুর বাড়ি গেলে বালির নাকের মাইলন পড়ে যে
হায় বাঁশি বাজে।
বালি বাপের বাড়ি আইল্যা বালি নাকের যত্তন করে যে
হায় বাঁশি বাজে।

বালির সিতির উপুর জুর জুর ছবি কাটে যে
হায় বাঁশি বাজে।
শ্বশুর বাড়ি গেলে বালির সিতির মাইলন পড়ে যে
হায় বাঁশি বাজে।
বালি বাপের বাড়ি আইল্যা বালির সিতির যত্তন করে যে
হায় বাঁশি বাজে।

বালির হাতের উপুর জুর জুর ছবি কাটে যে
হায় বাঁশি বাজে।
শ্বশুর বাড়ি গেলে বালির হাতের মাইলন পড়ে যে
হায় বাঁশি বাজে।
বালি বাপের বাড়ি আইল্যা বালি হাতের যত্তন করে যে
হায় বাঁশি বাজে।

বালির মুখের উপুর জুর জুর ছবি কাটে যে
হায় বাঁশি বাজে।
শ্বশুর বাড়ি গেলে বালির মুখের মাইলন পড়ে যে
হায় বাঁশি বাজে।
বালি বাপের বাড়ি আইল্যা বালি মুখের যত্তন করে যে
হায় বাঁশি বাজে।

বালির পায়ের উপুর জুর জুর ছবি কাটে যে
হায় বাঁশি বাজে।

www.pathagar.com

শ্বশুর বাড়ি গেলে বালির পায়ের মাইলন পড়ে যে
হায় বাঁশি বাজে।
বালি বাপের বাড়ি আইল্যা বালি পায়ের যত্তন করে যে
হায় বাঁশি বাজে।
হায় বাঁশি বাজে।

তথ্যসূত্র : ১নং থেকে ১৫নং গীতের গায়ক মোছা. ফাহিমা খাতুন (৩৮), স্বামী : মো. আশরাফ আলী, গ্রাম : হরিনাপাই, ডাকঘর : ফুলকোচা, থানা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর। সংগ্রহের তারিখ : ১৮-০১-২০১০

১৬.

উইঠেন সোরে কালা গো মামানি
কোমর ন্যাচর ব্যাচর করে গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।
শোনেন শোনেন শোনেন গো মামানি
মামু কোতায় গেছে গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।

তোমার মামু গেছে গো ভাগিন্যা
ইসলামপুরের হাটে গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।

আজক্যার রাতখান থাকগো ভাগিন্যা
খাসি জব কইর‍্যা খিল্যামু গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।
তোমার মামুর হইচি গো করিব
খাসি কিসে খাইছে গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।

তখন আমি ফাঁকি গো দিমু
খাসি শিয়ালে খাইছে গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।

আজক্যার রাত খান থাকগো ভাগিন্যা
মোরগ জব কইর‍্যা খিল্যামু গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।
তোমার মামু হইচি গো করিব
মোরগ কিসে খাইছে গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।

তখন আমি ফাঁকি গো দিমু
মোরগ ওয়াফে খাইছে গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।

www.pathagar.com

আজক্যার রাতখান থাকগো ভাগিন্যা
পুষ্কুনিত ঝাপুনি খ্যালামু গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।

তোমার মামু হইচি গো করিব
পুষ্কুনির পানি কে ঘুইল্যা গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।
তখন আমি ফাঁকি গো দিমু
পুষ্কুনির কই মাছ উইজেছে গো
কালা কাজলের ভাগিন্যা গো।

১৭.

মাই নামাই আন গো
মাই নামাই আন গো
আমার পূবের বেলোহারেক নামাই আন গো।
আমার পূবের বেলোহারেক নামাই আনগো।
বধূ নাইম্যা আসগো
বধূ নাইম্যা আসগো
আমার বাহি আগন্যা সুরব্যার অব্যায় আছে গো
আমার বাহি আগন্যা সুরব্যার অব্যায় আছে গো।

আম্মা নাম্মু না গো
আম্মা নাম্মু না গো
আমি বাহি আগন্যা সুরব্যার
নাম্মু না গো।

চাচী নামাই আন গো
চাচী নামাই আন গো
আমার পূবের বেলোহারেক
নামাই আনগো

বধূ নাইম্যা আস গো
বধূ নাইম্যা আস গো
আমার বাহি ঘর সুরব্যার অব্যায় আছে গো
আমার বাহি ঘর সুরব্যার অব্যায় আছে গো

চাচীমা নাম্মু না গো
চাচীমা নাম্মুনা গো
আমি বাহি ঘর সুরব্যার নাম্মু না গো।

জেঠি নামাই আন গো
জেঠি নামাই আন গো

www.pathagar.com

আমার পূবের বেলোহারেক নামাই আন গো
আমার পূবের বেলোহারেক নামাই আন গো

বধূ নাইম্যা আস গো
বধূ নাইম্যা আস গো
আমার বাহি পাইল্ল্যা মাঞ্জিব্যার অব্যায় আছে গো
আমার বাহি পাইল্ল্যা মাঞ্জিব্যার অব্যায় আছে গো

জেঠিমা নাম্মু না গো
জেটিমা নাম্মু না গো
আমি বাহি পাইল্যা মাঞ্জিবার নাম্মু না গো
আমি বাহি পাইল্যা মাঞ্জিবার নাম্মু না গো ।

ভাবী নামাই আন গো
ভাবী নামাই আন গো
আমার পূবের বেলাহারেক নামাই আন গো

কইন্ন্যা নাইম্যা আস গো
কইন্ন্যা নাইম্যা আস গো ।
আমার বাহি বিছন্যা তুলব্যার অব্যায় আছে গো
আমার বাহি বিছন্যা তুলব্যার অব্যায় আছে গো ।

ভাবী নাম্মু না গো
ভাবী নাম্মু না গো
আমি বাহি বিছন্যা তুলব্যার নাম্মু না গো
আমি বাহি বিছন্যা তুল্যাবার নাম্মু না গো ।

ভাবী দেন গো
ভাবী পান্টি দেন গো
আমার পূবের বেলাহারেক নামাই আন গো
আমার পূবের বেলাহারেক নামাই আন গো ।

সাধু পান্টি নাগবনা গো
পান্টি নাগবনা গো
আমি আস্তে ধীরে নাইম্যা আসি গো
আমি আস্তে ধীরে নাইম্যা আসি গো ।

১৮.

বাউই উড়ে ঝাঁকেরে ঝাঁকে
কোস্টার বাদাত যেন নাগে
আরে বাউই উড়ে ঝাঁকেরে ঝাঁকে
কোস্টার বাদাত যেন নাগে ।

www.pathagar.com

আরে খবরের আগে খবর গো দিও
হাসেনের শ্বশুরের দেশে।
আরে খবরের আগে খবর গো দিও
হাসেনের শ্বশুরের দেশে।

আরে মানুষ যাব হাজারে হাজারে
বইসপ্যার যোগাড় যেন করে।
আরে মানুষ যাব হাজারে হাজারে
বইসপ্যার যোগাড় যেন করে।
আরে হাসেনের শাওড়ি আল্লাবিল্যা করে
কত লোক যেন আসে।
আরে হাছেনের শাওড়ি আল্লাবিল্যা করে
কত লোক যেন আসে।

আরে বাউই ঝাঁকেরে ঝাঁকে
কোস্টার বাদাত যেন লাগে।

আরে খবরের আগে খবর গো দিও
হাসেনের সুমুন্দির বাড়ি।

আরে মানুষ যাব হাজারে হাজারে
খাবার যোগাড় যেন করে।

আরে হাসেনের সুমুন্দির বউ আল্লাবিল্ল্যা করে
কত লোক যেন আসে।

আরে বাউই উড়ে ঝাঁকেরে ঝাঁকে
কোস্টার বাদাত যেন লাগে।

তথ্যসূত্র : ১৬নং থেকে ১৮নং গীতের গায়ক মোছা. জরিনা খাতুন, বয়স ৩৫, স্বামী : মো. ইদ্রিস আলী, গ্রাম : দেউলাবাড়ি (পোড়াবাড়ি), থানা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর, সংগ্রহের তারিখ : ০৯-১০-২০১০

১৯.

কুইয়্যার পার মিষ্টি কামরাঙ্গার গাছ গো (২)
তারির তলে চাম্পা গোসল করে গো। (২)
উপর তলা মজনু বাজায় বাঁশি গো ॥
বাঁশির সুরে চাম্পা চাম্পা করে গো (২)
চাম্পার মনে কয় সাবান ফিক্যা মারি গো। (২)
কুইয়্যার পার মিষ্টি কামরাঙ্গার গাছ গো (২)
তারির তলে চাম্পা থালি মাজে গো। (২)
দূরতনে মজনু বাজায় বাঁশি গো (২)

www.pathagar.com

বাঁশির সুরে চাম্পা চাম্পা করে গো (২)
চাম্পার মনে কয় থালি ফিক্যা মারি গো। (২)

২০.

সাধুর ঘরের দিয়ের চিসকে মাটি
সেথায় সাধু আইজ্যে ডালিমের বিচি
যখন ডালিমের একটি পাতা
তখন সাধুর সাথে আমার না হয় দেখা
যখন ডালিমের দুইটি পাতা
সাধুর সাথে আমার না হয় কথা ।
যখন ডালিমের তিনটি পাতা
তখন সাধুর সাথে আমার হইল দেখা।
যখন ডালিমের চারটি পাতা
তখন সাধুর সাথে আমার হইল কথা।

সাধু আমার পাটের ব্যাপারি
পাট বেচতে সাধুর হইল রাতি।
ঢাকা জেলার নানান পানি
সাধুর হইল দাস্ত বমি।
ডাক্তার বাবুর হাতে ধরি
ডাক্তার বাবুর পায়ে পড়ি
সাধুক দিব্যান আমার ভাল করি।
ডাক্তার বাবুর মুনের ভারি
সাধুক দিছে আমার বিষের বড়ি।

বাড়ির পাশে বড়ইর কুসি
সাধুর মুখে আমার নাইক্যা হাসি
বাড়ির সামনে জোসনার আলো
সাধুর মুখখান দেখতে ভাল।

২১.

পালকি হালে পালকি গো ডুলে
পালকির পিছনে জলেরে মন মনের মতন।
পালকির পিছনে চাইয়্যা গো দেখি
আব্বা আইসে নাই সঙ্গেরে মন মনের মতন।
আব্বার যদি বেটি গো হইলামনি
আব্বা আইলনি সঙ্গেরে মন মনের মতন।
পালকি হালে পালকি গো ডুলে
পালকির পিছনে জলেরে মন মনের মতন।

www.pathagar.com

পালকির পিছনে চাইয়্যা গো দেখি
জ্যাঠা আসে নাই সঙ্গেরে মন মনের মতন।
জ্যাঠার যদি ভাস্তি গো হইলামনি
জ্যাঠা আইলনি সঙ্গেরে মন মনের মতন।

পালকি হালে পালকি গো ঢুলে
পালকির পিছনে জলেরে মন মনের মতন।
পালকির পিছনে চাইয়্যা গো দেখি
ভাইজান আসে নাই সঙ্গেরে মন মনের মতন।
ভাইজানের যদি বইনি গো হইলামনি
ভাইজান আইলনি সঙ্গেরে মন মনের মতন।

তথ্যসূত্র : ১৯নং থেকে ২১নং গীতের গায়ক মোছা. সাজেদা খাতুন, বয়স-২২, স্বামী- মো. সাত্তার আলী, গ্রাম ও পো.- তেঘরিয়া, পেশা-গৃহিনী, স্বামীর পেশা- কৃষি, থানা-মাদারগঞ্জ, জেলা-জামালপুর, সংগ্রহের তারিখ : ১২-০৩-২০১০

মাদারগঞ্জ উপজেলার মেয়েলি গীত

১.
(গায়ক : নেপালি)

ওলি, নদীর পলি পানি ময়না
ওলি, নদীর পলি পানি ময়না
ভিম সাগরের পানি কিওরে ময়না
ভিম সাগরের পানি কিওরে ময়না
ওইনে, পুকুরের সাকুল খেলাইতে ময়না
ওইনে পুকুরের সাকুল খেলাইতে
ময়না হারাইল শীতের সিন্দূর কি
ওরে ময়না, হারাইল শীতের সিন্দূর কি
ওরে ময়না,
নাহি হারাই শীতের সেন্দূর ময়না
নাহি হারাই শীতের সেন্দূর ময়না
ফির ফির কিনে দিমু কিওরে ময়না
ফির ফির কিনে দিমু কিওরে ময়না
ওলি নদীর পলি পানি ময়না
ওলি নদীর পলি পানি ময়না।

সাধারণ অর্থ : গৃহস্থের আদরের এক মেয়ে। পুকুর বা নদীতে গোসল করতে গিয়ে পাড়াপড়শির সঙ্গে একধরনের খেলায় মেতে উঠেছে। খেলতে গিয়ে সিঁদুরের কৌটা হারিয়ে ফেলেছে। সেই মেয়েটির মা বলছেন, সিঁদুরের কৌটা হারিয়েছ, তাতে সমস্যা নেই। বারবার (ফির ফির মানে বারবার) তোমাকে সিঁদুর কিনে দেব।

www.pathagar.com

২.

(গায়ক : নেপালি)

নৌকা বয়ে যায় বৈঠে মাইরে যায়, ধীরেরে
ডালিমের কলি ৷৷
মইধ্যে নদীতে যাইয়ে ছিড়িল নৌকার অশিরে
ডালিমের কলি ৷৷
গাবুরের বাপের আছে নম্বা নম্বা দাড়িরে
ডালিমের কলি ৷৷
সেই না দাড়ি দিয়ে বানামু নৌকার অশিরে
ডালিমের কলি ৷৷
নৌকা বয়ে যায় বৈঠে মাইরে যায়, ধীরেরে
ডালিমের কলি ৷৷
অর্ধেক নদী যায়ে ছিড়িল নৌকার বাদামরে
ডালিমের কলি ।
গাবুরের বাপের আছে নম্বায় নম্বায় ধুতিরে
ডালিমের কলি ।
সেই না ধুতি দিয়ে বানামু নৌকার বাদামরে
ডালিমের কলি ৷৷

সাধারণ অর্থ : নববধূকে নৌকায় করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে মেয়েপক্ষের এমন একজন মহিলা, যার সাথে ছেলের বাপের ঠাট্টার সম্পর্ক। ডালিমের কলি বলে সম্বোধন করা হচ্ছে আদরের মেয়েটাকে। আর গাবুর অর্থ হচ্ছে জামাই। নৌকা দিয়ে যাওয়ার সময় যদি দাঁড়ের রশি ছিঁড়ে যায়, যদি পালের কাপড় ছিঁড়ে যায়, তবে কী উপায় হবে। এমন আশঙ্কায় ঠাট্টার সম্পর্কের ওই নারীটি মেয়েকে সান্ত্বনাস্বরূপ এমন আশার বাণী শোনাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, আগে এই এলাকার পুরুষদের মধ্যে ধুতি পরার একটা রীতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে তেমনটি আর লক্ষ করা যায় না।

৩.

(গায়ক : নেপালি)

জামালপুরের ডালা মাই মইধ্যে কালো ডোরা
মাই ঝামপো দিল কে ৷৷
সেই না ডালার মইধ্যে মাই বেটির শীতের সেন্দূর
মাই ঝামপো দিল কে।
ওই না ডালার মইধ্যে মাই কইন্যার শীতের সেন্দূর।
মাই ঝামপো দিল কে।

সাধারণ অর্থ : জামালপুরে বাঁশ দিয়ে সুদর্শন ডালা তৈরি করা হয়। ডালার মধ্যে নানা রকম নকশাও থাকে। বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে কনে সাজানোর জন্য সিঁদুর রাখা

www.pathagar.com

হয় ডালায়। সেই সিঁদুর কে বা কারা পুরো ডালায় মাখিয়ে ফেলেছে। তাই বলা হচ্ছে, ডালার যে আকার ছিল, তা তো নেই-ই; আবার ঝম্প (ডালার মধ্যে ঝাঁপ) দিল কে?

৪.
(গায়ক : নেপালি)

বাবাগেরে বাড়ির আগে ঘুঞ্চি বেতের আড়া আমার সোনাই লো ॥
তারই মইধ্যে এক পায়ের ঘাটা আমার সোনাই লো ॥
দুই বাঘে ধরিয়ে খাবার আসে আমার সোনাই লো ॥
বাঘ কাটিয়ে করমু শত চাকা আমার সোনাই লো ॥
সাপ কাটিয়ে বানামু ডেনার বাজু আমার সোনাই লো ॥
দুই বাঘে ধরিয়ে খাবার আসে আমার সোনাই লো।
ঢোলের বাদ্যি বাজে তালে তালে আমার সোনাই লো ॥
সানাইর বাদ্যি ঘিচিয়ে পিন্দ কাপড় আমার সোনাই লো।
সানাইর বাদ্যি ঘিচিয়ে পিন্দ শাড়ি আমার সোনাই লো।
দুই বাঘে ধরিয়ে খাবার আসে আমার সোনাই লো।

সাধারণ অর্থ : বাবার বাড়িতে ঘন জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হাঁটার মতো সরু একটি রাস্তা আছে। সেখানে যেতে বাঘের ভয়। কিন্তু তাতে কী? অভিসারে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনে বাঘকে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সাপের ভয়ও নস্যি তার কাছে। সাপ মেরে বাহুর (ডেনা) বাজু বানাতেও দ্বিধা নেই তার। এর জন্য সে ভালো কাপড় পরে প্রস্তুত। কারণ মনের মধ্যে ঢোল আর সানাই সুর বাজছে। তাতে ভ্রূক্ষেপ করার সময় নেই।

৫.
(গায়ক : নেপালি)

ছিটিয়ে ফেলাইলাম সাইল্লের ধানের বিছন
হরিহরি নাল কালাই
ছিটিয়ে ফেলাইলাম সাইল্লের ধানের বিছন
হরিহরি নাল কালাই
খুটিয়ে খাইল, বাবার দেশের কবিতর
হরিহরি নাল কালাই
খুটিয়ে খাইল, বাবার দেশের কবিতর
হরিহরি নাল কালাই
বারাওছেন মুঞ্জু হস্তের কুটা নয়ে
হরিহরি নাল কালাই
মাইরো না মুঞ্জু, বাবার বাড়ির কবিতর
হরিহরি নাল কালাই
ওই কবিতর মারিলে আব্বা হবো বেজার

www.pathagar.com

হরিহরি নাল কালাই
ওই কবিতর পালিছে হাটের সদাই খাওয়াইয়ে
হরিহরি নাল কালাই
ছিটিয়ে ফেলাইলাম, সাইল্লেরধানের বিছন
হরিহরি নাল কালাই ।

সাধারণ অর্থ : গৃহস্থ ঘরের মেয়ের বিয়ে হয়েছে আরেক গৃহস্থ ঘরে। নববিবাহিত এই বধূটি উঠানে বীজ ধান আর মসুর কলাই রোদে দিয়েছে। দেখে হঠাৎ কবুতর এসে সেই ধান আর ডাল খাচ্ছে। কবুতরটি দেখতে বধূটির বাপের বাড়ির কবুতরের মতো। এই কারণে তাঁর স্বামী যেন কবুতরটিকে আঘাত না করে সেই কথা বলছে। সেই কবুতরটি যে খুব আদরের, যত্ন করে তার বাবা লালন-পালন করেন, সেটিও বুঝিয়ে বলছে তার স্বামীকে।

৬.
(গায়ক : নেপালি)

ছোট্ট ছোট্ট মারোয়াল ঢাল ঢাল পাতা ॥
শহরে মেলিয়া গেল ডাল, কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ।
আরে বন্দরে মেলিয়া গেল ডাল, কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ।
আরে ওই না মারোয়াল তুলতে গেল কইন্যার ভাবীরে ॥
মাইকআলা লাগিয়ে গেল পাছ কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ।
ইশকেআলা লাগিয়ে গেল পাছ কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ।
আরে হাত ধরি নে পাও ধরি ইশকেআলারে ॥
হাত ধরি নে পাও ধরি মাইকআলারে
ছাড়িয়ে দে মোর গুণের ভাবীর হাত কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ।
আরে ছাড়িয়ে দে মোর আমার ভাবীর হাত কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ।
আরে ছোট্ট ছোট্ট মারোয়াল ঢাল ঢাল পাতা ।
ছোট্ট ছোট্ট মারোয়াল ঢাল ঢাল পাতা ।
বন্দরে মেলিয়া গেল ডাল কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ॥
শহরে মেলিয়া গেল ডাল কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ।
আরে ওই না মারোয়াল তুলতে গেল কইন্যার চাচীরে ॥
মাইক্রোআলা লাগিয়ে গেল পাছ কী মারোয়াল

www.pathagar.com

ভালোবাসুম তোরে ॥
আরে হাত ধরি না পাও ধরি মাইক্রোআলারে ॥
ছাড়িয়ে দে মোর আমার চাচীর হাত কী মারোয়াল
ভালোবাসুম তোরে ॥

সাধারণ অর্থ : মাদারগঞ্জ অঞ্চলে আগে যারা ব্যবসাপাতি করত, তাদের মারোয়ারি বলা হতো। 'মারোয়ারি' শব্দটিই মারোয়াল হয়ে গেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, এক কন্যা এক মারোয়ালকে ভালোবাসার আশ্বাস দিয়ে নানা ছোট বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে যাচ্ছে। বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে কিছু বিড়ম্বনার সম্মুখীন নববধূর ননদ সম্পর্কের কেউ। তাই তার পছন্দের মারোয়ালকে স্মরণ করছে আসন্ন বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। এখানে 'ইশকে' রিকশা শব্দের আঞ্চলিক রূপ।

৭.

(গায়ক : নেপালি)

কালা মাটি ধলা গো বেগুন চিরল চিরল পাতা, হায় গো ॥
সিও বেগুন তুলিতে সোয়ামি নইগ ফুটল কাঁটা, হায় গো ॥
যাও যাও ওগো সোয়ামি মেলান্দরের হাটে, হায় গো ॥
বাইছে বাইছে কিনো গো সোয়ামি চিকন চিকন সুইও, হায় গো ॥
মইলাম মইলাম, মইলাম গো সোয়ামি দারুণ নইগের বিষ ওগো, হায় গো ॥
খসাও খসাও, খসাও ওগো সোয়ামি দারুণ নইগের কাঁটা, হায় গো ॥

সাধারণ অর্থ : নববিবাহিতা বউ ক্ষেতে গেছে বেগুন তুলতে। মাদারগঞ্জে সাদা জাতের একধরনের বেগুন হয়। এই বেগুনগুলোর বোঁটায় সচরাচর কাঁটা থাকে। অর্বাচীন এই বধূটি জানে না, কীভাবে এই বেগুন তুলতে হয়। বেগুন তুলতে গিয়েই হাতের আঙুলে কাঁটা ফুটেছে তার। কাঁটার ব্যথায় কাতর এই বধূটি তাই তার স্বামীর প্রতি মিনতি করছে যেন মেলান্দহ (মাদারগঞ্জের পাশে উপজেলার নাম) বাজার একটা চিকন সুই কিনে আনে। সেই সুই দিয়ে বিষম ব্যথায় আক্রান্ত হাতের কাঁটা বের করবে। সুইটি আনার পর স্বামী সেই কাঁটাটি বের করে দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করছে নববধূটি।

৮.

(গায়ক : নেপালি)

সাধু যে আইজে গেছে মিষ্টি কারাঙ্গার গাছ ওগো আল্লাহ।
তারই যে ডালও গেছে বগুড়ার শহরের মইদে গো আল্লাহ ॥
তারই যে ছ্যামায় ছ্যামায় বগুড়ার হাকিমেরা বইসে গো আল্লাহ।
তারাই যে খাবার চাইছে আমারই হাতে পানি গো আল্লাহ ॥
সাধু যে মানা করছে বাড়ির বাহির যেন হইও না আল্লাহ।
কেমনে দিমু আমি আমারই হাতের পানি গো আল্লাহ ॥

সাধু যে আইজে গেছে মিষ্টি কারাঙ্গার গাছ ওগো আল্লাহ।
তারই যে ডালও গেছে বগুড়ার শহরের মইদে গো আল্লাহ ॥

www.pathagar.com

তারই যে ছ্যামায় ছ্যামায় বগুড়ার উকিলেরা বইসে গো আল্লাহ।
তারাই যে খাবার চাইছে আমারই হাতে পানও গো আল্লাহ ॥
কেমনে দিমু আমি আমারই হাতের পান ওগো আল্লাহ।
সাধু যে মানা করছে বাড়ির বাহির যেন হইও না আল্লাহ ॥

সাধারণ অর্থ : এখানে সাধু হচ্ছেন গ্রাম্য রমণীটির স্বামী। যিনি একটা মিষ্টি কামরাঙ্গার (মাদারগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় কামরাঙ্গাকে কারাঙ্গা বলে) গাছ লাগিয়েছেন (আইজে)। যে গাছটির ছায়া বাড়ির আঙিনা পার হয়ে শহরের আদালতপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধু তো যথারীতি বাড়িতে কম কম থাকেন। এই সুযোগে হাকিমেরা এই কামরাঙ্গা গাছটির বাড়িওয়ালির হাতে পানি এবং আর উকিলেরা পান খেতে চান। সহজ-সরল গ্রাম্য এই নারী সেসব খাওয়ানোর ইচ্ছে পোষণ করলেও তার সাধু স্বামীর বাইরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার কথা মনে পড়ছে।

৯.

(গায়ক : নেপালি)

ঢোলও বাজে ডগর-মগর।
কবিতর বাকে থমোকে থমোকে ॥
সড়ক দিয়ে যায় আমার বানুইয়ে।
ডাক দিয়ে বসাও বাবার একখান ঘরে ॥
আমরই নিমু তেরাই সিতের সেন্দূর।
তাও না যামু আপোনার বাসরে ॥
ঢোলো বাজে ডগর মগর।
কবিতর বাকে থমোকে থমোকে ॥
ওইখান দিয়ে যায় আমার সোনারু।
ডাক দিয়ে চাচার একখান ঘরে ॥
আমরাই নিমু বোচা নাকের বেসর।
তাও না যামু আপোনার বাসরে ॥

সাধারণ অর্থ : একজন কন্যা অপেক্ষা করছে তার বিয়ের জন্য। এর জন্য হয়তো পুরো প্রস্তুতি নেই ছেলেপক্ষের। এই জন্য রাস্তা দিয়ে যে বানিয়া (নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা জিনিস ফেরি করে বিক্রি করত) যাচ্ছে, তাকে ডেকে বসতে দিতে বলছে কন্যা নিজেই। আবার স্বর্ণকার (এখানে সোনারু) তাকেই ডাকতে বলছে কন্যা নিজেই। একজনকে বাবার ঘরে আরেকজনকে চাচার ঘরে। কারণ 'আপোনার বাসরে' যেতে হবে। এই 'আপোনার' হলো স্বামী। আর এখানে 'তাও না যামু' কথাটি ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গীতের গায়ন শোনলে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

১০.

(গায়ক : নেপালি)

ও শরিফের বাপ আমার গরু দেখিয়ে শুরু হয়েছে
ও শরিফের বাপ ॥

www.pathagar.com

আমি আর যাব না জলের ঘাটে
ও শরিফের বাপ ॥
আমার ভার করিয়ে জল আইনে দেও
ও শরিফের বাপ ॥
আমি জুঁক দেখিয়ে পুক মাইরেছি
ও শরিফের বাপ ॥
আমি আর যাব না জলের ঘাটে
ও শরিফের বাপ ॥
আমার ভার করিয়ে জল আইনে দেও
ও শরিফের বাপ ॥
আমি ভেড়া দেখিয়ে টেরা হইয়েছি
ও শরিফের বাপ ॥
আমি আর যাব না জলের ঘাটে
ও শরিফের বাপ ॥
আমার ভার করিয়ে জল আইনে দেও
ও শরিফের বাপ ॥
আমি ঘোড়া দেখিয়ে খোড়া হইয়েছি
ও শরিফের বাপ ॥
আমি আর যাব না জলের ঘাটে
ও শরিফের বাপ ॥
আমার ভার করিয়ে জল আইনে দেও
ও শরিফের বাপ ॥
আমি সাপ দেখিয়ে লাফ মাইরেছি
ও শরিফের বাপ ॥
আমি আর যাব না জলের ঘাটে
ও শরিফের বাপ ॥
আমার ভার করিয়ে জল আইনে দেও
ও শরিফের বাপ ॥

সাধারণ অর্থ : নতুন বউ স্বামীর বাড়িতে প্রথম প্রথম নানা প্রতিকূলতর সম্মুখীন হতে পারেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, বাড়ির পুকুর ঘাটে জল আনতে গিয়ে একবার গরু দেখে ভয় পেয়েছে। এরপর একে জোঁক, এরপর ঘোড়া, ভেড়া, সাপ নানা জীবজন্তুর ভীতি কাজ করছে, তার মধ্যে। সেই কারণে স্বামীর কাছে তার আবদার, স্বামী যেন ভার (বাঁশের তৈরি বাঁক দিয়ে কাঁধে করে কোনোকিছু বহন করা) করে হলেও তার রান্না-বান্নাসহ প্রয়োজনীয় জল এনে দেন।

১১.

(গায়ক : নেপালি)

সড়ক দিয়ে যায় আমার তাতুয়ে আরশের ভাইধন কিও।
আরে তাতখান ফেইলে আমার শাড়িখান বুনায়ে দিবেন কিও ॥

www.pathagar.com

আরে সারা শাড়ি বুইনেয়ে আমার পেছনে লাগাবেন ডোরা কিও।
আরে তবে যে হমু আমি শ্বশুরের মুখের পানফুল কিও ॥
আরে তবে হমু আমি শাশুড়ির মুখের পানফুল কিও।

আরে রাস্তা দিয়ে যায় আমার খলিফে আরশের ভাইধন কিও ॥
আরে মেশিনখান ফেইলে আমার বেলাউস বানিয়ে দিবেন কিও।
আরে সারা বেলাউস বানিয়ে আমার সাইটে লাগাবেন বোতাম কিও ॥
আরে তবে যে হমু আমি সোয়ামির মুখের পানফুল কিও।
আরে তবে যে হমু আমি সোয়ামির মুখের বাঁশি কিও ॥

সাধারণ অর্থ : আগেকার দিনে তাঁতিরা বাড়ি বাড়ি ঘুরেও তাঁতের শাড়ি বানিয়ে দিতেন। সেটা বোঝা যায় এই গীতটি শোনলে। নতুন গেছে শ্বশুরবাড়ি। তার ভেতরে চলছে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছাকাছি যাওয়ার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করার প্রয়াস। এরই ধারাবাহিকতায় তার বাপের দেশের এক তাঁতিকে দেখে তার মনের মতো তাঁতের শাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য অনুনয় করছে। তার বিশ্বাস, একটা সুন্দর তাঁতের শাড়ি পরা অবস্থায় তাকে আরো বেশি সুন্দর দেখাবে। আর এতে তার শ্বশুর-শাশুড়ি তার ওপর খুশি হবেন। একইভাবে একজন 'খলফে'কে (দরজিকে মাদারগঞ্জে খলফে বলে ডাকা হয়) দেখে ডেকে একটি সুন্দর ব্লাউস বানিয়ে দেওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করছে। এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে, যেন এই দরজিও তার বাপের দেশ থেকে এসেছে।

১২.

(গায়ক : নেপালি)

মনও পোড়ায় মালঞ্চা, মনও পোড়ায় মালঞ্চা
মায়েরই কারণে, হায় মালঞ্চা মায়েরই কারণে।
তোমার মায়ের নাইগা ইশকে পাঠাইছি
মালঞ্চা আসিব সকালে ॥
তোরও মাও আইসে বিছনে পারিব
মালঞ্চ থাকিবি শুতিয়ে ॥
মনও পোড়ায় মালঞ্চার মনও পোড়ায়
মালঞ্চার, বোনেরও কারণে ॥
তোমার বোনের নাইগে ইশকে পাঠাইছি মালঞ্চা
আসিব সকালে, আরে মালঞ্চা আসিব সকালে ॥
তোমার বইন আসিয়া রান্ধন রান্ধিব মালঞ্চা
খাবিও বসিয়ে, আরে মালঞ্চা খাবিও বসিয়ে ॥
মনও পোড়ায় মালঞ্চার, মনও জোড়ায় মালঞ্চার
চাচীরই কারণে, আরে মালঞ্চা চাচীরই কারণে।
তোর চাচীর নাইগে মটর পাঠাইছি মালঞ্চা
আসিবে সকালে, আরে মালঞ্চা আসিব সকালে ॥
তোর চাচী আসিয়ে বারিন্দে সুরিব মালঞ্চা
খাবিও বসিয়ে, আরে মালঞ্চা খাবিও বসিয়ে ॥

www.pathagar.com

সাধারণ অর্থ : সন্দেহ নেই মালঞ্চা নামের মেয়েটি বালিকা বধূ। আগের অপ্রাপ্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ের রীতিটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সর্বজনবিদিত ছিল। বাল্যবিবাহের শিকার এই মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে। সে প্রতীক্ষা করছে তার আপনজনদের কেউ যেন তাকে দেখতে আসে। বাপের দেশের কাউকে না দেখে তার মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই তাকে কেউ একজন প্রবোধ দিচ্ছে যে, একটু ধৈর্য ধরো তোমার মা, বোন, চাচী সবাই আসবে। এরই মধ্যে তাদের খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে কে কী করবে, তারও একটা নিখুঁত বর্ণনা আছে।

১৩.

(ফেরদৌসী বেগম)

চাচায় দেখে ভাস্তিরও না সুরুত গো
ভাস্তি আমার সুন্দরি গো, জামাতা আমার ঘ্যাগা গো,
কিবেও দিমু আমি ঘ্যাগা জামাতার কাছে গো।
কিবেও দিমু আমি ঘ্যাগা জামাতার কাছে গো।

চাচা আমার বুজিয়ে গো, বেবুজ কতা কইই গো
ঘ্যাগা আমার মিঠেরও না সেরও গো।
ঘ্যাগা আমার মিঠেরও না সেরও গো ॥

সাধারণ অর্থ : জনৈক চাচার ভাতিজি (ভাস্তি) ভালোবাসার সম্পর্ক করেছে এক পুরুষের সঙ্গে। বিয়ের কথাবার্তা যখন চলছে, পাত্র হিসেবে সেই ছেলেটিকে পছন্দ হয়নি চাচার। কারণ ছেলে গলগণ্ড (ঘ্যাগ) রোগ আছে। চাচা একবার ছেলের দিকে তাকায়, আরেকবার ভাস্তির চেহারা দেখে। তখন চাচা প্রথম স্তবকের কথাগুলো বলতে থাকে। আর সেই কথা শুনে ভাস্তি বলছে নিজের স্তবকের কথাগুলো। গলার ঘ্যাগটি ভাতিজির কাছের গুড়ের দলার মতো সুন্দর মনে হয়। আসলে ভালোবাসার মানুষটির রূপ-সৌন্দর্য যে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না, সেটা সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেটাই প্রমাণিত হয়েছে এই গীতের কথাগুলোর মধ্য দিয়ে।

১৪.

(ফেরদৌসী বেগম)

নাল সুইতে ধলা সুইতে, রেশমি সুইতের গামছা গো
ও বুলবুল নাচনা গো ॥
সিও গামছা নিয়ে দামান পোনা মারিতে যায়ই গো
ও বুলবুল নাচনা গো ॥
সিও গামছা নিয়ে দামান পোনা মারিবার যায়ই গো
ও শইলের পোনা গো ॥
সারা বিল খেওয়ায়ে দামান পোনা মারিয়ে আনছে গো
ও শইলের পোনা গো ॥
পোনা কয়ডা মাইরে আইনে শউড়ির হাতে দিল গো
ও শইলের পোনা গো ॥

www.pathagar.com

শইড়িও না নিয়ে এ যে পোনা ভাজন ভাজিল গো
ও শইলের পোনা গো ॥
পোনা ভাজা নিয়ে শউড়ি পাকের ঘরে গেল গো।
ও শইলের পোনা গো ॥
পোনা ভাজা পাইয়ে শউড়ি বেমাক পোনা খাইল গো।
ও শইলের পোনা গো ॥
পোনা ভাজার স্বাদে শউড়ি বেমাক পোনা খাইল গো।
ও শইলের পোনা গো ॥
'বেমাক ভাজাই খাইলাম আম্মাজান পোনা ভাজা তো পাইলাম না গো'
ও শইলের পোনা গো ॥
'মুল্লেগরে বিলেই আইসে পোনা ভাজা খাইছে গো'
ও শইলের পোনা গো ॥
হাতের ভাতও ঝাইড়ে থুয়ে বিলেই দাবড়াবার গেল গো
ও শইলের পোনা গো ॥
সারা পাড়া দাবড়ায়ে এযে বিলেই ধরিয়ে আনল গো
ও শইলের পোনা গো ॥
'সত্যি কইরে কবি বিলেই পোনা ভাজা খাইছসটে'
ও শইলের পোনা গো ॥
'সত্যি কইরে কইছি আমি তোমার শাশুড়ি খাইছে গো'
ও শইলের পোনা গো ॥
বিলেকও ছাইড়ে দিয়ে শউড়ির চুলে মুষ্টি ধইরল গো
ও শইলের পোনা গো ॥
'সোনার আংটি দামান দেখো, সোনার আঙ্গুট দিমু গো'
ও শইলের পোনা গো ॥
'সোনার আংটি দামান দেখো, সোনার ওড়না দিমু গো'
ও শইলের পোনা গো ॥
'তাও যেনও দামান কন না পোনা চুন্নির বেটি গো'
ও শইলের পোনা গো ॥
বেলা গেল সন্ধ্যা হইল পোনা চুন্নির বেটি তো আইল না গো
ও শইলের পোনা গো ॥

সাধারণ অর্থ : মেয়ের জামাইকে একসময় 'দামান' বলা হতো। মাদারগঞ্জের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ এখনো জামাইকে দামান বলে ডাকেন। শ্বশুরবাড়িতে জামাই গেছে বেড়াতে। একদিন, হয়তো নিকটস্থ কোনো বিলেই গেছে মাছ ধরতে। অনেক কষ্ট করে সারা বিল ঘুরে (খেওয়াইয়ে) কিছু শোল মাছের পোনা ধরে নিয়ে এসেছে। শ্বশুরবাড়িতে এসে শাশুড়ির হাতে দিয়েছে পোনা মাছগুলো। শাশুড়ি সেগুলো ভেজেছে খাওয়ার জন্য। কিন্তু পোনাভাজাগুলো খেতে এতই মজা যে শাশুড়ি সবগুলোই খেয়ে ফেলেছেন। খাওয়ার সময় জামাই জিজ্ঞেস করেছে, সবই খেলাম কিন্তু পোনাভাজা তো পেলাম না। শাশুড়ি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, ওগুলো পাশের বাড়ির বিড়াল চুরি

www.pathagar.com

করে খেয়ে গেছে। কিন্তু শাশুড়ির কথা জামাইয়ের বিশ্বাস হয়নি। তাই সারা পাড়া বিড়ালের পিছে দৌড়ে একসময় বিড়ালটি ধরতে সমর্থ হয়। সত্যি সত্যি বিড়ালকে ধরে এনে যখন জিজ্ঞেস করেছে, কে মাছগুলো খেয়েছে? তখন জ্যোতিষির মতো বিড়াল বলে দিয়েছে যে, আর কেউ নয়, তোমার শাশুড়িই মাছগুলো খেয়ে ফেলেছে। ধরা পড়ার পর শাশুড়ি সোনার আংটি, সোনার ওড়না দেওয়ার কথা বলাসহ নানা প্রলোভন দেখাচ্ছেন, যাতে জামাই অন্য কাউকে পোনা চুরি করে খাওয়ার কথা না বলে। এমনকি তার মেয়েকে যেন পোনা-চুন্নির বেটি বলে না ডাকা হয়।

১৫.

(ফেরদৌসী বেগম)

'পরের দেশে গেছিলা বুবুজান
তোমার শাশুড়ি পীরিত কেমন ॥'

'আমার শাশুড়ির পীরিতি বুবুজান
নয় কুড়ালের ধারও যেমন ॥'

'পরের দেশে গেছিলা বুবুজান
তোমার শ্বশুরের পীরিতি কেমন ॥'

'আমার শ্বশুরের পীরিতি ভাইজান
নয়া খন্তার কুপও যেমন ॥
আমার শ্বশুরের পীরিতি ভাইজান
নয়া খন্তার পারও যেমন ॥'
'পরের দেশে গেছিলা বুবুজান
তোমার জায়ের পীরিতি কেমন ॥'

'আমার জায়ের পীরিতি বুবুজান
নয়া কোদালের কুপও যেমন ॥'
'পরের দেশে গেছিলা বুবুজান
তোমার ননদের পীরিতি কেমন ॥'

'আমার ননদের পীরিতি বুবুজান
চিল-কায়ের ঠুকরানি যেমন ॥'
'পরের দেশে গেছিলা বুবুজান
তোমার সোয়ামির পীরিতি কেমন ॥'

'আমার সোয়ামির পীরিতির বুবুজান
হাটও-বাজারের ফডারি যেমন ॥'

সাধারণ অর্থ : বাঙালি সমাজে, বিশেষ করে আগের নতুন বউয়ের ওপর শাশুড়ি-ননদ-জা আর শ্বশুরের যে মানসিক নির্যাতন তা বোধ করি সবারই জানা। এই গীতটির

www.pathagar.com

বিশেষত্ব হলো শ্বশুরবাড়ির লোকদের একেকজনের একেক রকম আচরণকে নানা শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

১৬.

(ফেরদৌসী বেগম)

বাংলাঘরে বসিয়ে মজনু বাংলায় এখন নেখে আরমেনকে।
বাংলায় খানিক নেখিতে মজনু ঘামিয়ে অস্থির হইছে আরমেনকে ॥
'হ্যালাও হ্যালাও গো জুবেদা তোমার অঞ্চলের বায়ি আরমেনকে।'
কেমনে হ্যালামু আমার গো অঞ্চল আপনার আব্বা সামানে আরমেনকে ॥
'বাঁশও কাটমু চটি গো তুলম ভাঙমু চক্ষে শরম আরমেনকে।
বাঁশও কাটমু মারমু গো বারি, ভাঙমু চক্ষের নজ্জা আরমেনকে ॥'
বাংলাঘরে বসিয়ে মজনু বাংলায় এখন নেখে আরমেনকে।
বাংলায় খানিক নেখিতে মজনু ঘামিয়ে অস্থির হইছে আরমেনকে ॥
'হ্যালাও হ্যালাও গো হেলেনা তোমার অঞ্চলের বায়ি আরমেনকে।
'হ্যালাও হ্যালাও গো হেলেনা তোমার অঞ্চলের বাতাস আরমেনকে ॥'

কেমনে দিমু বাতাস আমার গো তোমার আব্বার সামানে আরমেনকে।
'বাঁশও কাটমু মারমু গো বারি ছাড়ামু চক্ষের শরম আরমেনকে।
বাঁশও কাটমু মারমু গো বারি ছাড়ামু চক্ষের নজ্জা আরমেনকে ॥'

সাধারণ অর্থ : লজ্জা নারীর ভূষণ–কথাটি বাঙালি নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে দেখা যাচ্ছে, খুবই রোমান্টিক একটা চিত্রকল্প। গা-গতর ঘেমে যাওয়া স্বামী স্ত্রীকে বাতাস করতে বলছে, কিন্তু অজুহাত হিসেবে বলছে, তার স্বামীর বাবা অর্থাৎ শ্বশুর বাড়িতে থাকার বিষয়টি। এই অবস্থায় খুব লজ্জা বোধ করছে। কিন্তু স্বামী নাছোড়বান্দা। সে মৃদু ধমক দিচ্ছে যে, কীভাবে চোখের লজ্জ-শরম ভাঙতে হয়, তা সে দেখে নেবে। গীতটি নবদম্পতিদের একটা চিত্র ধারণ করেছে।

১৭.

(সম্মিলিত গীত : একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা)

বাড়ির শোভা বাগবাগিচা, ঘরের শোভা বেটি গো
সুন্দর ময়না গো ॥
ময়নার মায়ে কান্দে গো ময়না
ময়না নাই মোর ঘরে সুন্দর ময়না গো ॥
বাড়ির শোভা বাগবাগিচা, ঘরের শোভা বেটি গো
সুন্দর ময়না গো ॥
ময়নার বাপে ডাকে গো ময়না হাটের সদাই নিয়ে গো
সুন্দর ময়না গো ॥
এতদিনও পালিলাম ময়না ঠোঁটের আদর দিয়ে গো
সুন্দর ময়না গো ॥

www.pathagar.com

গায়ে হলুদ দেওয়ার পর বসে আছে কনে

আজকে কেনো গেল গো ময়না, মাথায় বারি দিয়ে গো
সুন্দর ময়না গো ॥
ময়নার ভাইও ডাকে গো ময়না, ময়না নাই মোর ঘরে গো
সুন্দর ময়না গো ॥
এতদিনে পালিলাম ময়না ঘাড়ে-মুখে নিয়ে গো
সুন্দর ময়না গো ।
এতদিনে পালিলাম ময়না বুকের ওপর তুইলা গো
সুন্দর ময়না গো ।
আজকে কেনো গেল গো ময়না ঘরও খালি কইরে গো
সুন্দর ময়না গো ।
আজকে কেনো গেল গো ময়না বুকও খালি কইরে গো
সুন্দর ময়না গো ।

সাধারণ অর্থ : বাড়ির একমাত্র মেয়ে বাড়ির শোভাবর্ধন করে ছিল । বাগানের সৌন্দর্য যেমন ফুল, তেমনি বাড়ির সৌন্দর্য হলো মেয়ে । এতদিন লালন-পালন করা হলো যে মেয়েকে তাকে বিয়ের পর অন্যের বাড়িতে তুলে দিতে হয় । এই নিষ্ঠুর সত্যকে মেনে নিতে কষ্ট হয় সবারই । এই গীতে দেখা যাচ্ছে, তেমনই একটা শাশ্বত চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে । বাবা-মা-ভাই সবাই যার যার মতো করে অনুভব করছে সদ্যবিবাহিত মেয়ের অভাব ।

১৮.

(সম্মিলিত গীত : একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে)

তকেতে উঠ বালি তকেতে উঠ ।
আল্লাহ-রাসুলের নাম নিয়ে তকেতে উঠ ॥

www.pathagar.com

তকেতে উঠ বালি তকেতে উঠ।
বাপও-মায়ের হুকুম নিয়ে তকেতে উঠ ॥
তকেতে উঠ বালি তকেতে উঠ।
খালা-খালুর হুকুম নিয়ে তকেতে উঠ।
চাচা-চাচীর হুকুম নিয়ে তকেতে উঠ।
তকেতে উঠ বালি তকেতে উঠ ॥
জেঠো-জেঠির হুকুম নিয়ে তকেতে উঠ।

তক্তায় বসানোর জন্য কনেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

সাধারণ অর্থ : একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে। কনেকে বিবাহ-পূর্ববর্তী গোসলের জন্য তার গায়ে হলুদ দেওয়ার প্রাক্কালে। মাদারগঞ্জে একটা রীতি আছে, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার আগে বর-কনেরে গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। এ সময় তাদের শীতলপাটিতে বসার জন্য বাধ্যতামূলক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। যাকে বলা হয় তক্তায় বসানো। গীতে এই তক্তা বসাকে 'তকেতে' বসা বলা হয়েছে।

১৯.

(সম্মিলিত গীত : একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা)

ইসলামপুরের নায়োরি কে বাটিব হলোদি।
জেঠি আমার দরদি, সে বাটিব হলোদি ॥
ইসলামপুরের নায়োরি কে বাটিব হলোদি।
দাদি আমার দরদি, সে বাটিব হলোদি ॥

ইসলামপুরের নায়োরি কে বাটিব হলোদি।
নানী আমার দরদি, সে বাটিব হলোদি ॥
ইসলামপুরের নায়োরি কে বাটিব হলোদি।
ভাবী আমার দরদি, সে বাটিব হলোদি ॥

www.pathagar.com

কনের জন্য হলুদ বাটা হচ্ছে, সেই সঙ্গে গায়েহলুদের গীত গাওয়া হচ্ছে

ইসলামপুরের নায়োরি কে বাটিব হলোদি।
ভাবী আমার দরদি, সে বাটিব হলোদি ॥

২০.

(গায়ক : আয়েশা খাতুন)

ঘুঙ্গুরি ঘুঙ্গুরি বেগুন গো ঘুঙ্গুরি
ধরিছে সোয়া গণ্ডা।
ঘুঙ্গুরি ঘুঙ্গুরি বেগুন গো ঘুঙ্গুরি
ধরে বহু গণ্ডা।
আমি যে যাবার চাই পরের গো বাড়ি
বাবার চইক্ষে কান্দে ॥
তোমাকে থুইয়ে গেলাম দয়ালের ভাই বউ
বাবাকে বুঝায়ে রাইখ।
তোমাকে থুইয়ে গেলাম দয়ালের বড় গো ভাই বউ
বাবাকে বুঝায়ে রাইখ।
আমার বাবার গোসলের সময় পানি তুলিয়েই দিও
আমার বাবার খাওয়নের সময় ভাতও বাড়িয়েই দিও।
আমার বাবার শুতনের সময় বিছনেই পারিয়েই দিও।
ঘুঙ্গুরি ঘুঙ্গুরি বেগুন গো ঘুঙ্গুরি
ধরিছে সোয়া গণ্ডা।
ঘুঙ্গুরি ঘুঙ্গুরি বেগুন গো ঘুঙ্গুরি
ধরে বহু গণ্ডা।
আমি যে যাবার চাই পরের গো দেশে
মায়ের চইক্ষে কান্দে ॥

www.pathagar.com

তোমাকে থুইয়ে গেলাম দয়ালের দয়ালের ভাই বউ
মায়েকেই বুঝায়ে রাইখ।
তোমাকে থুইয়ে গেলাম দয়ালের বড় গো ভাই বউ
মায়েকে বুঝায়ে রাইখ।
আমার মায়ের গোসলের সময় পানি তুলিয়েই দিও
আমার মায়ের খাওয়নের সময় ভাত বাড়িয়েই দিও,
আমার মায়ের শুতনের সময় বিছনে পারিয়েই দিও।

সাধারণ অর্থ : কন্যার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বিয়ের পর যখন শ্বশুরবাড়ি রওনা হচ্ছে, তখন তার বারবার মনে পড়ছে ভাবীরা তার মা-বাবার খোঁজখবর ঠিকমতো নেবে কি না। এতদিন সে নিজেই বয়স্ক বাবা-মায়ের খাওয়া-গোসলের খবর রাখত। এখন কী হবে? এই ভেবে সে তার ভাবীকে অনুরোধ করে যাচ্ছে, যাতে তার অনুপস্থিতিতে তার বাবা-মায়ের কোনো অযত্ন না হয়, কোনো কষ্ট না হয়।

২১.

(গায়ক : আয়েশা খাতুন)

সাতও ভাবী আঙনে গো শুরে
ঝিলমিল ঝিলমিল করে ॥
আমি শ্যামলি আঙনে গো শুরি
মইধ্যে নেছুড় থাকে ॥
আমার মইধ্যে মাও গো
কত মেন বিরিভাট আছে।
সাতও ভাবী কাপড় গো ধোয়ই
বুলবুলই করে ॥
আমি শ্যামলি কাপড় গো ধোয়ই
ময়লা ময়লা থাকে ॥
আমার নসিবের মইধ্যে মা ওগো
কত মেন বিরিভাট আছে ॥

সাধারণ অর্থ : বাঙালি গৃহস্থ ঘরের নারীদের বিয়ের পর অবধারিতভাবে গৃহকর্মে সুনিপুণ হওয়া লাগে। অলিখিত এই রীতি যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। এই গীতের বিবাহ-আসন্ন মেয়েটি ঠিকমতো সংসারের কাজ-বাজ তখনো শেখেনি। শ্বশুরবাড়ি গেলে না জানি কত সমস্যায় পড়তে হবে—এই ভেবে আতঙ্কিত সে। সে সংসারের ছোট কাজগুলোর চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু তখনো ঠিকমতো হচ্ছে না। তাই সে বেশ চিন্তিত।

২২.

(নিফুলি বেগম)

কুচি কুচি কুচি পোনা পঙ্খ মেলে ডালে যে
এত সুন্দর কন্যা তুমি মাথা কোতায় পাইছ যে।

www.pathagar.com

মায়ের পেটে গর্ভ ছিলাম বেলও আছির ঘরে যে
সেই কারণে হইছে সাধু বেলেরই মতন যে।

কুচি কুচি কুচি পোনা পঙ্খ মেলে ডালে যে
এত সুন্দর কন্যা তুমি নাকও কোতায় পাইছ যে।
মায়ের পেটে গর্ভ ছিলাম বাঁশি আছির ঘরে যে
সে কারণে সাধু নাকও হইছে বাঁশির মতন যে।

কুচি কুচি কুচি পোনা পঙ্খ মেলে ডালে যে
এত সুন্দর কন্যা তুমি ডেনা কোতায় পাইছ যে।
মায়ের পেটে গর্ভ ছিলাম বেলান আছির ঘরে যে
সেই কারণে সাধু ডেনা হইছে বেলানেরই মতন যে।

সাধারণ অর্থ : খুব সুন্দরি মেয়ে দেখে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে গেছে জনৈক এক ব্যক্তি। সে মেয়েটির রূপ-সৌন্দর্য খুবই মুগ্ধ। তাই সে মেয়েটিকে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্যের কারণ জিজ্ঞেস করছে। তখন মেয়েটি তার মায়ের গর্ভে থাকাকালে কী কী তাদের ঘরে ছিল, সেসবের সাথে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের তুলনা দিচ্ছেন আর বলছেন যে, গর্ভে থাকাকালে তাদের ঘরে বেল ছিল, তাই মাথা বেলের মতো সুন্দর হয়েছে। ঘরে বাঁশি ছিল, তাই নাক বাঁশির মতো সুন্দর হয়েছে। 'ডেনা' মানে হচ্ছে হাতের বাহু বা হাত। মেয়েটি বলছে, ওই সময় ঘরে রুটি বানানো বেলুন ছিল, তাই আমার হাত এত সুন্দর হয়েছে।

২৩.

(ফেরদৌসী বেগম)

উইচে দিয়েরে বসিয়ে গো ঘিয়ের বাতি নাগায়ে গো
বাবার দেখে বেটিরও না সুরুত গো ॥
'বেটি আমার সুন্দরি গো জামাতা আমার খাটো গো
কীবেই দিমু আমি জামাতার কাছে গো।'
'বাবা আমার বুজিয়ে গো বেবুজ কথা কয়ই গো
খাটো আমার মাচারও না খুঁটি গো ॥'

উইচে দিয়েরে বসিয়ে গো ঘিয়ের বাতি নাগায়ে গো
ভাইজান দেখে বোইনেরই না সুরুত গো ॥
'বোইন আমার সুন্দরি গো বইন্তে আমার কালো গো
কীবেই দিমু আমি কালো বইন্তের কাছে গো ॥
'ভাইজান আমার বুজিয়ে গো বেবুজ কথা কয়ই গো
কালো আমার চইক্ষেরও না কাজল গো ॥'

সাধারণ অর্থ : যে ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে, তারা পূর্বপরিচিত। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া আছে। মেয়েটি রূপসী। কিন্তু ছেলেটি খাটো এবং তার গায়ের রং কালো। মেয়েটির বাবা এবং ভাইয়ের আপত্তি। কীভাবে এত অসুন্দর ছেলের কাছে বিয়ে দেবে তার। কিন্তু মেয়েটি

www.pathagar.com

এই ছেলেটির চেহারার দুটি দোষকেই গুণ হিসেবে দেখছে। তার খাটোত্বকে মাচার খুঁটির সঙ্গে আর কালোত্বকে চোখের কাজলের মতো সৌন্দর্যবর্ধনের সঙ্গে তুলনা করছে মেয়েটি। গ্রাম্য প্রেমের একটা অভিনব রূপও এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২৪.

(গায়ক : সাজিরন)

বানিয়ের দোকেন দেইলে আইলাম স্বামীধন দুই সতীনের সেন্দূর।
আরে সেন্দূর পইরে মুই কাল্লা মোর মোর ঝুকামু আমার পরানে সয় না ॥
আরে বানিয়ের দোকানে দেইখে আইলাম স্বামীধন দুই সতীনের হাসা।
[illegible]রে মুই গলা মোর মোর ঝুকামু আমার পরানে সয় না ॥

২৫.

(গায়ক : সাজিরন)

ভিজে আগুনে রাতাইলে শুইকেয়ে টেকা দিছি গুইনে আরমেনকে।
আমাকও না দিছেন গো বিয়ে বহু দূরের রাস্তা আরমেনকে ॥
সিও রাস্তা যাইতে গো আব্বা পেটও নাগিল খিদে আরমেনকে।
'যদিল খিদে নাগে গো বেটি হোটেল সাজাইয়েই দিমু আরমেনকে ॥'
ভিজে আগুনে রাতাইলে শুইকেয়ে টেকা দিছি গুইনে আরমেনকে।
আমাকও না দিছেন গো বিয়ে বহু দূরের রাস্তা আরমেনকে ॥
সিও রাস্তা যাইতে গো ভাইধন পানি পিয়েস নাগে আরমেনকে।

২৬.

(গায়ক : সুবর্ণা)

নদীর বাতায় বাতায় ছাউনা কদমের গাছি গো আব্বা।
কাটিয়ে ফেলামু ছাউনা কদমের গাছি গো আব্বা ॥
দেন দেনও দা আর কুড়াল গো আব্বা।
কাটিয়ে ফেলামু ছাউনা কদমের গাছি গো আব্বা ॥
আমাকে দিছেন বিয়ে ওই না জালুয়ার কাছে গো আব্বা।
আমাকে দিছেন বিয়ে হাইলে হালুয়ার কাছে গো আব্বা ॥
আমাকে মারিব জাইলে কাঠি দিয়া গো আব্বা।
আমাকে মারিব হাইলে পান্টি দিয়া গো আব্বা ॥
কাটিয়ে ফেলামু ছাউনা কদমের গাছি গো আব্বা।
নদীর বাতায় বাতায় ছাউনা কদমের গাছি গো আব্বা ॥

সাধারণ অর্থ : মেয়েটি বাল্যবিবাহের শিকার। তার স্বামী একাধারে জেলে এবং কৃষক। তাকে যে পান্টি (হাল চাষের সময় গরু নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ছোট লাঠি) দিয়ে নির্যাতন করা হয়, সেটা কদম গাছের ডাল দিয়ে তৈরি। তাই সে খুব অভিমানের সাথে তার বাপের কাছে দা-কুড়াল চাচ্ছে ছোট কদম গাছগুলো কেটে ফেলার জন্য। তার ধারণা, এই ক-দম গাছগুলো কেটে ফেললে তাকে মারার আর কোনো লাঠি পাবে না তার স্বামী। ফলে মারের হাত থেকে রেহাই পাবে সে।

www.pathagar.com

২৭.

(গায়ক : সুবর্ণা)

ইকশা চলাই ধীরেরে ধীরে ইশকা চলাই ধীরেরে ধীরে
মিনিবাস চলাই জোরে যে মিনিবাস চলাই জোরে যে ॥
চলো চলো চলো গো দামান, চলো চালো চলো গো দামান
চলো আমার সাথে যে, চলো আমার সাথে যে ।
যামু না যামু না, যামু না গো দামান, যামু না যামু না গো দামান
তোমারই সঙ্গে যে, তোমারই সঙ্গে যে ॥
তোমার সঙ্গে গেলে গো দামান তোমার সঙ্গে গেলে গো দামান
নাস্তার শরম পাইমু যে নাস্তার শরম পাইমু যে ।
তোমার সঙ্গে গেলে গো দামান তোমার সঙ্গে গেলে গো দামান
বিছনের শরম পাইম যে বিছনের শরম পাইম যে ।

২৮.

(গায়ক : সুবর্ণা)

কদম গাছে বইসেরে মিন্টু কদম ফিকা (ছুড়ে) মারে আরমেনকে ।
কদম গাছে বইসেরে মিন্টু কদম ফিকা (ছুড়ে) মারে আরমেনকে॥
আস্তে-ধীরে মাইরো গো মিন্টু নিচে আছে সোয়ামী আরমেনকে ।
আস্তে-ধীরে মাইরো গো মিন্টু নিচে আছে সোয়ামী আরমেনকে॥
কদম গাছে বইসেরে মিন্টু কদম ফিকা মারে আরমেনকে ।
কদম গাছে বইসেরে মিন্টু কদম ফিকা মারে আরমেনকে॥
আস্তে-ধীরে মাইরো গো মিন্টু নিচে আছে সোয়ামী আরমেনকে ।
আস্তে-ধীরে মাইরো গো মিন্টু নিচে আছে সোয়ামী আরমেনকে ॥

২৯.

(গায়ক : সুবর্ণা)

ছোট ছোট সর্ষে গো ও সর্ষের গাছি গো ।
আসো জোলেখা সিথি পরিতন করো গো ॥
ছোট ছোট সর্ষেগো ও সর্ষের গাছি গো ।
আসো জোলেখা সিথি পরিতন করো গো ॥

বোজের আম্মা হয়ে গো বেবুজ কতাই বলেন গো ।
বোজের আব্বা হয়ে গো বেবুজ কতাই বলেন গো ॥
আসো জোলেখা সিথি পরিতন করো গো ।

ছোট ছোট সর্ষেগো ও সর্ষের গাছি গো ॥
আসো জোলেখা সিথি পরিতন করো গো ।

www.pathagar.com

৩০.

(গায়ক : নিফুলি)

ভিজিল ভিজিলরে চিকন চিকন পাতারে।
ভিজিল ভিজিলরে চিকন চিকন পাতারে ॥
ভিজিল ভিজলরে মাই মাই সাইরেকান্দির মালা।
ভিজিল ভিজলরে মাই মাই সাইরেকান্দির মালা ॥
স্বপতে শুইনেছিরে মাই মাই অমুকের মাও লো সতী।
স্বপতে শুইনেছিরে মাই মাই অমুকের মাও লো সতী ॥
সতী লয় সতী লয়রে বগুড়ার লটী।
সতী লয় সতী লয়রে বগুড়ার লটী ॥

৩১.

(গায়ক : নেপালি)

ভাসিয়ে যায় আমার নাল গেন্দা ফুল সরল নদী দিয়ে।
ভাসিয়ে যায় আমার জবা ফুল সরল নদী দিয়ে ॥
হাতের আঙুলে তুইলে নেবো ফুল আঁকিব খোপার মইধ্যে।
আরে হাতের আঙুলে তুইলে নেবো ফুল আঁকিব খোপার মইধ্যে ॥
আরে খোপার মইধ্যে ফলে আরে ফুল আকাশের তারা জানি জ্বলে।
আরে আইজকে যাওয়া হইলা নারে সই আব্বা হইয়াছে বাদী ॥
আরে আইজকে যাওয়া হইলা নারে সই আম্মা হইয়াছে বাদী।
'আরে তোমার আম্মাকে নিরলে বোজাও, যাওয়ার কালে কেন বাদী ॥

৩২.

(গায়ক : শেফালি)

পালকি হালে পালকি গো দোলে পালকি চালাইলাম জোরেরে মন
মনের মতন।
পালকির দরজা খুলিয়া দেখি আব্বা আসে নাই সঙ্গেরে মন
মনের মতন।
পালকির পিছনে চাইয়ে গো আব্বা আসে নাই সঙ্গেরে মন
মনের মনত।
আব্বার যদিল হইলামনি বেটি আব্বা আইলনি সঙ্গেরে মন
মনের মতন।
পালকি হালে পালকি গো দোলে পালকি চালাইলাম জোরেরে মন
মনের মতন।
আস্তে-ধীরে চালাইও পালকি চাচা আসে নাই মোর সঙ্গেরে মন
মনের মতন।

www.pathagar.com

৩৩.

(গায়ক : লাকি- নেপালি-শেফালি)

একই মায়ের তিনও বেটি একই রাজার বউই ।
কওছেন কওছেন কওছেন রাজা কোন দুলালী ভালো ॥
'বড় দুলালী আমার মাথারই পাগড়ি ।
মাঝলে দুলালী আমার হাই স্কুলের ছাত্রী ॥
ছোট্ট দুলালী আমার মুখের মোহন বাঁশি ।
সিও কথা কয়ে রাজা যায়ই বণিজ করতে ॥
আমরাইনে তিনও বইনে একই সনে খামু ।
এরই মইধ্যে যায়ই মোহন সরফে ভাইয়ের বাড়ি ॥
দেওই না দেওই সরফে ভাই একই তোলা বিষও ।
বিষখানি নিয়ে মোহন বাড়িতে ফিরিল ॥
বিষখানি নিয়ে দুলালী ঘরেতে ফিরিল ।
ডালও ভাত খাইই মোহন হাসিয়ে-খেলিয়ে ॥
দুধও ভাত খাইই মোহন কান্দিয়ে কাটিয়ে ।
একও নলা খাইয়ে মোহন গাও ঢল ঢুলি করে ॥
দুইও নলা খাইও মোহন ঢাসখাইয়ে পড়ে ।
তিনও নলা খাইয়ে মোহন জীবন ছাড়িয়ে দিল ॥
এরই মধ্যে আইল রাজা দূরের বণিজ (বাণিজ্য করা) কইরে ।
'তোমরাইনে দুইজন দুলালী একই সনে আইছ ॥'
তোমার মোহন পাড়া-বেড়ানি পাড়া বেড়াবের গেছে ।
তোমার মোহন রাজ্য-বেড়ানি পাড়া বেড়াবের গেছে ।
সিও কথা শুইনে রাজা পাড়ার মইদে সান্দাইল ॥
সিও কথা শুইনে রাজা দেশের মইদে সান্দাইল ।
তোমরাইনে পাড়ার সগলই আমার মোহনেক দেখছিলে ॥
তোমরাইনে দেশের সগলই আমার মোহনেক দেখছিলে ।
তোমার মোহনেক দেখছিলাম আমরা ডালও-ভাতও খাইতে ॥
তোমার মোহনেক দেখছিলাম আমরা দুধও-ভাতও খাইতে ।
সিও কথা শুইনে রাজা বাড়িতে ফিরিল ॥
সিও কথা শুইনে রাজা ঘরেতে ফিরিল ।
ঘরের মইদে যাইয়ে দেখে মোহন মরিয়ে আছে ॥
আমার মোহনেক মাটি দিমু ঘরের মাইঝের (মেঝে) মইদে ।
আমার মোহনেক মাটি দিমু উঠানের ভিতরে মইদে ॥
তোমার মোহনেক ঘরে মাটি দিলে শামটার পিটন খাবও ।
তোমার মোহনেক উঠানে মাটি দিলে ঝাটার পিটন খাবও ॥
'আমার মোহনেক মাটি দিমু নারকেল গাছের তলে ।
আমার মোহনেক মাটি দিমু পিয়ারার গাছের তলে ॥

www.pathagar.com

আমার মোহনের খিদে নাগব নারকেল পাড়িয়ে খাবও ।
আমার মোহনের খিদে নাগব পিয়ারা পাড়িয়ে খাবও ॥
তুমিনে বড় রানি খেথা (কাঁথা) শিলি (শেলাই) কইরে খাইও ।
তুমিনে মাঝলে রানি বারা (ধান ভানা) বানিয়ে খাইও ॥
আমি যে রাজ্য-রাজা রাজ্যে ফিরিয়ে গেলাম ।
আমি নে দেশের রাজা দেশান্তরীই হইলাম ॥'

গীত গাওয়া অবস্থায় তিন বোন লাকি-নেপালি-শেফালিসহ অন্যরা

৩৪.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

আগে জোড়া তেঁতুলের গাছে গো,
তারই ওপরে তোতা কইরেছে ভাসা (বাসা) মা
তারই ওপরে ময়না কইরেছে ভাসা গো
ওই পাখিডে ধরিয়ে মা, ওই পাখিডে মারিয়ে মা
ওই পাখিডে কুইড়েলে কাটিমু মাতা মা,
ওই পাখিডে বাটালে ছেচিমু মাতা ।
আমাক যেনি ধরিও না, আমাক যেনি মারিয়ে,
আমি হইয়াছি দেশের ওড়োইনে পাখি মা ।
আমি হইয়াছি রাজ্যের ওড়োইনে পাখি মা,
জাও-জুয়ালির যন্ত্রণা মা ।
শ্বশুর-শওড়ির যন্ত্রণা মা,
আমি হইয়াছি রাজ্যের ওড়োইনে পাখি মা ।
আমি হইয়াছি দেশের ওড়োইনে পাখি মা,
আসুক চৈত্র মাসও মা, আসুক জষ্ঠি মাসও মা ।
দেশের পাখি দেশে চলিয়ে যামু মা,
রাজ্যের পাখি রাজ্যে চলিয়ে যামু মা ।

www.pathagar.com

৩৫.

(গায়ক : লাকি- নেপালি-শেফালি)

পানও আইল আলনে-পালনে হায় গো
গুইয়ে আইল ডাবরে ভরিয়ে আরে কে ॥
সিও পানও পইছেলে উইড়েমু হায় গো
সিও গুইয়ে ঢেকিতে ছেচিমু আরে কে ॥
তাও না দিমু দুধের ময়নাক বিয়ে আরে কে ॥
'সুইদের বাবা কীসের পুকুর দিমু'
বাড়ির আগে দুধের পুকুর দিমু আরে কে ॥
তারই মইদে ময়নাক সারায়ে থুমু আরে কে
তারই মইদে ময়নাক নুকায়ে থুমু আরে কে।
বাবু হাটের জায়লেক খবর দিমু হায় গো ॥
বাবু হাটের জায়লেক খবর দিমু আরে কে ॥
জালও আইনে ময়নাক সারায়ে থুমু আরে কে ॥
সুইদের বাবা কীসের নড়াই (লড়াই) করো হাঁয় গো।
সুইদের চাচা কীসের নড়াই করো আরে কে।
যাগের ময়না তারাই নয়ে যাবো আরে কে ॥
তাও না দিমু দুধের ময়নাক বিয়ে আরে কে ॥

৩৬.

(গায়ক : লাকি- নেপালি-শেফালি)

উত্তরতনে আইলরে উত্তরের ডালা রে
আইল ডালা নালও বরণ হয়ে আরে কে।
আইল ডালা নীলও বরণ হয়ে আরে কে।
কোন মেন বড়রে, কোন মেন ডালা ছোটোরে ॥
বড় ডালা মাইজেল করিল খালি আরে কে।
ছোট ডালা বাড়ি করিল খালি আরে কে।
বুজের বাবা হয়ে গো বেবুজ কতা কয়ই গো
যাবার কালে দুধও ভাতও ভালো নাগে না
হাসির বাবা ডাকে গো, ও দয়াল হাসি গো
আসো হাসি খাও ও হাটের সদাই আরে কে ॥
বুজের বাবা হয়ে গো বেবুজ কতা কয়ই গো
যাবার কালে দুধও ভাতও ভালো নাগে না
আরে দুধু ভাতও ভালো নাগে না।

উত্তরতনে আইলরে উত্তরের ডালারে
আইল ডালা নীলও বরণ হয়ে আরে কে।
আইল ডালা নালও বরণ হয়ে আরে কে।

www.pathagar.com

কোন মেন বড়রে, কোন মেন ডালা ছোটোরে ॥
বড় ডালা মাইজেল করিল খালি আরে কে।
ছোট ডালা বাড়ি করিল খালি আরে কে।

হাসির আম্মা ডাকে গো, ও দয়াল হাসি গো
আসো হাসি খাও ও দোকানের সদাই আরে কে।
আরে আসো হাসি খাওও হাটের সদাই আরে কে।
বুজের আম্মা হয়ে গো বেবুজ কতা কয়ই গো
যাবার কালে হাটের সদাই ভালো নাগে না
আরে যাবার কালে হাটের সদাই ভালো নাগে না

৩৭.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

দামান গো, দামান গো একেলা শুয়ে আছে খানকা ঘরে দামান গো ॥
দামান তোমারই কুছে নাকি টেকা আছে দামান গো
দামান আপনার কুছে নাকি টেকা আছে, দামান গো।
দামান চুড়ি পরিবের মুন গেছে দামান গো।
দামান সেন্দূর পরিবের মুন গেছে দামান গো।
দামান ঘুরিয়ে নাচনা করমু তোমার সামনে দামান গো
দামান গো ঘুরিয়ে নাচনা করমু তোমার সঙ্গে।
দামান গো দামান গো দামান একেলা শুয়ে আছে খানকা ঘরে
দামান গো, দামান তোমারই পকেটে টেকা আছে দামান গো ॥
দামান ঘুরিয়ে নাচনা করমু তোমার সনে দামান গো
দামান ফিরিয়ে নাচনা করমু তোমার আগে দামান গো।

৩৮.

(গায়ক : লাকি- নেপালি-শেফালি)

কী মেন হাতে কী মেন হলুদি মাখিল যে ॥
মুখে তুলিয়ে দিতে মিলিল যে
গায়ে তুলিয়ে দিতে মিলিল যে
সুরুজ বরণে গাবুর (বর) সাজিল যে ॥
হলোদি হলোদি বরণ মাখিল যে
মায়ে তুলিয়ে দিতে মিলিল যে ॥
সুরুজ বরণে বালি সাজিল যে।
সুরুজ বরণে গাবুর সাজিল যে।

৩৯.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

ওরে গাবুর ওরে গাবুর, তোর মাথা কেরা ছাঁইটে দিছেরে গাবুর
তোর মাথা কেরা ছাঁইটে দিছেরে গাবুর।

www.pathagar.com

'ওলো বালি ওলো বালি, আমার দেশে চেংড়া নাপিত আছে লো বালি
আমার দেশে চেংড়া নাপিত আছে লো বালি ৷৷
হাউসে হাউসে মাথা ছাঁইটে দিছে লো বালি ৷৷'
ওরে গাবুর ওরে গাবুর, তোর গোসুল কেরা করিয়ে দিছেরে গাবুর
তোর গোসল কেরা কইরে দিছেরে গাবুর ।
'ওলো বালি ওলো বালি, আমার দেশে চেংড়া ভাবী আছে লো বালি
আমার দেশে চেংড়া ভাবী আছে লো বালি ৷৷
হাউসে হাউসে গোসুল করিয়ে দিছে লো বালি ৷৷'
ওরে গাবুর ওরে গাবুর, তোর সাজন কেরা সাজিয়ে দিছে রে গাবুর
তোর সাজন কেরা সাজিয়ে দিছেরে গাবুর ।
'ওলো বালি ওলো বালি, আমার দেশে চেংড়া বইনতে আছে লো বালি
আমার দেশে চেংড়া বইনতে আছে লো বালি ৷৷
হাউসে হাউসে সাজন করিয়ে দিছে লো বালি ৷৷'

৪০.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

একেলাই গাবুরেক পৌছাইছে চিটে পাতাইনে গাবুরেক কুইড়েইছে
তোর কি দেশে বড় বইনতে নাই, সঙ্গে করিয়ে গাবুর আনস নাই ৷৷
'আছে বড় বইনতে মাথা নাই, শরমের খাতিরে বইনতেক আনি নাই ৷৷'
তোর কি দেশের বেলের খাপড়া নাই, মাথা বানিয়ে গাবুর আনস নাই ৷৷
একেলা গাবুরেক পৌছাইছে, চিটে পাতাইনে গাবুরেক কুইড়েছে ৷৷
তোর কি দেশে বড় ভাই নাই সঙ্গে করিয়ে গাবুর আনস নাই ৷৷
'আছে বড় ভাইয়ের চইখও নাই, শরমের খাতিরে ভাইয়েক আনি নাই ৷৷'
তোর কি দেশের নাডাগুডা নাই, চইখও বানিয়ে গাবুর আনস নাই ৷৷

৪১.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

ভালো ভালো শাড়ি নামছে গো চান সদাগর ।
আমার ঢাকার শহরে গো চান সদাগর ।
আমার বগুড়া শহরে গো চান সদাগর ৷৷
সেই না শাড়ি কিনবের যায়ে গো চান সদাগর ।
আমার শ্বশুর পড়ল বন্দি গো চান সদাগর ৷৷
শীতের শহর বাইন্দা থুয়ে গো-চান সদাগর ।
আমি শ্বশুরেক করমু খালাস গো চান সদাগর ।
আমার শ্বশুরেক করমু খালাস গো চান সদাগর ।

www.pathagar.com

৪২.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

শ্বশুর জঙ্গলের মইদে গো জ্বলে মোমের বাতি
আরে শ্বশুর জঙ্গলের মইদে গো জ্বলে মোমের বাতি ।
আরে কনের মাও বলে নইটেনি ঘাটাত দিয়ে আসে ॥
তারই ডেরা-ডুরে বান্দিতে হইল নিশে রাইত ।

৪৩.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

ফুটবল খেলাইতেরে ফুটবল খেলাইতেরে
ঘামিল সোনার বরণ গাওও কী হায়রে ॥
ও শেফালি ছেরি লো, ও শেফালি ছেরি লো
বাতাস দে সোনার বরণ গাইয়ে কী হায়রে ॥
ফুটবল খেলিতে রে ফুটবল খেলিতেরে
ঘামিল সোনার বরণ মুখও কী হায়রে ॥
ও শেফালি ছেরি লো, ও শেফালি ছেরি লো
বাতাস দে সোনার বরণ মুখে কী হায়রে ॥

৪৪.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

আরে সারা মাইজেলি সুদ্ধে ওর ফুলের বিছনে
আরে সারা মাইজেলি সুদ্ধে ওর ফুলের বিছনে ।
আরে ওইদিক সরিয়ে বসো, অন্য দেশের গাবুর ।
আরে ওইদিক সরিয়ে বসো, ভিনদি দেশের গাবুর ।
আরে তোমারই টুপিরও ঘামে সেন্দূর মইলট পইল ॥
আরে কালই জোহরের ওক্ত সেন্দূর জালাইয়ে আনমু ॥

৪৫.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

ডান হাতে নারিকেল, বাম হাতে শিইরিকল
ওই আয়ো দুই হাতে ঢালো গাঙের জলও গো ॥
একে তো পুঁই-বেলা বাও আরও তো পশ্চিমে বাও যে
কত আয়ো কতই পানি ঢালিবের নাগে
বাড়ির পাশে বেলের গাছ, নানান পঙ্খি উড়ে তায় গো
তারই তলে গাবুর গোসুল করে না যে ॥

www.pathagar.com

৪৬.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

কুয়ার পারে হেলাঞ্চি শাকের গাছ স্বাদের কালোয়া
ও কালোয়া ভাই ।
আরে কুয়ার পারে হেলাঞ্চি শাকের গাছ স্বাদের কালোয়া
ও কালোয়া ভাই ॥
আমাক থুয়ে কোথায় যাবার চাও স্বাদের কালোয়া
ও কালোয়া ভাই ॥
আরে তোমাক থুয়ে খুলনা যাবার চাই, স্বাদের কালোয়া ।
ও কালোয়া ভাই ॥
আরে তোমাক থুয়ে ঢাকা যাবার চাই, স্বাদের কালোয়া ।
ও কালোয়া ভাই ॥
কেবলই আমি এক না ছেলের মাও, স্বাদের কালোয়া
ও কালোয়া ভাই ॥
কেবলই আমি এক না ছেলের মাও, স্বাদের কালোয়া
ও কালোয়া ভাই ॥
হাঁটিয়ে যাইতে বেড়িয়ে ধরমু পাও স্বাদের কালোয়া ।
ও কালোয়া ভাই ॥
আরে হাঁটিয়ে যাইতে বেড়িয়ে ধরমু পাও স্বাদের কালোয়া ।
ও কালোয়া ভাই ॥
কুয়ার পারে হেলাঞ্চি শাকের গাছ স্বাদের কালোয়া
ও কালোয়া ভাই ।
কুয়ার পারে হেলাঞ্চি শাকের গাছ স্বাদের কালোয়া
ও কালোয়া ভাই ॥

৪৭.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

বিদায় দেন বিদায় দেন স্বামী গো বিদায় দেন বিদায় দেন স্বামী
যামু বাপও মায়ের দেশে গো ॥
নাও ছাড়ো নাও ছাড়ো মাঝি ভাই
ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো মাঝি ভাই
যামু বাপও মায়ের দেশে গো ॥
বহুদিন পরে আইলাম মাঝি গো
আইলাম আইলাম ভাবী বাপও-মায়ের দেশে গো ॥
দেও-ও দেও-ও দেও মোর ভাবী গো
দেও-ও দেও-ও দেও ভাবী পান্তাভাতের পানি গো ॥
দেও-ও দেও-ও দেও ও মোর ভাবী গো

www.pathagar.com

দেও-ও দেও-ও দেও কুইলের আগালের খুদও গো ॥
কীবেই দিমু ও মোর ননন্দী ওই না খুদও তোমার ভাইয়ের
কবিতর নাইমে খাবও গো।
দেও-ও দেও-ও দেও ও মোর ভাবী গো
দেও-ও দেও-ও দেও ভাবী গাছের একখান কাঁঠাল গো ॥
কীবেই দিমু ও মোর ননন্দী ওই না কাঁঠাল তোমার ভাইয়ে
গুনিয়েই গুনিয়েই থুইছে গো ॥
দেও-ও দেও-ও দেও ও মোর ভাবী গো
দেও-ও দেও-ও দেও-ও ভাবী বাপও মায়ের চাবি গো ॥
কীবেই দিমু ও মোর ননন্দী, ওই না তোমার ভাইয়ে
নুকিয়ে নুকিয়েই থুইছে গো ॥
দেখাও দেখাও দেখাও ও মোর ভাবী গো
দেখাও দেখাও দেখাও ভাবী বাপও মায়ের কবর গো ॥
তোমার বাপের কব্বরের মইদে গো
তোমার বাপের কব্বরের মইদে সাপে করিছে বাসা গো ॥
তোমার বাপের কব্বরের মইদে বেজিয়ে করিছে বাসা গো ॥
সাপেক বুইজেমু আমি দুধ কলা দিয়ে
বেজিক বুইজেমু আমি চড়ুইর ছাও দিয়ে ॥

গীত গাচ্ছেন নেপালি-শেফালি-লাকিসহ অন্যরা

৪৮.

(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

দেয়ারই টিপাটিপি খলফের ভিজিল গাও ॥
খলফে ঘুরিয়ে বাড়িত যাও ॥
কাল যামু ছাগল চড়াবার সিন্তি করমু আও
খলফে ঘুরিয়ে বাড়িত যাও ॥

www.pathagar.com

ঘরের পাছে ফেনের পাতা ছিড়িয়ে মাথায় দেও
খলফে ঘুরিয়ে বাড়িত যাও ॥
ঘরের মইদে বাপও-মাও কেমনে করিমু আও
খলফে ঘুরিয়ে বাড়িত যাও ॥
ঘরের পাছে বেলের কাঁটা সিন্তি না দিও পাও
খলফে ঘুরিয়ে বাড়িত যাও ॥

৪৯.
(গায়ক : লাকি-নেপালি-শেফালি)

শ্বশুরই আব্বা গেছে মোকামতলার হাটে যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
আনব্যের কইছি চিতল মাছ আনছে পুইয়ে মাছও যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
শউড়ি দুলালী কয় যে ঘরে বসিয়ে কুটো যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
জাও দুলালী কয় যে বাইরে বসিয়ে কুটো যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
ননন দুষপনই কয় যে মাইজেই বসিয়ে কুটো যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
আকাশের দেউনই চিলে হাতে মারিল থাবা যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
মাছ নিলি ভালাই করলি, হাত কেন খুড়া করলি যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
এরই মইদে আইল সাদু দূরের বণিজ কইরে যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
'দেও-ও দেও-ও দেও শ্যামলা এক-ও গিলাস পানি যে'
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
'ডান হাতও নুকায়ে থুয়ে বাম হাতে দিলা পানি যে'
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
শউড়ি দুলালী কয় যে ঘরে বসিয়ে কুটো যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
জাও দুলালী কয় যে বাইরে বসিয়ে কুটো যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥
ননন দুষপনই কয় যে মাইজেই বসিয়ে কুটো যে
সোনার নাল মন টিয়া যে ॥

www.pathagar.com

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার মেয়েলি গীত

১.

ছোট্ট নদীর কিনারে পিয়ারা
ছোট্ট মেন্দি গাছোও
ওমেন্দি আনো না তুলি ॥
বড় নদীর কিনারে পিয়ারা
বড় মেন্দির গাছও
ওমেন্দি আনো না তুলি ॥

সেও মেন্দি তুলিতে পিয়ারা
গায়ে আইসাছে জ্বরও
ওমেন্দি আনো না তুলি ॥
খবরের আগে চিঠি গো পাঠাও
ডাক্তার বাবুর কাছে
ওমেন্দি আনো না তুলি ॥

দুজনে ধরি মশারি ফেলো
সে নাই দাউ তার গায়ে
ওমেন্দি আনো না তুলি ॥
আমার পিয়ারা ভালো গো হইলে
হোন্ডার করিমু দানও
ওমেন্দি আনো না তুলি ॥

২.

সিতি বালির সিতি দেখা যায়
দেওয়ানগঞ্জের রাস্তা গো সিতি বালি গো ॥

সিথি বালির মায়ে যে কান্দিব
সিথি বালির বাপও যে কান্দিব
রাস্তা হাঁটবের ধরিয়ে গো সিতিবালি গো ॥

সিতিবালি নাক সে দেখা যায়
হাতে মোহন বাঁশি গো
সিতিবালির ভায়ে যে কান্দিব
বাঁশি বাজাবার ধরিয়ে গো সিতিবালি গো ॥
সিতিবালির মুখ যে দেখা যায়
পান খাওয়া বাটা গো সিতিবালি গো ॥
সিতিবালির মাও যে কান্দিব
পানও খাওয়ার বেলায় গো সিতিবালির গো ॥

www.pathagar.com

সিতিবালির ডেনা যে দেখা যায়
পিড়ে করা বলুন গো সিতিবালি গো ॥
সিতিবালির বুবু যে কান্দিব
পিড়ে করবের ধরিয়ে গো সিতিবালির গো

সিতিবালির ঠেংগো দেখা যায়
মারাঝারার কারেল যে গো সিতিবালির গো ॥
সিতিবালির ফুফু যে কান্দিব
মারা ঝারবের ধরিয়ে গো সিতিবালি গো ॥

শব্দার্থ : সিতি-সিঁথি, ডেনা-হাত, কারেল-বাঁশের তৈরি কৃষিযন্ত্র।

৩.

ভাইর ঘরের দিয়েরে দিয়েরে গো
আমার জোড় ডালিমের গাছ
এডা ডালিম ছিড়বের গেলাম গো
আমার ভাইজি করল মানা কদমের ফুল গো ॥

খাইলাম না ছুইলাম না ডালিম গো
ডালিম কুচে তুলি নিলাম কদমের ফুল গো ॥
তারি মধ্যে খবর আইছে গো
আমার নৌকা আইছে ঘাটে কদমের ফুল গো
সিও নৌকা চড়বের গেলাম গো
আমার নৌকা নাইকে তলি বাদামের ফুল গো ॥

কনের মায়ের চুন্দল বাড়ি গো
আমি নৌকাত দিমু তুলি কদমের ফুল গো ॥
টান করিয়ে নাগাও বাদাম গো
আমি বসিয়ে নায়ের যামু কদমের ফুল গো
ঢিল করিয়ে নাগাও বাদাম গো।
আমি শুতিয়ে যামু নায়র কদমের ফুল গো ॥

শব্দার্থ : দিয়ের -দরজা, সিও -সেই, নাগাও- লাগাও।

৪.

আরে যায় সোনারে দক্ষিণ সড়ক দিয়ে সোনাই মোরকে
আর ডাক দিয়ে বসাও বাবার আলম তনে সোনাই
বানাবার দিছি নয়মুন ধানের ঘুগরে সোনাই
আর গুনিয়ে দিমু বিয়াল্লিশ জোড়া ঘুগরে সোনাই
গাতিয়ে দিমু কনের মায়ের কোমরে সোনাই

www.pathagar.com

আর হাঁটিয়ে যাতে বাজব তালে তালে সোনাই
আর নয়া জামাই হাসবে মনে মনে সোনাই
আর টেরা চোখে দেখবে চায়ে চায়ে সোনাই

শব্দার্থ : গাতিয়ে-গাথিয়ে, চায়ে-তাকিয়ে, থনে-হতে ।

৫.

নিলুফা সুন্দরি আংনে সুরে
সাধু পিছে পিছে ঘুরে নিলুফা সুন্দরি
একটা আও কর গো নিলুফা সুন্দরি
স্কুল পড়াবার যামু
কিবেই আও করমু
সাধু তোমার দাদি আছে চায়ে নিলুফা সুন্দরি
সাধু তোমার দাদি দিব খুটা
আড়ি কেচুরির নাতিন নিলুফা সুন্দরি

শব্দার্থ : আংনে-আঙ্গিনা, আও- কথা, কেচুরি-দুষ্ট প্রকৃতি ।

৬.

কতই ভাত খাই ছিলাম আব্বা গো
মাচা করছি খালি
যাও ময়না একেলা পরের দেশে ॥

দেন দেন দেন ভাবী গো
ছোট বেলার চাক্কু গো
ময়নার আম্মা ময়নাক নিয়ে
পালাইছে গো মনের মাচার মধ্যে ॥
আদাঘাটে যাইয়ে ময়না গো
গলাই দিছে ছুরি
কোথায় গেলা ময়নার শাশুড়ি গো
ময়নাক বরিয়ে নেও
ফিরেও ফিরেও ফিরেও পালকি গো
ময়নার আব্বার দেশে
পালকির কাপড় খুলিয়া দেখি গো
ময়না মরিয়ে আছে ॥
কতই ভাত খাইছিলাম আব্বাগো
মাচা করছি খালি
যাও ময়না একেলা পরের দেশে ॥

৭.

সুদেশের কুলি গো আমগর কুদেশে যাইও গো
আমগর কুলির ভাতের কষ্ট যেন হয় না গো

www.pathagar.com

তোমগর কুলির জন্যে গো আমরা এই ধান গো লাগাছি গো
তোমগর কুলি কতই ভাত খাব গো ॥

সুদেশের কুলি গো আমগর কুদেশে যায় গো
আমগর কুলির কাপড়ের কষ্ট যেন হয় না গো
তোমগর কুলির জন্যে গো আমরা এই দোকান বসাইছি
তোমগর কুলি কতই কাপড় পরে গো ॥

সুদেশের কুলি গো আমগর কুদেশে যাইওগো
আমগর কুলির তেল সাবানের কষ্ট যেন হয় না গো
তোমগর কুলির জন্যে গো আমরা এই দোকান বসাইছি
তোমগর কুলি কতই তেল সাবান মাখবো গো ॥

শব্দার্থ : তোমগর-তোমাদের, আমগর-আমাদের, কুলি-কনে।

৮.

সাধুর গায়ে দেখা যায় কাঁচা হলদির বাসর গো
সাধু নাই মরকে ॥
কেডাইযে দিছে তোমাক কাঁচা হলদির বাসর গো
সাধু নাই মরকে ॥
ঘরতি আছে আমার হাউস ডাংরি ভাবি গো
সাধু নাই মরকে ॥
সাধুর হাতে দেখা যায় জোড়া মেন্দির ফোটা গো
সাধু নাই মরকে ॥
কেডাইযে দিছে তোমাক জোড়া মেন্দির ফোটা গো
সাধু নাই মরকে ॥
ঘরতি আছে আমার হাউস ডাংরি বুবু গো
সাধু নাই মরকে ॥

শব্দার্থ : ডাংরি-যুবতী, নাই মরকে-কাছে, কেডাই-কে।

৯.

ছোট নদীর বড় গো বইঠা ঝিলিকে উঠে পানি।
আস্তে ধীরে চালাও গো গাড়িয়াল ভাই নিধুয়া পাথারের মধ্যে
গাড়ির পিছনে চাইয়ে দেখি দুলাভাই আসতেছে সঙ্গে
আসুক দুলাভাই বসুক গো কাছে
বুবুজান কেমন আছে
তোমার বুবু কান্দিতে কান্দিতে কাপড়ের আঁচল ভিজাইছে।

আসতে ধীরে চালাও গো গাড়িয়াল নিধুয়া
পাথারের মধ্যে
গাড়ির পেছনে চাইয়ে দেখি ভাই আসতেছে সঙ্গে

www.pathagar.com

আসুক ভাই বসুক গো কাছে
ভাবীজান কেমন আছে ।
তোমার ভাবী হাসিতে হাসিতে গ্রামের মানুষ জড়াইছে
ছোট নদীর বড় গো বইঠা ঝিলিকে উঠে পানি ।

১০.

খেলায় খেলায় খেলায় গো সোনাই
সোনাই ঠুলি দিয়ে গো সোনাই বেড়ি নাই মরকে ॥
খেলায়তে খেলায়তে সোনায়ের দুধের নিশে উঠলে গো
সোনাই বেড়ি নাই মরকে ॥
দৌড় পাড়ি যাই গো সোনাই দয়াল আম্মার কাছে গো
সোনাই বেড়ি নাই মরকে ॥
দেন দেন দেন গো আম্মা এক টান দুধ গো
সোনাই বেড়ি নাই মরকে ॥

ঝড় নাইকে তুফান নাইকে কিসের ফোটা পড়ে গো
সোনাই বেড়ি নাই মরকে ॥
মায়ের মুখে চায়ে দেখি চোখের পানি পড়ে গো
সোনাই বেড়ি নাই মরকে ॥
খেলায় খেলায় খেলায় গো সোনাই
সোনাই ঠুলি দিয়ে গো সোনাই বেড়ি নাই মরকে ॥

১১.

পরের দেশে যামুনা আব্বা গো ॥
আমার আংনে শুরিবের কব গো
আমার কাঞ্চা বয়সের শরীর গো
সাধু আমার অল্প বয়সের শরীর গো সাধু ॥
ঐনা আংনে শুরিতে আব্বা গো
আমার হাতে উঠিব ঠুসা গো
আমার অল্প বয়সের শরীর গো সাধু ॥
ইনা ঠুসা দেখিয়ে আব্বা গো
আমার আম্মা কান্দিব বসিয়ে গো
আমার অল্প বয়সের শরীর গো
সাধু আমার করুল বাঁশের শরীর গো
সাধু পরের দেশে যামুনা কাক্কা গো ॥
আমাকে বাড়া বানিবের কব গো
আমার অল্প বয়সের শরীর গো
সাধু আমার কাঞ্চা বয়সের শরীর গো ॥

www.pathagar.com

ঐনা বাড়া বানিতে কাক্কা গো আমার পায়ে ঠুসা গো
আমার অল্প বয়সের শরীর গো
সাধু আমার করুল বাঁশের শরীর গো
সাধু ইনা ঠুসা দেখিয়ে কাক্কা গো
আমার অল্প বয়সের শরীর গো
সাধু আমার করুল বাঁশের শরীর গো ॥

১২.

আরে জবা ফুল আমার ভাসিয়ারে যায়
মেঘনা নদী দিয়ে হাতের আঙ্গুলে তুলে নিবে ফুল
রাখিব খোঁপার মাঝে
আরে আমার যাওয়া যে হল না নারে সই
আব্বা যে হইছে বাদী
তোমার আব্বা কে নিরলে
বুঝাও যাইতের কালে ॥

আরে জবা ফুল আমার ভাসিয়ারে যায়
মেঘনা নদী দিয়ে হাতের আঙ্গুলে তুলে নিবে ফুল
রাখিব খোঁপার মাঝে আমার যাওয়া যে হল না নারে সই
আম্মা যে হইয়াছে বাদী
তোমার আম্মা কে নিরলে বুঝাও যাইতের কালে
আরে জবা ফুল আমার ভাসিয়ারে যায়
মেঘনা নদী দিয়ে হাতের আঙ্গুলে তুলে নিবে ফুল ॥

১৩.

বাড়ির আগের দেওয়ালের দেউরি ছোট্টমোট্ট দিঘি
দিঘির উপর বসিয়া বেটি কিসের কান্দন কান্দ ॥
ভেনা বেলার খিদে গো আব্বা কেরা সইয়ে নিব
ভেনা বেলার খিদে গো বেটি শাওড়ি সইয়ে নিব ॥

বাড়ির আগের দেওয়লের দেউরি ছোট্টমোট্ট দিঘি
দিঘির উপর বসিয়া বেটি কিসের কান্দন কান্দ ॥
বার হাতের শাড়ি গো আব্বা কেরা পরাইয়া দিব
কার হাতের গো বেটি যাইয়ে পরায়ে দিব ॥

বাড়ির আগের দেওয়ালের দেউরি ছোট্টমোট্ট দিঘি
দিঘির উপর বসিয়া বেটি কিসের কান্দন কান্দ ॥
আউলা মাথার কেশও গো আব্বা কেরাই বান্দে দিব
আউলা মাথার কেশও গো বেটি ননদে বান্দে দিব
বাড়ির আগের দেওয়ালের দেউরি ছোট্টমোট্ট দিঘি ॥

www.pathagar.com

১৪.

হলদি নাগাইলাম আলানে পালানে
মেন্দি নাগাইলাম গইল ঘরের পাছে ॥
সন্দা নাগাইলাম পাক ঘরের পিছে
কে গো হলদি মাই কিবে আছে ?
কে গো মেন্দি বুবু কিবে আছে ?
কে গো সন্দা কামলি কিবে আছে ?

তোমার মাই খায় না দানা পানি
তোমার বুবু যায় না পরের বাড়ি
তোমার কামলি করে না গিরস্তি ॥
মাইক কইও খায় যেন দানা পানি
বুবুক কইও যায় যেন পরের বাড়ি
কামলিক কইও করে যেন গিরস্তি
মাইর নাগি আনমু পাটের শাড়ি
বুবুর নাগি আনমু হাতের চুড়ি ।
কামলির নাগি আনমু সিতির সিন্দূর
মাইর কাপড় পইছেলে ছিড়িল
বুবুর চুড়ি আছারে ভাংগিল
কামলির সিন্দূর জনমের থাকিল ॥

১৫.

বাজ বাজনা আমি আব্বার কান্দন শুনি
তোমার আব্বা কান্দে গো হালের খুঁটি ধরি গো
আইজ নাগাতে বেটি বলিমু কাকে ॥

আমি আম্মার কান্দন শুনি গো
আমার আম্মা কান্দে গো
আইজ নাগাতে বেটি বলিমু কাকে গো ॥

আইজ নাগাতে ভাবী কান্দে গো
ঢেঁকির উপর দিবে পাড়
আইজ নাগাতে ভাবী কান্দে গো
ভাবী দুশমুন নিপাত হইল গো ॥

তথ্যসূত্র :
১. আয়না বেগম, বয়স-৪৮, স্বামী- নাজীম মিয়া, গ্রাম-বড়খালী, ইউনিয়ন-চিকাজানী, থানা- বকশীগঞ্জ, জেলা- জামালপুর
২. জুলেখা বেগম, বয়স-৪৬, স্বামী -আব্দুল জলিল, গ্রাম-পাথরের চর, ইউনিয়ন–পার রামরামপুর, থানা-দেওয়ানগঞ্জ, জেলা- জামালপুর
৩. ফরিদা বেগম, বয়স-৫১, স্বামী-আব্দুল করিম, গ্রাম-বাঘারচর, ইউনিয়ন-ডাংধরা, থানা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা- জামালপুর

www.pathagar.com

৪. আলেয়া বেগম, বয়স-৪৫, স্বামী-ফরহাদ হোসেন, গ্রাম-মাঠেরঘাট, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর, থানা-দেওয়ানগঞ্জ, জেলা- জামালপুর
৫. নূরেনা বেগন, বয়স- ৫৩, স্বামী- মজিবর রহমান, গ্রাম- কাঠারবিল, ইউনিয়ন-হাতিভাঙ্গা, থানা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা- জামালপুর
৬. রাদিয়া বেগম, বয়স-১৭, পিতা- রফিকুল , গ্রাম- তারাটিয়া, ইউনিয়ন- পার রামরামপুর, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা- জামালপুর
৭. চম্পা বেগম,বয়স-১৭, পিতা- সাইফুল ইসলাম, গ্রাম- তারাটিয়া বাঁশতলী, ইউনিয়ন- পার রামরামপুর, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা- জামালপুর

ঝ. বারমাসি

মেলান্দহ উপজেলার বারমাসি

১.

কমলা বলে হে
ওরে এহি তো আগুন মাসে
ক্ষেতে পাকারে ধান
কেহই কাটে কেহই মলে কেহই কররে লবণ ।
করইক করই করে লবণ
কইরেই নিকরে ঘরে,
ওরে এমন আমরা করিব ও লবণ
হায়রে সাধু আইলে ঘরে ।
কান্দিয়া কমলায়রে বলে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া
কোন বিধিরে ভাঙিল
হায়রে আমার গৈরব ॥

কমলায় বলে হে
ওরে এহি তো পোষ না মাসে
পশুইর‍্যার বৈরন
ওরে কেহ ডালে বইসে পাখি
হায়রে গরল করে রাও ।
কান্দিয়া কমলায়রে বলে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া
ওরে শিশুকালে প্রাণের পতি
হায়রে গেলারে ছাড়িয়া ।
শিশুকাল মোর বইয়ারে গেল
বাড়িলরে যৌবন
ভোমরায় না ছাড়ে পুষ্প
হায়রে মধুর কারণ ॥

www.pathagar.com

কমলায় বলে হে
ওরে এহি তো মাঘ না মাসে
গরলে পড়েরে শীত
শীতের তারসে কন্যা
হায়রে যায় বাপের বাড়ি ।
বাপ ভাইয়ের বাড়িতরে যাইয়্যে জুড়িল কান্দন
কোন বিধিরে ঘিরিয়া নিল
হায়রে আমার পীরিতির গৈরব ।
শীতের হৈরণ শীতেররে পৈরণ
তুইলের বালিশ বুকে
ওরে এমন নিষ্ঠুর বালিশ
হায়রে জবান নাই তোর মুখে ।
কান্দিয়া কমলায় বলে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া
শিশুকালের প্রাণের পতি
হায়রে গেলারে ছাড়িয়া ॥

কমলায় বলে হে
ওরে এহিতো ফাল্গুন মাসে
শশায়ে লাল হয়
সর্বলোকে খায় শাকরে ।
হায়রে নারীর মুখে তিতা
আন্ধিয়া বাড়িয়া শাকরে
তুইল্যা লইলামরে থালি
প্রাণের সাধু নাইরে ঘরে
হায়রে পরশ করব কারে ।
কান্দিয়া কমলায়রে বলে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া
শিশুকালে প্রাণের প্রতি
হায়রে গেলরে ছাড়িয়া ।
শিশুকাল মোর চইলারে গেল
হায়রে বাড়িল যৌবন
ভেমরায় না ছাড়ে পুষ্প
হায়রে মধুর কারণ ।

কমলায় বলে হে ।
ওরে এহি তো চৈত্র মাসে
চতুর্দিকেরে আশা

www.pathagar.com

কর্ম ডাল ভরসা কইর‍্যা
হায়রে কোকিল করে বাসা
সাজায় গো সাজায় করে বাসা
তুইলায় নিকরে ছাও
যেথায় আছে প্রাণের সাধু
হায়রে সেথায় চইলে যাও ॥

কমলা বলে হে
ওরে এহি তো বৈশাখ মাসে
চতুর্দিকেরে আশা
কর্ম ডাল ভরসা কইর‍্যা
হায়রে কোকিল করে বাসা
সাজায় গো সাজায় করে বাসা
তুইলায় নিকরে ছাও
যেথায় আছে প্রাণের সাধু
হায়রে সেথায় চইলে যাও ॥

কমলা বলে হে
ওরে এহি তো জৈষ্ঠি মাসে
গাছের পাকারে ফল
শতেক শতেক কাঁঠাল পাকে
হায়রে গাছে পাকা আমরে
নারী বইসে কাটে আমরে
সাধুরে বইসে খায়
হাসিতে খেলিতে তারা
হায়রে এই নিশি পোষায় ॥ ঐ

কমলা বলে হে
ওরে এহি তো আষাঢ় মাসে
নদীতে ভরারে পানি
ভিন্ন দেশের সাধু চলে
হায়রে উজান আর ভাইটালি ।
আমার দারবান সাধুর গেলরে পাছে
তারাই আইলরে আগে
আমার সাধুরে হিনে কাতর
তারে খাইছে বনের বাঘে ॥

কমলা বলে হে
ওরে এহি তো শাওন মাসে
রাইখে ধানেররে নাড়া

www.pathagar.com

তারি উপর বইসে ডাকে
হায়রে মস্ত মাইনে কুড়া।
ডাকে ডাকে বড়রে ডাকে
কুডায় ডাকেরে রইয়্যা
দারুণ কোকিলার ডাকে
হায়রে পাঞ্জর যায় মোর খইসে ॥

কমলা বলে হে
ওরে এহি তো ভাদ্দর মাসে
গাছে পাকারে তাল
সর্বলোকে খায়রে তালরে
হায়রে নারীর মুখে তিতা ॥
কান্দিয়া কমলায়রে বলে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া
শিশুকালে প্রাণের পতি
হায়রে গেলরে ছাড়িয়া।

কমলায় বলে হে
ওরে এহি তো আশ্বিন মাসে
ক্ষেতে বাইন্দরে আইল
সাধু আমার দেশে আইসে
হায়রে খাবে নানা মাছ ॥
কান্দিয়া কমলায়রে বলে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া
শিশুকালে প্রাণের প্রতি
হায়রে গেলরে ছাড়িয়া।

কমলায় বলে হে
ওরে এহি তো কার্তিক মাসে
কাকইর‍্যা রঙ্গরে বাড়ে
যার ব্যান সাধু নাইও রে ঘরে
তাহার মন্দির ডে খালি।
খোপের কবিতর যেমন
হায়রে বইসেই করে নালিশ ॥
কান্দিয়া কমলায়রে বলে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া
শিশুকালে প্রাণের প্রতি
হায়রে গেলরে ছাড়িয়া।

www.pathagar.com

২.

জ্বালাইলে জ্বালানো যায়
নিভানো বিষম দায়
আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।

এহি তো আগুন মাসে ক্ষেতে পাকা ধান
কেউ কাটে কেহ মলে কেউ করে লবণ
করে গো করে গো লবণ তুইল্যা নেয়কো ঘরে
আমরা কবির লবণ সাধু আইলে ঘরে
হায় আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।
জ্বালাইলে জ্বালানো যায়
নিভানো বিষম দায়
আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।

এহি তো পোষ না মাসে পসুইর‍্যার ভৈরব
যার ব্যান সাধু আছে ঘরে তার কতই গৈরব।
যার ব্যান সাধু নাইক্যা রে ঘরে তারব্যান মন্দির খালি।
খোপের কবিতর যেমন বইসে করে নালিশ
হায় আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।
জ্বালাইলে জ্বালানো যায়
নিভানো বিষম দায়
আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।

এহি তো মাঘ না মাসে
গরলে পড়ে শীত
শীতের তাড়সে কন্যা যায় বাপের বাড়িত।
বাপ ভাইয়ের বাড়িত যাইয়্যা
জুড়িল কান্দন
কোন বিধি হরিয়া নিল শীতেরই পৈরণ
শীতের হৈরন শীতের পৈরণ তুলার বালিশ বুকে
আহারে নিষ্ঠুর বালিশ জবান নাই তোর মুখে
হায় আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।

www.pathagar.com

জ্বালাইলে জ্বালানো যায়
নিভানো বিষম দায়
আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।
এহি তো ফাল্গুন মাসে চতুর্দিকে আশা
কর্মডাল ভরসা করে কোকিল সাজায় বাসা
সাজায় গো সাজায় গো বাসা তুলাই নেয় গো ছাও
যেথায় আছে প্রাণের সাধু সেথায় মন চলে যাও।
হায় আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।
জ্বালাইলে জ্বালানো যায়
নিভানো বিষম দায়
আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।

এহিতো জৈষ্ঠিক মাসে গাছে পাকা আম
নারী বইসে কাটে আম সাধু বইসে খায়
হাসিতে খেলিতে তারা এ নিশি পোষায়
হায় আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।
জ্বালাইলে জ্বালানো যায়
নিভানো বিষম দায়
আগুন জ্বালাইস না আমার গায় লো
আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।

তথ্যসূত্র : চান মিয়া (৫৫), পিতা : শুক্কুর সেখ, গ্রাম : মাজালিয়া, থানা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর। সংগ্রহের তারিখ ২৩-০২-২০১২

তেলিপাড়া বারমাসি

১.

জৈষ্ঠি মাসের মিষ্টরে ফল
আষাঢ় মাসের নতুন জলরে
শাওন মাস কাটাইল নারীর শয়নে শয়নে হারে শয়নে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।

ইয় তিনমাস গতরে হইল
প্রাণের সাধু নাহি আইলরে।
ওরে আইল সাধু রইল কার ম্যান বাসরে, বাসরে, হারে মন্দিরে
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।

www.pathagar.com

কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।
ভাদ্দর মাসের গুইয়ারে হাটে
আশ্বিন মাসের জোয়ার ভাটি
ওরে কার্তিক মাস কাটিল নারীর কাতরে কাতরে হারে কাতরে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।

ইয় ছয়মাস গতরে হইল
প্রাণের সাধু নাহি আইলরে।
ওরে আইল সাধু রইল কার ম্যান বাসরে, বাসরে, হারে মন্দিরে
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।
ও আগুন মাসে নতুনরে খানা
পুষ মাসে নায়র মানারে
ওরে মাঘের শীত লাগিল নারীর বুকেতে বুকেতে হারে বুকেতে
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।

ইয় নয়মাস গতরে হইল
প্রাণের সাধু নাহি আইলরে।
ওরে আইল সাধু রইল কার ম্যান বাসরে, বাসরে, হারে মন্দিরে
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।

ফাগুন মাসের রদ্দির জ্বালা
চৈত্রি মাসের রসিয়া কালা
ওরে বৈশাখ নারীর গায়ের চেহারা চেহারা হারে চেহারা
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।

বার মাস গতরে হইল
প্রাণের সাধু নাহি আইলরে।
ওরে আইল সাধু রইল কার ম্যান বাসরে, বাসরে, হারে মন্দিরে
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে মন বৈদ্যাশে।

সরিষাবাড়ি উপজেলার বারমাসি

১.

আসপের চাইয়্যা সোনার বন্ধু
এলাও না আইল।
পূর্ণিমার উঠিল চাঁদ গো
মেঘের আড়ালে।
আসিব্যার চাইয়্যা সোনার বন্ধু
এলাও না আইল।
চালাইল দক্ষিণা হাওয়া
ফুলেরই বাগানে।

www.pathagar.com

কি যে মজার দক্ষিণা হাওয়া
ফুলের বাগানে।
আসপ বন্ধু বসপ কাছে
খাওনা বাটার পান।
হাসিমুখে কওছেন কথা গো
যৌবন করমু দান।
আসপের চাইয়্যা সোনার বন্ধু
এলাও না আইল।

২.

কিরে আমার হাউসে বন্ধুরে
বন্ধুর বাড়ি যাবরে আমি
কুটব চির্যার ধান
পান বানাইয়্যান দিমু মুখেরে
ওরে বন্ধুর জুরাইত পরান।
কিরে আমার হাউসে বন্ধুরে।
আমার বাড়ি যাইও বন্ধু এই না বরাবর
ডালিম গাইছ্যা বাড়ি আমারডে
ওরে বন্ধু দক্ষিণ দুয়ার ঘর।
কিরে আমার হাউসে বন্ধুরে।
শাইল ধানের চিড়ারে বন্ধু
ডোপ ধানের খই।
আসপার চাইয়্যা আইলে না বন্ধুরে
আমি তোমার কতাই কই।
ওরে আমার হাউসে বন্ধুরে।
বন্ধুর বাড়ি আমার গো বাড়ি
যাইতে বলে হায়
নিরালায় যে আইস তুমিরে
করবো সুখেরই আলাপন।
ওরে কিরে আমার হাউসে বন্ধুরে।
আমার বাড়ি গেলেরে বন্ধু
বসতে দিব পিরা
জলপান করিতে দিমুরে
ওরে বন্ধু শাইল ধানের গো চিড়া
ওরে আমার হাউসে বন্ধুরে।

৩.

আগুন মাসে নতুন ডে খানা
পৌষ মাসে নায়র গো মানারে।

www.pathagar.com

ওরে মাঘ মাইস্যা জার গেল নারীর বুকেতে
হায়রে বুকেতে, হায়রে বুকেতে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে
সাধুরে মন বিদ্যাশে।
ইয় তিন মাস গতরে হইল
প্রাণের সাধু দেশে না আইলরে
ওরে আইল সাধু রইল কার ম্যান বাসরে
হায়রে মন্দিরে, হায়রে মন্দিরে
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে
সাধুরে মন বিদ্যাশে।
ফাল্গুন মাসে রইদের গো জ্বালা
চৈত্রি মাসে শরীল গো কালারে।
ওরে সকল জ্বালা দূর করিব আসি বৈশাখে
হায়গো বৈশাখে, হায়গো বৈশাখে
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে
সাধুরে মন বিদ্যাশে।
ইয় ছয়মাস গতরে হইল
প্রাণের সাধু দেশে না আইলরে।
ওরে আইল সাধু রইল কার মেন বাসরে
হায়রে বাসরে, হায়রে মন্দিরে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে
সাধুরে মন বিদ্যাশে।

জৈষ্টি মাসে মিষ্টরে ফল
আষাঢ় মাসে নতুন জলরে
ওরে শাওন মাস গেল নারীর শয়নে
হায়রে শয়নে হায়রে শয়নে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে
সাধুরে মন বিদ্যাশে।
ইতা নয়মাস গতরে হইল
প্রাণের সাধু দেশে না আইলরে
ওরে গেল সাধু রইল কার মান বাসরে
হায়রে মন্দিরে হায়রে মন্দিরে
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে
সাধুরে মন বিদ্যাশে।

আশ্বিন মাসে শশারে মিঠা
কার্তিক মাসে রসিয়ার নিশা

www.pathagar.com

আবার আগুন মাস আইল
নারীর বাড়িল যৌবনরে
হায়রে বাড়িল যৌবনরে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে
সাধুরে মন বিদ্যাশে।
এই বার মাস গতরে হইল
প্রাণের সাধু দেশে না আইলরে
আইছ সাধু তুমি বইসরে কাছে
আমার পাশে
হায়রে আমার না পাশে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ সাধুরে
সাধুরে মন বিদ্যাশে।

৪.

বন্ধুর মনে কতই গোস্যারে
ঘুরিয়া আয় কালাহে।
ঐ কালা বড়ই বালারে
কালা আমার গলার মালারে
ঘুরিয়া আয় কালা হে।

যখন কইরাছি পীরিতেরে
তুমি আর আমি
এখন কেন যেসব কথারে
আমি লোকের মুখে শুনিরে
ফিরিয়া আয় কালা হে।
বন্ধুর মনে কতই গোস্যারে
ঘুরিয়া আয় কালাহে।

আমার বাড়ি যাইও বন্ধুরে
এই না বরাবর
ডালিম গাইছে বাড়ি আমার
দক্ষিণ দুয়ইর‍্যা ঘররে।
ফিরিয়া আয় কালা হে।
বন্ধুর মনে কতই গোস্যারে
ঘুরিয়া আয় কালাহে।

তথ্যসূত্র : মো. ফজল বয়াতি, বয়স : ৬০, গ্রাম : খাগরিয়া, থানা : সরিষাবাড়ি, জেলা : জামালপুর। সংগ্রহের তারিখ : ২৪-০২-২০১২

www.pathagar.com

ঞ. সারিগান
বকশীগঞ্জ উপজেলার সারিগান

সারি সমাবেত কণ্ঠের গান। নৌকায় সারিবদ্ধভাবে বসে মাঝি মাল্লারা সমস্বরে এ গান গায়। তাই একে সারিগান বলা হয়। সাধারণত নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আগে বা পরে দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের সারি গায়করা উপস্থিত বুদ্ধিতে সারিগান পরিবেশন করে। সারিগানের বিষয়বস্তু-রাধাকৃষ্ণ, লীলারাম ও নিমাই সন্ন্যাস সম্পর্কিত গান, নারীপুরুষের প্রেম-বিরহ, কৌতূকরস ও পরস্পর আক্রমণাত্মক গান ইত্যাদি। সারিগান ভাটিয়ালি গানের সমগোত্রীয়। তবে ভাটিয়ালি একক কণ্ঠের গান এবং সারিগান সমবেত কণ্ঠে নৃত্যগীতে পরিবেশিত হয়। যদিও উভয় গানই অথই জলে ভাসমান নৌকায় মাঝি মাল্লারা পরিবেশন করে থাকে। বকশীগঞ্জের লোকসমাজে ছাদ পিটানো, ভারিবস্তু টানা, ধান পাট কাটা, নিড়ানোর সময়ও সারিগানের প্রচলন আছে। এদিক থেকে সারিগানকে Working song বা কর্মসংগীত বলা যায়।

সারিগানের সাথে নৌকাবাইচের সম্পর্ক আছে। সাধারণত নৌকাবাইচ খেলায় সারিগান গাওয়া হয়। বকশীগঞ্জ উপজেলার ব্রহ্মপুত্রের শাখা দশানী নদীতে কোন জাতীয় দিবস কিংবা লৌকিক কোন অনুষ্ঠানে নৌকাবাইচ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাইচের নৌকা আশি থেকে নব্বই ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। খেলার সময় বাইচের নৌকাকে নানা রঙে সাজানো হয়। নৌকাবাইচ খেলার সময় একজন প্রধান কাণ্ডারি এবং বিশ ত্রিশ জন বাইচাল থাকে। প্রধান কাণ্ডারির নির্দেশে বাইচালকগণ গানের তালে তালে বৈঠা মারে। নৌকার মেঝের তকতার উপর অবস্থান করে নৌকার মালিক, বয়াতি, ছোকরা ও বাদকগণ। সারিগান তিনপর্বে বিভক্ত। বন্দনাগীতির পর সারিগান শুরু হয়। শেষে বিদায়ি সারিগান গেয়ে থাকে। বাইচালকরা তালে তালে বৈঠা ফেলে দিশা ধরে আর বয়াতি সারিগান তৈরি করে। বাদকগণ নৌকার মাঝখানে পাটাতনে দাঁড়িয়ে বাদ্য বাজায়। অর্থাৎ নৌকার বাইচালকদের বৈঠা মারার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে দোতারা, কাশি ও ঢোলের তালে তালে গীত সারিগান দর্শক শ্রোতার মনে অন্যরকম আনন্দ দোলা সৃষ্টি করে।

এখানকার কতিপয় সারিগান নিচে দেওয়া হলো।

১.

তিন সখি যায় জলের ঘাটে
দেখিয়া প্রাণ ফাটে
আরে তোমাগর দেশের আমরা নোয়াইরে ॥
নাতে নিলাম হয় সঙ্গে কইরে
আরে তোমাগর দেশের আমরা নোয়াইরে ॥

তুমি আমি করলাম পীরিতি হে
ফুটে বালুচরে
আরে তোমাগর দেশের আমরা নোয়াইরে

www.pathagar.com

নাতে নিলাম হয় সঙ্গে কইরে
আমরা তোমাগর দেশের নোয়াইরে ॥

মধ্যের সখি যেমন তেমন হে
পাছের সখি ভালারে
আরে তোমাগর দেশের আমরা নোয়াইরে
নাতে নিলাম হয় সঙ্গে কইরে
আমরা তোমাগর দেশের নোয়াইরে ॥

শব্দার্থ : তোমাগর-তোমাদের, নোয়াইরে-নয়রে, নাতে-নইলে।

২.

পীরিতি কইরা যাইওনা বিদেশি বন্ধুরে
বন্ধুরে পীরিত কইরা ছাইড়া যাও না ॥

পীরিত রতন পীরিত যতন পীরিত গলার হার,
ঐ যে পীরিত কইরা যে জন মরে সফল জনম তার।
বৈদেশি বন্ধুরে ...॥

পীরিত রতন পীরিত যতন পীরিত বড় লেডা।
ছাড়াইলে ছাড়িতে চায় না টেংরা মাছের কাডা
বৈদেশি বন্ধুরে ...॥

বুড়া কালের পীরিত ভাইরে কাঁঠালেরই কোষ
যে না বুঝে এই মজা তার জনমেরই দোষ।
বৈদেশি বন্ধুরে ...॥
১. লেডা-ঝামেলা ২. কাডা-কাঁটা

৩.

কালাচান আমারে মজাইলেরে
ও কালাচান পাগল করিলে ॥

কাক কালা কুলি ফালা কালা মাথার কেশ
চিরল দাতের হাসি দিয়ে পাগল করল দেশ।
কালাচান আমারে মজাইলেরে
ও কালাচান পাগল করিলে ॥
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি মধ্যে মধ্যে ছেদা
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশি কলংকিনি রাধা
কালাচান আমারে মজাইলে
ও কালাচান পাগল করিলে ॥

বাঁশি না বাজাইয়া কানু রাখে কদম ডালে
নিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলে।

www.pathagar.com

কালাচান আমারে মজাইলে
ও কালাচান পাগল করিলে ॥

আষ্ট আঙ্গুল নাড়ে বাঁশি জলে ভাইসা যায়
বালুচরে ঠেকে বাঁশি রাধার গুণ গায় ।
কালাচান আমারে মজাইলেরে
ও কালাচান পাগল করিলেরে ॥

৪.

রূপচান হে ক্যানে আইলাম বৈদাশে
পাকা ডালিম টলর মলর করে
অই কদম ডালে এ... এ...এ...॥
তুমি আমি জানি
রূপচান হে ক্যানে আইলাম বৈদাশে
পাকা ডালিম টলর মলর করে
অই কদম ডালে এ... এ...এ...॥

আমার বাড়িত যাই গো বন্ধু
বসতে দেব মোড়া
রূপচান হে ক্যানে আইলাম বৈদাশে
পাকা ডালিম টলর মলর করে
অই কদম ডালে এ... এ...এ...॥

বন্ধু ভিজালো ঘাড়ের গামছা গো
আমার ভিজালো শাড়ি
রূপচান হে ক্যানে.আইলাম বৈদাশে
অই কদম ডালে এ... এ...এ...॥

হাতা হাতি পান দিতে
দেখল দেউর ছেড়া গো
রূপচান হে ক্যানে আইলাম বৈদাশে
পাকা ডালিম টলর মলর করে
অই কদম ডালে এ... এ...এ...॥

৫.

ঝাড়িয়া বান্ধিও মাথার কেশ
রূপের বাহার গো ॥

আউলা চুলের বাউলা খোঁপা
বাহার তাতে নাই,
বেণীর খোঁপায় ফুল গুণজিলে

www.pathagar.com

পাগল হয়ে যাই।
ঝাড়িয়া বান্ধিও মাথার কেশ
রূপের বাহার গো ॥

তথ্যসূত্র : ১. বয়াতি সাহেজ আলী, বয়স - ৬৫, গ্রাম-আইরমারি, ইউনিয়ন-মেরুরচর, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর
২. ধলা শেখ, বয়স– ৫৪, গ্রাম- ঘুগরা কান্দি, ইউনিয়ন - মেরুরচর, উপজেলা - বকশীগঞ্জ, জেলা– জামালপুর
৩. দুদু মিয়া, বয়স-৫২ , গ্রাম - শেখেরচর, ইউনিয়ন - মেরুরচর, উপজেলা - বকশীগঞ্জ, জেলা - জামালপুর

ট. ঘাটু গান

মেলান্দহ উপজেলার ঘাটু গান

১.

একখান পাতিল যাও না বিকাইয়া
পাতিলারে নাইয়া
একখান পাতিল যাও নারে বিকাইয়া।
নাইয়ারে ঘরে আছে ছোট্টরে ননদি
তারে দিব বিয়ারে
পাতিলারে নাইয়া
একখান পাতিল যাওনা বিকাইয়া।

২.

পাগল করিল ও নাল গামছারে
বাঁশি শোনরে শোন।
ভাগ্নের হাতে নালরে গামছা
আস ভাইগ্ন্যা করি তামসা
শ্যামের ভাগ্নেগো
ও পাগল কইরাছে নাল গামছারে।
একে তো দুইপর্যা বেলা
বাঁশিতে দিলা টান
নিদারুণ শ্যাম।
কাক্ষের কলসি ভূমে গো রেখে
শোনলাম বাঁশির গান
নিদারুণ শ্যাম।
ও পাগল কইরাছে নাল গামছারে।

তথ্যসূত্র : জলিল প্রামাণিক, পিতা : দুগ প্রামাণিক, গ্রাম : দেউলাবাড়ি, থানা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর। তারিখ : ১২-১২-২০১১ রাত : ১০-০০ মি., স্থান : প্রামাণিকপাড়া

www.pathagar.com

সরিষাবাড়ি উপজেলার ঘাটু গান

১.

পিয়ারপুরের আনু গো মুনশি
সে যে হইয়াছে পাগল
বাইরবাড়িতে তার জুম্বা ঘর গো বানছে ঘাটুর দল।

শুক্করবারে আজান গো দিলে
ও তার নামাজের কী গো ফল
মওতকালে সঙ্গে যাব গো
ঐন্যা ঘাটুর দল।
বাপে আমার দিছে গো বিয়ে
আমার মায়ে তো জানে না
না বাল্লগ সোয়ামী আমার গো
প্রেম তো বুঝে না।

সাঞ্জর বেলা বিছানা গো পারি
সে যে শুইতে জানে না।
বেড়ার বুগলে শুইয়ে থাকে গো
ঠেলতে নড়ে না।

বন্ধু যদি থাকতো গো ঘরে
ঝাইরে বানতাম ক্যাশ
খঞ্জন পাখির মুতন আমি গো
ঘুরতাম নানান দেশ।
বন্ধু যদি থাকতো গো ঘরে
খাইতো বাটার পান।
শীতল পাটি দিতাম পাইর‍্যা গো
যৌবন করতাম দান।
আরশি হাতে মেসি গো দাঁতে কাঙ্কন হাতেতে নিয়ে
তেরা সিথি মাথায় রেখে
ও যায় জলের ঘাটে ॥

তথ্যসূত্র : মোকছেদ, বয়স ৮৫, তারিখ : ২৩/২/১২

২.

হারে যাইও যাইও চেংড়া বন্ধু
করি প্রেমের নিমন্ত্রণ। (২)
হারে যাইও যাইও চেংড়া বন্ধু

www.pathagar.com

করি প্রেমের আলাপন।
শিমুল ফুলের টাটকারে মধু
খাইয়া যাওরে ভোমরা বন্ধু
ওরে গিলাসে ভরিয়া মধু
খাওয়াব বসাইয়া কোলেরে।
হারে যাইও যাইও চেংড়া বন্ধু
করি প্রেমের নিমন্ত্রণ। (২)

৩.

হারে রসের যৌবন ফুল ফুইটাছে
মধু দান করব কারে।
ঐ মধু দান করব কারে গো
মধু দান করব কারেরে।

ঠাণ্ডা জলে চান করাব
হৃৎকমলে বসাইব
ওরে ছাপর কাষ্ঠে শোয়াইয়া
সোনার যৌবন করব দান।
হারে রসের যৌবন ফুল ফুইটাছে
মধু দান করব কারে।

৪.

চেংড়া বন্ধুরে ঘর তুইল্যা দে
নদীয়ার কূলে
ঘর তুইল্যা দে নদীয়ার কূলে
ঘর তুইল্যা দে নদীয়ার কূলে
চেংড়া বন্ধুরে।
ঘর তুইল্যা দে নদীয়ার কূলে

ছোট কমলা আনারে আনা
বড় কমলা দাম চার আনা
রসের কমলা গো বন্ধু কিনল না।
চেংড়া বন্ধুরে
ঘর তুইল্যা দে নদীয়ার কূলে।
ঘর তুইল্যা দে সারি গো সারি
মদ্দে মদ্দে বাঁশের গো দেউরি
ঘর তুইল্যা দে সারি গো সারি
চেংড়া বন্ধুরে।
ঘর তুইল্যা দে নদীয়ার কূলে।

www.pathagar.com

৫.

তোমার মালঞ্চা বনে ফুল ফুইটাছে
এক ঝাড় কলি। (২)
তোমার মালঞ্চা বনে ফুল ফুইটাছে গো
এক ঝাড় কলি।
ওগো ফুল ফুইটাছে এক ঝাড় কলি গো (২)
ওরে ফুলের মালিকা মালতি যত
হইয়াছে বিকশিত। (৩)
অই একা হইয়া ফুল তুলিব কত। (২)
ঝরিয়া পড়ে ডালে ডালে (২)
তোমার মালঞ্চা বনে ফুল ফুইটাছে
এক ঝাড় কলি। (২)

৬.

মন তো মানে নারে
চোখের নিশি প্রাণ সখা
ও চোখের নিশি প্রাণ সখা (৩)
মন তো মানে না চোখের নিশি প্রাণ সখা।

ভালবাসা ছেড়ে যাব
মনেরে বুঝায়ে লব।
না হয় মনে কষ্ট হব। (২)
মন তো মানে নারে
চোখের নিশি প্রাণ সখা
ও চোখের নিশি প্রাণ সখা (৩)

৭.

প্রথমে বন্দনা করি পাক নিরঞ্জন
তার শেষে বন্দনা করি রসুলের চরণ
বেশ ভাই রসুলের চরণ।
দমে দমে লওছেন মাওলার নাম
দম গেলে মরণ।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বন্দন কইরা থির
মাঝখানে বন্দনা করি হজ মক্কা শরিফ
বেশ ভাই হজ মক্কা শরিফ
সেই ঘরেতে হজ করিলে পাপির হয় মুক্তি।
ও মোহাম্মদ মোস্তফা নবি উম্মতের কাণ্ডার
উম্মতি উম্মতি বইলা কানছে যারে যার
বেশ ভাই কানছে যারে যার
তিনার চরণ ধইরে আখেরে হইয়া যাব পার।

www.pathagar.com

উস্তাদ গুরু বইন্দ্যা গাব তেলিপাড়া গেরাম
তথায় বসতি করে মহরদ্দি নাম
বেশ ভাই মহরদ্দি নাম ।
তিনার কাছে শিক্ষা নিয়ে দেশ বিদেশ
ঘুইর‍্যা বেড়াইলাম ।
বেশ ভাই ঘুইর‍্যা বেড়াইলাম ।

৮.

পরথমে কইরাছি পীরিত গো দাদা বট বিরিক্ষেরেই তলে
নিয়রে যে ভিজলরে শাড়ি
দাদা গামছা বিছাও তুমিরে
মায়া ছাড়রে ।

ও তার শেষে কইরাছি পীরিত গো দাদা
ছোট ছনের ঘরে গো দাদা
আশপড়শি আছে গো যারা
তারাই দিছে কইয়ারে
মায়া ছাড়রে ।

ও তার শেষে কইরাছি পীরিত গো দাদা
ছনের আড়ে গো দাদা
সেসব পীরিতের কথা লোকের মুখে শুনি রে
মায়া ছাড়রে ।
দাদার বাড়ি নাইয়র যাবরে বলে
কাপড় দিলাম ক্ষারে
ক্ষারের কাপড় ক্ষারেতে রইল
দাদা নিব্যার আইল পরেরে
মায়া ছাড়রে ।

ও কিসের আমার রান্ধন বাড়ন গো দাদা
কিসের মসলারে বাটা
দুই নয়নের জলে গো দাদা ভিজে গেল পাটারে
মায়া ছাড়রে ।

ঠ. আসরের গান

মেলান্দহ উপজেলার তেলিপাড়ার আসরের গান

আকাশে শুক্লা নবমীর চৈতালি চাঁদ । হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন ধরণীর উপর মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ছে । দুই ধারে ফসলের মাঠ মাঝখান দিয়ে তেলিপাড়া গ্রামের একটি মেঠো পথ । সেই পথের উপর বসেছে এই গানের আসর । স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেলিপাড়া গ্রামের কয়েকজন হৃদয় উজাড় করা আবেগ দিয়ে গাইছেন নানা ধরনের লোকগান ।

www.pathagar.com

১.

ভাঙ্গা চকি ছাপর কাঠ
নাইয়র যাবার উঠছে ঠাঁটরে
ওকি আরে ও কালারে
নাইয়র যাব বাপ মায়ের দেশেরে
ছয় মাসের বারা বানছিরে
ওকি আরে ও কালারে
নাইয়র যাব বাপ মায়ের দেশেরে।

২.

আরে চান সভায় লওছেন আল্লাহর নাম
ওরে আল্লার নূরে মুহম্মদ পয়দা
দুনিয়া তামাম। (২)
আল্লা আল্লা বল সবে আল্লা আছে সবখানে
ওরে আল্লাজীর চরণ ধইরে
এ সভায় ধুইমে গাইলাম
ইমানে তরাও তরাও
তরাও গো নিদান
আয় আহা আ।

মাগো তুমি সরস্বতী
কণ্ঠে বইসে যোগাও কথা
মাগো সরস্বতী
আজ তোমারে ডাকি মাগো
ডাকি মাগো সভাতে
অধম জব্বার আলী বলছে মাগো
দয়া কি তার হইল
ইমান নিদান কালে
ছাইরে যাইয়োনা
আয় আহা আ।

৩.

যুদ্ধের পরে একটি কথা আরে ও শুইনাছি আমি।
কলকাতা হরতাল গেলি বিষম গণ্ডগোল
সে সব কথা বলতে গো
আরে ও চক্ষে আসে জল।
ও ভারতবর্ষে একটি কথা
আরে ও নেতা তিনজনা
সুভাষ বস্ক জহরলাল আর মিস্টার জিন্না
এই তিনজনা কুমতি কইরা গো

www.pathagar.com

আরে ও করল ঘটনা।
সুভাষ বস্ক উইঠে বলে চিন্তায় বাঁচি না।
সোনার বাংলা স্বাধীন নিব গো
আরে ও মিস্টার জিন্না।
বিহারিরা লোক মারিয়্যা
আরে ও রাজ্য নিতে চায়।
ও এই জব নিয়া জিন্না সেই দেশেতে যায়
সেই দেশের ইসলামগণ সুন্নি শিয়াগণ
কত যুবক ছাত্র উইঠ্যা বলে রক্ত করবো দান
তবু না ছাড়িব আমরা গো।
আরে ও সাধের পাকিস্তান।
আমার আলেমগণ ডাইক্যা বলে
আরে ও শোন মুসলিম ভাই
মুসলমানের জাতি আমরা হও সাবধান
হিন্দুগরে মরা মইলে পুইর‍্যা কর ছাই
আমরা মুসলমান ভাগ্যবান ধর্মসাক্ষী
জানাজা পড়িয়া মরা গো আরে ও গোরে দেয় মাটি।
আমার আলেমগণে ডাইকে বলে
আরে ও শোন কংগ্রেস ভাই।
আমার পাঠান সৈন্য অতি মান্য
অতি বলিমান
শিব সৈন্য পাইলে পরে গো
আরে ও করে অপমান।
ওরে তাই শুনিয়া হিন্দুরা সব
হিন্দুস্তানে যায়
বেনামাজি পাকিস্তানে গো
আরে ও থাকতে দেয় না ভাই।

৪.

ও দেওরারে ওরে হিন্দুলা মন্দিররে ঘরে
ঘুনে করল জর জররে।
টান দিলে খসিয়া পড়ে ঘরের উয়েরে

ও দেওরারে ওরে উত্তর তনে আইলরে ভারই
কতা জিগাই মাইরি সাইরিরে
কওছেন ভারু প্রাণবন্ধুর খবররে।
নাট সখি হে ওরে তোমার স্বামী আছেরে ভাল

www.pathagar.com

ও খাবার চাইছে পঞ্চভারু
আরো চাইছে জিয়াল মাগুর মাছরে।

ও দেওরারে এহি তো আষাঢ় মাসে
খালে বিলে ভাসে পানিরে
আবার কোথায় পাব জিয়াল মাগুর মাছরে।
ও নাট সখি হে, ওরে বান্দ আইল সিচরে পানি
ও বাইন্দে মার মাগুর মাছরে
ও মাটির পাতিলে পাকাইয়া পাঠাও বন্ধুর দেশেরে।

ও দেওরারে ওরে পাখির মন্দে হারুইয়্যা প্যাচারে
ও তার চোখে নাইক্যা দয়ারে
আবার পাখি হইয়া পাখি ধইর‍্যা খায়রে।

ও দেওরারে পাখির মন্দে হারুইয়া প্যাচা
ও নারীর মন্দে তেল কালারে
দেখতে ভালা রসিকা নাগররে।

ও দেওরারে পুরুষ নষ্ট হাট বাজাররে
ও কাপড় নষ্ট ধোপার কাছেরে
নারী নষ্ট থুইলে বাপের ঘরেরে

৫.

হাউসেই বান্দিলামরে নৌকা
আগায় দিলামরে গোড়া
কোন মিস্ত্রি বানাইয়াছে নৌকা
নৌকার মন্দে মন্দে জোড়া নাও
ঘাটে নাগাও নাও রে।

হাল বাইলাম ডালরে কাটলাম
চিকন করে বানাইলাম বৈঠা
জীবন ভরে টাইনেই আইলাম
আল্লা না পাইলাম কূল নাও
ঘাটে নাগাও নাও রে।

আগা ঢুলে পাছারে ঢুলে
ঢুলে রসেররে গুইরে
কিরমে কিরমে ডুইবেরে গেল
আল্লা সমস্ত গুইরে নাও
ঘাটে নাগাও নাও রে।
শালা কান্দে সুমুন্দি কান্দে

www.pathagar.com

কান্দে রসেররে শালী
ঘরের রমণী কান্দে
আল্লা বিছন্যা করলা খালি নাও
ঘাটে নাগাও নাও রে।

৬.

আহারে সোনার নৌকা
শুকনায় তল হবে।
চারখান বৈঠা কলেররে নৌকা
শুকনায় তল হবে।

কাজি আইসে যেদিন
হিসাব নিব রে
ওগো হাইল ছাইরে মাঝি পলারে
আহারে সোনার নৌকা
শুকনায় তল হবে।

৭.

বন্ধু আমার হাল বাইঅরে
ঐ না নদীর কূলে কূলে কূলেরে
ও দারুণ মুখ শুকাইল পৈছালা
বাতাসেরে।

বন্ধুর মুখ শুকনা দেইখারে
আমি গেলাম জল ভরিতেরে
ও দারুণ খইসা পইল
গলার চন্দ্র হাররে।

বাপে শোনলে গালি দিবরে
মায়ে শোনলে নাকফুল কাটবরে
ও দারুণ ভাইও নাই মোর
তুইল্যা দিব গলার হাররে।

শওরের কতা মাথায় রাখবরে
শওরির কতা অঞ্চলে বান্ধিরে
ও দারুণ নন্দের জ্বালায়
ঘরের বাহির হইলামরে।

উত্তরে ছান্দারের বাদা
ঘর বাইন্ধাছে ঘাটে বান্দা নৌকারে
ও দারুণ সিঅ ঘরে
এক নিশি পোসাইলরে।
মেঘনা নদীর চিকন বালারে

www.pathagar.com

মুই নারীর যৌবন জ্বালারে
ও দারুণ সিঅ নদীর
ঘিরিল বোয়াতেরে।

৮.

পুঁইবেলা পশ্চিমা বায়
নায়ে জোড় বাদাম খাটাইয়্যা যাও রে।
ও তোর হেলে মাঞ্জা দুলে মাথার কেশরে
আরে ও দক্ষিণা নাইয়ারে
ও মন তো হেরিল নারে
প্রাণ তো চায়অরে।

ও বাপ মাওঅ নিদারুণ
কালা ট্যাকা নিছে ষোল পণরে।
ওরে বিয়্যা দিছে ঘাটের মরার কাছেরে
আরে ও দক্ষিণা নাইয়ারে
ও মন তো হেরিল নারে
প্রাণ তো চায়অরে।

ও বাইজবরা তামুক খায়
কালা আগুন দিতে পরান যায়অরে।
ওরে সেই আগুনে শরীর হইল কালারে
আরে ও দক্ষিণা নাইয়ারে
ও মন তো হেরিল নারে
প্রাণ তো চায়অরে।

তথ্যসূত্র : এই আসরের আয়োজক তেলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন নাট্যশিল্পী, লোকসংস্কৃতির একজন সেবক জনাব মো. শহিদুল্লাহ

আসরে উপস্থিত শিল্পীদের কয়েকজনের নাম :

১। মো. শহিদুল্লাহ (ম্যানেজার)
পিতা- সৈয়দ আলি

২। মো. আলতাফুর, বয়স ৫৫
পিতা- আকবর শেখ

৩। রইচ মিয়া, বয়স ৫৫
পিতা- আব্দুল শেখ

৪। মো. আলতাফুর, বয়স ৫২
পিতা- মো. ছাবেদ আলি

৫। মো. আবুল কালাম আজাদ, বয়স ৫০
পিতা- আব্দুর রহমান

৬। মো. নাজিম উদ্দিন, বয়স ৬২
পিতা- জবেদ মুন্ডল

www.pathagar.com

সবার গ্রাম : তেলিপাড়া, থানা : মেলান্দহ, জেলা : জামালপুর, তারিখ : ০১/০৪/২০১২, রাত- ৮ : ৩০ – ১২ : ৩০ পর্যন্ত

ড. জারি গান

জামালপুরে জারি গানের ঐতিহ্য ছিল। বৃটিশ আমলে সদর উপজেলার পাথালিয়া গ্রামের ফয়েজ উদ্দিন জারি গানের ওস্তাদ ছিলেন। হাজরাবাড়ির গরীবুল্লাহর জারি গান এককালে এ অঞ্চলে মুখর করে রাখতো। মেলান্দহের চারণকবি কুরবান আলী রচিত ও গীত বিখ্যাত গদাই সিং এর জারি। এটি ষাটের দশকের শেষের দিকে রচিত। জারিটি ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল।

জারি গান (জামালপুর নিয়ে)

বন্দনা : উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পাহাড়
দক্ষিণে বন্দনা করি নদ-নদী সাগর ॥
পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর
পশ্চিমে বন্দনা করি পবিত্র কাবা ঘর ॥
চারিদিকে বন্দনা করি মহান স্রষ্টার নাম
যাহার দয়ায় সৃষ্টি হইল জমিন আসমান
জামালপুরের কথা এখন শুরু করিলাম ॥

ধুয়া : শোনেন শোনেন ভাই শোনেন সুধীজন
জামালপুরের কথা আমরা করিব বর্ণন ॥

জারি : উত্তরেতে ব্রহ্মপুত্র সাগরের পাহাড়
দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলা মধুপুরের গড়।
পূবেতে আছে ভাই ময়মনসিংহ জেলা ॥
পশ্চিমে যমুনা নদী বালুচরের মেলা ॥

জামালপুরের জেলায় আছে সাতটি থানা
ধন সম্পদে ভরা মোদের সকল থানা।
সদর থানায় আছে দিঘি হরিশ্চন্দ্র নাম
শাহজামাল এর পুর্ণ্য স্মৃতি জামালপুর ধাম ॥
ইসলামপুরের কাঁসার বাসন পাবে তার জুড়ি।
বকশীগঞ্জের নকসি কাঁথা বৈদেশেতে পারি ॥
মেলান্দহে পাবেরে ভাই উন্নত মান তামাক
দেওয়ানগঞ্জে চিনিকল, পাইবা মিষ্টি আখ ॥
মাদারগঞ্জে মাছ পাট হয় যে অতুলন।
সরিষাবাড়ির ধান, নান্দিনার পান
ঝিনাই ব্রহ্মপুত্রের পলিমাট যে সুফলা
ধান পান পাট ফসলের জামালপুর জেলা ॥

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত জারিটি অধ্যাপক প্রদীপ কান্তি মজুমদার রচিত জামালপুর জেলার রজতজয়ন্তী স্মরণিকা থেকে সংগৃহীত

www.pathagar.com

চ. একদিল গান

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার একদিল গান

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় একদিল গান নামে এক ধরনের গান প্রচলিত আছে। একদিল হচ্ছে মানতের গান। সাধারণত বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনার জন্য সত্যপিরের নামে মানত করে আচার পালন করা হয়। মানত সফল হলে মানতকারী গেরস্থ কোন একদিন পেশাদার বয়াতি ও প্রতিবেশী ডেকে সত্যপিরের গানের আসর বসায়। বয়াতি লৌকিক আচাররীতিতে গেরস্থ বাড়িতে সত্যপিরের গানের পালা গায়। তার সঙ্গে থাকে কয়েকজন দোহার। বন্দনাগীতি এবং পরিচয় পর্বশেষে মূলপালাগান শুরু হয়। এটি একদিল পালাগান নামে পরিচিত। সত্যপিরের জন্ম-বৃত্তান্ত একদিল গানের উপজীব্য। গান ও সংলাপের মধ্যদিয়ে একদিল গানের পালা শুরু এবং শেষ হয়। সত্যপিরের এ পালাগানে আছে, শানপুরের সওদাগর শামীম ও আশেক নূরির পুত্র সত্যপির। নিঃসন্তান আশেক নূরি সন্তানের আশায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে মুসা নবির খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। অনেকদিন পরে মুসা নবির সঙ্গে তার দেখা হয়। তার দুঃখের কথা শুনে মুসা নবি আল্লাহর সঙ্গে দিদার করেন। মুসা নবি আল্লাহর সঙ্গে দিদার করে আশেক নূরিকে কুতুবপিরের মাজারে বার বছর এবাদত করার নির্দেশ দেন। এবাদত ত্রুটিপূর্ণ হলে আশেক নূরিকে আবার নিথুয়া পাথারে বার বছর তপস্যা করতে হয় এবং তার অভিশাপ মুক্ত হতে আরো বার বছর সময় লাগে। এভাবে ছত্রিশ বছর সাধনা করে সফল হলে আশেক নূরি সন্তান লাভ করেন। এ সন্তান সত্যপির নামে পরিচিত।

একদিল পালাগানের প্রচলিত রীতি

আগেই বলেছি, বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনার জন্য সত্যপিরের পালা গানের আসর দেওয়া হয়। মানতকারী তার বাড়িতে পেশাদার বয়াতি ও প্রতিবেশীদের ডেকে সত্যপিরের পালাগানের আসর বসায়। এখানে বয়াতিকে গীদেল বলা হয়। পেশাদার বয়াতি ও দোহারদের পরনে থাকে সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা। বয়াতির হাতে থাকে একটি আর্ষা। একফুট লম্বা এ কাঠের তৈরি আর্ষার অগ্রভাগে একগুচ্ছ কালো চুল ঝোলানো থাকে। এটিই আর্ষা বা সত্যপিরের প্রতিকৃতি। একজন ছেলেকে মেয়ের অভিনয়ে ছোকড়া সাজানো হয়। একটা লাল শাড়ি পেচিয়ে ঘাগড়ার মত করে নিয়ে ছোকড়া পরিধান করে। তার গায়ে লাল ব্লাউজ, হাতে চুড়ি, গলায় চেইন, মাথায় বেণীগাঁথা লম্বা কালো পরচুলার উপর একটা জরি খচিত লাল স্কার্ট থাকে। গোল হয়ে দাঁড়ানো বা বসা দর্শক শ্রোতার মাঝখানে যে খালি অংশ থাকে তাতে পালাগানের আসর বসানো হয়। এটিই পালাগানের মঞ্চ। এখানে দোহার, বাদক ও কুশল-কুশলীরা গোল হয়ে বসে। বয়াতি, ছোকরা ও অভিনেতারা তাদের চতুর্পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে গান ও সংলাপ পরিবেশন করে। এ পালাগানের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা আশেক নূরি, শামীম সওদাগর, জিব্রাইল, মাদারপির, ইল্লাল্লাহ পাথর, মুসা নবি, গায়েবি আল্লাহ ভূমিকায় অভিনয় করে। মুসা নবির হাতে থাকে দু ফুট লম্বা একটি লাঠি। এখানে বয়াতি গায়েবি আল্লাহ, ছোকড়া আশেক নূরি এবং একজন কৌতুক অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করে

www.pathagar.com

থাকে। আসরের পশ্চিমপার্শ্বে কুতুবপিরের কল্পিত মাজার স্থাপন করা হয়। জলচৌকির উপর একটা কুলা ও চালুনি রাখা হয়। কুলার ভিতর সত্যপিরের আর্ষাটি লাল শালুক কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। চালুনি এককাদি কলা, এক মুঠো খই, ধান-দূর্বা, হলুদ ও একটি পানে সিঁদুর মাখানো থাকে। পাশে একটি মাটির ঘটির জলে আমপাতা সমেত একটি ছোট্ট ডাল লম্বা-লম্বি ডুবিয়ে রাখা হয়। আমপাতায় কয়েটি সিঁদুরের ফোটা আঁকা থাকে। পালা শুরু করার আগে বয়াতি কল্পিত মাজারে আগর বাতি ও মোম জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারে লৌকিক আচার পালন করে। তারপর বয়াতি আর্ষা হাতে নিয়ে ঘটির পানিতে ভিজিয়ে নেয়। তারপর আর্ষার অগ্রভাগে ঝুলানো চুলগুলোর ভিজানো পানি দর্শক শ্রোতার মাঝে ছিটিয়ে সত্যপিরের পালাগান শুরু করে। সাধারণত সত্যপিরের পালাগানে বাদ্যযন্ত্র খোল, চটি, খমক ও কাঁসার জুড়ি ব্যবহার করা হয়। বন্দনায় আল্লাহ রাসূলের সাথে সত্যপিরে প্রশস্তি গাওয়া হয়। বয়াতি ও দোহার নৃত্যগীতে সত্যপিরের কেরামতি, আল্লার সঙ্গে মুসা নবির দিদার পালাগানে পরিবেশিত হয়। মূল পালাগানে আল্লাহর সঙ্গে মুসা নবির দিদারের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সত্যপিরের জন্ম কাহিনি, আশেক নূরির সাধনা, মুসা নবির সাথে আশেক নূরির সাক্ষাৎ নানা বিষয় গান ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে একদিল গান পালায় প্রকাশিত হয়। পরিচয় পর্ব শেষে মূল পালাগান শুরু হয়।

বন্দনাগীতি

আল্লাহ আল্লাহ বলো ভাই নবি কর সার
নবির কলেমা পড় হইয়া যাবে পার ॥
আল্লাহ আল্লাহ বলো ভাই গো যত মমিনগণ
সত্যপিরের কথা তোমরা শোনো দিয়া মন ॥
আল্লাহ নবির নাম লইতে যে করিবে হেলা
তার জবানও হইবে বন্দী মউতের বেলা ॥
আও মোড়লি আও দয়া করে আও
শানপুরও ছাড়িয়ে আমার আসরে দাঁড়াও ॥
বন্দি বশে খোদাতালা
তার মহিমার নাই সীমানা ॥
হক নামে সোবাহান মওলা
তার তরে জানাই আমি হাজারও সালাম ॥

পরিচয় পর্ব

সভা কইরে বইছেন যত হিন্দু মুসলমান
সবার চরণে আমি অধমের সালাম ॥
আমি অতি মূর্খমতি বিদ্যাবুদ্ধি নাই
পালা গাইয়ে শান্তি দিবার আমার সাধ্য নাই ॥
বাড়ি আমার বাঁশতলি নাম রকমান আলী
আপনার এইখানে আইসে বিরক্ত করলাম খালি ॥

www.pathagar.com

গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই একদিল পালাগানের শ্রোতা দর্শক। তবে নারীদের প্রতি বয়াতির বিশেষ নজর থাকে। কারণ সাধারণত নারীরাই মানত করে সত্যপিরের পালাগানের আসর বসায়। বয়াতি গান ধরে আর দোহারেরা সাথে সাথে সমস্বরে গায়। নিচে কয়েকটি গানের অংশ বিশেষ দেয়া হলো।

১.

পাখিটা ধরিয়া দে
কতো না হাউসে বানাইলে পাখি
পাখিটি ছাড়িল কে
হলুদ বরণ পাখিটা ছাড়িল কে ॥
থাকো থাকো পাখি
আমার শ্যাম সুন্দর পাখিরে
ধরা দে ধরা দে।
পাখিটা ধরিয়া দে
কতো না হাউসে বানাইলে পাখি
পাখিটি ছাড়িল কে ॥

২.

ও চেংরা বন্ধুরে
নয়নের কাজল চেংরা বন্ধুরে
ওরে যায়রে কোথায় ॥

৩.

আমি যামু মেরাজে
ও স্বামী বিদায় দেন যামু মেহরাজে
আল্লার কাছে এই মিনতি করলাম ॥

৪.

ও পাড়ার মানুষ শোনো দিয়া মন
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেছি
মুর্শিদের কারণ ॥

৫.

ও দাদার বউ হারাইছে
একেতো আট খুড়ে বিবি
হাট বাজারে যায়
হাট বাজারে যাইয়ে বিবি
চড় থাপ্পড় খায় ॥

৬.

ও বাবা অল্প বয়সে কেন শিখাইলে পীরিতি
আমি একটা ছেলের জন্য পাগলিনী হয়েছি ॥

www.pathagar.com

ও বাবা আমি বাড়ির বাহির হইয়াছি
ও বাবা অল্প বয়সে কেন শিখাইলে পীরিতি ॥

৭.

চল না আমার হাওয়ার গাড়ি গো
হাওয়ার গাড়ি টং টং লেবুর বাগানে ॥
আমার নাতি জামাই গো
পুবেল বাতাসে মনের মত
মানুষ পাইনে গো ॥

৮.

নদীর কূলে কূলে গো
ও ঘাটে মাঝি নাইরে
কেমনে হব পার ॥
ও ধ্বনি আল্লাহ ও দয়াল দয়া কর
নদী পার করিবার ॥

৯.

আমি অপরাধী অপরাধী
আমি অপরাধী অপরাধী গো বাবা ॥
আমি ভুল কইরাছি
মুসাক্বারি আল্লাহর অলি
তাহার তরে আইলাম আমি গো
আমি অপরাধী গো বাবা
আমি অপরাধী ॥

১০.

কপালের দুঃখ আমার গেল নারে
দুঃখ আমার বলব কার কাছে
আমি কোন বনে যাইয়া
তাহার পাব দেখারে ॥
ও দয়াল আল্লারে
আমি কোন বনে যাইয়া পাব তোমারে ॥

১১.

আমায় বিধিরে এতই দুঃখ দিলিরে
ও আমার বিধিরে
একটা ছেলের কারণে আমায় এত দুঃখ দিলিরে ॥

১২

তল্টিপারে ভল্টিপারে
স্বামী নাই মোর ঘরে

www.pathagar.com

এত রাতে জানালা দিয়ে
কে কথা বলেরে ॥

একদিল গান গানের ফাঁকে ফাঁকে অভিনয় করা হয়। একদিল পালাগানের কিছু সংলাপ নিচে দেওয়া হলো—

১. পড় বিসমিল্লাহ
পড় আলহামদুলিল্লাহ
আল্লাহর বাড়ি কত দূর
এখন আল্লাহর আরসে যামু
সেখানে গিয়ে ছেলে চামু
আমার নাম মুসাক্বারিমুল্লাহ।

২. মাছের পেটে দিয়েছেন লাখে লাখে পোনা
তোমার পেটে বাচ্চা দিতে কে করেছে মানা?

৩. বন্দেগি করলে ষোল আনা
অর্ধেক করলে ফল পাবা না।

৪. বিনা সলতে, বিনা আগুনে,
বিনা তেলে বাতি জ্বালাইতে পারলে
আশেক নূরির সন্তান হবে।

৫. মেরাজে যাইতে হইলে
রোজা করতে হয়
নামাজ পড়তে হয়।

৬. কুতুবপিরের মাজারে বার বছর
এবাদত করলে তোমার সন্তান হবে।

৭. নিথুয়া পাথারে বার বছর তপস্যা করতে হবে।

৮. আশেক নূরির অভিশাপ মুক্ত হতে
বার বছর ভিক্ষে করতে হবে।

সত্যপিরের পালাগানে বয়াতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বয়াতি বাজনার তালে তালে অপূর্ব অঙ্গভঙ্গিতে নাচে এবং গান গেয়ে উপস্থিত শ্রোতা দর্শকের মন জয় করে। তার বর্ণনা বড়ই মজাদার এবং চমৎকার হয়। অর্থ্যাৎ তিনি রসিকজন এবং দোহারদের বলা যায় রসের হাঁড়ি। দোহারেরা মাঝে মাঝে কৌতুকময় গান পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। বিশেষ করে যুবক যুবতীর উদ্দেশে রঙ্গরস ও হাস্য কৌতুকপূর্ণ গান গেয়ে আসর মাতিয়ে তোলে। পালাগান শেষে উপস্থিত শ্রোতা দর্শকদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পার রামরামপুর ইউনিয়নের ভাতখাওয়ার বাঁশতলী গ্রামের রকমান আলী বয়াতি ও তার দল সত্যপিরের পালা গান গায়। এ অঞ্চলে রকমান আলী একজন পেশাদার বয়াতি হিসাবে সুপরিচিত।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র : **বয়াতি রকমান আলীর দল পরিচিতি** : সংগ্রহের সময় ও স্থান : সময়-২.০০টা, তারিখ : ১০.১১.২০১২, আসরের স্থান : বকশীগঞ্জ উপজেলার মেরুরচর ইউনিয়নের টুপকারচর গ্রাম

১. বয়াতী রকমান আলী, বয়স-৫৭, পিতা-কিসব আলী, গ্রাম-ভাতখাওয়া, বাঁশতলী, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর, উপজেলা-দেওয়ানগঞ্জ, জেলা জামালপুর

২. ম্যানেজার আজম আলী, বয়স-৫৬, গ্রাম-ভাতখাওয়া, বাঁশতলী, ইউনিয়ন- পার রামরামপুর, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

৩. ছোকড়া : কলম মিয়া, বয়স-৪২, গ্রাম-ভাতখাওয়া, বাঁশতলী, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

৪. আব্দুল মজিদ, বয়স-৪৩, গ্রাম-ভাতখাওয়া, দক্ষিণপাড়া, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর, উপজেলা-দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

৫. খুসু মিয়া, বয়স-৫৩, গ্রাম-তাঁরাটিয়া, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর, উপজেলা-দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

৬. মহল উদ্দিন, বয়স-৪২, গ্রাম-ভাতখাওয়া, বাঁশতলী, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

৭. সহিজল, বয়স-৩৮, গ্রাম-ভাতখাওয়া, দক্ষিণপাড়া, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর

৮. ইলিয়াছ মিয়া, বয়স-৪০, গ্রাম-ভাতখাওয়া, বাঁশতলী, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

৯. সওদাগর মিয়া, বয়স-৬৭, গ্রাম-ভাতখাওয়া, বাঁশতলী, ইউনিয়ন-পার রামরামপুর, উপজেলা- দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. মৌসুমি উৎসব

জামালপুর জেলা মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ঈদকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে ওঠে এখানকার সাধারণ মানুষ। ঈদকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবে সারা দেশের মতো এখানেও শহরের স্বজনেরা বাড়ি ফেরে। এই দুই উৎসবকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন পর পর একে-অন্যের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন করার সুযোগ পায়। শুধু তাই নয়, নববিবাহিত দম্পতিদের জন্য এ সময়গুলো খুবই উপভোগ্য। এ ক্ষেত্রে সচরাচর স্বামীরা তাদের শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ স্ত্রীর বাপের বাড়িতে ঈদ কাটাতে যায়। এ রীতি মাদারগঞ্জে অনেক আগে থেকে শুরু করে এখনো বিরাজমান। এমনকি ঈদের আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে নতুন জামাইকে তাদের পরিধেয় নতুন জামা-কাপড় দেওয়ার রীতিটা বেশ প্রত্যাশিত। আর ঈদের দিনে সেলামি দেওয়ার রীতিটাও বেশ পুরোনো। ঈদের কয়েক দিন আগে থেকে জামাই এবং তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করার অলিখিত বাধ্যতামূলক রীতি এ অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও আছে কি না, জানা নেই। এর নেতিবাচক ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেই জামাইয়ের বাড়ি বউয়ের বাড়ির লোকজনের মধ্যে শুরু হয়ে যায় মান-অভিমান। গ্রাম্যজীবনের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের এমন ব্যর্থতা কখনো কখনো প্রভাবিত করে সংসারজীবন থেকে শুরু করে দাম্পত্যজীবনকেও। তবে এই অলিখিত বাধ্যতামূলক রীতিটা এখন শুধুমাত্র নিম্ন-আয়ের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

বারো মাসে তের পার্বণের কথা আমরা বইপুস্তকে শুনে থাকলেও এ অঞ্চলে তেরপার্বণ উদ্‌যাপনের কোনো নজির নেই। এলাকা জ্যেষ্ঠ কিছু মানুষ এসব উৎসবের কথা অনুমান করে বললেও বেশির ভাগের মতই ভিন্ন। তারা বরং এখনো প্রচলিত তিনটি সাধারণ আয়োজনের কথাই বলে থাকেন। যদিও সেটা সামাজিক-সংস্কৃতির ভিত্তিতে পারিবারিকভাবেই পালিত হয়। নতুন দম্পতিদের জন্য এই আয়োজনগুলোও বেশ উপভোগের-আনন্দের। মানুষের নানামুখী ব্যস্ততার কারণে অনেকাংশে কমে গেলেও গ্রামের নিম্ন-আয়ের মানুষের মধ্যে এখনো নায়র যাওয়ার রীতিটা বেশ উজ্জ্বল। শীত-মৌসুমে শীতের পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে না, এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই সময়টাই গৃহস্থরা, বিশেষ করে জামাই-মেয়েকে এবং জামাইয়ের পক্ষের আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ পৌষ-মাঘ মাসের দিকে শীতের পিঠা খাওয়ার জন্য নববিবাহিত মেয়েরা সাধারণত বাপের বাড়িতে 'নাইয়র' যায় কয়েক দিনের জন্য সঙ্গে অবশ্যই থাকেন 'জামাইবাবুরা'ও।

আমরা জানি, ভাদ্র মাস হচ্ছে তাল পাকার সময়। তালের রস দিয়ে বানানো হয় সুস্বাদু পিঠা। এ ছাড়া এ সময়ের অন্যতম মজাদার খাবার হচ্ছে নারকেল-চিঁড়া। নারকেলে সঙ্গে চিঁড়া আর গুড় মিশিয়ে ঢেঁকির সাহায্যে গুঁড়া করার পর একধরনের

www.pathagar.com

বিশেষ খাবার তৈরি হয়, যাকে বলে নারকেল-চিঁড়ার গুঁড়া। এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের ঐতিহ্য হচ্ছে, এই তাল পাকার মৌসুম আর নারকেলের এই সময়ে মেয়ে-জামাইকে নাইয়র নিয়ে যেতে হবে। তাই শীতের মৌসুমে মতো একইভাবে ভাদ্রমাসের তালের পিঠাকে কেন্দ্র করেও গ্রামের পরিবারগুলোতে জমে আত্মীয়স্বজনদের আনাগোনা। এসব উদ্‌যাপনে প্রতিবেশীদের অংশগ্রহণও বেশ সরব।

আবার আম-কাঁঠালের সময়েও হয় আরেক দফা পারিবারিক উৎসব। এ সময়টাতে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আম-কাঁঠাল বিনিময়ের একটা প্রবণতা এখনো লক্ষণীয়। এ অঞ্চলে তেমন উন্নত জাতের আমের সমাহার না থাকলেও দেশি আমের ফলন বেশ ভালো। তবে এ অঞ্চলে কাঁঠালের ফলন অন্য যেকোনো ফলের তুলনায় অনেক বেশি। এখানকার নারীপুরুষ-শিশু সবার কাছেই কাঁঠাল অত্যন্ত প্রিয় ফল। এই আম-কাঁঠাল আবার শুধু শুধু খাওয়ার চেয়ে মেয়ে-জামাইদের মধ্যে এর সঙ্গে দুধ আর খইয়ের মিশেল খাবারটি বেশি পছন্দের। অর্থাৎ আম-দুধ আর খই-কাঁঠালকে কেন্দ্র করেই মূলত এই মৌসুমের সামাজিক সংস্কৃতি বেশ ঐতিহ্য বহন করে আসছে, যুগ যুগ ধরে। তবে যেসব গৃহস্থের গাছে আম-কাঁঠালের ফলন ভালো হয়, তারা এই সময়ে মেয়ে-জামাইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদেরও নিমন্ত্রণ করে থাকেন, বিশেষ করে আম-দুধ আর খই-কাঁঠাল খাওয়ার জন্য। এখনো এই রীতিটা বেশ প্রচলিত মাদারগঞ্জের বেশির ভাগ গ্রামে।

এর সবই জামালপুরের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। এই ঐতিহ্যগুলো লালন কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। তবে যৌথ পরিবারের ক্রমাগত ভাঙনের ফলে এসব উৎসব আগের মতো স্বতঃস্ফূর্ত ও জমজমাট হয় না। নিমন্ত্রণ পেলেও যে স্বজনেরা সব সময় উপস্থিত হতে পারেন, এমন নিশ্চয়তা এখন আর তেমন পাওয়া যায় না। এর অন্যতম কারণ হলো কর্মব্যস্ততা। তাই এখন বছরের অন্যান্য উৎসব-আয়োজনের চেয়ে মানুষের অবসর সময় বা ছুটি পাওয়া ঈদই দেশের অন্যান্য এলাকার মতো এ অঞ্চলের বড় উৎসব। ঈদ ছাড়া অন্যান্য আয়োজনগুলো এখন হয়ে গেছে শুধু যারা সারা বছর গ্রামের থাকে, গ্রামই যাদের কর্মক্ষেত্র, তাদের জন্য। জামালপুরে ঈদের আয়োজনটা অবশ্য একটু ব্যতিক্রম।

২. লোকউৎসব ও অনুষ্ঠান

অষ্টমী স্নান ও মেলা

গ্রাম বাংলার এক চিরপরিচিত উৎসব মেলা। মেলা শব্দের অর্থ অনেক। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনেক লোকের সমাগমে মেলা বসে। এখানে বিচিত্র পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনাসহ অস্থায়ী আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। বকশীগঞ্জ এলাকার ঐতিহ্যবাহী অষ্টমী স্নান ও মেলা সাধারণত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়ে থাকে। মেলায় গ্রামের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রচিত হয়। উল্লেখ্য, মেলা ও অষ্টমী গ্রাম বাংলার নদীর ঘাটে ও খাল বিলের পাড়ে বসতে দেখা যায়। বিশেষ তিথিতে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অষ্টমী হয়। এখানে হিন্দুদের পূজা পার্বণ ছাড়াও

www.pathagar.com

পুণ্যস্নান হয়। হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস করে অষ্টমীর দিন নদীতে স্নান করে বিগত দিনের সকল পাপ ধুয়ে মুছে আত্মশুদ্ধি হওয়া যায়। বকশীগঞ্জের কয়েকটি মেলা ও অষ্টমীর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

কোরকা মেলা

বকশীগঞ্জের কোরকা বিলের পাড়ে বৈশাখ মাসের তের ও ষোল তারিখে দুদিনব্যাপি মেলা বসে। ঐতিহ্যবাহী কোরকা লোক উৎসব কখন থেকে শুরু হয়েছিল কেউ বলতে পারে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ মেলায় লোকজনের আগমন ঘটে। বকশীগঞ্জ উপজেলা ও শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার জিরো পয়েন্টে অবস্থিত মেলার অঞ্চলটি এক সময় শেরপুর জমিদারদের দখলে ছিল। এ অঞ্চলের কোন জোতদার হয়তো এলাকাটি তাদের কাছে পত্তন নিয়েছিল। জোতদারের প্রজাদের কোরফা প্রজা বলা হত। সেটি তখন কোরফা প্রজার বিল নামে পরিচিতি লাভ করে। কালের বিবর্তনে কোরফা বিল থেকে কোরকা বিলে রূপান্তরিত হয়। কোরফা শব্দের পরিবর্তিত রূপ কোরকা হয়েছে অনুমান করা যায়। ঐতিহ্যবাহী কোরকা মেলায় রকমারি খাবারসহ বাঁশ, কাঠ ও মাটির তৈরি খেলনা পাওয়া যায়। এখানে মিষ্টিসহ চিনি গুড়ের সাঁচ, উরফা, কদমা, বাতাস, তিলের চাপড়া, বাদামটানা ইত্যাদি খাবার প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। এখানে পুতুল নাচের আয়োজনও করা হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে পুতুল নাচ অত্যন্ত প্রিয়। শিশুকিশোর নাগর দোলায় চেপে ভীষণ আনন্দ পায়। বাঁশ, ছন, তালপাতার হাতপাখা ও রঙিন সুতার তৈরি নকশি পাখাও পাওয়া যায়। গেহস্থালি কাজে ব্যবহৃত যথা-লোহার তৈরি কুড়াল, দা, বটি, খনতি, কুড়াল, কাঠের তৈরি ডালকাটা, ডই, ছাইদানি, বেতের তৈরি মনকা, টালা, বাঁশের তৈরি খুচি, ডালা, ডুল, কুলা, চালুন ইত্যাদি পণ্য পাওয়া যায়। দুযুগ আগে এখানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হত। রাতে জারি ও পালাগানের আসর বসত। এখানে নানা রঙের ঘুড়ি বেচাকেনা হয় এবং ঘুড়ি খেলার প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। মেলা উপলক্ষে আশেপাশের এলাকার বাবা মা তাদের মেয়েকে নাইওর নিয়ে আসে এবং জামাইকেও দাওয়াত দেওয়া হয়। কয়েক হাজার লোকের সমাগমে বকশীগঞ্জ দড়িপাড়ার ঐতিহ্যবাহী কোরকা মেলা উৎসব মুখর হয়ে উঠে।

সারমারার অষ্টমী স্নান ও মেলা

বকশীগঞ্জে সারমারার অষ্টমী জিঞ্জিরাম নদীর তীরে বসে। চৈত্র সংক্রান্তিতে বাসন্তি পূজার অষ্টম তিথিতে সারমরার অষ্টমী মেলা বসে। এ মেলায় প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। সনাতন ধর্মের লোকজন অষ্টমীর দিনে জিঞ্জিরাম নদীতে স্নান করে আত্মশুদ্ধির নতুন শপথ গ্রহণ করে। সারমারার ঐতিহ্যবাহী লোক-উৎসবে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মিলন মেলায় পরিণত হয়। এখানে রকমারি খাবারসহ মাটির তৈরি বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলনা পাওয়া যায়। বেত ও বাঁশের তৈরি কারুপণ্য, ছন, বাঁশ, তালপাতার তৈরি হাতপাখা, সুতার তৈরি নকশি হাতপাখা ও নকশি শিকাও পাওয়া যায়। এখানে তরি-তরকারিসহ বড় মাছ কিনতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সাজিমারা অষ্টমী

নিলাখিয়া সাজিমারা গ্রামের দশানী নদীর তীরে হিন্দ্র সম্প্রদায়ের বারুণী পূজা শেষে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মেলা বসে। এ মেলায় কুমারদের তৈরি মাটির পণ্য সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়াও অ্যালোমিনিয়াম ও প্লাস্টিকের পণ্য সামগ্রীও বিক্রয় করা হয়। বাচ্চাদের খেলনা সামগ্রী ও গেহস্থালির কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যথা-খুচি, ঢাকি, কুলা, চানুন এবং লৌহজাত পণ্য দা, কুড়াল, বটি, খনতি, মাটির তৈরি হাঁড়ি পাতিল ও কলসি পাওয়া যায়। এখানে মিষ্টিসহ চিনির সাঁচ, উরফা, বাদামটানা, খুরমা প্রচুর বিক্রি হয়। এখানে প্রতি বছর হাজার হাজার লোকের সমাবেশে জমজমাট মেলা বসে।

অষ্টমী ও মেলা

বকশীগঞ্জের মেরুরচর ইউনিয়নের টুপকার চরের দশানী নদীর ঘাটে প্রতি বছর মেলা বসে। বহু দূরদূরান্ত থেকে এখানে লোকজনের সমাগম ঘটে। সকাল বেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের বারুণী পূজা হয়। হিন্দুরা এদিন সকাল বেলা দশানী নদীর ঘাটে স্নান করে আত্মশুদ্ধি লাভ করে। এখানে নানা রকম পণ্য সামগ্রী বেচা কেনার ধুম পড়ে যায়। এক সময় উত্তাল দশানী নদীতে মেলা উপলক্ষে নৌকাবাইচ খেলা হত। দশানী নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় এখন সেখানে মেলা বসলেও নৌকাবাইচ খেলা হয় না। নৌকাবাইচের পরে জমজমাট সারিগান হত।

আখড়া বাজার মেলা

বকশীগঞ্জের বাট্টাজোড়ের চৈত্র মাসে আখড়ার মেলা বসে। দুদিন ব্যাপী মেলায় বহু লোকের সমাবেশ ঘটে। আগেরকার দিনে এখানে সাতদিন ব্যাপী মেলা বসত। মেলায় সার্কাস খেলার আয়োজন করা হয়। শিশু কিশোররা নাগর দোলায় চেপে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। এখানে চিনির সাঁচ, বাতাসা, কদমা, উরফা, খুরমা প্রভৃতি খাবার পণ্য এবং মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। এখানে মাটির তৈরি পণ্য, প্লাস্টিকের তৈরি পণ্যসহ বাচ্চাদের খেলার পণ্য কেনা বেচার ধুম পড়ে যায়। দূর-দূরান্ত থেকে মেলায় আগন্তুক লোকজনের সমাগমে মেলার মাঠ সরগম হয়ে উঠে। এক সময় এখানে মেলার রাতে পালাগানের আসর বসত।

বিয়ে, মঙ্গলাচরণ

মঙ্গলাচরণ হিন্দু বিয়ের পূর্ববর্তী কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বরপক্ষ প্রথমে কনেকে তার বাড়িতে দেখে আসে। বরপক্ষের কনে পছন্দ হলে পরবর্তী সময়ে বিয়ের কথা পাকাপাকি করতে গিয়ে কনেকে মঙ্গলাচরণ করে। এ সময় বর পক্ষ একটি সোনার আংটি, মিষ্টান্ন ও বড় মাছ নিয়ে কনের বাড়িতে হাজির হয়। বরপক্ষ শুভবিবাহের মঙ্গল কামনায় কনেকে ধান দূর্বা মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করে থাকে। কনে বরপক্ষে গুরুজনদের চরণে প্রণাম করে। এটিই মঙ্গলাচরণ।

গায়ে হলুদ

এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়েতে গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠান হয়। সাধারণত বিয়ের আগের দিন বর-কনে স্বগৃহে এ আচারটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গিলা ও সরিষার

www.pathagar.com

সংমিশ্রনে কাঁচা হলুদ বাটা হয়। বর-কনের স্বগৃহে হলুদ মাখানো হয়। হিন্দু বিয়েতে প্রথমে পাঁচজন এয়ো এবং মুসলমান বিয়েতে আত্নীয়-স্বজন বর-কনের মুখে ও গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেয়। কনেকে লাল পাড়ে হলুদ শাড়ি পরানো হয়। এটি ভিজানো শাড়ি। ভিজানো শাড়ি বরের বাড়ি থেকে আসে। কনেকে পিঁড়ি বা পাটিতে বসিয়ে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এ সময় চারদিক ঘিরে থাকা নারীরা গায়ে হলুদের গীত পরিবেশন করে।

বউবরণ

বিয়ে করে পুত্র বউ নিয়ে স্বগৃহে ফিরলে বর-কনেকে বরণ করা হয়। বরের মাতা কিংবা প্রবীণা আত্মীয় প্রথমে বর ও পরে বউকে মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে বরণ করার রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত। মুসলমান বিয়েতে মা প্রথমে পুত্র ও পরে বউকে দুধ পান করিয়ে বরণ করে। এ অঞ্চলে এভাবে নতুন বউকে বরণ করে ঘরে তোলা হয়। বউবরণ অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী নববধূকে একনজর দেখার জন্য ভিড় করে।

বৌভাত

এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়েতে বৌভাতের প্রচলন আছে। সাধারণত বিয়েতে দুদিন বা তিনদিন পর বরের বাড়িতে বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। বরপক্ষের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে। বৌভাত খাওয়া-দাওয়ার একটি উৎসব বলা যায়। কন্যা পক্ষ ও আত্নীয়-স্বজনকে পূর্বেই দাওয়াত করা হয়। বরপক্ষ, দাওয়াতি কন্যাপক্ষ ও আত্নীয়-স্বজন একত্রে বরের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে। এটি মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের বউভাত অনুষ্ঠান নামে পরিচিত।

ভাত-কাপড়

এখানে হিন্দু বিয়েতে ভাত-কাপড় আচারটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি বৌভাত অনুষ্ঠানে পালন করা হয়। বৌভাত অনুষ্ঠানে বর একটি থালায় পাঁচ প্রকারের খাবার কনের হাতে দিয়ে ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ দায়িত্ব গ্রহণকালে বর কনের পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে শাসন করার অধিকারও প্রাপ্ত হয়। এটিই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভাত-কাপড় অনুষ্ঠান বলে পরিচিত।

ওয়াগানওয়ালা

বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন কামালপুরের উঁচু-নিচু সবুজ গারো পাহাড় অপরূপ সৌন্দর্যের নীলাভূমি। এখানে পাহাড় টিলায় প্রায় দুহাজার গারো বসবাস করে। এরা গারো ভাষার পাশাপাশি বাংলায় কথা বলে। গারো ভাষার লিখিত কোন বর্ণমালা নেই। তবে এদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আছে। ধর্মীয় উৎসব পালনে এরা নিজস্ব মৌখিক ভাষায় রচিত দলীয় নৃত্যগীতে আনন্দ উল্লাস করে। তার মধ্যে ওয়াগানওয়ালা বা ফসল তোলার উৎসব অন্যতম। আদিকালের দেবতাকে উদ্দেশ্য করে ওয়াগানওয়ালা পালিত হয়। এটি গারো নৃ-গোষ্ঠীর প্রাচীন দেবতা সন্তুষ্টির একটি ধর্মীয় উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে জুম ফসল তোলার পরে ওয়াগানওয়ালা অনুষ্ঠিত হয়। এ নৃ-গোষ্ঠী জুম চাষের

www.pathagar.com

উৎপাদিত ফসল তাদের প্রাচীন দেবতার প্রতি উৎসর্গ করে। ওয়াগানওয়ালা বা ফসল তোলার উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা জুম চাষের নতুন অন্নগ্রহণ করে। এদের আনন্দ উল্লাস ও দলীয় নৃত্যগীতে গারো পাহাড় উৎসব মুখর হয়ে উঠে। এ সময় গারো পরিবারে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য ও পিঠা খাবার ধুম পড়ে যায়।

৩. উরস ও মেলা

হযরত শাহ্ কামালের মাজার

১৫৭৫ সনে মুলতান হতে হযরত শাহ্ কামাল (র.) মেলান্দহের দুরমুটে আগমন করেন। তখন দুরমুট ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। হযরত শাহ্ কামাল তাঁর সাথিদের নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে কুটির স্থাপন করে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন এবং ইসলাম প্রচার করতেন। তাঁর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। এসব অলৌকিক কেরামতির কথা জনসমাজে কিংবদন্তি রূপে এখনও টিকে রয়েছে।

ব্রহ্মপুত্রের একটি খরস্রোতা শাখা তখন দুরমুটের উপর দিয়ে প্রবহমান ছিল। এর ভাঙনে এলাকার ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হচ্ছিল। তখন শাহ্ কামাল (র.) তার কেরামতি দ্বারা সেই নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে এলাকাকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীতে এ নদী একটি বিলে পরিণত হয়েছে। এ বিলটি এখন দরগাডাংগা বিল নামে খ্যাত। এ বিলের পাড়েই হযরত শাহ্ কামালের মাজার-শরিফ বহুকালের স্মৃতি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। ১৬৪৪ সালে তার মৃত্যু হয়। দুরমুট মাজারসহ সাত জায়গায় তাঁর মাজার আছে। এর মধ্যে ভারতের মেঘালয়ের এবং আসামের মহেন্দ্রগঞ্জের মাজার উল্লেখযোগ্য।

দুরমুট মাজারে প্রতিবছর বৈশাখমাস ব্যাপী মাজারে উরস অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মাজার প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে। এ মেলায় নানা পণ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। নানা ঐতিহ্যপূর্ণ খাদ্য বুইন্দা, ঝুরি, খোরমা, সাজ, কদমা, বাতাসা, গুলগুলি, জিলাপি ইত্যাদি পাওয়া যায়। নানা শ্রেণির প্রসাধনী পণ্য পাওয়া যায় যেমন– স্নো, পাউডার, ফিতা, মেকাপ, লিপস্টিক, নেইলপলিশ, আয়না-চিরনি, অলঙ্কার ইত্যাদি। হস্ত ও কুটির শিল্পজাত অনেক দ্রব্য এ মেলায় উঠতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে হাত পাখা, নকশি কাঁথা, হাতব্যাগ, ভ্যানিটিব্যাগ, বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন গৃহস্থালি দ্রব্য, কামারের তৈরি বিভিন্ন হাতিয়ার, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ মেলায় নানা শ্রেণির প্রচুর আসবাবপত্র পাওয়া যায়। যেমন খাট, পালং, শোকেজ, আলমিরা, মিটসেলফ, ড্রেসিং টেবিল, সোফাসেট, চেয়ার-টেবিল, চকি ইত্যাদি। মাটির তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, কলস, হাতি, ঘোড়া, ষাঁড়, গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি পাওয়া যায়। নানা রকম গৃহস্থালি ও রান্নাসংক্রান্ত অনেক কিছু এবং বিভিন্ন খেলনা সামগ্রী পাওয়া যায় এখানে। পুতুল নাচ, যাদু, মোটরসাইকেল খেলা, বিচিত্র-প্রদর্শনী, চরকি ইত্যাদি এ মেলার বাড়তি আকর্ষণ। পাগলদের অনেকগুলো ডেরা এ মেলার প্রধান আকর্ষণ। এসব ডেরাতে ভক্তিমূলক, দেহতত্ত্ব, মারফতি, মুর্শিদি গান পরিবেশিত হয়। হযরত শাহ্ কামালের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ এবং ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি কামনা করাই এসব গানের মূল

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য। গানের ফাঁকে ফাঁকে গাজা খাওয়া চলে পালাক্রমে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢোল, বাঁশি, করতাল, জিপসি, একতারা, কোথাও বা হারমোনিয়াম, জুড়ি, ঢোল আবার কোথাও বা শুধু জুড়ি, একতারা ও খমক। গানের তালে পাগলরা নৃত্যে মেতে ওঠে। তাদের সাথে ভক্তশ্রোতারাও নাচতে ও দুলতে থাকে। এভাবে গানের পর গান চলতে থাকে। রাত যত গভীর হতে থাকে সুরের মূর্ছনা, বাদ্যের তাল নৃত্যের লীলায় অপূর্ব আবেশে ডেরাগুলো নক্ষত্রের মত জ্বলতে থাকে। ডেরাগুলোতে কিছু পাগল গাজার ব্যবসাও করে। গাজা ও গাজা খাওয়ার কলকিসহ বিভিন্ন উপাদান ক্রয়-বিক্রয় করা হয় এ মেলায়।

৪. ঈদুল ফিতরের ঈদ ও গ্রামীণ মেলা

মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের দুটি ঈদই হয়ে ওঠে সবার জন্য অনেক আনন্দময় সম্মিলনের প্রধানতম উৎসব। বিশেষ করে রোজার ঈদের পর মাদারগঞ্জে ঈদমেলার আয়োজনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। রোজার ঈদকে ছোট ঈদ আর কোরবানির ঈদকে বড় ঈদ বলে আখ্যায়িত করে থাকে এ অঞ্চলের মানুষ। এই নামকরণের অবশ্য সুনির্দিষ্ট কোনো কারণের কথা কেউ বলতে পারেন না। এলাকা বা গ্রামভেদে এক থেকে সাতদিন, এমনকি ১৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে গ্রামীণ মেলা হয়ে থাকে। এই মেলা এখনো আলাদা মাত্রা নিয়ে ধনী-গরিব-নির্বিশেষ সব শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বহাল রয়েছে। মেলাকে কেন্দ্র করে ঘরে ফেরা মানুষ তো বটেই সাধারণ মানুষও নানাভাবে তাদের সময়কে উপভোগ করে। মেলার কয়েক দিন আগে বিভিন্ন ধরনের রঙিন কাগজের পোস্টার, ব্যানার গ্রামের হাট-বাজারসহ ঘরবাড়িগুলোতে মেলায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে সেঁটে দেওয়া হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে। প্রচার-প্রচারণার জন্য আরও ব্যবহার করা হয় মাইক। প্রতিটি মেলার আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রচারের জন্য প্রায় অভিন্ন পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। তবে মেলার স্থান যেহেতু ভিন্ন, আয়োজক ভিন্ন। তাই মেলার আয়োজকদের পক্ষ থেকে নানা বৈচিত্র্যময় উপকরণের কথা বলে মানুষকে আকৃষ্ট করার নানা কৌশল গ্রহণ করে থাকে। সাধারণভাবে এসব মেলায় প্রধান আকর্ষণ থাকে, বাচ্চাদের খেলনার বিভিন্ন মনোহারি সামগ্রী। চিত্তবিনোদনের জন্য থাকে পুতুল খেলা, স্থানীয় ও জেলা শহর থেকে আনা শিল্পীদের পরিবেশিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনেক সময় মঞ্চস্থ হয় যাত্রাপালা। কোনো বছরে আয়োজন করা হয় সার্কাস খেলারও। এছাড়াও গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলারও আয়োজন করা হয়ে থাকে–যেমন সাইকেল বাইচ, মোটরসাইকেলের গতি সবচেয়ে ধীরে চালানো, ঘুড়ি ওড়ানো, শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, হাডুডু, হস্তচালিত নাগরদোলা প্রভৃতি। এই আয়োজনগুলো একদিকে যেমন আবহমান বাংলার শাশ্বত ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, তেমনি মাদারগঞ্জের বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকেও চোখের সামনে সজীব করে তোলে। মেলার বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি করা বিভিন্ন স্টলের, যেখানে বাড়ি ফেরা তরুণেরা সম্মিলিত হতে পারে। স্টলগুলোতে আড্ডা দেওয়ার উপযোগী করার জন্য থাকে বেশ ভালো সাজসজ্জা। মেলার মাঠের কোণায় থাকে বইমেলাও।

www.pathagar.com

আবার মেলায় বানানো বাহারি খাবার-দাবারের দোকান দেখলেও বাংলার গ্রামগুলোতে হরহামেশায় আনাগোনা করা ফেরিওয়ালাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। একই সঙ্গে পুরোনো দিনের নানা মিষ্টান্ন খাবারের কথা মনে পড়ে। গ্রামের সব শ্রেণির মানুষ মেলা থেকে মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবার যেমন— গুঁড়ের জিলাপি, গুঁড়ের গজা, সন্দেশ, বাতাসা (হাতি, ঘোড়া, গরু, পুতুল প্রভৃতি আকৃতির), নৈ, গুলগুলি, কদমা, ঘরে তৈরি দই, মাখন, মিষ্টি প্রভৃতি। এসব মিষ্টান্ন যে মাদারগঞ্জের লোকজনই বানিয়ে বিক্রি করেন, তা নয়। যেহেতু মাদারগঞ্জের মেলার ঐতিহ্য অনেক বছর থেকেই অব্যাহত রয়েছে, তাই দেশের অন্যান্য জেলার লোকজনও এখানে বছরের ওই সময়টাতে বিভিন্ন সামগ্রীয় নিয়ে দোকন বসান ব্যবসার জন্য। অন্যান্য পণ্যে ক্ষেত্রে তো বটেই, বিশেষ করে মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবারের কারিগরেরা আসেন বগুড়া ও টাঙ্গাইল থেকে। তাঁতে বোনা কাপড় নিয়ে ব্যবসা করতে আসেন সিরাজগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি জায়গা থেকে।

আর বর্তমান সময়ে মাদারগঞ্জের প্রধান আকর্ষণ হলো ফার্নিচার বা আসবাবপত্রে মেলা। মেলার অন্যান্য সবকিছু বিক্রিবাট্টা হয়তো শেষ হয়ে তিন দিন বা সাত দিনের মধ্যেই কিন্তু এই ফার্নিচার মেলার জন্যই মেলার নির্ধারিত মেয়াদ মাঝে মধ্যে কয়েকবার বৃদ্ধি করতে হয়। ঈদ মেলার সঙ্গে এই ফার্নিচার মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, দামে অনেক সস্তা। সেগুন, মেহগনি, একাশিয়া, কড়ই, কাঁঠাল প্রভৃতি কাঠের ফার্নিচারের জন্য প্রতি বছরই মেলার আকর্ষণ বাড়ছে বই কমছে না। মাদারগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের হাট-বাজারগুলোর কর্তৃপক্ষই সাধারণত মেলা আয়োজন করে থাকে। যেসব বাজারে ঈদ মেলার আয়োজন করা হয়, সেগুলো হলো— বালিজুড়ি বাজার, জোনাইল বাজার, মিলনবাজার, তেঘরিয়া বাজার, গুণারিতলা বাজার, দক্ষিণ জোড়খালি বাজার ও মহিষবাথান বাজার। এই বাজারগুলোর মধ্যে ফার্নিচার মেলার জন্য বিখ্যাত হলো বালিজুড়ি আর জোড়খালি বাজার। অন্যান্য বাজারগুলোতে মেলার অন্যান্য সামগ্রী, যেমন শিশুদের খেলনা, মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি প্রভৃতি পাওয়া যায়। চিত্তবিনোদনের জন্য পুতুল খেলা, বায়োস্কোপ ছাড়া আরো কিছু আনন্দদায়ক খেলার আয়োজন করা হয়।

৫. ঈদুল আযহার ঈদ ও মজলিশ

'মজলিশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বৈঠক, সমাবেশ বা কোনো আলোচনার উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়া। কিন্তু মাদারগঞ্জে মজলিশ শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাৎপর্যপূর্ণ। কোরবানি ঈদের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এখানকার বড় গৃহস্থরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের আত্মার কল্যাণ কামনায় দুই-তিন এলাকার মানুষকে নিমন্ত্রণ করে বড় ধরনের বিশেষ খাবারের আয়োজন করে থাকে। মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মঙ্গল ও মাগফিরাত কামনায় এমন আয়োজনের ধর্মীয় কোনো ভিত্তি না থাকলেও যুগ যুগ ধরে এটা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে, স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর গৃহস্থরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, এমন আয়োজন না করলে কবরে শায়িত নিকটাত্মীয় বা পরিবারের মুরব্বি মানুষগুলো বুঝি অভিশাপ দেবে ! এমন ধারণা থেকেই প্রতি বছর কেউ না কেউ এই 'মজলিশ'-এর আয়োজন করে থাকেন। দেশের অন্য এলাকায় যদিও এটি ভিন্ন নামে

www.pathagar.com

পরিচিত–মেজবান প্রভৃতি। মজার ব্যাপার হলো মৃত মানুষদের জন্য আত্মার শান্তির জন্য মজলিশের আয়োজন করা হলেও এখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাগম ঘটে থাকে। দরিদ্র, নিম্ন-আয়ের মানুষ, চাকরিজীবী থেকে শুরু করে সব শ্রেণি-পেশার নারী পুরুষ-শিশু সবার অংশগ্রহণে মজলিশ সফলভাবে শেষ হলে আয়োজকেরাও বেশ খুশি হন। যাঁরাই মজলিশের আয়োজন করেন, তাঁরা মনে করেন, যত বেশি মানুষ এই খাবার খাবে, তত বেশি সওয়াব হবে। খাবরের তালিকার মধ্যে সচরাচর থাকে ভাতের সঙ্গে গরু মাংস, মহিষের মাংস, খাসি মাংসের মধ্যে যেকোনো একপ্রকারের মাংস আর মাষকলাইয়ের ডাল প্রভৃতি। যাঁর যেমন সাধ্য, তিনি তেমন করেই মজলিশের আয়োজন করেন। তবে সাধারণত দুই-তিন গ্রামের মানুষ যেন পেট পুরে খেতে পারে, তেমন করেই যথাসাধ্য চেষ্টা রান্নাগুলো ভালো করার। এর জন্য আলাদা করে বাবুর্চি আনা হয়। খাবারের মেন্যু বা তালিকা খুবই ছোট, কিন্তু তা পরিমাণে বেশি–এখানেও থাকে একধরনের গ্রামীণ ছোঁয়া। খাবার পরিবেশনা থেকে শুরু করে খাবারের পাত্রতেও থাকে বৈচিত্র। এখানে সচরাচর কেউ থালা বা প্লেটে করে খায় না। মজলিশের খাওয়ার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় কচি কলাপাতা। আর বসার জন্য নিচে বিছিয়ে দেওয়া হয় খড়-বিচালি। স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয় কোনো মাঠ বা উন্মুক্ত যে কোনো জায়গা।

অনেক সময় ছোট গৃহস্থ বা সীমিত সাধ্যের লোকজন ঋণ করে বা জায়গা-জমি বিক্রি করেও এমন আয়োজন করে থাকেন তাঁদের মৃত মা-বাবার পারলৌকিক জীবনের শান্তি কামনায়। কেউ কেউ আবার স্বপ্নাদিষ্ট হয়েও মজলিশ করে মানুষকে খাইয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। মাদারগঞ্জের বাইরে এমন উদ্দেশ্যে, কেউ কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে, এভাবে 'মজলিশ' করার রীতি দেশের অন্যান্য স্থানে থাকলেও তা এমন দৃঢ় লোকবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে করা হয় বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

আচার-অনুষ্ঠান

১. অন্নপ্রাশন

শিশুর মুখে প্রথম ভাত খাওয়ানোই অন্নপ্রাশন। হিন্দু সমাজে জন্মের ষষ্ঠ, সপ্তম কিংবা নবম মাসে পুত্রের এবং অষ্টম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন করে। পুত্রের ক্ষেত্রে বেজোড় মাস ও কন্যার ক্ষেত্রে জোড়া মাসে অন্নপ্রাশনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাধারণত মামা কিংবা জেঠা শিশুর মুখে প্রথম ভাত তুলে দেয়। পুত্র বা কন্যাকে একটি স্বর্ণের আংটি ও নতুন কাপড় পরিয়ে নিকট আত্মীয়ের কোলে রাখা হয়। সোয়া সের দুধের পায়েস একটি থালায় রাখা হয়। মামা বা জেঠা একটি আংটি তিনবার পায়েশের ভিতর ডুবিয়ে তিনবার শিশুর নাকে গন্ধ শুকিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠবার যতটুকু পায়েশ আংটিতে ধরে তা শিশুর মুখে তুলে দেয়। অন্নপ্রাশনের সময় শিশুর নাম রাখা হয়। পুত্রের জন্য চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ডি বা যজ্ঞ করে। কন্যার ক্ষেত্রে যজ্ঞের প্রয়োজন নেই। এরপর মামা বা জেঠা শিশুকে কোলে নিয়ে বাদ্য বাজনাসহকারে বাজিয়ে মন্দিরে নিয়ে প্রণাম করোনো হয়। অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে বাড়িতে ধুমধামের সঙ্গে ভুড়িভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

২. খৎনা বা মুসলমানি

খৎনা বা মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। শরিয়ত মতে পুত্রের বয়স ছয় থেকে সাত বৎসর পূর্ণ হলে খৎনা বা মুসলমানি করতে হয়। খৎনার সময় পুত্রকে নতুন জামা-কাপড় পরানো হয়। হাজম বা গুডকা (অঞ্চলিক ভাষা) বাড়িতে ডেকে খৎনা করানো হয়ে থাকে। হাজম লিঙ্গের অগ্র ভাগের চামড়া কেটে দেন। খৎনা বা মুসলমানি অনুষ্ঠানে পিতা মাতার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের জন্য ভুড়িভোজের আয়োজন করে। এখানে আগেকার দিনে খৎনার অনুষ্ঠানে মেয়েলিগীতের প্রচলন ছিল।

৩. আকিকা

আকিকা মুসলমান সমাজে শিশু নামকরণের একটি অনুষ্ঠান। শরিয়ত মতে আকিকা দিয়ে শিশুর নামকরণ করতে হয়। জন্মের সপ্তম দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে আকিকা করার বিধান আছে। পুত্রের জন্য একজোড়া এবং কন্যার জন্য একটি (গরু, ছাগল, ভেড়া) জবাই করে আকিকা দিয়ে থাকে। আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের দাওয়াত করে আকিকা অনুষ্ঠানে খাওয়ানো হয়। আগেরকার দিনে আকিকার জবাইকৃত পশুর মাংস আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করা হত। পুত্র বা কন্যার পিতা মাতা তা গ্রহণ করত না। শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রেও নানা কুসংস্কার ছিল।

www.pathagar.com

৪. সিমন্তনা

হিন্দু সম্প্রদায়ের মতে পঞ্চম মাসে মাতৃগর্ভে শিশুর পঞ্চম আত্মা আসে। এটিকে কেন্দ্র করে সিমন্তনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিমন্তনা অনুষ্ঠানে বউকে নতুন কাপড় পরানো হয়। শাড়ি, শাঁখা, সিঁদুর বাপের বাড়ি থেকে আসে। সকাল বেলা বিভিন্ন আচারাদি পালন শেষে শাশুড়ি সোয়া সের দুধের পায়েস রান্না করে বউকে খেতে দেয়। আবার দুপুরে পাঁচ প্রকার খাদ্যদ্রব্য বউকে খাওয়ানো হয়। সবশেষে শাশুড়ি ধান দূর্বা বউয়ের মাথায় দিয়ে মঙ্গল কামনায় আশীর্বাদ করে।

৫. সাধ ভক্ষণ

সাধ ভক্ষণ মহিলাদের একটি লৌকিক অনুষ্ঠান। মুসলমান সমাজে নয় মাসের গর্ভবতী নারীকে সাধ খাওয়ানো হয়। সাধ ভক্ষণ অনুষ্ঠান গর্ভবতীর ইচ্ছা অনুযায়ী খাবার দেওয়া হয়ে থাকে। এখানকার হিন্দু সমাজেও নয় মাসের গর্ভবতী নারীকে সাধ খাওয়ানোর নিয়ম প্রচলিত। গর্ভবতীকে নতুন একটা লাল শাড়ি পরিয়ে পিঁড়ায় বা পাটিতে বসায়। একটি কাঁসার থাকায় পাঁচ প্রকার (মাছ, মাংস, ডাল, মুড়িঘণ্ট ও বেগুন ভাজি) খাদ্যদ্রব্য গর্ভবতীকে খেতে দেয়। পরে পোয়াপিঠা ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গর্ভবতী নারীর সাধ খাওয়ানো অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়।

৬. ষষ্ঠি

হিন্দু সমাজে ষষ্ঠিতে শাশুড়ি জামাইকে নিমন্ত্রণ করে। ষষ্ঠিতে জামাই-মেয়েকে নতুন কাপড়চোপড় দেওয়া হয়। ষষ্ঠির দিন শাশুড়ি একটি সাইটের ডালা নিয়ে পুকুর বা নদীতে গোছল শেষে বাড়ি ফিরে ষষ্ঠি ঠাকুরের পূজা করে। একটি পিঁড়া বা পাটিতে জামাইকে বসিয়ে সাইটের জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। শাশুড়ি সাইট সাইট বলে ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে জামাইয়ের হাতে রঙিন সুতা বেঁধে দেয়। ষষ্ঠির অনুষ্ঠানে জামাইকে ফল মিষ্টান্নসহ পাঁচ প্রকার (মাছ, মাংস, ডাল, মুড়িঘণ্ট ফল) খাদ্যদ্রব্য খাওয়ানো হয়। আড়াই দিন পর জামাই স্বগৃহে চলে যায়।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষই দিনে তিনবার খাবার খেয়ে থাকে। বেশির ভাগ পরিবারে তিন বেলাতেই ভাত খাওয়ার প্রবণতা বেশি। গরিব বা নিম্ন আয়ের মানুষজন ভাতের বিকল্প হিসেবে সকালে মিষ্টি আলু, গমের ভাত, গমের আটার রুটি ও পিঠা প্রভৃতি খেয়ে থাকে। সকালে সাংসারিক কাজ শুরুর আগে প্রথমে খাবার খেয়েই শুরু হয় তাদের পুরোদিনের কার্যকলাপ। কৃষক ও কৃষিশ্রমিকেরা সকালের খাবার খেয়ে মাঠে বের হয়ে যান। কৃষি মাঠটি যদি দূরের হয়, তবে দুপুরে তাঁদের জন্য খাবার সরবরাহ করা হয়। অনেক সময় তাঁদের স্ত্রীরা খাবার সরবরাহ করেন, আবার কোনো কোনো সময় লোকমারফত মাঠেই খাবার পাঠিয়ে দেন। মাঠের এক কোণায় কিংবা আশপাশের গাছের তলায় বসে তাঁর খাবার খেয়ে আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে থাকেন।

আর কর্মজীবী, যাঁরা বাড়ি থেকেই কর্মস্থানে যান, তাঁরা সকালে খেয়ে অফিসে যান আবার বাড়ি ফিরে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে অনেক সময়ই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্মজীবী বা সংসারের উপার্জনক্ষম সেই পুরুষটির অপেক্ষায় থাকেন সংসারের অন্য নারীরা। বিশেষ করে না খেয়ে স্বামীদের অপেক্ষায় থাকেন বেশির ভাগ সংসারের স্ত্রীরা। নারীরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা যদি সংসারের উপার্জনক্ষম পুরুষটির আগে খাবার খান, তবে সংসারের বরকত কমে যাবে।

১. কলার পিঠা

জামালপুর সদর উপজেলার এক ঐতিহ্যবাহী পিঠার নাম 'কলার পিঠা'। শুধু সদর উপজেলাতেই নয়, জেলার সব উপজেলাতেই কলার পিঠা তৈরি করা হয়ে থাকে। কলার পিঠা শীতকালীন পিঠা। গ্রামাঞ্চলে প্রতি শীত মৌসুমে অন্তত একবার এই পিঠার স্বাদ নিতে সকলেই উৎসুক থাকে।

উপকরণ: কলার পিঠা তৈরি করার জন্য প্রয়োজন আতপ চালের গুঁড়া, বিচিকলা বা 'ভিমাইট্টা কলা' দুধ গুড় বা চিনি (আখের গুড়ই বেশি ব্যবহার হয়)। মশলার মধ্যে তেজপাতা, দারুচিনি ও ছোট এলাচ।

প্রস্তুত প্রণালী: কলার পিঠা বানানোর জন্য প্রথমে বিচিকলার খোসা ছাড়িয়ে দুই টুকরা করে সিদ্ধ করতে হয়। এতে কলার রস বের হয়ে আসে। এরপর হাত দিয়ে কচলিয়ে এবং চালুনির সাহায্যে কলার বিচি আলাদা করতে হয়। প্রস্তুত হয় কলার রস। এরপর আতপ চালের গুড়াঁ গরম পানি দিয়ে কাওয়া করে ভালো করে ডলে খামি প্রস্তুত করতে হয়। খামি থেকে হাত দিয়ে ডলে ডলে লম্বা লম্বা লতি বানানো হয়। হাতের তালুর নিচে অংশ দিয়ে লতিগুলো কেটে সেমাই বানানো হয়। সেমাই বানানো

www.pathagar.com

শেষ হলে কলার রসে দুধ-গুড় দিয়ে ভালো করে জ্বাল দিতে হয়। তারপর তাতে তৈরি হয় মুখরোচক কলার পিঠা।

গ্রামাঞ্চলের বউ-ঝিরা অনেক রাত অবধি বসে বসে চালের গুঁড়ার লতি ও সেমাই প্রস্তুত করে। এরপর এ্যালুমিনিয়ামের বড় পাতিল ভরে কলার পিঠা তৈরি করে রেখে দেয়। শীতের রাতের ঠাণ্ডায় কলার পিঠা জমে থাকে। সকালে পরিবারের সদস্যরা নাস্তা হিসেবে কলার পিঠা খেয়ে থাকে। কলার পিঠার সাথে মুড়ি মিশিয়ে খাওয়া যায়। দুধ মিশিয়ে কলার পিঠা খাওয়া আরোও মুখরোচক হয়। কলার পিঠা সুস্বাদু এবং কলা ও দুধের সংমিশ্রণে তৈরি বলে স্বাস্থ্যকর।

শীতকালে কলার পিঠা বানিয়ে এ্যালুমিনিয়ামের পাতিল ভরে শিকায় ঝুলিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ আজো এই অঞ্চলে চালু আছে। জামালপুরের প্রাচীন কৃষিবিদ ও উদ্যানবিদ ঈশ্বরচন্দ্র গুহ শতবছর আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কৃষি সমাচার' পত্রিকায় লেখা এক প্রবন্ধে কলার পিঠা কৌটাজাত করে রপ্তানি করা যায় কিনা সে ব্যাপারে স্বদেশবাসীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন–'কলার পিঠা বাঙালির খাঁটি নিজস্ব সম্পত্তি'।

২. পিঠালি

জামালপুরসদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী লোকব্যঞ্জনের নাম পিঠালি। শুধু সদর উপজেলাতেই নয় জামালপুর জেলায় সব উপজেলাতেই পিঠালিব্যঞ্জনের প্রচলন আছে। তবে কোনো-কোনো উপজেলায় পিঠালিকে 'মেন্দা' বা 'মিলানি' বলে অভিহিত করে থাকে। ভাতের সাথে পিঠালিব্যঞ্জন উপাদেয় লোকখাদ্য। সাধারণত বড় বড় মেজবান বা 'চল্লিশা'র খাবার আয়োজনে মাংসের পিঠালির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে পারিবারিকভাবেও বিশেষ আয়োজনে পিঠালি দিয়ে ভাত খাওয়া যায়।

উপকরণ: পিঠালিব্যঞ্জনের জন্য প্রয়োজন আতপ চালের গুঁড়া; গরু, মহিষ বা খাসির মাংস; সরিষারতেল, মাংস রান্না করার প্রয়োজনীয় গরমমশলা, যেমন: আদা, রসুন, পিয়াজবাটা, লবণ, শুকনো মরিচেরগুড়াঁ, হলুদেরগুড়াঁ, সজেরগুড়াঁ, জিরা, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা এবং পাঁচফোড়ন ও কাঁচামরিচ। সাথে বড় বড় আলুর টুকরা দেয়া যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে মাংস রান্না করার প্রয়োজনীয় মশলাদি ও লবণ তেল দিয়ে মাংস ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখাতে হয়। তারপর চুলায় দিয়ে মাংস কষাতে হয়। মাংস সিদ্ধ হয়ে এলে তাতে সামান্য পানি দিয়ে আবারও জ্বাল দিতে হয়। এরপর ঠাণ্ডা পানিতে চালের গুঁড়া ভালোভাবে গুলিয়ে নিয়ে মাংসে ঢেলে দিয়ে আবার জ্বাল দিতে হয়। এরপর পুনরায় তৈল, কাটা পিয়াজ, তেজপাতা, পাঁচফোড়ন দিয়ে বাগার বা সম্বার দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। এরপর রান্না হয় মাংসের পিঠালি।

আগে গ্রামাঞ্চলে মেজবান বা চল্লিশার খাবার আয়োজনে কলার পাতায় খাবার দেয়া হতো। এতে সাধারণ তরকারির মতো পিঠালির তরকারি গুড়িয়ে যায় না। চাপাইনবাবগঞ্জের যেমন 'কালাইয়ের রুটি' বিখ্যাত, তেমনি জামালপুর অঞ্চলের মাংসের পিঠালি বিখ্যাত। গরুর মাংসের পিঠালি সবচেয়ে ভালো, তবে মেজবান বা চল্লিশায় মহিষের মাংসও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৩. মিষ্টান্ন

এ জেলার মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবারের মধ্যে আছে শীতকালে তৈরি বিভিন্ন রকমের পিঠা। এর মধ্যে রয়েছে ভাঁপা পিঠা, তেলের পিঠা, চিতই পিঠা। এই পিঠাগুলোকেই দুধ ও গুড়ের সহায়তায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের রসপিঠা। শীত ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ে তিল দিয়ে তৈরি বড়া পিঠা, নারকেল দিয়ে তৈরি বড়া পিঠা, তালের রস দিয়ে বানানো চাপড়া পিঠা, তালের রসের বড়া পিঠা, শুধু চালের আটা দিয়ে তৈরি মুঠি পিঠা প্রভৃতি মাদারগঞ্জের জনপ্রিয় খাবারের তালিকাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। মাদারগঞ্জের অনেক লোকঐতিহ্য বিলীন হতে চললেও খাবার নিয়ে যত স্বকীয় উদ্ভাবনী আছে, এখানকার মানুষের, তাতে দিন দিন এগুলো আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে। সারা দেশের গ্রামীণ খাবারের প্রেক্ষাপটে এখানকার মানুষের অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখার এই প্রবণতাকে ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে দেখলে বাড়িয়ে বলা হবে বলে মনে হয় না।

এখানকার জনগণের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। এক সময় এখানে নদ-নদী, খালবিল ও পুকুর মাছ ভরা ছিল। গোলাভরা ছিল ধান। দুর্ভিক্ষ ও বন্যা ছাড়া এখানে কখনো খাদ্যের অভাব হয় না। এক বেলা রুটি ও দুই বেলা ভাত খেত। কৃষকরা সকালে পান্তা ভাত খেত। এ উপজেলায় মরিচ, পিয়াজ ও শাকসবজির ব্যবহার বেশি। তরকারিতে পিঁয়াজ ও মরিচ বেশি ব্যবহার করে। হিন্দু মুসলমাদের খাদ্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। হিন্দুরা গরুর মাংস খায় না, খাসি ও মুরগি খায়। মাছ, দুধ, ডিম, তরকারি, খইদই, চিড়ামুড়ি, হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রিয় খাদ্য। মুসলমানরা গরু, মহিষ, ছাগল ও মুরগির মাংস খায়। গরিবরা কখনো কখনো গরু ছাগলের মাংস খেতে পায়। তাদের ডাল, শাকসবজি ও বিভিন্ন ভর্তার উপর নির্ভর করতে হয়। গড়ে একজন মানুষের মাসে ১৫ কেজি চাউলের প্রয়োজন হয়। তারা আটা ময়দা কম খায়। এখানে চাউলের গুঁড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করে। এখানে ঋতুভিত্তিক পিঠার প্রচলন আছে। অতিথি আপ্যায়ন, বিয়ে-শাদি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সুন্নাতে খাৎনা, নবান্ন, শবেকদর ও শবেবরাত উৎসবে পিঠার গুরুত্ব অস্বাভাবিক। অবশ্য পিঠার কদর সব চেয়ে বেশি শীতকালে। উল্লেখযোগ্য পিঠার মধ্যে পাটিসাপ্টা, পুলি, ভাপা, টুপা (তেলের পিঠা), নারিকেল পিঠা, নাড়ু, চিতই, দুধ চিতই, গরগরি, পানাপিঠা অন্যতম। চা, মুড়ি, রুটি, বিস্কুট সকাল বেলার নাস্তা হিসাবে বেশ প্রচলিত। তবে এখানে পানের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

১. খায়রন সুন্দরি

চরিত্রসমূহ : বয়াতি, নাচনেওয়ালি, দাদু, ফজল, মান্নান, খায়রন, ভাবী, ঘটক, আকবর মাস্টার, খায়রনের মা, আলাউদ্দিন, রফিক, বড়বাবু, ছোটবাবু, ইন্সপেক্টর, সিপাহি, মাঝি-১, মাঝি-২, মুন্সি, খায়রুল হক, ফকির-১ ও ফকির-২ ।

বন্দনা

[বয়াতিসহ ৭জন মঞ্চে উঠে গাইবে]

অলি বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আমার আসরে দাঁড়াও হে... ॥
এ-প্রথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন
তারপরে বন্দনা করি রসুলের চরণ ॥ ঐ
এ-পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
সেইখানেতে উদয় ভানু পশ্চিমে হয় তল ॥ ঐ
এ-উত্তরে বন্দনা করি হিমলি পর্বত
সেইখানেতে লইছে জনম মালমের পাথর ॥ ঐ
এ-পশ্চিমে বন্দনা করি হজ মক্কার ঘর
সেই ঘরেতে পড়ে নমাজ লক্ষ হাজিগণ ॥ ঐ
এ-দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর
সেই সাগরে চালায় ডিঙ্গা সাহু সদাগর ॥ ঐ
এ-চারকানি বন্দনা করি মধ্যে করলাম স্থান
মন দিয়া শুনবেন সবে খায়রন বিবির গান ॥ ঐ
এ-সভা করে বসছেন যত হিন্দু-মুসলমান
মুসলমানকে জানাই সালাম হিন্দুদের পরনাম ॥ ঐ
এ-আমারও কাঞ্চা শরীরে যে মারিবে ঘাও
দোহাই নাগে আল্লা রসুল ছেলের মাথা খাও ॥ ঐ
এ-এসো মাগো সরস্বতী কণ্ঠে কর ভর
বসিতে আসন দিব মস্তকের উপর ॥ ঐ
এ-আছিল যে ফজল মিয়া বরখালি গ্রামে
দেওয়ানগঞ্জে বিড়ির দোকান হিসাব নাহি জানে ॥ ঐ
এ-বিড়ির পাতা আনতে ফজল বকশীগঞ্জে যায়
আইতে যাইতে মেরুরচরে দুইবার সে জিরায় ॥ ঐ

www.pathagar.com

এ-আছিল যে খায়রন বিবি মেরুরচর গিরামে
রূপ দেইখা তার ফজল মিয়া অন্তর জ্বালায় মরে ॥ ঐ
এ-ফজল মিয়া দুঃখের কথা বন্ধুরে জানায়
বন্ধুরে সে সঙ্গে নিয়ে দাদুর কাছে যায় ॥ ঐ
এ-বন্দনা করিতে আমার অনেক হল দেরি
মন দিয়ে শুনবেন সবে খায়রন সুন্দরির জারি ॥ ঐ

বয়াতির গান : যাদুরে...আরে...ওরে।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান : ফজল মিয়ার বাড়ি

(কথা বলতে বলতে লাঠি হাতে দাদুর প্রবেশ)

দাদু : বুড়ো হয়েছি আমি, তিনকাল গিয়ে এককালে আইসে ঠেকছি। সঙ্গের সাথি সবাই আমাকে একা ফেলে চলে গেল। ছেলে চলে গেল একটা নাতি রেখে। পড়ালেখা করতে দিলাম তাতে মন নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দিলাম তাও ঠিকমত করতাছে না। সারাদিন শুধু টু টু করে ঘুরে বেড়ায়। কে জানে কোথায় যায়, কোথায় না যায়। আরে ও ফজল মিয়া, ফজল মিয়া, আরে ও ফজা ফজা...।

(ফজল মিয়ার প্রবেশ)

ফজল : বুড়োর সারাদিন শুধু ডাকাডাকি। না জানি কি কাজ দেয় আবার। জি দাদু, আমারে ডাকতাছেন কে?

দাদু : আমারে ডাকতাছেন ক্যা? বলি সারাদিন শুধু খাবি আর আড্ডা দিয়ে বেড়াবি, নাকি ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু করতে হবে? তিনদিন থেকে দোকানের মালামাল শেষ হয়েছে, তার কোন খবর রাখো? এই মুহূর্তে তোমাকে জামালপুর যেতে হবে বিড়ির পাতা আনতে।

ফজল : আমাকে মাফ করে দাও দাদু। আমি এখন জামালপুর যেতে পারব না।

দাদু : যাইতে পারব না কইলেই অইলো। তুই না গেলে আর ক্যারা যাব। আমার আর কে আছে? এই বুইড়্যা বয়সে আমি আর কত পরিশ্রম করমু?

ফজল : যেতে পারি এক শর্তে।

দাদু : কি শর্ত শুনি?

ফজল : আমি একা একা যেতে পারব না, দাদু। আমার বন্ধু মান্নানকে যদি সঙ্গে দাও তাহলে যেতে পারি।

দাদু : তবে তাই নিয়ে যা। কিন্তু দেরি করিস না।

ফজল : ঠিক আছে দাদু। আমার লক্ষ্মী দাদু। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

স্থান : মান্নানের বাড়ি। মান্নান বাড়ির ভিতরে থাকবে। ডাকতে ডাকতে ফজলের প্রবেশ।

ফজল : বন্ধু, বন্ধু। ও বন্ধু, বাড়িতে আছ নাকি?

মান্নান : কে কে ডাকে? আরে বন্ধু ফজল মিয়া? তা কী মনে করে?

ফজল : আর বল না বন্ধু দাদুর আদেশ এই মুহূর্তে আমাকে জামালপুর যেতে হবে বিড়ির পাতা আনতে।

মান্নান : খুব ভাল কথা। দাদুর আদেশ অবশ্যই যাবে।

ফজল : আমি একা যেতে পারব না। তাই তোমাকে ডাকতে এলাম। আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য।

মান্নান : দাদুর আদেশে তুমি ডাকতে এসেছ। আমি কি আর না গিয়ে পারি। অবশ্যই যাব।

ফজল : তবে আর দেরি নয়। এক্ষণি রওনা হতে হবে।

মান্নান : চল। (প্রস্থান)

বয়াতির গান : যাদুরে...আরে...ওরে।

ছেড়ি কপালে তিলকের ফোটা মুখে দিলা ছাচি পান
খোদাই পাঠাইলো পাকিস্তান ॥
আছিলো যে ফজল মিয়া কোন কর্ম করিল,
মান্নানেরে সঙ্গে নিয়া হাঁইটা মেলা দিল ॥
আর কতেক দূর হইতে ফজল আর কতেক দূর গেল
কলকি হারা ছাড়াইয়া খেয়ার ঘাটে গেল ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চার ডাকের কালে খেওনি পার করিয়া দিল ॥
আর কতেক দূর হইতে ফজল আর কতেক দূর গেল
কলকি হারা ছাড়াইয়া খেয়ার ঘাটে গেল ॥
আর কতেক দূর হইতে ফজল আর কতেক দূর গেল
মেরুরচর যাইয়া ফজল উপনীত হলো ॥
যাদুরে...আরে...ওরে।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান : মাঠের ভিতরে পথ।
(ফজল ও মান্নান কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।)

ফজল : বন্ধু বড্ড পানি পিপাসা পেয়েছে। পানি কোথায় পাই।

মান্নান : কোন চিন্তা নাই বন্ধু। ঐতো সামনে একটা বাড়ি দেখা যায়। চল, ঐ বাড়িতে গিয়ে তোমাকে পানি খাওয়াবো।
(ফজল ও মান্নান যেতে থাকবে। অন্য পথ দিয়ে খায়রন তার ভাবী ও সাথিসহ কলসি কাঙ্ক্ষে গান গাইতে গাইতে পানি আনতে যাবে।)

www.pathagar.com

গান : খায়রনলো তোর লম্বা মাথার কেশ
চিরলদাঁতের হাসি দিয়া পাগল করলি দেশ ॥
পায়ে তাহার রূপার নূপুর বাজে তালে তালে
বাঁকা চোখে চেয়ে চেয়ে জলের ঘাটে চলে ॥
মৌরি তালের ঝুমকা তাহার বাতাসেতে দোলে
ফুলের মালা গলায় দিয়ে হেসে কথা বলে ॥
(প্রস্থান)
(পুন ফজল ও মান্নানের প্রবেশ)

ফজল : বন্ধু, মেয়েটি কে?

মান্নান : চিনতে তো পারলাম না। তবে মনে হচ্ছে মেরুরচর গ্রামের আকবর মাস্টারের মেয়ে খায়রন সুন্দরি।

ফজল : নাম যার খয়রন সুন্দরি, রূপেও সে খায়রন সুন্দরি। আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি বন্ধু, আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমার আর পানি খাওয়ার প্রয়োজন নেই, বন্ধু।

মান্নান : কেন কি হয়েছে?

ফজল : কিছুই না বন্ধু। আমি মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই।

মান্নান : পাগলামি কইর না বন্ধু। আমরা যাচ্ছি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। আর পথের মধ্যে কাকে না কাকে দেখলে, এখন তাকে বিয়ে করতে চাও।

ফজল : না না বন্ধু, সে যেই হোক না কেন, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। তাকে ছাড়া আমার লেখাপড়া ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু হবে না। তাকে না পেলে আমি দেশান্তর হয়ে যাবো।

মান্নান : শুধু বললেই তো হবে না। বিয়ে করতে হলে দাদুকে রাজি করাইতে অব। কন্যাপক্ষের মতামত নিতে অব।

ফজল : আমি কিচ্ছু বুঝি না বন্ধু। তুমি, সব ব্যবস্থা কর।

মান্নান : তবে চল, জামালপুর থেকে ফিরে আইসেই আমরা দাদুর কাছে কথাটা কই।

ফজল : না বন্ধু, আমি আর জামালপুর যাব না। তুমি এক্ষণি বাড়ি ফিরে চল।

মান্নান : আহা কি মুশকিলেই না পড়লাম। তবে চলো, বাড়ি ফিরে চল।
(প্রস্থান)

বয়াতির গান : যাদুরে...আরে...ওরে।
ছেরির চুল কালো দেখতে ভাল কাজল লাগায় চোখেতে
তাই না দেখে ফজল মিয়া পাগল হইয়াছে ॥
খায়রন দেখতে ভালা চিকন কালা আয়না লাগায় খোঁপাতে
তাই না দেখে ফজল মিয়া পাগল হইয়াছে ॥
পাগল হইয়াছেরে ফজল পাগল হইয়াছে
তাই না দেখে ফজল মিয়া পাগল হইয়াছে ॥ ঐ

www.pathagar.com

আর কতেকদূর হইতে ফজল আর কতেকদূর গেল
মান্নানেরে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরিয়া আসিল ॥
আছিল যে মান্নান মিয়া কোন কর্ম করিল
দাদু দাদু বলে মান্নান ডাকিতে লাগিল ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চাইর ডাকের কালে দাদু বাইর বাড়িতে আইল ॥
শোনেন শোনেন প্রাণের দাদু কি বলব আপনারে
আপনার ফজল পাগল হইছে বিয়ারও কারণে।
যাদুরে...আরে...ওরে।

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান : ফজল মিঞার বাড়ি। ফজল ও মান্নানের প্রবেশ)

মান্নান : দাদু, দাদু, আরে ও দাদু।

দাদু : কে কে ডাকে? ফজল মান্নান তোরা? তোদের পাঠালাম জামালপুরে বিড়ির পাতা আনতে, আর তোর কিনা ফিরে আসলি। কি ফজল মিয়া, মান্নান মিয়া, ব্যাপার কি?

মান্নান : কিসের বিড়ির পাতা দাদু, কিসের জামালপুর। আপনার ফজল মিয়ার কথা শোনেন আগে।

দাদু : কি কথা মান্নান।

মান্নান : আপনার ফজল মিয়া পাগল হয়েছে বিয়ের জন্য।

দাদু : কি? কি বললি হারামজাদা। বিয়ের জন্য পাগল হয়েছে? ওকে দিলাম লেখাপড়া করতে তাও করল না। দিলাম ব্যবসা-বাণিজ্য করতে তাও ভালভাবে করলে না। আবার এখন বিয়ের জন্য পাগল হয়েছে। ওকে আমি আজ উচিত শিক্ষা দিব।

ফজল : দাদু, দাদু আমার প্রাণের দাদু। মেরুরচর গ্রামের আকবর মাস্টারের মেয়ে খায়রন সুন্দরি। যেমন তার নাম তেমন তার রূপ আর তেমনি তার গুণ। তাকে বিয়ে করতে না পারলে আমি ব্যবসা বাণিজ্য কিচ্ছু করব না। প্রয়োজনে আমি দেশান্তর হয়ে যাব।

দাদু : অ্যা, বললেই হলো। ছেলেখেলা পেয়েছো। হাতে নাই টাকাপয়সা নাই কোন প্রস্তুতি। ওনি বললেন বিয়ে, আর আমি অমনি রাজি হয়ে গেলাম। না না, এখন কিছুতেই আমি তোমাকে বিয়ে করাতে পারব না।

ফজলের গান : দাদা গো তোর হাত ধরিয়া কই
এবার বিয়া না করাইলে দেশে থাকবার নই, দাদাগো।
দাদাগো তোর পায় ধরিয়া কই
এবার বিয়া না করাইলে দেশে থাকবার নই।
দাদাগো তোমার ভাঙ্গা ঘরের বেড়া

www.pathagar.com

এবার বিয়া না করইলে বাড়া বানবে কেরা, দাদাগো।
দাদাগো তোমার হাতে বান্ধা ঘড়ি
এবার বিয়ে না করাইলে গলায় দিব দড়ি, দাদাগো।

দাদুর গান : নাতি গো তোকে বিয়ে করাব
২-৪ দিনের মধ্যেই আমি ঘটক পাঠাব নাতি গো...।
অমনি কথা কইস না নাতি বুকটা ধড়ফড় করে
তর কিছু হলে নাতি আমি যাব মরে নাতি গো...।

দাদু : আরে শুন শুন। ও ফজল মিয়া শুন। ও মান্নান ওকে ধর। দশটা না পাঁচটা না, আমার একমাত্র নাতি। বউ, ছেলে মেয়ে সব হারিয়ে আমি তোকে নিয়েই বেঁচে আছি। তুই না থাকলে আমি আর কাকে নিয়ে বাঁচবো। মান্নান, ওকে ডাক, ও যা চায় আমি তাতেই রাজি।

ফজল ও মান্নান : কি মজা! কি মজা, দাদু আমার রাজি। কি মজা! কি মজা।

ফজল : আমার লক্ষ্মী দাদু। আমার সোনার দাদু। বিয়ের পর আমারক যা বলবে আমি তাই শুনবো।
জামালপুর থেকে বিড়ির পাতা আনবো, ব্যবসা ঠিক মতো দেখবো। আমি সব করব।

দাদু : (মুখ ভেংচিয়ে) আমি সব করবো বিয়ে করতে গেলে বিয়ের আয়োজন করতে হবে না। সবার আগে ঘটক পাঠাতে হবে। শুন ফজল মিঞা এক কাজ কর।

ফজল : কি কাজ দাদু?

দাদু : তুই এই মুহূর্তে গিয়ে টেপুর বাপকে আমার কাছে ডেকে আন।

ফজল : আমি এক্ষণি যাচ্ছি দাদু। (প্রস্থান)

দাদু : আমি এক্ষণি যাচ্ছি দাদু। (মুখ ভেংচিয়ে) পর্দা পড়বে।

বয়াতির গান : যাদুরে...আরে...ওরে।
আরে ব্যাঙের পায়ে ঘুগরে দিয়ে নাইচা নাইচা গান গায়
ফেচা পাখি ময়ূর হবার চায়॥
আছিল যে ফজল মিঞা কোন কর্ম করিল
টেপুর বাপকে ডাকবে বলে যাইতে লাগিল।
আর কতেক দূর হইতে ফজল আরে কতেক দূর গেল
টেপুর বাপের বাড়ি গিয়ে ডাকিতে লাগিল।
এক ডাক, দুই ডাক তিন ডাক দিল
চার ডাকের কালে টেপুর বাপ বাড়ির বাহির হইল।
শোনেন শোনেন টেপুর বাপ বাড়ির বাহির হইল।
শোনেন শোনেন টেপুর বাপ গো বলি যে আপনারে
আমার সাথে যাইতে হবে দাদুরও নিকটে।
যাদুরে...আরে...ওরে।

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

(ঘটকের বাড়ি। ফজল মিয়ার প্রবেশ)

ফজল : টেপুর বাপ, আরে ও টেপুর বাপ, বাড়িতে আছেন নাকি?

ঘটক : আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। আবার কে ডাকে আমাকে। কে, কে গো তুমি কেড়া মিঞা?

ফজল : আমি ফজল মিয়া।

ঘটক : ও ফজল মিয়া, তুমি? গরিবের বাড়ি হাতির পারা। আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। তা কি মনে করে ফজল মিয়া। আস আস বস।

ফজল : শোনেন টেপুর বাপ। আমি বসতে আসিনি। আপনাকে দাদু তলব করেছেন। এখনই আপনাকে আমাদের বাড়িতে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ঘটক : আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। তা আবার কি কেলেংকারি কাণ্ড। তা ফজল মিয়া বেপারি সাব যখন ডেকেছে। তখন অবশ্যই যাব। তুমি একটু বস। আমি এখননি কাপড়চোপড় পরে আসি। (একটু পরে কাপড় পরে ঘটকের প্রবেশ।)

ঘটক : আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। তা চল ফজল মিয়া।

ফজল : চলেন। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(ফজল মিয়ার বাড়ি। দাদুর প্রবেশ)

দাদু : ফজল মিয়াকে পাঠালাম টেপুর বাপকে ডাকতে। কিন্তু এখনও আসার নাম নাই।

(ফজল মিয়া ও ঘটকের প্রবেশ)

ফজল : দাদু, আমি আইছি দাদু।

ঘটক : আসসালামু আলায়কুম আমর তিনপুরুষের ঘটকালি। তা আমারে কি জন্য ডাকছেন বেপারি সাব?

দাদু : তোমাকে আর কি জন্য ডাকব টেপুর বাপ। আমার একমাত্র নাতি ফজল মিয়া বিয়ের জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমি এখন কি করি টেপুর বাপ।

ঘটক : আমার তিনপুরুষের ঘটকালি। আপনার কোন চিন্তা নাই বেপারি সাব। সব ভার আমার উপর ছাইরে দেন। আরে কত শত শত পাত্রী আমার দেখা। সতের বাইশা তেত্রিশা পাত্রীর ছবি আমার হাতেই আছে। আমি এখনই নিয়ে আইতাছি বেপারি সাব। (প্রস্থানোদ্যত)

ফজল : আরে দাঁড়াও টেপুর বাপ। আপনাকে আর কষ্ট করে পাত্রীর খোঁজ করতে হবে না। পাত্রী আমি নিজেই দেইখে আইছি। মেরুরচরের আকবর মাস্টারের মেয়ে খায়রন সুন্দরি।

www.pathagar.com

ঘটক : আমার তিন পুরুষের ঘটকালি, আকবর মাস্টারের মেয়ে খায়রন সুন্দরি।

দাদু : হ্যাঁ! টেপুর বাপ। আমর ফজল মিয়ার পছন্দই আমার পছন্দ। শোন টেপুর বাপ এই বিয়ের ঘটকালি তোমাকেই করতে হবে।

ঘটক : ঠিক আছে বেপারি সাব, একশবার ঠিক আছে। কিন্তু..কিন্তু. বেপারি সাব, আ... আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। মানে... ইয়ে...

দাদু : আহ্ ! তোমাকে আর ভাবতে হবে না টেপুর বাপ, এই নাও তোমার বকশিস্।

ঘটক : আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। আমি কলিমুদ্দিন ঘটক, আমার বাপ ছলিমুদ্দিন ঘটক, আমার দাদা জলিমুদ্দিন ঘটক। ঘটকালি আমার জাত ব্যবসা। আসি, বেপারি সাব আসসালামু আলাইকুম।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বয়াতির গান : যাদুরে...আরে...ওরে।
ঘটক চলে চলে গো মেরুরচর গ্রামে ঘটক চলে গো।
আর কতেক দূর হইতে ঘটক আরে কতেক দূর গেল
কলকি হারা ছাড়াইয়া ঘটক খেওয়া ঘাটে গেল।
খেওয়ার ঘাটে গিয়া ঘটক কোন কাজ করিল।
খেওনি খেওনি বলে ঘটক ডাকিতে লাগিল।
এক ডাক, দুই ডাক তিন ডাক দিল
চার ডাকের কালে খেওনি পার করিয়া দিল।
এইভাবেতে ঘটক বেটা যাইতে লাগিল
মেরুরচরে ঘটক বেটা উপনিত হইল।
আছিল যে ঘটক বেটা কোন কাজ করিল।
মাস্টার মাস্টার করে ঘটক ডাকিতে লাগিল।
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চার ডাকের কালে মাস্টার বাড়ির বাহির হইল।
যাদুরে...আরে...ওরে।

প্রথম দৃশ্য

স্থান : আকবর মাস্টারের বাড়ি। মাস্টারের প্রবেশ।

ঘটক : আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। মাস্টার সাব বাড়িতে আছেন নাকি, মাস্টার সাব। আরে ও মাস্টার সাহেব।

মাস্টার : কেন বাপু আমাকে ডাকছেন কেন? কে আপনি?

ঘটক : তওবা তওবা তওবা। আমাকে চিনলেন না মাস্টার সাব। তওবা তওবা তওবা আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। আমি হচ্ছি গিয়ে বরখালি গ্রামের ঘটক কলিমুদ্দিন। লোকে আমাকে টেপুর বাপ বইলাই ডাকে।

www.pathagar.com

মাস্টার : ও তাই বলেন ঘটক সাহেব। তা হঠাৎ আমার বাড়িতে কি মনে করে?

ঘটক : আমার তিনপুরুষের ঘটকালি। আমি আসব না তো আসবে কোন বেটা। তা মাস্টর সাব লোকমুখে শুনতে পেলাম আপনার ঘরে একটি মেয়ে আছে। আমি তার বিকেয়র প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

মাস্টার : খুব ভাল কথা ঘটক মশায়। কিন্তু আমার মেয়ে এখনও খুব ছোট। ঘরে আমার স্ত্রী পুত্র আছে।
তাদের সাথে পরামর্শ ছাড়া তো আমি একা একা কথা দিতে পারি না। আপনি একটু বসুন। আমি বাড়ির ভিতর থেকে বুঝ-পরামর্শ করে আসি।

ঘটক : ঠিক আছি মাস্টার সাব। আমি তাইলে বইতাছি, আপনি ভালভাবে বুঝে শোনে আসেন। আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। ইয়ে মাস্টার সাহেব বরখালি থেকে আসতে আসতে পেটটা খালি হইয়া গেছে। শুধু শুধু বসে থাকবো একটু ..

মাস্টার : আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। পর্দা পড়বে।

মাস্টার : ওগো কোথায় গেলে গো এদিকে একটু আস তো দেখি।
(খায়রনের মায়ের প্রবেশ)

মা : কি হলো এত ডাকাডাকি করতাছ কে?

মাস্টার : এই কখন থেকে ডাকাডাকি করতাছি শুনতাছ না ক্যা। কোথায় গেছিলে?

মা : এই একটু চুন পাতা খেতে গিয়েছিলাম। তাই এতো দেরি অইল।

মাস্টার : রাখ তোমার চুন পাতা। এদিকে আস দেখি। মা খায়রন তো দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল তাকে বিয়ে-সাদি দিতে হবে না? তাই তো মা খায়রনের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে ঘটক এসেছে। এতে তোমার মতামত কি?

মা : কি! নাবালক মেয়ে আমি বিয়ে দেব? আপনার মেয়ে আপনি যা খুশি করেন। আমি কিছু বলতে পারব না। (প্রস্থান)

মাস্টর : আহ্ হা বড় জ্বালার মধ্যে পড়লাম। ছেলেটা কোথায়। বাবা আলাউদ্দীন আরে ও বাবা আলাউদ্দিন।
(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

আলাউদ্দিন : আমি আসছি বাবা। আমাকে কি জন্য ডাকছেন বাবা?

মাস্টার : সারাদিন তোমার দেখা নাই। কোথায় গিয়েছিলে?

আলাউদ্দিন : একটু তাস খেলতে গিয়েছিলাম বাবা। মা খায়রনের বিয়ে শাদি দিতে হবে না?

আলাউদ্দিন : জি আব্বা, অবশ্যই দিতে হবে। আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিতে পারলেই ভাল।

মাস্টার : বরখালি গ্রাম থেকে ঘটক এসেছে মা খায়রনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তাহলে বিয়েতে মত দিয়ে ফেলি কি বল?

www.pathagar.com

আলাউদ্দিন : ঠিক আছে আব্বা তাই করুন। পর্দা পড়বে।
(ঘটকের প্রবেশ)

ঘটক : আমার আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। আরে ও মাস্টার সাহেব আপনার বুঝাশুনা কি এখনো হল না।
(মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : হ্যাঁ! ঘটক মশায়, বুঝা শুনা হল। তবে বাপু সবারই মতামত আছে, শুধু ওর মায়েরই একটু অমত।

ঘটক : আর অমত করবেন না মাস্টার সাহেব। আমার তিন পুরুষের ঘটকালি।

মাস্টার : তা ঘটক মশায়, ছেলেটি কে? তার বংশ পরিচয় কি?

ঘটক : আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। আমি কি খারাপ ছেলের কথা বলতে পারি। ছেলে অতিশয় ভাল হাজারের এক। বরখালি গ্রামের আয়েজউদ্দিন বেপারির ছেলে ফজল মিয়া। বংশ অতি উচ্চ। চরদখলের মারামারিতে এক ডাকে ৪০০ লাঠি বের হয়। দেওয়ানগঞ্জের বাজারে বড় বিড়ি-ব্যবসা আছে। ট্রাকে ট্রাকে মাল আইতাছে আর যাইতাছে। আর একটু টাকা পয়সা হলে বিড়ির কারখানা দিয়ে ফেলাব। যদি বলেন তো ছেলের দাখিলা পচরা সিএস রেকর্ড সব বের করে দেই।

মাস্টার : হ্যাঁ! বাপু ছেলে অতিশয় ভাল। আমি তাকে ভাল ভাবেই চিনি।

ঘটক : হে হে হে, আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। আমি কি খারাপ ছেলের কথা বলতে পারি? তাহলে মাস্টার সাহেব আর দেরি না করে বিয়ের দিন তারিখটা ঠিক করে ফেলুন।

মাস্টার : না ঘটক মশায় আপনিই ঠিক করুন।

ঘটক : আমার আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। মাস্টার সাহেব মঙ্গলে তুঙ্গল, বুধে হাহা, বৃহস্পতিতে যাত্রা নাই। তাহলে আগামী শুক্রবার বাদ জুমা আমরা বরযাত্রী নিয়ে হাজির হব।

মাস্টার : হ্যাঁ বাপু, ঠিক আছে, এই তারিখই ঠিক থাকুক।

ঘটক : হে হে হে, আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। তাহলে আামি এখন আসি মাস্টার সাব।
আসসালামু আলায়কুম। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।
খায়রনলো তোর দিঘল মাথার কেশ
চিরলদাঁতের হাসি দিয়া পাগল করলি দেশ ॥
খায়রনলো তুই ভাইবা করবি কি
ফজল মিয়া আইসা গেছে তৈরি হয়েনি।
আছিল যে খায়রন বালা কোন কর্ম করিল

www.pathagar.com

দাসী বান্দি সঙ্গে নিয়ে জলের ঘাটে গেল।
হাঁটু পানি নাইমা খায়রন হাঁটু মাজন করে
কোমর জলে নাইমা খায়রন কোমর মাজন করে।
ছাতি পানি নাইমা খায়রন ছাতি মাজন করে।
গলা পানি নাইমা খায়রন পঞ্চ ডুব মারে।
যাদুরে...আরে...ওরে।

(ফজল মিয়ার বাড়ি দাদুর প্রবেশ)

দাদু : ঘটক বেটাকে পাঠালাম মেরুরচরে। দেখতে দেখতে সারাদিন চলে গেল। কিন্তু এখনও ফিরছে না। তবে কি.....।

(ঘটকের প্রবেশ)

ঘটক : আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। আমি এসে গেছি বেপারি সাব। একদম বিয়ের কথাবার্তা সব পাকা করে আইছি। আগামী শুক্রবার বাদ জুমা আমরা বরযাত্রী নিয়ে কনে বাড়ি উপস্থিত হব।

দাদু : বেশ বেশ টেপুর বাপ। কথাটা তাহলে ফজল মিঞাকে জানাতে হয়।
কোন চিন্তা নাই দাদু।
আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। আমি এখনই ফজল মিঞাকে জানাচ্ছি। (প্রস্থান)

ঘটক : ফজল মিয়া ও ফজল মিয়া।

ফজল : কিহে টেপুর বাপ নাকি? তা কি সমাচার?

ঘটক : হে হে হে, আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। কতাবার্তা সব পাকা। আগামী শুক্রবার বাদ জুম্মা আমরা বরযাত্রী নিয়ে যাব। তুমি রেডি তো ফজল মিয়া।

ফজল : কুচপরোয়া নেহি টেপুর বাপ। মিয়া বিবি রাজি তো কিয়া করঙ্গে কাজি। আমি রেডি।

ঘটক : তাহলে আমি এখন আসি ফজল মিয়া। হে হে হে, আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। (প্রস্থান)

(মান্নানের বাড়ি ফজলের প্রবেশ।)

ফজল : বন্ধু বাড়িতে আছ নাকি হে। বন্ধু আবদুল মান্নান...।

মান্নান : কে বন্ধু নাকি। আরে এসো এসো। তা কী খবর বন্ধু? প্রজাপতি কি রঙ বেরঙের ডানা মেলে দিল নাকি?

ফজল : হ্যাঁ বন্ধু। প্রজাপতি এবার আমার গৃহে। কথা বার্তা সব পাকা। আগামী শুক্রবার বাদ জুমা বিবাহ তারিখ ধার্য। তো তোমার কোন সমস্যা নাই তো?

মান্নান : অবশ্যই না। বন্ধুর গৃহে প্রজাপতি আর আমি বসে থাকব? তা কি হয়?

ফজল : তাহলে তোমাকে যেন আর ডাকতে না হয়। আমি এবার আসি। ওদিকে অনেক কাজ বাকি। (প্রস্থান)

বয়াতির গান : খায়রন সাজে সাজে গো ...

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান : আকবর মাস্টারের বাড়ি। বিয়ের সাজে ফজল, মান্নান ও ঘটকের প্রবেশ সাথে দাদু)

ঘটক : হে হে হে, আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। মাস্টার সাহেব বাড়িতে আছেন নাকি, মাস্টার সাহেব, আমরা বরযাত্রি নিয়ে হাজির। আসসালামু আলাইকুম।

মাস্টার : আসেন আসেন ঘটক সাহেব। কই বাবা আলাউদ্দিন, তুমি কোথায়? তাড়াতাড়ি এদিকে এসো।

আলাউদ্দিন : আমাকে ডাকতাছেন আব্বা?

মাস্টার : বাড়িতে বিয়ের মানুষ এসে হাজির আর তোমাদের কোন পাত্তা নাই। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আলাউদ্দিন : একটু তাস খেলতে গেছিলাম বাবা।

মাস্টার : ধ্যাৎ বেয়াদব। বাড়িতে বিয়ে, লোকজনের সমাগম তা রেখে ওনি গিয়েছেন তাস খেলতে।
বরযাত্রি এসেছে, তাদের বসতে দাও। আর তাড়াতাড়ি করে ভাল একজন মুন্সি ডেকে আন। তাড়াতাড়ি করে বিয়ের কাজটা শেষ করে ফেলি।

আলাউদ্দিন : ঠিক আছে আব্বা। আপনারা সবাই বসুন। আমি এখন মুন্সি ডাকার ব্যবস্থা করছি।

দাদু : হ্যাঁ, আমরা বসছি। তুমি একটু তাড়াতাড়ি করে একজন মুন্সি ডেকে আন। (প্রস্থান)

(মুন্সির বাড়ি, আলাউদ্দিনের প্রবেশ।)

আলাউদ্দিন : মুন্সি সাহেব, মুন্সি সাহেব বাড়িতে আছেন নাকি? মুন্সি সাহেব।

মুন্সি : কে আবার অসময়ে ডাকাডাকি করে। হ্যাঁ। আমি তো বাড়িতেই আছি। কিন্তু তুমি কেড়া বাপু?
অসময়ে ডাকাডাকি করতেছ?

আলাউদ্দিন : আমি আলাউদ্দিন, মুন্সি সাহেব।

মুন্সি : ও বাবা আলাউদ্দিন। তা এই অসময়ে তুমি কি জন্য ডাকছ বাপু।

আলাউদ্দিন : মুন্সি সাহেব, আমার বোন খায়রনের বিয়ে। সেই বিয়ে পড়ানোর জন্য আপনাকে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যেতে হবে।

মুন্সি : (অন্য দিকে তাকিয়ে) এই অসময়ে ডাকাডাকি। টাকা পয়সা না নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? (নিজে নিজেই মাথা নাড়বে) না। (আলাউদ্দিনের দিকে চেয়ে) না বাবা আমি বুড়া মানুষ এত রাত্রে যেতে পরব না। তাছাড়া অন্ধকার রাত্রি, আমি চোখে দেখি না।

আলাউদ্দিন : না না মুন্সি সাহেব। আমাদের বাড়ির সব বিয়েতেই তো আপনাকে ডাকি। আপনি না গেলে কেমনে হবে?

www.pathagar.com

মুন্সি : না না বাবা, তোদের বাড়ির স্বভাব ভাল না। বিয়ে পড়ালে টাকা পয়সা দেস না ঠিকমত। তাছাড়া তোরা মানুষের যত্ন বুঝস না। পেট ভরে আলু খাস আর ঢস ঢস করে হাগস।

আলাউদ্দিন : না না মুন্সি সাহেব টাকার জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না। টাকা আমি সঙ্গেই এনেছি। এই নিন অগ্রিম ৫০/- টাকা বাকি টাকা বিয়ের পরে পাবেন।

মুন্সি : (অন্য দিকে খুশিতে মাথা নাড়বে) আহা হা কি দরকার দরকার ছিল বাবা অগ্রিম টাকার। এই থার কথা বলছিলাম আর কি। তা নাহলে তোমাদের বাড়ির বিয়ে তাও আবার মা খায়রনের বিয়ে, আমি নাগিয়ে কি পারি? চলো চলো বাবা।

গান : খায়রন সুন্দরির বিয়েলো
সোনার চাক চালুন দিয়েলো
মুন্সি হেলিয়ে দুলিয়ে চলেরে। (প্রস্থান)

(স্থান : আকবর মাস্টারের বাড়ি। বরযাত্রী এবং আকবর মাস্টার, খায়রনের মা রফিক, ভাবী উপস্থিত।)

গীত :

ঘটক : আমার হে হে হে, আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। মাস্টার সাহেব হে হে হে, আমার তিন পুরুষের ঘটকালি। ছেলেকে পাঠালেন মুন্সি ডাকতে আর এখন তার খোঁজ নাই।
(আলাউদ্দিন ও মুন্সির প্রবেশ)

আলাউদ্দিন : আব্বা আব্বা আমরা চলে এসেছি আব্বা। আসুন মুন্সি সাহেব।

মাস্টার : আসুন, আসুন মুন্সি সাহেব।

মুন্সি : যত সব বেদাত, বেশরিয়তি কাজ কারবার। বিবাহ আসরে গীত। মাস্টার সাহেব, ঘটক মশায় আপনারা যাই বলুন আমি এ বিয়ে পরাইতে পারবো না। তওবা, তওবা, আসতাগফিরুল্লাহ।

মাস্টার : রাগ করবেন না মুন্সি সাহেব আর এ রকম হবে না। আসুন মুন্সি সাহেব মা খায়রনের বিয়েটা পরিয়ে দিন।

মুন্সি : শরিয়তের বরখেলাপ বেদাতি কাজকর্ম তো করা চলবে না। শরিয়ত মতেই সব করতে হবে।
তা কই দেখি ছেলে কোমন। ও...এই ছেলে আর (ভাবীকে) এই মেয়ে।

ভাবী : আ, হাবা কানা মুন্সি কোথাকার আমি মেয়ের ভাবী। এই হল মেয়ে।

মুন্সি : আসতাগফিরুল্লাহ। আমার ভুল হয়েছে। তো তোমার নাম কি, বাবা?

ফজল : ফজল মিঞা।

মুন্সি : খুব ভাল, খুব ভাল। আপনারা সবাই হুকুম দিয়ে দিন, আমি বিয়ের কাজ শুরু করে দেই।

www.pathagar.com

সবাই : হ্যাঁ আমরা সবাই হুকুম দিলাম।

মুন্সি : আমবুলের গাছে তামবুলের বাসা
ইঁদুরে কাটে কুচ কুচ
বিয়েবাড়ির সবাই মিলে মুড়ি খাবে মুচ মুচ।
বল বাবা কবুল।

ফজল : কবুল।

মুন্সি : আমের গাছে বেন্দে বিছে
বিয়ে পরাইলাম আমি ছাতা মিছে
সেই বিয়ের কতা শুনলো বনের বগে
বিয়ে গেল তোদের রগে রগে
বল মা কবুল ॥

খায়রন : কবুল।

মুন্সি : আপনারা সবাই দোয়া ধরুন। (সবাই দোয়া ধরবে) আল্লাহুম্মা আমিন। বরখালি গ্রামের ফজল মিঞা মেরুরচরের খায়রন বালা এই মজলিসে বিয়ে পরাইলাম মুন্সি ইম আমি মানুষ ভালা। হে আল্লাহ ৫০ টাকা নগদ, সব টাকাই বাকি। সবাই বলুন আল্লাহুম্মা আমিন।

সবাই : আল্লাহুম্মা আমিন।

মুন্সি : মাস্টার সাহেব, ঘটক মশায় আমার কাজ শেষ। বাকি টাকাটা...

মাস্টার : এই নিন আপনার বাকি টাকাটা।

মুন্সি : তাহলে আমি আসি। আসসালামু আলাইকুম।

ঘটক : ওয়া আলাইকুম আসসালাম।

মান্নান : ভাই আলাউদ্দিন, নদী নালা খাল বিলের রাস্তা আমাদের একটু তাড়াতাড়ি বিদায় করেন।

আলাউদ্দিন : আব্বা, আমার মনে হয় বেশি দেরি করা ঠিক হবে না।

মাস্টার : ওগো একটু তাড়াতাড়ি কর। রাস্তা ঘাট খারাপ। মা খায়রন –

খায়রনের গান : যাব না যাব না আব্বা গো বরখালি গ্রামে, আব্বা গো
বরখালি গ্রামে যাইয়া আব্বা থাকিব কেমনে গো
মরি হায় হায় গো।

মাস্টার : তাই কি হয় মা মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস তখন তোকে পরের ঘর করতেই হবে। ওরে আমি যে ইচ্ছে করলেও তোকে ঘরে রাখতে পারবো না, মা ইচ্ছে করলেও না।

মা : খায়রন, মা খায়রন।

খায়রনের গান : যাব না যাব না আব্বা গো বরখালি গ্রামে, আম্মা গো বরখালি গ্রামে যাইয়া আম্মা থাকিব কেমনে গো মরি হায় হায় গো।

মা : মা খায়রন, মা খায়রন। ওরে আমি যে তোকে এত ছোট বিয়ে দিতে চাইনি। আজ যে আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছে মা।

আলাউদ্দিন : ওরে কাঁদিস না তুই কাঁদিস না বোন। তোর কান্নায় যে আজ আমার বুকের পাজর ভেঙ্গে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

খায়রনের গান : যাব না যাব না আব্বা গো বরখালি গ্রামে, ভাইজান গো
বরখালি গ্রামে যাইয়া ভাইজান থাকিব কেমনে গো
মরি হায় হায় গো।

মাস্টার : মা খায়রন খায়রন তুই আর কাঁদিস না।

ভাবী : খায়রন বোন আমার। তোকে ছাড়া আমি কেমন করে থাকবো?

খায়রনের গান :

ভাবী গান : যাও যাও যাও ননদ গো ফজল মিঞার ঘরে ননদ গো
ফজল মিঞা ঘরে যাইয়া ননদ সুখের সংসার কর গো
মরি হায় হায়রে।
যাও যাও যাও ননদ গো বরখালি গ্রামে ননদ গো
তোমার ভাইজান আইলে কব ননদ আনবে মাসে মাসে গো
মরি হায় হায় রে।

রফিক : বুবু তুমি কেঁদ না বুবু। তুমি শ্বশুর বাড়ি গেলে আমি তোমাকে দেখতে যাবো বুবু।

খায়রন : রফিক ওরে ভাই আমার আমার কাছে আয় ভাই।

রফিক : বুবু (কেঁদে দিবে)।

দাদু : খায়রন, তুমি তোমার বাবা মা ভাই ভাবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাও।

ঘটক : হ্যাঁ, মা তুমি সবার থেকে বিদায় নিয়ে নাও। আমরা সবাই যেন তোমাকে হাসি মুখে বিদায় দেয়।
দাদু, মান্নান, আমরা সবাই বরং পাশের ঘরে যাই। খায়রন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসুক। আরে ঐ ছোকরা চল।

খায়রন : বিদায় দেন বিদায় দেন আব্বা গো বিদায় দেন আমারে আব্বা গো। বিদায় লইয়া চইলা যাবো আব্বা বরখালি গ্রামে গো মরি হায় হায় গো।

মাস্টার : ওরে মা খায়রন। তুই আর চোখের পানি ফেলিস না মা। তোর চোখের পানি যে সহ্য করতো পারছি না। ওরে মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস, তখন তোকে পরের ঘর করতেই হবে। আমি যে ইচ্ছে করলেই তোকে ঘরে রাখতে পারবো না মা।

খায়রনের গান : ঐ

মা : ওগো ওকে নিষেধ করে দাও। ওর চোখের পানি যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।
ওকে বিদায় করে আমি কেমন করে ঘরে থাকবো?

খায়রনের গান : ঐ ভাইজান

আলাউদ্দিন : কাঁদিস না বোন। দুদিন পরেই তোকে আনতো যাবো। তোকে বিদায় দিয়ে আমাদের ঘর যে শূন্য হয়ে যাবে বোন।

খায়রনের গান : ঐ ভাবী

www.pathagar.com

ভাবীর গান : এত আদরের ননদ তুমি গো কেমনে বিদায় দিবো ননদ গো
তোমাকে না বিদায় দিয়ে ননদ থাকিবো কেমনে গো
মরি হায় হায়রে গো।
ছোট কালে খেলা খেলছি ননদ গোয়াল ঘরের পাছে ননদ গো
তোমাকে না বিদায় ...॥
যদি থাকে ছোট ননদ গো কোলে কাতেক নিও ননদ গো
যদি থাকে ছোট দেবর ননদ হাইসে কথা কইও গো মরি হায় হায়রে গো।
যদি শুনি ভাল কথা ননদ আনবো মাসে মাসে, ননদ গো
যদি শুনি মন্দ কথা ননদ না আনবো ছয় মাসে গো মরি হায় হায় গো।

রফিক : বুবু বুবু আমাকে নিয়ে যাও, বুবু। আমি তোমর সঙ্গে যাব বুবু।

খায়রন : বাপের আদরের বেটি গো মায়েরও দুলালী ভাবী গো
আজ হতে বিদায় হলো ভাবী খায়রন সুন্দরি গো
মারি হায় হায় গো।
আব্বার যদি ক্ষুধা লাগে ভাবী খেতে দিও মুড়ি ভাবী গো আজ হতে...॥
বাপে কান্দে হালের বন্দে ভাবী মায়ে কান্দে ঘরে বসে ভাবী গো
আশপরশি সবাই কান্দে ভাবী খায়রন খায়রন বলে গো
মরি হায় হায় গো।

মাস্টার : আর কাঁদিস না খায়রন। তোর কান্না আমাদের আর সহ্য হচ্ছে না। রফিক, তুমি ফজল মিয়াকে নিয়ে আয় বাবা। (রফিকের প্রস্থান এবং ফজলকে নিয়ে প্রবেশ)

ফজল : আব্বা।

মাস্টার : (খায়রনের হাত ধরে।) বাবা ফজল আজ হতে মা খায়রনকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি ওকে দেখে রেখ। খায়রন আমার নয়নের মনি কলিজার টুকরা। ওর কোন কিছু হলে আমি যে সহ্য করতে পারব না বাবা আমি সে সহ্য করতে পারব না।

ফজল : আপনি দোয়া করবেন বাবা আম্মা ভাইজান ভাবী রফিক আমরা এখন আসি।

আলাউদ্দিন : চলে গেলো ...আমাদের (প্রস্থান)।

বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।
ও একবার উড়িয়া যায়, ময়নারে পাখি॥
আছিল যে ফজল মিঞা গো কোন কর্ম করিলরে।
খায়রনের হাত ধরিয়া গো যাইতে লাগিলরে। ঐ
আর কতেক দূর হতে ফজল মিঞা আর কতেক দূর গেলরে।
খেয়ার ঘাটে গিয়ে ফজল মিয়া ডাকিতে লাগিলরে। ঐ

www.pathagar.com

এক ডাক দুইও ডাক গো তিনও ডাকও দিলরে । ঐ
চার ডাকের কালে খেউনি গো পার করিয়া দিলরে ।
যাদুরে ...আরে...ওরে ।

তৃতীয় অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

স্থান : ফজল মিয়ার বাড়ি । (ফজল ও খায়রনের প্রবেশ)
ফজল : আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম খায়রন ।
খায়রন : কেন স্বামী?
ফজল : একা মানুষ আমি, কোন দিকে যাই । একদিকে সংসার অন্যদিকে ব্যবসা । একা একা তো দুইদিক সামলানো যাচ্ছে না । তুমি আমাকে একটা বুদ্ধি দাও খায়রন ।
খায়রন : স্বামী এক কাজ করতে পারেন আপনি । আমাদের রফিক তো বাড়িতেই থাকে । তার কোন কাজ কর্ম নাই । তাকে নিয়ে আসুন দোকান দেখতে পারবেন ।
ফজল : খুবই ভাল কথা খায়রন । কিন্তু রফিক কি আসবে?
খায়রন : অবশ্যই আসবে । আমার কথা বললেই আসবে ।
ফজল : তাহলে খায়রন, আমি আজই মেরুর চরে যাচ্ছি রফিককে আনতে ।
খায়রন : আপনি আজই চলে আসবেন স্বামী । একা একা আমি থাকতে পারবো না ।
ফজল : তুমি কোন চিন্তা কর না খায়রন । আমি আজই রফিকরেক সঙ্গে নিয়ে আসিবো । (প্রস্থান)
বয়াতির গান : কলে টিপ দিলে উড়িয়া চলে কোম্পানি জাহাজ কলে টিপ দিলে
আছিল যে ফজল মিঞা কোন কর্ম করিল
মেরুর চরে যাবে বলে মন শোভা করিল । ঐ
আর কতেক দূর হইতে ফজল আর কতেক দূর গেল
কলকি হারা ছাড়াইয়া মেরুর চরে গেল । ঐ
মেরুর চরে যাইয়া ফজল কোন কর্ম করিল
রফিক রফিক বইলা ফজল ডাকিতে লাগিল । ঐ
যাদুরে... আরে... ওরে ।
(স্থান : আকবর মাস্টারের বাড়ি । ফজলের প্রবেশ ।)
ফজল : রফিক, রফিক, রফিক বাড়িতে আছ নাকি, রফিক ।
মাস্টার : কে? বাবা ফজল মিঞা?
ফজল : আসসালামু আলায়কুম আব্বা । কেমন আছেন আব্বা?
মাস্টার : আল্লাহর রহমতে আমি ভালই আছি । তা তুমি কেমন আছ? মা খায়রন কেমন আছে?
ফজল : আমি ভাল আছি আব্বা, খায়রনও ভাল আছে?
মাস্টার : ওগো কোথায় গেলে?
(খায়রনের মায়ের প্রবেশ)

www.pathagar.com

মা : আমারে ডাকতাছেন ক্যা?
মাস্টার : কেন ডাকছি, এদিকে আইসে দেখ। জামাই আইছে?
মা : কে বাবা ফজল মিঞা? কেমন আছ বাবা?
ফজল : আমি ভাল আছি, আম্মা। আপনারা সবাই কেমন আছেন?
মা : আমরা সবাই ভাল আছি বাবা।
ফজল : আব্বা আম্মা আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে আইছি আমাকে আবার আজকেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে।
মাস্টার : তা কি প্রস্তাব, বাবা?
ফজল : আমাদের ব্যবসার দিন দিন বেশ উন্নতি হইতাছে। এদিকে সংসারের ঝামেলা। সবকিছু মিলিয়ে আমি একা একা পেরে উঠছি না বাবা। তাই আমি আর খায়রন পরামর্শ করলাম, রফিক তো বাড়িতে বেকার বসে থাকে। ওকে যদি আমার সঙ্গে দিয়ে দেন, তাহলে আমার ব্যবসা দেখতে পারতো।
মাস্টার : একটা কথা বলি বাবা ফজল মিঞা। তুমি আমাদের নতুন আত্মীয়। রফিক ছোট মানুষ। টাকা পয়সার কারবার ঠিক মত পালন করতে পারবে কিনা। শেষে কিনা কি হয়ে যায়।
মা : ওগো নতুন জামাই এসেছে। তুমি তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিও না। তুমি রফিককে দিয়ে দাও। জামাই একটু দেখাশুনা করলে ও ঠিকই দোকান চালাতে পারবে।
মাস্টার : একি মহা সমস্যায় পড়লাম আমি। নতুন জামাই তাকে বিরক্ত করি কিভাবে? আবার শেষে কোন বিপদ আপদ না হয়? বাবা ফজল মিঞা, তুমি রফিককে নিয়ে যাও। কিন্তু তুমি ওকে ছোট ভাইয়ের মত দেখে রেখ বাবা। ছোট মানুষ কি করতে কি করে বসে তার ঠিক নেই।
ফজল : আপনার কোন চিন্তা করতে হবে না আব্বা। রফিক আমাদের ওখানে ভালভাবেই থাকবে। তাহলে আমি রফিককে নিয়ে যাই আব্বা।
মাস্টার : হ্যাঁ. তাই কর। (প্রস্থান)
বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।
ওরে কোম্পানি পাঠাইছে কল পানি পড়ে হলাহল
নোকে বলে কুমার মারার কল ॥
আছিল যে ফজল মিয়া কোন কর্ম করিল
রফিকেরে সঙ্গে নিয়ে যাইতে লাগিল। ঐ
আর কতেক দূর হইতে ফজল আর কতেক দূর গেল
খেউনি ঘাটে গিয়া ফজল উপনীত হল॥
এইভাবেতে ফজল মিয়া যাইতে লাগিল
আপন বাড়ি যাইয়া ফজল ডাকিতে লাগিল
আপন বাড়ি যাইয়া ফজল ডাকিতে লাগিল॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল

www.pathagar.com

চার ডাকের কালে খায়রন বার বাড়ি আসিল ॥
যাদুরে... আরে... ওরে ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান : ফজল মিয়ার বাড়ি । ফজল ও রফিক)

ফজল : খায়রন, খায়রন । (খায়রনের প্রবেশ)

খায়রন : আপনি এসেছেন স্বামী?

ফজল : হ্যাঁ খায়রন । এই যে, রফিককে এক বারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি । তুমি ওকে বসতে দাও । আমি একটু ঘুরে আসছি । (প্রস্থান)

খায়রন : রফিক এসছিস ভাই, কেমন আছিস?

রফিক : আমি ভাল আছি বুবু । তুমি কেমন আছ?

গান : খায়রন -বল বল বল রফিকরে
প্রাণের আব্বা কেমন আছে, রফিকরে ।
আব্বার কথা মনে হইলে রফিক পরান যায় ফাটিয়া গো
মরি হায় হায়রে ॥
বল বল বল রফিকরে
প্রাণের আম্মা কেমন আছে, রফিকরে ।
আম্মার কথা মনে হইলে রফিক পরান যায় ফাটিয়া গো
মরি হায় হায়রে ॥

রফিক : আব্বা কান্দে মাঠে ঘাটে বুবু
আম্মা কান্দে ঘরে বসে বুবুরে
পাড়া পড়শি সবাই কান্দে গো
খায়রন খায়রন বলে গো
মরি হায় হায়রে ।

খায়রন : তুই অনেক দূর পথ হেঁটে এসেছিস ভাই । চল তোকে খেতে দিই ঘরে চল ।

রফিক : চল বুবু । (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান : বড় বাবুর আড়তের দোকান । বড়বাবু বসা থাকবে । (ফজলের প্রবেশ ।)

ফজল : বড় বাবু আছেন নাকি? বড় বাবু । আরে ও বড় বাবু ।

বড়বাবু : কে ডাকে ভিতরে আসুন । কে?

ফজল : আমি ফজল মিয়া বড়বাবু ।

বড়বাবু : ও ফজল মিয়া তা হঠাৎ কী মনে করে?

ফজল : বলবেন না বড়বাবু, দেশে প্রচণ্ড অভাব । মানুষ না খেয়ে মরছে । আমাকে কিছু রিলিফের মাল দিতে হবে বড়বাবু ।

বড়বাবু : ও এই কথা । তো কতমণ মাল চাই তোমার?

www.pathagar.com

ফজল : আমাকে ৫০ মণ মাল দিতে হবে বাবু।

বড়বাবু : বেশ, তাহলে আমাকে ৫০ মণ মালের টাকা দিয়ে দাও। ছোটবাবু, ছোটবাবু।
(ছোট বাবুর প্রবেশ)

ছোট বাবু : আমাকে কেন ডাকছেন বড়বাবু?

বড়বাবু : ফজল মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাও। গুদাম হতে তাকে ৫০ মণ মাল দিয়ে দিবে। (প্রস্থান)

ছোটবাবু : ঠিক আছে বাবু। আস ফজল মিয়া আমার সঙ্গে চল।

ফজল : চলেন ছোটবাবু। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(স্থান : ফজল মিয়ার দোকান। ফজল ও রফিকের প্রবেশ)

ফজল : রফিক, রফিক।

রফিক : জি ভাইজান।

ফজল : আজ তিনদিন যাবত দোকানে মাল নাই। তোমাকে এই মুহূর্তে জামালপুর যেতে হবে বিড়ির পাতা আনতে। বড়বাবুর দোকান থেকে তিন বান্ডিল বিড়ির পাতা আনবে।

রফিক : ঠিক আছে ভাইজান। আমাকে তাহলে তিন বান্ডিল বিড়ির পাতার টাকা দিয়ে দেন।

ফজল : তাহলে চল বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে জামালপুরে যাবে। আর এই নাও তিন বান্ডিল বিড়ির পাতার দাম।

রফিক : ঠিক আছে ভাইজান। (প্রস্থান)

(স্থান : বড়বাবুর দোকান। বড়বাবু বসা। রফিকের প্রবেশ)

রফিক : আদাব বড়বাবু।

বড়বাবু : তুমি কে ভাই?

রফিক : আমি রফিক। বরখালি গ্রামের ফজল মিয়ার শ্যালক।

বড়বাবু : তা কি মনে করে?

রফিক : ভাইজান আমাকে পাঠিয়েছেন তিন বান্ডিল বিড়ির পাতা নেওয়ার জন্যে।

বড়বাবু : বেশ তবে দাও তিন বান্ডিল পাতার দাম।

রফিক : এই নিন টাকা।

বড়বাবু : (টাকা নিয়ে কিছু লিখবে) এই নাও স্লিপ। ছোটবাবুর কাছে স্লিপ দিয়ে তোমার বিড়ির পাতা বুঝে নাও।

রফিক : ঠিক আছে বড়বাবু আমি তাহলে আসি। (প্রস্থান)
(রফিকের প্রবেশ)

রফিক : ছোটবাবু, ছোটবাবু।

ছোটবাবু : কে, কে ডাকে আমাকে?

www.pathagar.com

রফিক	: আমি রফিক ছোটবাবু।
ছোটবাবু	: তা আমার কাছে কি মনে করে রফিক?
রফিক	: বড়বাবুর কাছে টাকা দিয়ে এসেছি তিন বান্ডিল বিড়ির পাতার জন্য। এই যে বাবু স্লিপ দিয়েছে।
ছোটবাবু	: হু, ঠিক আছে, রফিক চল আমার সাথে তোমাকে তিন বান্ডিল বিড়ির পাতা দিয়ে দিচ্ছি।
রফিক	: চলেন বাবু।
ছোটবাবু	: আর শুন ইদানিং পুলিশের উৎপাত খুব বেড়েছে। একটু সাবধানে যেও।
রফিক	: ঠিক আছে বাবু। (প্রস্থান) (রফিক যেতে থাকবে। পুলিশের প্রবেশ)
পুলিশ ১	: এই কে কে যায় ওদিকে? সিপাহি, দেখ তো কে যায়?
পুলিশ ২	: এই কে যায়, দাঁড়াও! দাঁড়াও! দেখি তোমার হাতে ওটা কি?
রফিক	: কিছু না স্যার। জামালপুর এসেছিলাম টকেটু ঘুরতে আর একটু সিনেমা দেখতে। তাই ব্যাগের মধ্যে কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে এসেছি।
পুলিশ ২	: স্যার ওর হাতে একটা ব্যাগ স্যার।
পুলিশ ১	: হু, ওর ব্যাগ খুলে দেখ।
পুলিশ ২	: ঠিক আছে স্যার, এই দাও দেখি তোমার ব্যাগের মধ্যে কি?
রফিক	: আমি বললাম তো কিছু না স্যার।
পুলিশ ২	: তবুও দেখতে হবে। স্যারের হুকুম। দে ব্যাগ দে। (কেড়ে নেবে।)
পুলিশ ১	: এই এই শালা শুয়ারকি বাচ্চা বললি কাপড়চোপড় আর এখন দেখি বিড়ির পাতা। শালা চোরাই মালের কারবার করিস? সিপাহি বাঁধ
পুলিশ ২	: শালাকে। ঠিক আছে স্যার।
রফিক	: স্যার আমাকে মারবেন না স্যার আমার কোন দোষ নেই স্যার। বড়বাবুর দোকান থেকে আমি এই বিড়ির পাতা এনেছি।
পুলিশ ১	: কি? বড়বাবুর দোকান থেকে? তাহলে চল তোর বড়বাবুর দোকানে। সিপাহি নিয়ে চল শালাকে।
পুলিশ ২	: চল শালা শুয়ারকি বাচ্চা। (বড়বাবুর দোকান। পুলিশ ও রফিক)
পুলিশ ১	: বড়বাবু, বড়বাবু আরে ও বাড়বাবু।
বড়বাবু	: কে? ও দারোগাবাবু। তা কি জন্যে ডাকছেন দারোগাবাবু?
পুলিশ ১	: কি জন্য আর ডাকবো? আপনি দেখছি চোরাই মালের কারবার করেন। এই ছোকরার কাছে আপনি ইন্ডিয়ান বিড়ির পাতা বিক্রি করেছেন।
বড়বাবু	: না না না, দারোগা বাবু। আমি করবো চোরাই মালের কারবার? অবশ্যই না। ছোকরা কোথা থেকে না কোথা থেকে পাতা কিনেছে

www.pathagar.com

আর দোষ দিয়েছে আমার। ভেবেছে আমার দোষ দিয়ে পার পেয়ে যাবে। আমি এর কিছু জানি না দারোগা বাবু।

পুলিশ ১ : এই শালা শুয়ারকি বাচ্চা এতক্ষণ বললি বড়বাবুর কথা। কিন্তু বড়বাবু তো অস্বীকার করল।
চল তোকে থানায় নিয়ে যাবো। সিপাহি, শালাকে থানায় নিয়ে চল।

পুলিশ ২ : জি স্যার, শালাকে থানায় নিয়ে ঠিক মত পেদানি দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। চল শালা শুয়ারকি বাচ্চা, শ্বশুর বাড়ি চল। (প্রস্থান)

বড়বাবু : নালায়েক ছোকরা। বললাম সাবধানে যেতে। এখন ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। এখন যাও পুলিশের লাথি গুতা। কিন্তু ফজল মিয়াকে একটা খবর দেওয়া উচিত। আমি বরং একটা পিয়নের কাছে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেই। (প্রস্থান)

বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।
ওরে সমুদ্রে জাহাজ চলে শুকনায় চলে রেলগাড়ি
জামালপুরে রফিক হয় বন্দি॥
আছিল যে বড়বাবু কোন কর্ম করিল
চিঠিখানা লেইখা বাবু পিয়নেরে দিল। ঐ
আছিল যে পিয়নবেটা কোন কর্ম করিল
চিঠিখানা নিয়ে পিয়ন গাড়িতে চড়িল। ঐ
এই না হালে পিয়নবেটা কোন কর্ম করিল
দাগি দুরমুঠ ছাড়াইয়া ধর্মকুড়ায় গেল। ঐ
ধীরে ধীরে পিয়ন বেটা যাইতে লাগিল
বরখালিতে গিয়ে পিয়ন ডাকিতে লাগিল।
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চার ডাকের কালে ফজল বার বাড়ির বাহির হইল ॥
শুন শুন শুন ফজল মিয়া বলিযে তোমারে
তোমার রফিক হইছে বন্দি জামালপুরের জেলে
যাদুরে... আরে... ওরে।

পঞ্চম দৃশ্য

(ফজল মিয়ার বাড়ি। চিঠি হাতে ফজলের প্রবেশ)

ফজল : খায়রন খায়রন। খায়রন আমার সর্বনাশ হয়েছে খায়রন।

খায়রন : কি হয়েছে স্বামী? কি সর্বনাশ হয়েছে?

ফজল : আজ তিন দিন যাবত রফিক জামালপুরের জেলখানায় বন্দি।

খায়রন : ওহ্! কি সর্বনাশ। এখন কি হবে স্বামী? কিভাবে বন্দি হল স্বামী?

ফজল : বিড়ির পাতা আনার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

খায়রন : হায় আল্লাহ, এখন কি হবে স্বামী?

ফজল : কি আর হবে? টাকা পয়সা দিয়ে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। খায়রন আমার সমস্ত টাকাই তো রফিকের হাতে দিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছি। এখন তো আমার হাতে টাকা নাই। তুমি বরং মেরুরচরে গিয়ে তোমার আব্বার থেকে ৫০০/-টাকা নিয়ে আস।

খায়রন : আমি একা মেয়ে মানুষ কিভাবে যাবো? বরং খায়রুল হককে পাঠাই ওর নানার কাছে।

ফজল : তাই কর খায়রন। (প্রস্থান)

খায়রন : খাইরল হক, বাবা খায়রল হক।

খাইরল : আমারে ডাকছেন আম্মা?

খায়রন : হ্যাঁ বাবা তোমাকে এখনই তোমার নানার কাছে মেরুরচরে যেতে হবে বাবা।

খায়রল : কি জন্য আম্মা?

খায়রন গান : যাও যাও যাও, বাবা খায়রল হক তোমার নানার দেশে খাইরল গো তোমার নানার দেশে গিয়ে বাবা আন ৫০০/- টাকা গো মরি হায় হায়রে ॥

খাইরল : ঠিক আছে আম্মা আমি এখনই যাচ্ছি। (প্রস্থান)
(আকবর মাস্টারের বাড়ি। খাইরল হকের প্রবেশ)

খাইরল : নানা মিয়ে নানা মিয়ে।

মাস্টার : কে কে ডাকে?

খাইরল : আমি খাইরল হক নানা মিয়ে?

মাস্টার : খাইরল হক নানা তুই কোথা থেকে কেমন করে এলি? কেমন আছিস নানা? তোর মা কেমন আছে?

খাইরল : আমরা সবাই ভাল আছি নানা মিয়ে। কিন্তু ছোট মামা আজ তিন দিন থেকে জামালপুর জেলখানায় বন্দি হয়েছে।

মাস্টার : কি কি বললি? রফিক জেলখানায় বন্দি কিন্তু কিভাবে কিভাবে খাইরল হক?

খাইরল : বড়বাবুর দোকন থেকে বিড়ির পাতা আনতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে?

মাস্টার : কি সর্বনাশ আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল। ওগো তুমি কোথায়? আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।
(খায়রনের মায়ের প্রবেশ)

মা : ওগো কি হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন?

মাস্টার : আমার সর্বনাশ হয়েছে খায়রনের মা, আমার সর্বনাশ হয়েছে বিড়ির পাতা আনতে গিয়ে রফিক পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

মা : একি একি কথা শুনালে স্বামী? আমার রফিক জেলখানায় বন্দি। হে আল্লাহ এখন আমার কি হবে গো।

খাইরল : নানা মিয়ে নানী আপনারা কাঁদবেন না। আব্বা আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছ থেকে ৫০০/- টাকা নিয়ে যেতে। আমার আব্বা মামাকে ছাড়িয়ে আনবে।

www.pathagar.com

মাস্টার : কিন্তু খায়রনের মা আমার কাছে তো কোন টাকা নাই। আমি কোথা থেকে ৫০০/- টাকা দিব? নানা খাইরল হক তুই তোর বাবাকে গিয়ে বল ৫০০/- টাকা সংগ্রহ করে যেন রফিককে ছাড়িয়ে আনে। আমি পরে সংগ্রহ করে টাকা দিয়ে দেব।

খাইরল : ঠিক আছে নানা মিয়ে। আমি পরে সংগ্রহ করে টাকা দিয়ে দেব।

খাইরল : ঠিক আছে নানা মিয়ে। আমি তাহলে এখন আসি।

নানা : আর শুন তোর মাকে বলিস ৫-৭ দিন পর আমি তোদের বাড়িতে আম-কাঁঠালের ভার নিয়ে যাব। সেই সময় টাকাটা দিয়ে আসব।

খাইরল : ঠিক আছে নানা নিয়ে। আসি নানী। (প্রস্থান)

মা : ইয়া আল্লাহ, রক্ষাকর্তা তুমি আমার রফিককে রক্ষা কর আল্লাহ তুমি আমার রফিককে রক্ষা কর। (প্রস্থান)
(ফজল মিয়ার বাড়ি খাইরল হকের প্রবেশ)

খাইরল : আম্মা আম্মা।

খায়রন : কি বাবা তোমার নানা টাকা দিয়েছে?

খাইরল : না আম্মা। নানা মিয়ার হাতে এখন কোন টাকা নাই। আব্বাকে টাকা সংগ্রহ করে রফিক মামাকে ছাড়িয়ে আনতে বলল। নানা মিয়া পড়ে টাকা দিয়ে দিবে।

খায়রন : আল্লাহ এখন কি হবে, কিভাবে রফিককে ছাড়িয়ে আনবে?
(ফজলের প্রবেশ)

ফজল : তুমি কোন চিন্তা কর না খায়রন। আমি কোনভাবে টাকা সংগ্রহ করে রফিককে ফিরিয়ে আনব।
এখনই আমি জামালপুরে যাচ্ছি।

খায়রন : তাই করেন স্বামী তাই করেন। (প্রস্থান)

বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।
খায়রনলো তোর গলায় চন্দ্র হার
তো বাপেরা দিতে চাইছে আম্মা কাঁঠালের ভার খায়রন লো
আছিল যে ফজল মিয়া কোন কর্ম করিল
জামালপুরে যাব বলে মনশোভা করিল। ঐ
আর কতেক দূর হতে ফজল আর কতেক দূর গেল
জামালপুরে গিয়ে ফজল উপনীত হইল। ঐ
জামালপুরে গিয়ে ফজল মিয়া কোন কর্ম করিল
দারোগা বাবু বলে ফজল ডাকিতে লাগিল। ঐ
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চার ডাকের কালে দারগা বাড়ির বাহির হল।
যাদুরে... আরে ... ওরে।
(থানা : ফজলের প্রবেশ)

ফজল : দারোগা বাবু দারোগা বাবু আসসালামু আলাইকুম দারোগা বাবু।

www.pathagar.com

পুলিশ : সালাম। তা কি খবর, কে তুমি বাড়ি কোথায়?

ফজল : আমি ফজল মিয়া দারোগা বাবু। বাড়ি দেওয়ানগঞ্জ থানার বরখালি গ্রাম। ছোট খাট একটা ব্যবসা করে খাই। পুলিশ তা আমার কাছে কি মনে করে?

পুলিশ : তা আমার কাছে কি মনে করে?

ফজল : আমার শ্যালক নাম রফিক আপনার থানা হাজতে আছে। দারোগাবাবু নিতান্তই ছোট মানুষ না বুঝতে পেরে কোথা থেকে কার পরামর্শে সে ঐ বিড়ির পাতা নিয়ে এসেছিল ওকে ক্ষমা করে দেন দারোগা বাবু। দয়া করে ওকে ছেড়ে দেন।

পুলিশ ২ : তা ফজল মিয়া শালাবাবুর জন্য যখন এত দরদ তখন দাও কিছু মালপানি।

পুলিশ : হ্যাঁ, শালাবাবুকে যখন ছাড়িয়ে নিতে এসেছো তখন দাও ৫০০/-টাকা।

ফজল : এই নিন দারোগাবাবু ৫০০/-টাকা। তবু ওকে ছেড়ে দিন।

পুলিশ ১ : ঠিক আছে ফজল মিয়া সিপাহি ছেড়ে দাও ওকে।

পুলিশ ২ : যা শালা শুয়ারকি বাচ্চা এবারের মত বেঁচে গেলি। আর যদি এমন কারবার করিস তাহলে শালাকে এমন পেদানি দিব, একেবারে বাপের নাম ভুলে যাবি। (প্রস্থান)

বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।

ওরে জাগোরে নিন্দের বালি রাত পোহাল নাগর না আইল।
আছিল যে ফজল মিয়া কোন কর্ম করিল
দাগী দুরমুঠ ছাড়াইয়া ধর্মকুড়া আইল। ঐ
এই না হালে ফজল মিয়া যাইতে লাগিল।
রফিকেরে সঙ্গে নিয়ে হাইটে ফজল আর কতেক দূর গেল
বাড়ি যাইয়া ফজল মিয়া ডাকিতে লাগিল।
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চার ডাকের কালে খায়রন বাড়ির বাহির হল। ঐ
যাদুরে... আরে... ওরে।

চতুর্থ অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

(স্থান : ফজল মিয়ার বাড়ি। ফজল ও রফিক)

ফজল : খায়রন খায়রন এদিকে এসো দেখি।

খায়রন : স্বামী এসেছেন স্বামী?

ফজল : হ্যাঁ, খায়রন এই যে রফিককে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম।

খায়রন : রফিক তুই এসেছিস ভাই? তোর জন্য কত না চিন্তা করলাম।

রফিক : আমি এসেছি বুবু। পুলিশের লাথি গুতায় আমার সারা শরীরে বড় ব্যথা হয়েছে বুবু।

www.pathagar.com

খায়রন : চল ভাই আগে তোকে খেতে দেই। চলুন স্বামী।

ফজল : তাই চল খায়রন। আর রফিক শুন আজ কয়েকদিন থেকে দোকান বন্ধ। তুমি খেয়ে গিয়ে দোকানে বস।

রফিক : ঠিক আছে ভাইজান। প্রস্থান

(ফজল মিয়ার দোকান রফিক একা)

রফিক : এত কষ্ট করে দোকান চালাই। সারাদিন খাটুনি। পরার দোকানে খাটুনি আর ভাল লাগে না, পরার কাজ করতে গিয়ে জেল খাটতে হল আমাকে। শালা পুলিশের লাথি গুতায় এখনও আমার সমস্ত শরীরে ব্যথা লেগে আছে। পরার দোকানে খাটুনি আর খাটতে পারব না।

(রফিক টাকার বাক্স খুলবে। খোলে টাকা হাতে নিয়ে)

রফিক : পুরা তের হাজার টাকা আমার হাতে। এ টাকা এখন আমার। আর কলুর বলদের মত খাটতে পারব না আমি। এই সুযোগে টাকা নিয়ে আমি পলায় যাব। (প্রস্থান)

বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।

ওরে ওলুর বাছরা খচর মচর বিন্যের বাছরায় লুকাইলো
টাকা নিয়ে রফিক পালাইল ॥
আছিল যে রফিক বেটা কোন কর্ম করিল
১৩ হাজার টাকা নিয়া বাড়ি চলে গেল। ঐ
আর কতেক দূর হতে রফিক আর কতেক দূর গেল
মেরুর চরে যাইয়া রফিক উপনিত হইল।
যাদুরে... আরে... ওরে।

(আকবার মাস্টারের বাড়ি। রফিকের প্রবেশ)

রফিক : ভাইজান ভাইজান (আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

আলাউদ্দিন : কে রফিক এসেছিস?

রফিক : হ্যাঁ ভাইজান কিন্তু

আলাউদ্দিন : কিন্তু আবার কি রফিক?

রফিক : আমি যে ফজল মিয়ার দোকান থেকে ১৩ হাজার টাকা নিয়ে এসেছি ভাইজান।

আলাউদ্দিন : হ্যাঁ, কি বললি, তের হাজার টাকা এনেছিস তা বেশ করেছিস শালার সারাদিন খাটা খাটুনি আর ভাল লাগে না। কই দেখি দেখি টাকা। দে আমর কাছে।

রফিক : এই নিন ভাইজান।

আলাউদ্দিন : ওহ্ ১৩ হাজার টাকা। বেশ বেশ করেছিস রফিক লক্ষ্মী ভাই আমার। শুন, ফজল মিয়া যদি এই টাকার জন্য আসে তাইলে তুই অস্বীকার

www.pathagar.com

করবি। আমরাও সবাই অস্বীকার করব। প্রয়োজনে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব। খাটা খাটুনি আর ভাল লাগে না। এই টাকা দিয়ে আমরা কিছু জমি বন্ধক রাখব এবং একটা দুধেল গাভী কিনব।

রফিক : ঠিক আছে ভাইজান তাই করব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান : ফজল মিয়ার বাড়ি। ফজল ও খায়রন।

ফজল : খায়রন খায়রন আমি কয়েকদিন থেকে দোকানে যাই না। রফিক কোথায়?

খায়রন : রফিক তো দোকানেই থাকে। আজ দুইদিন সে বাড়িতে আসে না।

ফজল : তাহলে আমি দোকানে যাই। খোঁজ নিয়ে দেখি রফিক কোথায় থাকে।

খায়রন : ঠিক আছে স্বামী। (প্রস্থান)

(স্থান : ফজল মিয়ার দোকান। ফজল একা।)

ফজল : একি দোকান বন্ধ। কিন্তু রফিক কোথায়। (দোকানের ভিতরে গিয়ে বাক্স খোলে) একি বাক্সের মধ্যে টাকাও তো নাই। এখানেই তো তের হাজার টাকা থাকার কথা। তবে তবে কি রফিক এই টাকা নিয়ে গেল। দেখি খায়রনকে জিজ্ঞেস করে দেখি। (প্রস্থান)
(ফজল মিয়ার বাড়ি)

ফজল : খায়রন খায়রন।

খায়রন : কি জন্য ডাকছেন স্বামী?

ফজল : আমার সর্বনাশ হয়েছে খায়রন। দোকানে গিয়ে দেখি দোকান বন্ধ, রফিক নাই। টাকার বাক্স খোলে দেখি আমার ১৩ হাজার টাকাও নাই। আমার মনে হয় রফিক টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

খায়রন : কি বলেন স্বামী রফিক টাকা নিয়েছে?

ফজল : অবশ্যই নিয়েছে। তা না হলে রফিক রফিক কোথায় আর আমার টাকাই বা কোথায়। নিশ্চয়ই টাকা নিয়ে রফিক মেরুর চরে চলে গেছে।

খায়রন : তাহলে কি হবে স্বামী?

ফজল : তুমি এখনই মেরুরচরে যাও খায়রন গিয়ে টাকা নিয়ে এসো।

খায়রন : আমি কেন স্বামী আপনিই মেরুর চরে যান। রফিক যদি টাকা নিয়েই থাকে তাহলে আব্বাকে বললেই আব্বা টাকা নিয়ে দিয়ে দিবে।

ফজল : ঠিক আছে খায়রন, আমিই যাচ্ছি। (প্রস্থান)
(আকবর মাস্টারের বাড়ি। ফজলের প্রবেশ।)

ফজল : আব্বা আব্বা।

মাস্টার : কে ফজল মিয়া তা কি মনে করে বাবা।

ফজল : আর কি মনে করে বাবা, রফিক আমার দোকান থেকে ১৩ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে এসেছে, বাবা।

www.pathagar.com

মাস্টার : কি রফিক তোমার দোকান থেকে ১৩ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না বাবা।

ফজল : আপনি বিশ্বাস করুন বাবা, রফিক ছাড়া আমার টাকা কেউ নিতে পারে না। রফিকই টাকা নিয়ে কাউকে না বলে চলে এসেছে।

মাস্টার : ঠিক আছে রফিক যদি টাকা নিয়েই থাকে ওকে ডাকছি আমি। রফিক রফিক। (রফিক ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

রফিক : আমাকে ডেকেছেন আব্বা?

মাস্টার : হ্যাঁ রফিক। তুমি নাকি ফজল মিয়ার দোকান থেকে ১৩ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে এসেছ?

রফিক : না আব্বা, ইম কেন টাকা চুরি করে নিয়ে আসব? মিথ্যা কথা আব্বা?

ফজল : কি? মিথ্যা কথা? না আব্বা রফিক ছাড়া কেউ আমার টাকা চুরি করতে পারে না।

আলাউদ্দিন : তুমি কি দেখেছো ফজল মিয়া যে রফিক টাকা চুরি করছে? সব বানানো কথা আব্বা। আপনি বিশ্বাস করবেন না।

ফজল : কি বানানো কথা? আমি কি মিথ্যা বলছি নাকি? অবশ্যই রফিক টাকা নিয়ে এসেছে। এজন্য সে কাউকে বলে আসে নি।

মাস্টার : বাবা ফজল মিয়া আমরা কি চোর নাকি আমার ছেলেরা চোর। তুমি বার বার এক কথা বলছ্ কিরে আলাউদ্দিন তোরা কি চোর নাকি?

ফজল : হ্যাঁ, আপনার ছেলে চোর। আমার টাকা চুরি করে এনেছে।

আলাউদ্দিন : সাবধানে কথা বল ফজল মিয়া। তা না হলে একেবারে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

ফজল : কি করবেন আমাকে? টাকা চুরি করে এনেছে, আবার বলতেও দিচ্ছে না।

আলাউদ্দিন : তবেরে শালা রফিক, ধর শালারে (মারপিট শুরু করিল। আকবর মাস্টার বাধা দিয়ে)

মাস্টার : আরে আরে করে কি, করে কি? আলাউদ্দিন রফিক তোরা থাম।

ফজল : কি আমাকে এত বড় অপমান আমিও ফজল মিয়া। আমি এর বদলা নিবই নিব। জেনে রাখবেন আব্বা এর প্রতিশোধ যদি না নিতে পারি তাহলে বৃথাই আমার নাম ফজল মিয়া। (প্রস্থান)

আলাউদ্দিন : আরে যা যা। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান : ফজল মিয়ার বাড়ি। রাগান্বিত ভাবে ফজলের প্রবেশ)

ফজল : খায়রন, খায়রন, এই খায়রন।

খায়রন : আমাকে ডাকছেন কেন স্বামী?

ফজল : তোমার করুণ সুরের ডাক আমি আর চাই না খায়রন।

খায়রন : কেন, কি হয়েছে স্বামী?

www.pathagar.com

ফজল : কি হয়নি তাই বল। তোমার ভাই আমার ১৩ হাজার টাকা নিয়ে পালালো। আমি গেলেম টাকা আনতে টাকাতো দিলই না, বরং ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। আমার মাথায় আগুন ধরে গেছে খায়রন। আমি যে সহ্য করতে পারছি না।

খায়রন : আমি এখন কি করব স্বামী?

ফজল : যাও, এই মুহূর্তে মেরুর চরে চলে যাও। আমার টাকা চাই, টাকা। টাকা না পেলে আমি তোমার পিঠের চামড়া উঠিয়ে নিব।

খায়রনের গান : আমি কি করিব কোথায় যাব গো, আমি কি করিব কোথায় যাব স্বামী না দেখি উপায় গো... ওগো প্রাণ স্বামী।

ফজল : আমি তোমার কোন কথায় শুনতে চাইনা। টাকা চাই টাকা। এই মুহূর্তে মেরুর চরে এক দিনের মধ্যে আমার টাকা এনে দিতে হবে।

খায়রন : আমি একা একা কেমনে যাব স্বামী।

ফজল : তুমি একা যাবে কে? তোমার ছেলে খায়রুল হককে সঙ্গে নিয়ে যাও।

খায়রন : ঠিক আছে স্বামী আমি তাই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

(স্থান : আকবর মাস্টারের বাড়ি। খায়রনের প্রবেশ)

খায়রন : আব্বা, আব্বা। (মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : কে, মা খায়রন, তুই কোথা থেকে এলি মা?

খায়রন : আব্বা, রফিক আমাদের দোকান থেকে ১৩ হাজার টাকা চুরি করে এনেছে।

সেই টাকা জন্য আপনার জামাই এসেছিল। তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আবার টাকা নিতে এসেছি আব্বা। আপনার জামাই আমাকে টাকা নিতে পাঠিয়েছেন।

মাস্টার : কিন্তু মা রফিক বলে টাকা আনেনি। আব্বা ফজল মিয়া বলছে টাকা এনেছে। এখন আমি কাকে বিশ্বাস করি। (মায়ের প্রবেশ)

মা : ওগো বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই। রফিক টাকা আনুক বা না-আনুক তুমি সংগ্রহ করে টাকা দিয়ে দাও। তা না হলে যে, আমার মেয়ের যন্ত্রণা হবে।

মাস্টার : এ টাকা আমি কোথা থেকে দেই।

খায়রন : গান

টাকা দেন (২) আব্বা গো টাকা দেন আমারে আব্বা গো
টাকার শুলেন বড় শুলেন আব্বা, গাথিব দিলেতে গো
মরি হায়, হায় গো।
টাকা দেন (২) আব্বা গো টাকা দেন আমারে আব্বা গো
টাকা লয়ে চইলা যাব আমি বরখালি গ্রামে গো।
মরি হায়, হায় গো।
(রফিক ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

www.pathagar.com

রফিক : না আব্বা টাকা আমি নিয়া আসিনি। তাই আমরা টাকাও দিতে পারব না।

খায়রন : রফিক লক্ষ্মী ভাই আমার। তুই-ই টাকা নিয়েছিস। তুই না নিলে তাহলে আর কে টাকা নিবে? আর টাকা যদি তুই নাই নিবি তাহলে কাউকে বলে আসিসনি কেন? টাকা গুলি দিয়ে দে ভাই।

রফিক : না বুবু জেল খানায় থেকে পুলিশের লাথি গুতা খেয়ে আমার শরীর বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার কিছু ভাল লাগছিল না তাই আমি কাওকে না বলে চলে এসেছি।

আলাউদ্দিন : এমনতো হতে পারে খায়রন যে ফজল মিয়া টাকা সরিয়ে রেখে রফিকের উপর দোষ চাপিয়েছে।

খায়রন : না ভাইজান রফিকই টাকা নিয়ে এসেছে। ওকে বলে আমার টাকাগুলো নিয়ে দেন ভাইজান।

মাস্টার : মা খায়রন রফিক বলছে যে সে টাকা আনেনি। এখন আমি এত টাকা কোথায় পাব। তুই চলে যা মা, ফজল মিয়া যদি না ছাড়ে তবে জমি বিক্রি করে হলেও টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।

খায়রন : তাহলে আমি চলে যাচ্ছি বাবা।

মা : মা খায়রন খালি মুখে চলে যাইসনে। কিছু খেয়ে যা।

খায়রন : না মা আমার গলা দিয়ে এখন কিছুই ঢুকবে না মা। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(ফজল মিয়ার বাড়ি। ফজল মিয়ার প্রবেশ)

ফজল : খায়রনকে পাঠালাম টাকার জন্যে। কিন্তু এখনও ফিরে আসছে না। তবে কি সে আর আসবে না?
(খায়রনের প্রবেশ)

খায়রন : আমি এসছি স্বামী।

ফজল : এসেছ বেশ? বেশ, তবে কি আমার টাকা নিয়ে আইছ?

খায়রন : না স্বামী টাকা তো দেয়নি।

ফজল : কি টাকা দেয়নি? আমি জানতাম টাকা ওরা দেবে না। তবে টাকা কিভাবে আদায় করতে হয় তা আমার ভাল ভাবেই জানা আছে।
(খায়রনকে বাঁধবে)

খায়রন : এত টাকা আমি কোথায় পাব স্বামী।

ফজল : কোথায় পাবে তা আমি জানি না। তবে আমার টাকা চাই। আর টাকা না পেলে চাবুকের আঘাতে আমি তোমার চামড়া উঠিয়ে নেব। (চাবুক মারে)

খায়রনের গান : একেতো কোমলা শরীর তাতে বেতের বাড়ি গো
ওহের গো স্বামী পায় ধইরা কই
ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন স্বামী হাতের বাধন।
একেতো চামেরও রশি তাতে বেতের বাড়ি গো

www.pathagar.com

ওহের গো স্বামী পায় ধইরা কই
ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন স্বামী হাতের বাঁধন।
বন্ধন জ্বালা বিষম জ্বালা সহে না পরানে গো
ওহের গো স্বামী পায় ধইরা কই
ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন স্বামী হাতের বাঁধন।

ফজল : না, না খায়রন আমি তোমার কোন কাহিনি শুনতে চাই না। আমি চাই শুধু টাকা। টাকা না পেলে চাবুকের আঘাতে আমি তোমাকে শেষ করে ফেলবো। (চাবুক মারে)

খায়রনের গান : শাড়ি বেচব ব্লাউজ বেচব বেচব কানের সোনা গো-ঐ
তাতে যদি না হয় স্বামী বেচব হাতের চুরি গো-ঐ
তাতে যদি না হয় স্বামী বেচব গলার হার গো-ঐ
তাতে যদি না হয় স্বামী বেচব বাপের জমি গো-ঐ

ফজল : এসব কথায় আমার মন ভরবে না খায়রন।
আমার টাকার জ্বালা, আমার অপমানের জ্বালা আমি তোমার পিঠে তুলবো। আমি তোমার শরীর কেটে লবণ লাগিয়ে দেব।

খায়রন : না, না, না-না স্বামী আমি মরে যাবো স্বামী, আমি মরে যাবো। ফজল মরে যাবে-হাঃ হাঃ হাঃ। আমিও তো চাচ্ছি। (শরীর কেটে লবণ দিবে)

খায়রন : আঃ আঃ-আর পারছি না স্বামী, আমি আর পারছি না।

ফজল : হাঃ হাঃ হাঃ পারতে তোমাকে হবেই।

খায়রনের গান : আমার কাটা ঘায়ে লবণ দিলে গো
আমার কাটা ঘায়ে লবণ দিলে স্বামী সহেনা পরানে গো, ওগো প্রাণ স্বামী।
আমার শরীর কেটে লবণ দিলে গো। (২)
আমার শরীর কেটে বেলেট ভাঙ্গলে গো। (২)
আমি ময়লাম ময়লাম, ময়লাম স্বামী গো
আমি ময়লাম ময়লাম, ময়রাম স্বামী আমি লবনের জ্বালায় গো
ওগো প্রাণ স্বামী।
কোথায় রইলা বাবা খাইরন হক
কোথায় রইলা বাবা খাইরন হক দেখনা আসিয়া গো
ওগো প্রাণ প্রিয়
তোমার বাপে মারলো জীবন গো।

ফজল : এসব করুণ কাহিনি তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না খায়রন।
এখনও সময় আছে যাও, মেরুরচরে গিয়ে আমার টাকা নিয়ে এস। আর টাকা যদি না আনতে পার তাহলে তুমিও আর ফিরে আসবে না। যাও (ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে) (প্রস্থান)
(খেয়ার ঘাট। খায়রনের প্রবেশ)

www.pathagar.com

খায়রন : মাঝি ভাই, মাঝি ভাই, আমাকে একটু পার করে দাও মাঝি ভাই।
মাঝি : তুমি কে মা, বাড়ি কোথায়?
খায়রনের গান : মেরুর চরে বাড়ি আমার মাঝি সেই চরেতে ঘরও,
মাঝিভাই পিতার নামটি আকবর মাস্টার মাঝি দিলাম পরিচয় গো।
মরি হায়, হায় গো।
বাপের আদরের বেটি গো, মায়েরও দুলালী, মাঝি ভাই
হাওস কইরা নাম রাইখাছে মাঝি, খায়রন সুন্দরি গো।
মরি হায়, হায় গো।
মাঝি (২) : কি, কি বললে, আকবর মাস্টারের মেয়ে তুমি। তোমার এ অবস্থা কিভাবে হল?
সমস্ত শরীর রক্তে ভাইসে যাইতাছে। চল, চল মা তোমাকে পার কইরা দেই।
মাঝি (১) : এমন কইরা মানুষ মানুষেরে মারে। মানুষের অন্তর থেকে দয়া মায়া উইঠা যাইতাছে। এই চল নাও ছাড়।
গান : আমি বাইয়া যাইয়া কোন ঘাটে
নাগাররে সোনার নাও।
নৌকার মাস্তুলে কান্দিয়া কয়
ধীবর মাঝিয়া বাইওরে
ওই না ঢেউয়ের তাল মোর
না সহে পরানে দয়াল মাঝিরে।
নৌকার গলুইয়ে কান্দিয়া কয়
ধীবর মাঝিয়া বাইওরে
ওই না ঢেউয়ের তাল মোর
না সহে পরানে দয়াল মাঝিরে।
আমি বাইয়া যাইয়া কোন ঘাটে
নাগাবরে সোনার নাও।
বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।
ও একবার ময়ূর পঙ্ক্ষী নাও রে সাগরে ভাসে।
এই না হালে খায়রন মালা গো বাইতে লাগিলরে-ঐ
খেয়ার ঘাট পার হইয়া মেরুর চরে গেলরে-ঐ
মেরুরচরে যাইয়া খায়রন মালা ডাকিতে লাগিলরে-ঐ
এক ডাক দুই ডাক গো তিন ডাক দিলরে-ঐ
চার ডাকের কালে মাস্টার বাবু বাড়ির বাহির হইলরে-ঐ
যাদুরে...।

পঞ্চম দৃশ্য

(আকবর মাস্টারের বাড়ি। আকবর মাস্টার থাকবে। খায়রনের প্রবেশ)
খায়রন : আব্বা, আব্বা।
মাস্টার : মা খায়রন, আয় মা। একি! তোর এই অবস্থা কেন মা?

www.pathagar.com

খায়রন : আব্বা টাকার জন্য আমাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।
(মায়ের প্রবেশ)

মা : কই, কই আমার মা খায়রন। ওগো একি সর্বনাশ হল। টাকার জন্য আমার মেয়েকে মেরে শেষ করে দিয়েছে। আল্লাহ আল্লাহ গো তুমি বিচার করো মালিক।

মাস্টার : টাকা, টাকা, টাকা। টাকার জন্য মানুষ একজন মানুষকে এত অমানুষিক নির্যাতন করতে পারে? আমার মাথায় আগুন ধরে যাচ্ছে, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

খায়রনের গান : টাকা দেন (২) আব্বা গো, টাকা দেন আমারে আব্বা গো, টাকা যদি না দেন আব্বা গো, জীবন মারবো শেষে গো মরি হায়, হায় গো।

মা : ওগো যে ভাবেই পার তুমি ওদের টাকা গুলি দিয়ে দাও। টাকার জন্য আমার মেয়ের শরীরে এত বেতের আঘাত দিয়েছে, শরীর কেটে তাতে লবণ লাগিয়ে দিয়েছে। এ যে মানুষের কাজ নয়, এ যে পশুর কাজ।

খায়রনের গান : টাকা দেন (২) আম্মা গো, টাকা দেন আমারে আম্মা গো,
টাকা যদি না দেন আম্মা গো,
জীবন মারবো শেষে গো
মরি হায়, হায় গো।

খায়রন : আব্বা আপনি কি আমাকে টাকা দিবেন না?

মাস্টার : মা খায়রন এতটাকা আমি তোমাকে কোথা থেকে দিব মা।
(রফিক ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

রফিক : হ্যাঁ আব্বা, আমরা এত টাকা কোথা থেকে দিব।

খায়রন : রফিক, ওরে সর্বনাশা, তোর জন্যে, তোর জন্যে আমার সাজানো সংসারে আগুন লেগেছে। তোর কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

আলাউদ্দিন : খায়রন, এত টাকা আমরা দিতে পারবো? তোর যদি বেশি কষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তোর আর বরখালি যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তুই এখানে থেকে যা।

মাস্টার : হ্যাঁ মা, আমি আর তোকে বরখালি যেতে দিব না মা। যত দিন টাকা যোগাড় না হয় ততদিন তুই এখানেই থেকে যা।
চল মা, ঘরে চল। (প্রস্থান)

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

(মান্নানের বাড়ি। ফজলের প্রবেশ)

ফজল : বন্ধু, বাড়িতে আছ নাকি?

মান্নান : কে, বন্ধু নাকি। তা এতদিন পর কি মনে করে? কেমন আছ বন্ধু?

ফজল : আরে ভাল থাকা বন্ধু! আমার টাকার টাকা গেল, অপমানিত হয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে আইলাম। কোন প্রতিশোধ নিতে পারলাম

www.pathagar.com

না। প্রতিশোধের আগুন আমার বুকের মধ্যে দাও দাও করে জ্বলছে। এখন আমি কি করি বন্ধু?

মান্নান : একটি বুদ্ধি দিতে পারি আমি।

ফজল : কি বুদ্ধি বলনা বন্ধু।

মান্নান : যাও এই মুহূর্তে দোকানে গিয়ে এক পেকেট বিস্কুট আর একটু বিষ নিয়ে এসো।

বিস্কুটের সাথে বিষ মিশিয়ে দাও আমার কাছে। আমি গিয়ে এই বিষ মাখানো বিস্কুট খায়রনের হতে দেই। রফিক দোকানে থাকতে বিস্কুট খাওয়ার অভ্যাস করেছে। সে খায়রনের হাতে বিস্কুট দেখলেই খেতে চাবে এবং বিষ মাখানো বিস্কুট খেয়ে নিশ্চিত মারা যাবে। এভাবে কৌশলে তোমার প্রতিশোধ লওয়া হয়ে যাবে।

ফজল : উত্তম বুদ্ধি বন্ধু। চল, এক্ষণি দোকানে চল। আমি তাই করছি।

মান্নান : বেশ চল বন্ধু। (প্রস্থান)

বয়াতির গান : যাদুরে... আরে... ওরে।
ওরে থুর কলা বাদুরে খাইল কান্দা রইল গাছেতে
বাজল নেটা জলের ঘাটেতে।
আছিল যে মান্নান মিয়া কোন কর্ম করিল
মেরুরচরে যাইবে চলে মনশোভা করিল। ঐ
আর কতেক দূর হইতে মান্নান আর কতেক দূর গেল
খেয়ার ঘাটে গিয়ে মান্নান উপনিত হল। ঐ
ঐ না হালে মান্নান মিঞা যাইতে লাগিল
মেরুর চরে গিয়ে মান্নান ডাকিতে লাগিল।ঐ
এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাক দিল,
চার ডাকের কালে খায়রন বাড়ির বাহির হইল।ঐ
যাদুরে... আরে... ওরে।
(আকবর মাস্টারের বাড়ি। মান্নানের প্রবেশ)

মান্নান : ভাবী, ভাবী, কেমন আছেন ভাবী?

খায়রন : মান্নান ভাই, কি খবর মান্নান ভাই, আপনার বন্ধুর কি সমাচার?

মান্নান : বন্ধুর সমাচার ভাল ভাবী। বন্ধু আমাকে পাঠিয়ে দিল। এই দেখেন দোকান থেকে এক পেকেট বিস্কুট আর আপনার জন্য একখানা শাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বন্ধু খুব দুঃখ করল। বলল, আহারে বেচারা রফিক, দোকানে বসে বসে সে মজা করে বিস্কুট খেত। বিস্কুট খেতে ও খুব ভালবাসত। বন্ধু এই বিস্কুট গুলো রফিকের জন্য পাঠাইছে।

খায়রন : বেশ মান্নান ভাই। আপনি বসুন।

মান্নান : না ভাবী, আমি একটি কাজ নিয়ে এসেছি মেরুর চরে। কাজ শেষ করে আমার আজই বাড়ি ফিরতে হবে। তাই আর দেরি করতে পাছি না। আমি এখন আসি ভাবী। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আকবর মাস্টারের বাড়ি। খাইরল হকের প্রবেশ)

খায়রল : আম্মা, আম্মা। আপনি কোথায় আম্মা?

খায়রন : এই আসছি আব্বা। তুমি কোথায় গিয়েছিলে।

খইরল : একটু খেলতে গিয়েছিলাম মা। মা আপনার হাতে ওগুলি কি?

খায়রন : এগুলো বিস্কুট বাবা। তোমার আব্বা পাঠিয়েছে তোমার ছোট মামা রফিকের জন্যে।

খাইরল : তা হোক মা। আমাকে দেন আমিও খাব। (বিস্কুট দিবে এবং খাবে)

খাইরল : একি মা, আমার গলা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বালা বড় জ্বালা। আহ, পানি, আমাকে পানি দেন আম্মা।

খায়রন : একি কি হল বাবা। আব্বা, আম্মা, ভাইজান, ভাবী তোমরা সবাই এসে দেখ, আমার খাইরল হক এ রকম করছে কেন? (সবাই আসবে)

মাস্টার : কই দেখি দেখি, কি হল?

মা : ওগো খাইরল হক এ রকম করছে কেন? ওকে ধর।

রফিক : আমি ডাক্তার ডাকছি মা। (প্রস্থান)

খাইরল : আমি বাঁচবো না মা। আর বুক পুড়ে যাচ্ছে, কলিজা ফেটে যাচ্ছে। নানা-নানী আম্মাকে ধরেন। আমার জ্বালা-বড় জ্বালা-আঃ আঃ আঃ (মরবে)

সবাই : চিৎকার করে উঠবে।

খায়রন : আমার সব শেষ বাবা আমার সবশেষ। আমি এখন কি নিয়ে বেঁচে থাকবো।
(কান্না)

মা : মা খায়রন, কার কপালে এত দুঃখ লিখা ছিল মা। তোর দুঃখে গাছের পাতা ঝরে যায় (২)

মাস্টার : মা কাঁদিস না মা। ওরে এখন যে আর কেঁদে কোন লাভ হবে না।
(খাইরলকে নিয়ে) চল ওর সৎকাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

খায়রন : (পিছনে পিছনে) বাবা, আমার খাইরল হক (২)
(প্রস্থান)
(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির : নূর নবি মোস্তফা রাস্তা দিয়ে হাঁইটে যায়
একটি হরিণ বান্দা ছিল গাছেরই তলায় গো
হরিণ একটা বান্দা ছিল গাছেরই তলায়।
ওমা, বাড়িওয়ালা মা বাড়িতে আছেন। আমাদের চারটে ভিক্ষা দেন মা।

খায়রন : ফকির বেটা, তোমার বাড়ি কোথায়?

ফকির : বরখালি গ্রামে মা।

www.pathagar.com

খায়রন : বরখালি গ্রামের ফজল মিয়াকে চেন?

ফকির : হ্যাঁ চিনব না কেন, মা। আমি ফজল মিয়ার বাড়ির পাশের বাড়িতে থাকি।

খায়রন : তাহলে বাবা, আমার একটি কাজ করে দিতে পাবে?

ফকির : কি কাজ মা?

খায়রন : ফজল মিয়াকে গিয়ে বলবে, রফিকের জন্য তার বন্ধুর কাছে সে যে বিস্কুট দিয়েছিল সেই বিস্কুট খেয়ে তার ছেলে খাইরল হক মৃত্যুবরণ করেছে।

ফকির : এই মুহূর্তে যেতে পারব না মা। সারাদিন ঘুরব। ঘুরে ঘুরে আমার সারাদিন কিছু রোজগার হবে।

খায়রন : তুমি চিন্তা কইর না ফকির বেটা। তোমার সারাদিন যে রোজগার হবে আমি তোমাকে তা দিয়ে দিতাছি। দয়া করে এখনি তুমি আমার খবরটা পৌঁছায়ে দাও, বাবা।

ফকির : ঠিক আছে মা, ঠিক আছে। আমি এক্ষণি যাচ্ছি। (প্রস্থান)
(ফজল মিঞার বাড়ি। ফকিরের প্রবেশ)

ফকির : ফজল মিঞা, ফজল মিঞা।

ফজল : কে, কে ডাকে। ও সিধু ফকির। তা কি খবর।

ফকির : খবর আর কি বলব ফজল মিয়া। গিয়াছিলাম মেরুরচরে ভিক্ষা করতে। তোমার শ্বশুর বাড়ি থেকে তোমার খায়রন খবর দিল মান্নানের হাতে তুমি রফিকের জন্য যে বিস্কুট পাঠিয়েছিলে সেই বিস্কুট খেয়ে তোমার ছেলে খাইরল হকের মৃত্যু হয়েছে।

ফজল : কি, কি বললে ফকির? খাইরল হক মরেছে? আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না ফকির, আমি বিশ্বাস করি না।

ফকির : বিশ্বাস অবিশ্বাস তোমার ব্যাপার। আমি খবরটা দিয়ে গেলাম। (প্রস্থান)

ফজল : আমি যে দিকে যাচ্ছি সেদিকেই শুধু অন্ধকার। আমি,আমি কি করব, আমি কি করব। হায়! খোদা আমাকে সঠিক পথ দেখাও।
(মান্নানের প্রবেশ)

মান্নান : বন্ধু, কি হয়েছে?

ফজল : কি আর হবে বন্ধু? তোমার বুদ্ধিতে বিস্কুট পাঠালাম রফিককে মারতে, আর সে বিস্কুট খেয়ে মরল আমার ছেলে খাইরল হক। এখন আমি কি করি বন্ধু?

মান্নান : কোন উপায় দেখছি না, বন্ধু। যা ভাল বুঝ কর।

ফজল : হ্যাঁ, আমি তাই করব। এই মুহূর্তে আমি চলে যাব মেরুরচরে। খায়রনকে বেঁধে নিয়ে এসে আমার টাকার প্রতিশোধ আমার ছেলের প্রতিশোধ আমি খায়রনের উপর তুলব।

মান্নান : যা ভাল বুঝ কর বন্ধু। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

(আকবর মাস্টারের বাড়ি। ফজলের প্রবেশ)

ফজল : খায়রন, খায়রন, এই খায়রন।

খায়রন : আপনি এসছেন, স্বামী।

ফজল : হ্যাঁ এসেছি, কিন্তু তোমার করুণ সুরের ডাক শুনতে নয়। এসেছি আমার ছেলের খবর নিতে। বল, আমার ছেলের কি হয়েছিল?

খায়রন : স্বামী আপনি যে বিস্কুট পাঠিয়েছিলেন মান্নান ভাইয়ের হাতে সেই বিস্কুট খেয়ে আপনার ছেলে মারা গেল।

ফজল : অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি না। বিস্কুট খেয়ে মানুষ মরতে পারে একথা আমি বিশ্বাস করি না। এসবই তোমাদের সাজানো নাটক, এখানে রাখতে চাই না। চল, চল আমার সাথে।

খায়রনের গান : আমার কোন দোষ নাই স্বামী, আপনার দুষেই মইল আমার খায়রুল
গো, ওহে গো স্বামী পায়ধরে কই
ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন স্বামী মেরুরচর গেরাম।

ফজল : না ছেলে হারানোর জ্বালা আমার বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না।

খায়রনের গান : কি ম্যান বিস্কুট পাঠাইছেন স্বামী মান্নান মিঞার হাতে গো
ওহে... গেরাম।
সেই না বিস্কুট খেয়ে মরল আপনার ছেলে গো। ঐ
পরার জন্য দর খুদিলে নিজেই সেই দরে পড়ে গো। ঐ
পরার চালে ঢিল মারিলে নিজের চালেই পড়ে গো। ঐ

ফজল : আমি বিশ্বাস করি না। এ সবই চক্রান্ত। তুমি জেনে শোনেই আমার ছেলেকে খুন করেছ।

খায়রনের গান : মাছে চিনে গহীন গাঙ্গ স্বামী পক্ষি বৃক্ষের ডাল,
ওহে গো স্বামী মায়ে জানে পুত্রের দরদ
স্বামী যার হৃদে শোলে গো,
মরি হায়, হায় গো।

ফজল : না, না, খায়রন তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করি না। চল, চল আমার সঙ্গে। (নিয়ে প্রস্থান)
(ফজল মিয়ার বাড়ি, একা ফজল মিয়া)

ফজল : আমার তের হাজার টাকা, আমার মান সম্মান, আমার ছেলে সব চলে গেল। আর আমি কোন প্রতিশোধই নিতে পারলাম না। না না, তা হয় না। যেভাবেই হউক আমি খায়রনকে শেষ করে ফেলব। খায়রনকে শেষ করেই আমি আমার প্রতিশোধ নিব। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(মাঝির বাড়ি। ফজল মিঞার প্রবেশ)

ফজল : মাঝি, এই মাঝি, বাড়িতে আছ?

মাঝি : হ্যাঁ, তা কি মনে করে ফজল মিঞা?

www.pathagar.com

ফজল : এই মাঝি, সন্ধ্যার পরে আমি আর খায়রন মেরুরচরে যাব। তোমরা নৌকা ভাড়া দিতে পারবে?

মাঝি : পারব, তবে আমাদের ৫০০/- টাকা দিতে হবে।

ফজল : ঠিক আছে। এই নাও ৫০০/- টাকা। সন্ধ্যার পরে ঘাটে নৌকা নিয়ে তৈরি থেক।

মাঝি : ঠিক আছে ফজল মিয়া। (প্রস্থান)

(ফজল মিঞার বাড়ি)

ফজল : খায়রন, খায়রন।

খায়রন : জি স্বামী।

ফজল : খবর পেলাম তোমার বাবা খুবই অসুস্থ্য।

খায়রন : বাবা অসুস্থ্য, কে বলল স্বামী। কি অসুখ?

ফজল : তা তো জানি না। তবে জানতে পেলাম তিনি মৃত্যুর মুখে।

খায়রন : ওহে স্বামী, এখন আমি কিভাবে যাব স্বামী?

ফজল : কোন চিন্তা নাই খায়রন। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

খায়রন : আপনি যাবেন স্বামী? ওহ, স্বামী, তাহলে ছোট ছেলেটাকে নিয়ে আসি স্বামী।

ফজল : না খায়রন, ছোট ছেলেকে নেওয়ার কোন দরকার নাই। আর গিয়ে তোমার বাবাকে দেখেই চলে আসব।

খায়রন : তাহলে তাই চলেন, স্বামী। (প্রস্থান)

(খেয়ার ঘাট)

ফজল : ওহে মাঝিগণ তোমরা এসেছো।

মাঝি : হ্যাঁ, ফজল মিঞা, ওঠ, ওঠ, নৌকা ছেড়ে দেই।

মাঝির গান : নদীতে না যাইওরে
যইদর নদীতে না যাইওরে
যইদর নদীর পানি ঘোলারে ভোলা পানি।
এক নোটা তুলিতেরে
যইদর দুই নোটা তুলিতেরে
যইদর বাপ নাই মোর তুলিয়ারে দিব নোটা ॥
নদীতে না যাইওরে
যইদর নদীতে না যাইওরে
যইদর নদীর পানি ঘোলা রে ভোলা পানি।

ফজল : এই মাঝিগণ নৌকা ডান দিকে ছাড়।

মাঝি : কেন ভাই? আমরা যাব মেরুরচর। মেরুরচর হল বামদিকে। আমরা ডান দিকে যাব কেন?

ফজল : আমি যা বলছি তাই কর। তা নাহলে তোমাদের জানে মেরে ফেলবো।

মাঝি : ঠিক, আছে ভাই, তাই যাচ্ছি।

www.pathagar.com

খায়রনের গান : একে তো ভাইটেল পানি মাঝি তাতে বাদাম খানি মাঝি সওজে সওজে সাইর বৈঠা মাঝি ছেলের কান্দন শুনছে মরি হায়, হায় গো। ছাড়লাম (৩) মাঝি ভাই, বাপ ভাইয়ের ঘাট, মাঝি ভাই। ঐ

মাঝি : ও ফজল মিঞা, আমরা যে মেরুর চর ছেড়ে আসলাম। এখন কোন দিকে যাব?

ফজল : এই মাঝিগণ, আমি খায়রনকে জলমহল দেখাতে নিয়ে যাব। নৌকা ঐ দিকে ছাড়।

মাঝি : না ভাই, আমরা ঐ দিকে যেতে পারব না।

ফজল : যেতে পারবে না বললেই হল। এই আমার হাতে দেখেছো কি? একেবারে জানে মেরে ফেলবো।

মাঝি : (কানতে কানতে) যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি।

খায়রনের গান : যাব না (২) মাঝি ভাই জলমহল দেখিতে, মাঝি ভাই জলমহল দেখিতে গেলে মাঝি, না আসিব ফিরে গো মরি হায়, হায় গো। যাব না (২) মাঝি ভাই জলমহল দেখিতে, মাঝি ভাই ঘরে আছে দুধের বালক মাঝি, দুধ বেগরে মরি গো মরি হায়, হায় গো।

ফজল : এই মাঝিগণ গভীর জায়গায় নৌকা নামাবে।

মাঝি : ফজল মিঞা, এই হচ্ছে গহীন গাঙ।

ফজল : ঠিক আছে, নৌকা থামাও। আর এই নাও ছালা। তোমরা দুজন খায়রনকে এই ছালার মধ্যে উঠাও।

মাঝি : পায়ে পড়ি ফজল মিঞা। আমরা এ কাজ করতে পারবো না।

ফজল : করতে পারবা না। কিন্তু করতে তোমাদের হবেই। তাহা হলে এই মুহূর্তে তোমাদের শেষ করে দিব।

মাঝি : ইয়া আল্লাহ। তুমি রক্ষা কর আল্লাহ্ রক্ষা কর।
(মাঝিরা খায়রনের কাছে যাবে)

খায়রন : ওগো স্বামী, আমাকে প্রাণে ভিক্ষা দাও স্বামী, আমাকে প্রাণে ভিক্ষা দাও।

ফজল : প্রাণে ভিক্ষা দিব হাঃ হাঃ হাঃ প্রাণে ভিক্ষা দিলে যে আমার প্রতিশোধ লওয়া হবে না। এই মাঝিগণ দাঁড়িয়ে দেখছো কি?
তাড়াতাড়ি কর।
(মাঝিরা বস্তা মধ্যে ওঠাবে)

খায়রন : ইয়া আল্লাহ তুমি কোথায়, আল্লাহ। আমাকে বাঁচাও।

গান : খুল(৩) মাঝি ভাই, ছালার মুখ খান খোল,
মাঝি ছালার মুখখান খুইলা দিলে মাঝি
দেখব চন্দ্র মুখেড়েরে মরি, হায় হায়, গো।
আবার (দেখবো সূর্য মুখ)

মাঝি (১) : এই মুখটা একটু খুলে দে।

মাঝি (২) : ঠিক আছে। (খোলে)

www.pathagar.com

ফজল : দেখি, দেখি তোমার হাতে এটা কি?
ও যাদুর ঝুলি। দাও, দাও তোমার যাদুর ঝুলি আমি পুড়ে ছারখার করে দিব। (পুড়ল)

খায়রনের গান : যাদুর ঝুলি নয়গো স্বামী খোদার ও কালাম গো
ওহের গো স্বামী পায় ধরে কই পুড়বেন না (২) স্বামী খোদার ও কালাম।
খোদার কালাম পুড়লে স্বামী ঠেকবেন আল্লাহর কাছে গো ।ঐ

ফজল : এই মাঝিগণ, আর দেরি করা চলবে না। বন্ধ কর ছালার মুখ।

মাঝি : ঠিক আছে ভাই।

খায়রনের গান : তোমরা আমার ধর্মের মাঝি ভাই ধর্মের কাজ কর,
ওহরে মুসলমানের মরার মতে মাঝি, জানাজা করিও গো
মরি হায়, হায় গো।
(বস্তার মুখ বাঁধবে)
(কিছুদূর গিয়ে)

ফজল : এই মাঝিগণ এই বস্তা পানির মধ্যে ফেলে দাও।

মাঝি : নানা আমরা তা পারব না।

ফজল : পারবে না। তবে দেখ, তোমাদের কি করি।
(মাঝিরা ভয়ের বস্তার মুখ খুলে খায়রনকে ফেলে দিল। খায়রন সুযোগ বুঝে নৌকার বাতা ধরবে। সঙ্গে সঙ্গে ফজল খায়রনের হাত কেটে দিবে।)

ফজল : এই মাঝিগণ তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়। আর শুন, খায়রনকে যে এখানে ফেলে দিলাম তা কাউকে বলবে না। বললে তোমাদের শেষ করে দিব।

মাঝি : (কেঁদে কেঁদে) আমরা বলব না ফজল মিয়া। কিন্তু আমরা ছাড়াও বিচারের মালিক ওপর ওয়ালা একজন আছেন। ওনি ঠিকই দেখেছেন। উনি এর বিচার করবে ফজল মিয়া, উনি এর বিচার করবে।

বয়াতি : যাদুরে... আরে... ওরে।
তার পরেতে ফজল মিয়া কি কর্ম করিল
খায়রেনেরে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলিল।
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দে বৃক্ষের ফল
আজগুবি এক শব্দ হইল কি করলি ফজল।
ভয় পাইয়া নৌকার মাঝে কথা নাহি কয়
নৌকা ভিড়ায় চরের মাঝে ফজল নাহি রয়।
তার পরেতে ফজল মিয়া কি কর্ম করিল
আন্দর রাইতে হাঁইটে হাঁইটে বাড়িতে আসিল॥
একদিন গেল ঐ যে দুই দিন গেল

www.pathagar.com

তিন দিনেতে গোপন কথা ছড়িয়া পড়িল॥
সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল খায়রনের বাড়ি
আকাশে বাতাসে ভাসে করুণ আহাজারি ॥
ফজল মিয়া পড়ল ধরা পুলিশের হাতে
টাইনে টাইনে থানায় নিল দড়ি কোমরেতে ॥
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে গো সকলে
খায়রনের শোক আজ ভাসে কয়ড়া নদীর জলে ॥

তথ্যসূত্র : তৈয়বুর রহমান বয়াতি, গ্রাম : রামভদ্রা, ডাক : হাড়গিলা, থানা : ইসলামপুর, জেলা : জামালপুর

মাধ্যম : ডা. মো. ফজলুল হক বিসিএস (স্বাস্থ্য)
মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কম্প্লেক্স
উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর
সংগ্রহের তারিখ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪

২. চন্দ্রাবতী

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মির্জা আশরাফ উদ্দীন হায়দারের সম্পাদনায় জামালপুরে তাঁর নিজস্ব আমিনা প্রেস থেকে 'তওফিক' নামে একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হত। এ সাপ্তাহিকীতে কিংবদন্তি রাজা হরিশ্চন্দ্রের দিঘির করুণ কাহিনির কিছু তথ্য ছাপা হয়। সে তথ্যের উপর ভিত্তি করে জামালপুর জিলা স্কুলের শিক্ষক, গীতিকার ও অভিনেতা মো. মুখলেসুর রহমান ফকির ১৯৮৪ সালে 'চন্দ্রাবতী' নামে একটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। যা জামালপুরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হয় এবং ১৯৮৫ সালে জামালপুর জেলাকল্যাণ ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উক্ত নৃত্য-নাট্যের কপি দুস্প্রাপ্য। কালের গর্ভে যাতে চন্দ্রা ও রশীদের কিংবদন্তিতুল্য প্রেমকাহিনি হারিয়ে না যায়, সেজন্য নৃত্য-নাট্যটি এখানে উপস্থাপন করা হলো।

চন্দ্রাবতী
নৃত্য নাট্য

চরিত্রসমূহ

১.	গোকুল দেব	চন্দ্রাবতীর পিতা
২.	নকুল দেব	গোকুল দেবের পুত্র
৩.	চন্দ্রাবতী	গোকুল দেবের কন্যা
৪.	রশীদ	জনৈক সেনানী

এছাড়া তিনজন গ্রামবাসী, চন্দ্রাবতীর চারজন সখি, একজন সেনানী ও একজন বাউল।

উপস্থাপনা

দূর থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসছে। পেছনের পর্দায় উদীয়মান সূর্যের সোনালি পরশ। পাখপাখালির আওয়াজ শোনা যাবে। দু'একজন চাঁষি মাথাল মাথে, কাস্তে হাতে মঞ্চ

www.pathagar.com

দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে চলে যাবে। বাঁশির আওয়াজ স্পষ্ট হবে। দু'জন গ্রামবাসীর প্রবেশ। গানের তালে তালে ওরা আসবে।

গ্রামবাসীগণ : জামালপুর শহরের কাছে চন্দ্রা নামে গ্রাম
সেই গ্রামে লুকিয়ে আছে প্রেমের উপাখ্যান।
আহা, প্রেমের উপাখ্যান ॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা যখন শাসন করেন দেশ
ঘরে ঘরে খুশির জোয়ার দুঃখ নাহি লেশ।
রাজার মনে খেয়াল জাগে এলেন চন্দ্রা গ্রামে —
দিঘি খনন করেন হরিশ্চন্দ্র দিঘি নামে।
টলটলাটল দিঘির জলে ছলছলাছল ঢেউ,
সবার মুখে ফুটলো হাসি, দুঃখী নাহি কেউ।
হরিশ্চন্দ্র গেলেন ফিরে স্মৃতির প্রদীপ জ্বেলে
(সেই) দিঘির জলে আজো হাজার শাপলা-শালুক দোলে।
অনেক অনেক দিনের পরে
সেই দিঘিটির পূর্বধারে
আম কাঁঠালের বন।
(সেই) ঘুঘু ডাকা বনের ছায়ে
ঝির ঝিরে পূবালি বায়ে
গোলকচন্দ্র দেবের আগমন ॥
সুখের সংসারে তার
জন্ম নিল চন্দ্রাবতী সোনার বরণ ॥
হাসিতে তার মানিক ঝরে,
চাওনিতে তার পরাণ হরে,
রূপে-গুণে চন্দ্রা অনুপম॥
সাত সকালে পাখপাখালি
গানে গানে ডানা মেলি
যখন জাগে বনে—
চন্দ্রাবতী তারও আগে
গানের সুরে নিতি জাগে
ফুল কলিদের সনে ॥
পূবাল হাওয়া দোদুল নাচে
তার পরশে গাছে গাছে
জাগে শিহরণ,
দিনে দিনে চন্দ্রাবতী
লভিল যৌবন ॥
তরুণ সেনা রশীদ মিয়া,
চন্দ্রাবতীর রূপ দেখিয়া

www.pathagar.com

মন যে উচাটন ॥
আড়ালে আড়ালে থাকে
এ উহারে কাছে ডাকে
দুইটি হিয়ায় জাগে মৃদু গুঞ্জরণ ॥

প্রথম দৃশ্য

ছায়া আর মায়ায় ঘেরা, পাখি ডাকা, ফুল ফোটা কুঞ্জবন। গানের সুরে নৃত্যের লীলাময়ী ভঙ্গিতে সখিদের প্রবেশ। সঙ্গে চন্দ্রাবতী। সময় সকাল।

সখিগণ : সুরভিত কুসুমের গন্ধে
রিমিঝিমি নূপুরের ছন্দে
প্রাণে প্রাণে একি দোলা লাগলো!
সুরে সুরে সাত সুর জাগলো ॥

চন্দ্রাবতী : বসন্তের এই আগমনে
ফুল ফুটেছে বনে বনে,
মধু লোভে মৌমাছির মেলা,
দোয়েল, কোকিল, শ্যামার গানে
কোন সুদূরে পরান টানে,
যে দিকে চাই শুধুই রঙের খেলা ॥
হৃদয়ে হৃদয়ে ফোটে ফুল
হিয়াতে হিয়াতে লাগে দোল।
চারিদিকে শুধু হাসি
শুধু ভালবাসাবাসি,
রিনিঝিনি বয়ে যাক বেলা ॥

সখিগণ : তাই মোরা উচ্ছল, চঞ্চল ফুলদল,
গানে গানে সুরে সুরে ব্যাকুলিত বিহ্বল ॥

চন্দ্রাবতী : ওগো সখি, যা বলেছ সত্য,
অই দেখ তমালের শাখে
সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
বিহগ বিহগীদল প্রেমালাপে মত্ত ॥

জনৈক সখি : তাই তো !

চন্দ্রাবতী : ওগো সখি, যা বলেছ সত্য ॥
চারিদিকে রাশি রাশি
এতো সুর, এতো হাসি,
তবু কেন কাঁদে মোর প্রাণ?
বলনা, বলনা সখি,
কেন কাঁদে প্রাণ ?

সখিগণ : রূপের পসরা তুমি দেবী চন্দ্রাবতী,
দেব বংশে জন্ম তব অতি বুদ্ধিমতী,
কী বুঝাব আমরা তোমায় ?

www.pathagar.com

কী করে বুঝাব বল,
কেন প্রাণ করে হায়, হায় ?

চন্দ্রাবতী : কেন এত শিহরণ হৃদয়ের যমুনায় ?
ব্যথার রাগিনী কেন বীণাতারে মূরছায় ?
ফুলে ফুলে প্রজাপতি,
কেন আনাগোনা নীতি ?
মেঘে মেঘে আজি কেন বিজলীরা চমকায় ?

সখিগণ : কেন তুমি চন্দ্রাবতী উন্মন অধীর ?
গৃহে ফিরে চল সখি, মন কর স্থির ।

চন্দ্রাবতী : না,না,না, গৃহে যাব না,
যাব না, যাব না, যাব না ॥
মনের মাধুরী দিয়া
প্রেমের সুরভি নিয়া
স্বপনে পেয়েছি যারে
তারে গৃহে পাব না ॥

সখিগণ : তবে তাই হোক,
তবে তাই হোক,
(ওগো) চন্দ্রাবতী, তবে তাই হোক ।

চন্দ্রাবতী : ফাগুনের মায়াময় গন্ধে
যারে যাচি নৃত্যের ছন্দে,
যারে আমি এ হৃদয় দিতে চাই
সে যে ধরা দেয় নাই, দেয় নাই,
এসো প্রিয়, বকুলের গন্ধে ॥
পিপাসিত নয়নের জলে
আজো খুঁজি তারে পলে পলে,
দুলায়িত হিয়া নানা ছন্দে ॥

[এমন সময় অশ্বাহরোহী কয়েকজন সেনার নৃত্যের ভঙ্গিতে মঞ্চে প্রবেশ । চন্দ্রাবতী ও সখিগণ ভীত হয়ে মঞ্চের পাশে সরে যাবে । জনৈক সিপাহী আব্দুর রশীদ সহসা চন্দ্রাবতীকে দেখে চমকিত হয় । চন্দ্রাবতী লাজ নত চোখে ওর দিকে তাকায় । উভয়ে উভয়কে হারিয়ে ফেলে । সিপাহিরা প্রস্থান করবে । চন্দ্রাবতী ফ্রিজ]

সখিগণ : শয়নে স্বপনে যারে সংগোপনে
দিয়েছ গো প্রেমহার পূত চরণে
এ যে সেই গো, এ যে সেই গো,
বিঁধিলে কি তারে আজি নয়ন বাণে ?

চন্দ্রাবতী : একি হেরিলাম নয়নাভিরাম
যারে চাই এ যে সেই তো !
আমি রিক্ত, অনুরক্ত,
কি করিব দান কিছুই নেই তো,

www.pathagar.com

কিছু নেই তো।
(আমি) যারে চাই এ যে সেই তো ॥
[চন্দ্রাবতী ফ্রিজ। উদ্বেগাকুল হয়ে সখিগণও ফ্রিজ হবে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রাবতী পুকুরঘাটে, কলসি কাঁখে তার অচেনা প্রেয়সের ভাবনায় নিমগ্ন। পল্লিগীতি সুরে গান গাইতে গাইতে একজন বাউলের প্রবেশ।

বাউল : এই গেরামের চন্দ্রাবতীর চাঁদের চেয়ে দাম,
একবার তারে দেখলে পরে পুরে সবার মনস্কাম ॥
রূপের কিবা বলবো তাহার –
ভ্রমর কালো চুলের বাহার,
হলদে পাখির হলুদ নিয়া
গড়লো তারে ভগবান ॥
হাসিতে তার মুক্তা ঝরে,
চোখের বাণে পরাণ হরে,
মুখে তাহার চাঁদের শোভা
তাই হলো তার চন্দ্রা নাম ॥
[বাউলের প্রস্থান। সখিদের প্রবেশ]

সখিগণ : সেদিন প্রভাতকালে
আঁকিলে যাহার ভালে
হৃদয় জড়ানো প্রেম-টীকা
সে কি বধূ এল কাছে?
অথবা কি লিখিয়াছে
প্রেমেরলিপিকা?

চন্দ্রাবতী : যারে আমি বাঁধিয়াছি প্রেমের ডোরে
সে তো এলো নাকো, শুধু কাঁদাল মোরে।
যারে চাই তারে কেন পাই না?
যারে পাই তারে কেন চাই না?
হৃদয় হারাল কেন বেদনার অশ্রুনীরে।

সখিগণ : কেঁদো না, কেঁদো না বধূ, কেঁদো না,
বিফল হবেনা প্রেম সাধনা,
সুরে সুরে ভরে দাও চিত্ত
(এসো) গানে গানে করি মোরা নৃত্য,
ভুলে যাই ক্ষণিকের বেদনা ॥
[জনৈক গ্রামবাসীর প্রবেশ]

গ্রামবাসী : সরো, সরো, সরো,
সেনানী দেখিনু পথে,
আসিতেছে কোথা হতে,

www.pathagar.com

এখানে কী কর?
ভাল চাও অন্য পথ ধর।
[গ্রামবাসীর প্রস্থান]

সখিগণ : একি কথা শুনি চন্দ্রা
একি তবে, সেই মন চোর ?

চন্দ্রাবতী : তাই তো –
এস গো আমার স্বপনের সহচর,
এস গো সুরের সাধনা –
তোমার প্রেমের সুরভিত মোরে
ফাগুনের রাগে বাঁধনা ॥
আমার হৃদয়ে তোমার আসন পাতা,
কুন্দ মালতী, মল্লিকা মালা গাঁথা।
(তব) নন্দন বনে কেন মন যাচে
করিতে প্রেমের সাধনা ?

[রশীদের প্রবেশ। চন্দ্রাবতী সহসা গান থামিয়ে অপলক নেত্রে ছলছল তাকিয়ে থাকবে বিশেষ ভঙ্গিতে। সখিগণ বঙ্কিম ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান]

রশীদ : একি অপরূপ রূপের আলোয়
লীলায়িত তব অঙ্গ ?
দেবী, না মানবী, পটে আঁকা ছবি?
মন যাচে তব সঙ্গ ॥
তবু মনে জাগে ভয় –
দুইটি হিয়ার গোপন বাসনা
হবে না কি মধুময় ?
ঝরা বকুলের কলির মতন
ধুলায় লুটাবে রঙ্গ ?

সখিরা : হে সুজন, কেন অকারণ ব্যাকুলতা?
তোমারি ধ্যায়ানে সে যে
প্রণয়াবনতা ॥

রশীদ : তবে ধন্য, আমি ধন্য,
চাই, চাই না কিছু অন্য,
আমি ধন্য।

চন্দ্রাবতী : আমার পরাণে তুমি থাকবে চিরদিন,
যুঁই চামেলির গন্ধে আমার বাজবে হৃদয় বীণ।
ফুলে ফুলে গাঁথবো মালা,
অচেনাকে চেনার পালা,
এক নিমেষের একটু দেখা থাকুক অমলিন ॥
নিদ্রাহারা রাতের গানে

www.pathagar.com

হৃদয় যদি তোমার টানে –
স্বপ্নে এসে পরশ দিও
ফুরালে এইদিন ॥

রশীদ : নব রাগিনীতে
ব্যাকুল বাণীতে
বেঁধেছি গান –
প্রাণের গভীরে
স্মরণের তীরে
রবে অম্লান ॥

চন্দ্রাবতী : সখি, দে তবে দে মণিহার –
অতিথি এসেছে দ্বারে
ফিরাতে কি পারি তারে।
এ শুভ লগনে গলে নিবেদিব উপহার ॥

[চন্দ্রাবতী রশীদের গলায় মালা উপহার দেবে এমন সময় তার ভ্রাতা নকুলের প্রবেশ]

নকুল : একি তন্দ্রা !
ওহে চন্দ্রা,
হও, হও, হও তুমি ক্ষান্ত ॥
তুমি গলে যার
দাও মণিহার
অচেনা পথিক সে যে ভ্রান্ত।
ওহে চন্দ্রা, হও ক্ষান্ত ॥

[ভীতা হরিণীর ন্যায় চন্দ্রা থমকে দাঁড়ায়।]

ক্ষণিক মোহের ভুলে
কেন মালা দাও গলে?
চিত্ত তোমার কেন ক্লান্ত?

সখিগণ : না,না,না।
বাঁধার নিগড়ে তারে বেঁধো না।
প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে
দেবে মালা যার গলে
সে যে তার যুগ যুগ সাধনা ॥

[চন্দ্রাবতী রশীদের বক্ষে আশ্রয় যাচে।]

নকুল : ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না তারে,
বিনাশিবি অনাচারে,
কলঙ্কের রেখা
পড়িবে তোমার ভালে,
জড়ায়ো না মায়া জালে,
অনিত্য এ ক্ষণিকের দেখা ॥

(সবাই ফ্রিজ হবে। বাতি নিভবে।)

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

[গোকুল দেব সন্ধ্যা-আরাধনায় নিরত। নকুলের প্রবেশ]

নকুল : একি অন্যায়, মহা অন্যায়,
যশ কুল, খ্যাতি ভাসে বন্যায়,
ফুল দলে কীটবাস,
নহে, নহে পরিহাস,
ব্যাকুলিত চন্দ্রার ভাবনায়।

[বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গোকুল পূজার আসন থেকে উঠে আসে]

গোকুল : তব মুখে শুনি একি বাণী!
চিত্ত আকুল হল,
কী প্রমাদ বল, বল,
কী অন্যায় হল, কিবা গ্লানি ॥

নকুল : কেমনে সহিব প্রভু, হেন অপমান?
নিজ চোখে দেখিয়াছি, শুনিয়াছে কান ॥
কি জানি মায়ার ছলে
অচেনা সিপাহি গলে
চন্দ্রা তার মণিহার করিয়াছে দান ॥

গোকুল : এ কি সত্য।
জ্বলে চিত্ত,
কোথায় সে মত্ত পাষাণী ?
কুল-বংশে
কীট দংশে,
লৌহ-শিকলে বাঁধ এখনি ॥

[উদ্ভ্রান্ত চন্দ্রার প্রবেশ]

চন্দ্রাবতী : সেই ভালো পিত সেই ভালো,
লৌহ শিকলে বেঁধে পলে পলে
তাহার স্মৃতির প্রদীপ জ্বালো ॥

গোকুল : ধিক্ ধিক্ শতধিক তোরে,
তুইরে পাষাণী, তুইরে কাঁদালি মোরে।

[চন্দ্রাকে নিয়ে নকুলের প্রস্থান]

আমি নিষ্ঠুর, আমি নির্মম,
(আমি) মানি নাক পরাজয়,
(ঐ) কাল নাগিনীর বিষ-দংশনে
(কুল) গৌরব হবে ক্ষয়?
না, না, না,
তা হয় না, তা হয় না, তা হয় না ॥

[ফ্রিজ]

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

চন্দ্রাবতীর কক্ষ। সঙ্গে সখিবৃন্দ। বেহালায় করুন সুরের মূর্ছনা। সময় মধ্য-নিশি।

চন্দ্রাবতী : এই ঘন শ্রাবণ বরিষণে
নীড়হারা পাখি এক
কাঁদে নিরজনে ॥
থর থর কম্পিত
ব্যথাহত মত চিত,
মেঘমালা অম্বরে গম্ভীর গরজনে ॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু ঝরে কদম কেয়া,
মন মোর চাহে মন দেয়া নেয়া।
এসো গো সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গিতে
সজল মেঘের ছায়ে মৃদু আলাপনে ॥

সখিরা : মন দিয়েছো গো,
মন নিয়েছো গো
তাই তো পড়েছো ফাঁদে,
প্রেমের ফাগুন
জ্বালায় আগুন,
নীরবে হৃদয় কাঁদে ॥

চন্দ্রাবতী : কেমনে হৃদয় খুলিব?
সখি, কেমনে তাহারে ভুলিব?
আমার সকল অন্তরলোকে
তারি ছবি শুধু রাজে,
সেই গান, সেই সুরের লহরি
হৃদয়ের তারে বাজে।
তারে ভুলিব, কেমনে ভুলিব ?
যারে আমি আজো খুঁজি সংগোপনে
সে কি গো আমারে রেখেছে স্মরণে?
এমনি করে কি বিরহ বেদনে
আশা নিরাশয় দুলিব ?

সখিগণ : সে তোমারে পারে না ভুলিতে,
তুমি যে এঁকেছো তারে প্রেমের তুলিতে।
প্রেম যুগে যুগে চির সত্য,
তোমাতে সে ভরিয়াছে চিত্ত,
প্রেমের বাঁধন কভু পারে না খুলিতে।

চন্দ্রাবতী : তবু মন মানে না,
আঁধারে একেলা কাঁদি

www.pathagar.com

সে কি তাহা জানে না ॥
(কেন) ভাঙিল ফুলের মেলা?
(কেন) অকূলে ভাসিল ভেলা
দখিণা সমীরে হৃদয়ের তীরে
সে কেন আমায় ডাকে না ?

[গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল : ওরে, তোর নাই কি প্রাণে ভয়?
এমনি করে করবি কি তুই সকল কিছু ক্ষয় ?
নাম না জানা পাখির টানে
ভাসবি কত অথই বানে?
জাতি কুলের নাই কি বিচার,
নাই প্রাণে সংশয় ॥

[নেপথ্যে সংগীত । সবাই ফ্রিজ]

নেপথ্যে : জাতি-কুল-ধর্ম বিচার,
সকল আচার কর অবসান,
জানিস না কি সবই ফাঁকি?
সকল সৃষ্ট জীবে বিরাজ করেন ভগবান ॥

গোকুল : না, না, না,
আমি মানবো না,
আমি মানবো না তোমাদের উক্তি ।
এ যে অন্যায়,
এ যে ভ্রান্ত,
এ যে মিথ্যা তোমাদের যুক্তি ॥

[রাগতভাবে গোকুলের প্রস্থান]

চন্দ্রাবতী : পিত! পিত!
(চন্দ্রাবতী খানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

সখি : দে পরায়ে মনিহার,
জ্বালো জ্বালো দীপের আলো,
আনো শত উপচার ॥
রেশমী ফিতায় বাঁধো
এলায়িত কুন্তল,
ফুল দলে দেরে ভরে
বিবসিত অঞ্চল ।
খুলে দাও হৃদয়ের অন্ধ দুয়ার ॥

চন্দ্রাবতী : এসো, এসো চিত্তে, এসো মোর স্বপনের সাথি,
নিশীথ রাতের ঝরো ঝরো ছন্দে
রেখেছি হৃদয় মম পাতি ।

[চন্দ্রার প্রস্থান । সখিদের প্রবেশ । চন্দ্রাকে না দেখে]

www.pathagar.com

সখিগণ : একি স্বপ্ন!
নাকি মগ্ন
কোন চিত্ত!
কোথা চন্দ্রা
নাকি তন্দ্রা?
মোহসিক্ত!
[সবাই ফ্রিজ]

পঞ্চম দৃশ্য

হরিশ্চন্দ্র দিঘির একাংশ। আকাশে ঘনঘটা। বিদ্যুতের চমক। রশীদের প্রবেশ।

রশীদ : হে প্রিয়া সজনী,
কত যে রজনী
তব পথ পানে চাহি
মনের গোপন কথাটি সাজিয়ে
বিরহের গান গাহি।
নিশীথ গগনে
পবনে পবনে
বিজলীর ছটা রাজে,
তোমার প্রেমের সুরভিতে
(হৃদে) বিরহ বেদন বাজে ॥
আশা ছিল মনে তুষিব যতনে
আর কিছু নাহি চাহি ॥
[জনৈক সেনানীর প্রবেশ]

সেনানী : ওরে ও পাগল বেভুল,
প্রেমে আকুল,
কাঁদিসনে আর দীর্ঘশ্বাসে,
(সে যে) বনের হরিণ
বাঁধিসনে বীণ
নতুন করে মিথ্যে আশে ॥

রশীদ : আমি তারে ভুলতে পারি না যে,
নিত্য আমার গানের সুরে
তারি ছবি হৃদয় জুড়ে,
ছড়িয়ে আছে ছন্দময়ী
আমার সকল কাজে ॥

সেনানী : বুঝিয়াছি মায়াবিনী ফাঁদে
জড়িয়ে পড়েছ তুমি। এই অপরাধে
সমুচিত দণ্ড দিব তোমা,
নাই, নাই, নাই, কোন ক্ষমা ॥
[সেনানীর প্রস্থান। রশীদ ফ্রিজ। বাতি নিভবে]

www.pathagar.com

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাতের আবছা অন্ধকারে দিঘির ঘাটে চন্দ্রাবতী। ঝিঁ ঝিঁ পোকার আনাগোনা। নেপথ্যে করুণ সুরের রাগিনী। শ্রাবণের বারিধারা।

চন্দ্রাবতী : ভুলিও, আমারে ভুলিও ।
তোমার সকল হৃদয় জুড়িয়া
স্মৃতির দেউল তুলিও ॥
তোমাতে হয়েছি প্রিয়, লীনা,
চির শান্তির নীড়ে বসে একা
নীরবে বাজাব বীণা।
আমার প্রেমের রাখিবন্ধন,
যদি পার তুমি খুলিও ॥
শেষ রাগিনীর করুণ সুরে
হারিয়ে যাব অচিন পুরে
স্তব্ধ নিঝুম রাতে স্মৃতির প্রদীপ জ্বেলে দিও।

[চন্দ্রাবতী এক চরম মুহূর্তে, হৃদয় বিগলিত চিত্তে দিঘির নিস্তব্ধ নিঝুম ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে রশীদের কণ্ঠ]

রশীদ : চন্দ্রাবতী ও গো চন্দ্রাবতী,
(তুমি) লুকায়োনা জলধীর জলে,
আমি যে এসেছি প্রিয়ে,
বন ফুল মালা নিয়ে
যেওনা, যেওনা, প্রিয়ে,
যেওনা চলে ॥

চন্দ্রাবতী : না, না, না।

রশীদ : চন্দ্রা জলে ঝাঁপ দিও না।
মরমের কথা আজো বলা হলো না।

চন্দ্রাবতী : না, না, না।

[চন্দাবতী দিঘির কালো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবছা অন্ধকারে দিঘির অতল গভীরে চন্দ্রা হারিয়ে যাচ্ছে। রশীদের প্রবেশ। এক মুহূর্ত সে স্বব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর 'চন্দ্রাবতী' বলে চিৎকার করে সেও দিঘির কালো জলে আত্মহুতি দেয়। করুণ সুরের মূর্ছনায় রাতের আকাশে কাঁপন জাগে। তারপর চারদিক নিস্তব্ধ।]

নেপথ্যে : এমনি করে দু'টি হিয়া
প্রেমের সুরভি নিয়া
মিশে গেল অতল সলিলে।
চন্দ্রাবতীর প্রেমের স্মৃতি
চন্দ্রা নামে গ্রাম,
রশীদ মিয়ার নামে হলো
রশীদপুর গ্রাম,

www.pathagar.com

চন্দ্রা গ্রামে কাঁদে আজো
চন্দ্রাবতীর প্রাণ,
রশীদ মিয়া তারে আজো
করিছে সন্ধান।

**তথ্যসূত্র : রচনা- মুখলেছুর রহমান ফকির
কলেজ রোড, আমলাপাড়া, জামালপুর**

৩. সুজনি সুন্দরি

চরিত্রসমূহ

বয়াতি, আশরাফ, সুজনি সুন্দরি, বাগু মণ্ডল (সুজনি সুন্দরির বাবা), লালমিয়া (আশরাফের বাবা), বছির (বাগু মণ্ডলের ভাই), কদ্দুস (বাগু মণ্ডলের ভাই), নজরুল (আশরাফের চাচা), ওসি, পুলিশ, মাহালি (খেয়াঘাটের মাঝি), ছাত্র-ছাত্রী, মাস্টার, সুজনির মা, সুজনির ভাবী ও ভিখারিনী চাচী।

বন্দনা

আমরা পরথমে বন্দনা করি আল্লা নিরঞ্জন
হায়গো তার শেষে বন্দনা করি রসুলের চরণ।
আমরা পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
হায়গো একদিকে উদয় ভানুর চৌদিকে পশর।
আমরা উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
হায়গো সেইখানেতে লইছে জনম মালুমের পাথর।
আমরা পশ্চিমে বন্দনা করি হজ মক্কার ঘর
হায়গো সেই ঘরেতে পড়ে নামাজ লক্ষ হাজিগণ
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর
হায়গো সেইখানেতে চালায় ডিঙ্গা সাহু সদাগর।
আমরা চারকানি বন্দনা করি মধ্যে করলাম স্থির।
হায়গো আকাশ পাতাল বইন্দ্যা গাব আশি হাজার পির।
আমরা ম্যানেজারকে বইন্দে গাব সিরাজ মিয়া নাম
হায়গো তাহার চরণে জানাই হাজার সালাম।
আমরা সেরকেটারি বইন্দে গাব সুলতান মিয়া নাম
হায়গো তাহার চরণে জানাই হাজার সালাম।
আমরা গানের উস্তাদ বইন্দে গাব বাবুল মিয়া নাম
হায়গো তাহার চরণে জানাই হাজার সালাম।
এই আসরে বসছেন সবাই হিন্দু মুসলমান
হায়গো মুসলমানকে জানাই সালাম হিন্দুকে প্রণাম।
হায়গো বন্দনা ছন্দনা গাইতে অনেক হইল দেরি।
হায়গো এই আসরে গাইবো মোরা সুজনি সুন্দরি।

www.pathagar.com

প্রথম দৃশ্য

(স্থান : লালমিয়ার বাড়ি। লালমিয়ার প্রবেশ)

লালমিয়া : আশরাফের মা ঘরে আছ নাকি? ও আশরাফের মাও, আশরাফের মাও, ঘরে আছ নাহি।

মা : কী হইছে স্বামী, আমাকে ডাকছেন কেন?

লাল : ডাকি যে আশরাফের মা, আশরাফ তো বড় হয়ে গেছে, তাকে তো লেখাপড়া করানি দরকার, তুমি কী মনে কর আশরাফের মা?

মা : আমি আর কী বলব স্বামী, তবে আমার ইচ্ছা ছিল আশরাফকে মাদ্রাসায় পড়ায়ে যুদি আশরাফকে আলেম বানাইতে পারতাম, তাহলে আমার ইহকালেও শান্তি পরকালেও শান্তি।

লাল : ঠিক বলেছ আশরাফের মা, তুমি ঠিক বলেছো। আগামী কালই আশরাফকে আমি ডেঙ্গারগড় মাদ্রাসায় ভর্তি করায় দিব। কেমন?

মা : তাই করেন স্বামী। এখন ঘরে চলেন, কিছু খাওয়া দাওয়া করবেন।

লাল : তাই চল আশরাফের মাও। তাই চল।

বয়াতি : ও যাদুরে, আরে ও রে
আশরাফ ছোট থেকে বড় হইল বই নিল হাতেতে
যায় গো আশরাফ মাদ্রাসায় পড়তে।
আছিল আশরাফ ছেরা কোন কর্ম করিল
মাদ্রাসাতে যাব বইলা মনশোভা করিল।
আর কতেক দূর হইতে গো আশরাফ আর কতেক দূর গেল
মাদ্রাসাতে যাইয়্যা গো আশরাফ উপনীত হইল।
আশরাফ ছোট থেকে বড় হইল বই নিল হাতেতে
যায় গো আশরাফ মাদ্রাসায় পড়তে।
মাদ্রাসাতে যাইয়্যা আশরাফ কোন কাজ করিল
মাস্টার মাস্টার বইল্যা আশরাফ ডাকিতে লাগিল।
আশরাফ ছোট থেকে বড় হইল বই নিল হাতেতে
যায় গো আশরাফ মাদ্রাসায় পড়তে।
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
চার ডাকের কালে গো মাস্টার ডাকের জবাব দিল।
আশরাফ ছোট থেকে বড় হইল বই নিল হাতেতে
যায় গো আশরাফ মাদ্রাসায় পড়তে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান : ডেঙ্গারগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়।

লাল : মাস্টার সাব আছেন নাকি, ও মাস্টার সাব?

মাস্টার : ইয়েস আছি। কে ডাকছেন ভিতরে আসুন।

লাল : সালামু আলাইকুম, মাস্টার সাব।

www.pathagar.com

মাস্টার : কী ব্যাপার, বলুন কী জন্য এসেছেন?
লাল : আসছি যে মাস্টার সাব, আমার ছেলে আশরাফকে আপনের ইসকুলে ভর্তি করাতে।
মাস্টার : বেশ ভাল কথা। ভর্তির ফিস দশ টাকা, আর মাসিক বেতন বিশ টাকা, মোট তিরিশ টাকা দিলে আপনের ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি করাই নিমু।
লাল : এই নিন তিরিশ টাকা। (পকেট থেকে টাকা বের করে মাস্টারকে টাকা দেয়)
মাস্টার : আচ্ছা ঠিক আছে। বল তো তোমার নাম কী?
আশরাফ : আমার নাম মোহাম্মদ আশরাফ।
মাস্টার : তোমার বাবার নাম কী?
আশরাফ : আমার বাবার নাম মোহাম্মদ লালমিয়া।
(শিক্ষক খাতায় লিখবে)
মাস্টার : আচ্ছা তোমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করা হলো। আগামী কাল থেকে তুমি ইতিমতো কিলাস করবে।
লাল : আচ্ছা মাস্টার সাব আজ তাহলে আসি। (সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাবে)
মাস্টার : এই ঝন্টু মন্টু, আজ আর তোমাদের পড়াবো না, আজ তোমাদের ছুটি।
(ছাত্র-ছাত্রীরা টিচারকে সালাম দিয়ে চলে যাবে)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান : বাঘু মণ্ডলের বাড়ি

বাঘু : ও সুজনির মা সুজনির মা, ঘরে আছ নাকি, সুজনির মা?
(ধানভর্তি একটি হোচা নিয়ে সুজনির মায়ের প্রবেশ)
সুজনির মা : কী হল সুজনির বাপ, এত ডাকাডাকি করতাছেন ক্যা?
বাঘু : তোমারে যে ডাকতাছি সুজনির মা, সুজনি তো বড় অইয়্যা গেল। তাকে তো লেখাপড়া শিখানি দরকার তাতে তুমি কী বল, সুজনির মা?
মা : আমিও তো তাই বলি। ওকে লেখাপড়া করানি দরকার।
বাঘু : তাহলে আগামী কাল বামনা সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করাই দিব।
মা : তাই কর সুজনির বাপ।
বাঘু : ঠিক আছে, তাহলে এবার চল।
মা : তাই চলো।
বয়াতি : বাঘা গাই দোয়াইল দুধ বেচিল ট্যাকা নিল হাতে তে
যায় গো বাঘা বামনা স্কুলে।
আছিল যে বাঘারে মুণ্ডল কোন কর্ম করিল

www.pathagar.com

স্কুলেতে যাইব বইলা মনশোভা করিল।
আর কতেক দূর হইতে বাঘা আর কতেক দূর গেল
স্কুলেতে যাইয়ে গো বাঘা উপনীত হইল।
বাঘা গাই দোয়াইল দুধ বেচিল ট্যাকা নিল হাতে তে
যায় গো বাঘা বামনা স্কুলে।
স্কুলেতে যাইয়্যা বাঘা কোন কাম করিল
সুজনিকে স্কুলেতে ভর্তি করাই দিল।
বাঘা গাই দোয়াইল দুধ বেচিল ট্যাকা নিল হাতে তে
যায় গো বাঘা বামনা স্কুলে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান : বামনা প্রাইমারি স্কুল।
বাগু : মাস্টার সাব, মাস্টার সাব।
মাস্টার : কে, আসুন, আসুন। মণ্ডল সাব। কাকে নিয়ে আসছেন।
বাগু : আমার মেয়ে সুজনিকে আপনার স্কুলে ভর্তি করাইতে নিয়ে আইছি।
মাস্টার : ঠিক আছে। ভর্তির ফিস ১০ টাকা বেতন ৫ টাকা মোট ১৫ টাকা দেন আমি ভর্তি করে নিচ্ছি।
বাগু : এই যে নেন ১৫ টাকা।
মাস্টার : ঠিক আছে। (কাগজে কিছু লিখবে) তোমার নাম কি মা?
সুজনি : আমার সুজনি।
মাস্টার : বাবার নাম - ঠিক আছে। আমি ভর্তি করাইয়্যা নিলাম। কাল থেকে নিয়মিত স্কুলে এসো। নিয়মিত স্কুল কামাই করলে কিন্তু ফেল করবে। আমরা চাই নিয়মিত স্কুল করে যেন মানুষের মত মানুষ হতে পার।
বাগু : ঠিক আছে আজ তাহলে আসি। আস্‌সালামু আলাইকুম।
মাস্টার : ওয়া আলাইকুম আসসালাম।
(বাগুর ও ছোট্ট সুজনির প্রস্থান)
মাস্টার : এই ঝন্টু মন্টু আজ আর তোদের পড়াব না। আজ তোদের ছুটি।
(সবাই হৈচৈ করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হবে।)
বয়াতি : যাদুরে ... আরে ... ওরে...।
আছিল যে আশরাফ মিয়া পড়ে মাদরাতে
সুজনি সুন্দরি পড়ে বামনা স্কুলেতে।
আসা যাওয়ার পথের মধ্যে দুই জনাতে দেখা
পিরীতি করে তারা থুইয়ে পড়ালেখা।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান : আশরাফের মাদ্রাসায় যাওয়ার পথের ধার। সুজনি অপেক্ষারত। আশরাফের প্রবেশ।

www.pathagar.com

সুজনি : আশরাফ ভাই তুমি কোথায় চলছ?
আশরাফ : আমি মাদ্রাসায় যাচ্ছি সুজনি।
সুজনি : তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।
আশরাফ : কী কথা সুজনি?
সুজনি : কী কথা, তুমি বুঝতে পার না কেন?
আশরাফ : না আমি বুঝতে পারি না। তোমার মুখে বল।
সুজনি : আমি তোমাকে--- তোমাকে ভালবাসি।
আশরাফ : এ হয় না সুজনি।
সুজনি : কেন হয় না আশরাফ?
আশরাফ : তোমরা ধনী, আমরা অনেক গরিব সুজনি।
সুজনি : গান
ও বন্ধুরে ক্ষুধায় মানে না পান্তরে ভাত
ঘুমে মানে না শ্মশান ঘাট
পিরীতে মানে না জাত আর বেজাতরে।
আশরাফ : নাগো সুজনি, তোমার বাবা জানলে আমাকে কেটে ফেলবে। তুমি থাক আমি চললাম।
সুজনি : কোন বা প্রাণে আমায় ছেড়ে যাও
প্রাণ বন্ধুরে আমায় কোন বা প্রাণে আমায় ছেড়ে যাও।
অভাগিনীর মনপ্রাণ তোমারে করেছি দান
তুমি ছাড়া কে আছে আমার
প্রাণ বন্ধুরে তুমি কোন বা প্রাণে
আমায় ছেড়ে যাও।
আশরাফ : আচ্ছা, ঠিক আছে সুজনি আমি আর তোমাকে ছেড়ে যাব না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান : বাঘু মণ্ডলের বাড়ি।
(সুজনির মা রান্না বান্নায় ব্যস্ত, হাড়ি-পাতিলের শব্দ হচ্ছে। সুজনির বাবা ধানকাটার জন্য কামলা নিয়েছে ৪০টি।)
সুজনির মা : আমার হয়েছে যত জ্বালা। আমি কোন দিক সামলাব? চাল ঝাড়ব, ভাত রান্না করবো না মাছ কুটবো। সুজনি, সুজনি।
সুজনি : কী হইছে মা? আসতাছি।
মা : তোমার বাবা ধান কাটার জন্য কামলা নিয়েছে ৪০টি। এই নাও ঘরে চালের বস্তা আছে, ঝেড়ে নাও ভাত বসাতে হবে।
সুজনি : আমি চাল ঝাড়তে পারবো না মা।
(গান) চাল ঝাড়তে পারবো না আম্মা গো
চাল ঝাড়তে পারবো না
স্কুলের বেলা হইছে গো মা
যাব যে চলিয়া।

www.pathagar.com

বৈশাখ মাসের ১০ তারিখে মাগো
আম্মা গো পরীক্ষা শুরু হইবে
স্কুল কামাই করলে আম্মা গো
পাশ করবো কেমনে?
১০০ টাকা ফিস দিছি আম্মা গো
আম্মা গো পরীক্ষার লাগিয়া
পরীক্ষায় ফেল করলে আম্মাগো
মুখ দেখাবো কেমনে?
(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

বয়াতি : যাদুরে... আরে... ওরে।
ওরে পায়জামা আর কামিজ পরে
বই নিল হাতেতে
যায় সজনি গুঠাইল স্কুলে। ২
আছিল যে সুজনি ছেরি কোন কাজ করিল
স্কুল পালাইয়্যা সুজনি কুঞ্জবনে গেল।
ওরে পায়জামা আর কামিজ পরে
বই নিল হাতেতে
যায় সজনি গুঠাইল স্কুলে।
এ দিকেতে বাঘু মণ্ডল কোন কাজ করিল
ক্ষেত থেকে বাড়িত আইসে ডাকিতে লাগিল।
আরে পায়জামা আর কামিজ পরে
বই নিল হাতেতে
যায় সজনি গুঠাইল স্কুলে।

বাঘু : আরে ও সুজনির মা ঘরে আছ নাকি?

মা : কী হল সজনির বাপ, আমাকে ডাকছো কেন?

বাঘু : ডাকছি যে সুজনির মা, বেলা তো এগারোডা বেজে গেছে। এখনো বন্দে ভাত গেল না কেন?

মা : সে আমি কি করবো? আমি কোন দিকে সামলাবো? আমি চালই ঝাড়ব, না ভাত রান্না করবো?

বাঘু : কেন, সজনি কোথায় গেছে?

মা : সজনি স্কুলে চলে গেছে?

বাঘু : স্কুলে চলে গেছে? তাহলে আমার নতুন লুঙ্গি আর নতুন পাঞ্জাবিটা দাও। আমিও যাচ্ছি সুজনি স্কুলে গেছে না কোথায় গেছে।

মা : এই শুন শুন, রাস্তার মদে যেন ঝগড়া ঝাটি করো না।

বাঘু : আচ্ছা, ওটা আমি দেখে নেব।

মা : হ! আমার হয়েছে যত জ্বালা।

www.pathagar.com

অষ্টম দৃশ্য

(আশরাফ সুজনির জন্য অপেক্ষা করছে। পায়চারি করছে। পরে সুজনি আসে।)

সুজনি : আশরাফ ভাই তুমি একা একা বসে আছ?

আশরাফ : তুমি এত দেরি করলে কেন? আমি তোমার জন্য দেড় ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

সুজনি : আর বলো না আশরাফ ভাই, আমার মা আমাকে বারণ করেছে। আমি জোর করে এসেছি।

আশরাফ : কি তুমি জোর করে এসেছ? (রাগান্বিত হয়ে) তোমার জোর করে আসার দরকার নাই, তুমি থাক আমি চললাম।

সুজনি : না তুমি যেতে পারবে না আশরাফ ভাই।

(সুজনি ডেকে নিয়ে কাছে বসাবে। দুজনে বসে থাকবে। এমন সময় বাঘুর প্রবেশ।)

বাঘু : (জোরে চিৎকার দিয়ে) আ...শ...রা...ফ।

সুজনি : (চমকে উঠে) বাবা তুমি এখানে?

বাঘু : ছোট থেকে আদর দিয়ে লালন পালন করে আজ এতটুকু বড় করেছি। সেই মেয়ে আমার উঁচু মাথাটাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। না না, এ আমার অসহ্য অসহ্য। আশরাফ (হুংকার দিয়ে আশরাফকে চাবুক দিয়ে পিটাতে থাকবে। আশরাফ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। সেই অবস্থায় গান ধরবে।)

আশরাফ : (গান) ওকি চাচা হে মারবেন না
মারবেন না আমারে গো। (দুই পা জড়িয়ে ধরবে আবার)

বাঘু : সরে যা, শুয়রের বাচ্চা, তোর জন্য আজ আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারি না। সমাজের মানুষগুলো আমাকে থু থু দিয়ে যাচ্ছে। বল বল ফকিরের বাচ্চা, কোন সাহসে আমার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিস?

আশরাফ : (গান) চাবুকের বারি চাচা গো
ওগো চাচা সহে না পরানে গো
ও কি চাচাহে
মারবেন না, মারবেন না আমারে গো।

সুজনি : ওকে তুমি আর মেরো না বাবা, তুমি ওকে আর মেরো না। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। ওকে ছেড়ে দাও বাবা ওকে তুমি ছেড়ে দাও।

বাঘু : উঠ উঠ। ঠিক আছে, আজ আমি তোকে সুজনির অনুরোধে ছেড়ে দিচ্ছি, আর যদি কোনদিন সুজনির দিকে চোখ তোলে তাকাস, তাহলে তোকে আমি তোকে আমি জীবিত রাখবো না, শুয়রের বাচ্চা, তোকে আমি জীবিত রাখবো না।

www.pathagar.com

নবম দৃশ্য

বয়াতি : যাদুরে... আরে... ওরে।
সুজনি কান্দে কান্দে গো
কেশ নাহি বান্দে গো
গতর ভিজিল চোখের জলে হে।
(আশরাফের প্রবেশ আলুথালু বেশে।)

আশরাফ : হে খোদা আমার কপালে তুমি এই লিখেছিলে? তানা হলে আমাকে পরের হাতে মার খেতে হল কেন? পরের হাতে মার খেতে হল কেন?

(আশরাফ একা একা বসে আছে। কোকিল ডাকতে থাকবে। সুজনির প্রবেশ)

সুজনি : আশরাফ ভাই, তুমি একা একা বসে আছ, আমি তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি।

আশরাফ : একি সুজনি তুমি এখানে কেন এলে? না না সুজনি তুমি এখান থেকে চলে যাও, তা নাহলে আমিই চলে যাচ্ছি।

সুজনি : গান
ওকি বন্ধুরে
আমারে ছেড়ে বন্ধু যাইও না রে।
হায় গো তুমি যাইবা দূর দেশে বন্ধু
আমারে ছাড়িয়া
ও রে বন্ধু আমারে ছাড়িয়া।
তুমি যাইবা দূর দেশে বন্ধু
আমারে ছাড়িয়া
তবে কেন এই অবলার সাথে করছো ভালবাসারে।
বন্ধুরে... রে।

আশরাফ : ঠিক আছে সুজনি তুমি এখন বাড়ি যাও।

সুজনি : তাই যাচ্ছি আশরাফ ভাই।

দশম দৃশ্য

সুজনির মা : এই সজনি, এদিকে আয়তো মা, আজ দুদিন হল তুই কিছুই খাসনি, তোর কী হয়েছে মা?

সুজনি : গান
কি শুনিব প্রাণের আম্মা গো
কি শুনিব আরো
আশরাফ গেল বাড়ি ছেড়ে গো মা
কোথায় গেলে পাব।
ছোট থেকে প্রাণের আম্মা গো
আশরাফকে ভালবাসি
লাথি মেরে ফেলে দিল মা
মারল বেতের বারি।

www.pathagar.com

মা : তুই আমার কাছে আয় মা, তোর কান্না আর সহ্য হয় না। যা করার আমি করবো। তুই আমার সঙ্গে এখন ঘরে চল।

বয়াতি : কোকিল ডাইকো নারে
আজি ঐ কদম ডালে।
আল্লা গো, আছিল যে সুজনি ছেরি গো
কান্দিতে লাগিলরে।
কোকিল ডাইকো নারে
আজি ঐ কদম ডালে।
আম্মা গো, দশ মাস দশ দিন মা
রাইখাছ উদরেরে।
কোকিল ডাইকো নারে
আজি ঐ কদম ডালে।
আম্মা গো দুঃখের কথা কইলাম আম্মা গো
আপনার কাছে রে।
কোকিল ডাইকো নারে
আজি ঐ কদম ডালে।

একাদশ দৃশ্য

স্থান : সুজনির ঘর
(সুজনির প্রবেশ)

সুজনি : তুমি তোমার ছবি রেখে কোথায় গেলে আশরাফ ভাই? আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না আশরাফ ভাই। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।

ভাবী : আরে ও সজনি, তুমি এখানে বসে আছো? আর আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কী দেখছিস, দেখি। একি তোর হাতে আশরাফের ছবি? ছি ছি ছি। আশরাফ হলো গরিবের ছেলে আর তুই হলি ধনীর দুলালী। ছি ছি ছি।

সুজনি : ও ভাবী গো ক্ষুধায় মানে না পান্তরে ভাত
ঘুমে মানে না শ্মশানঘাট
পিরীতে মানে না জাত আর বেজাতরে।

ভাবী : তুই একি করেছিস সুজনি। এই ফাঁদে তুই কেমনে পড়লিরে বোন তুই কেমনে পড়লি।

সুজনি : ভাবী, আমি লোকের মুখে শুনলাম আশরাফ নাকি পাঁচবাইর‍্যা চলে গেছে। ভাবী আমি সেখানে চলে যাব। আমি আশরাফকে ছাড়া বাঁচবো না ভাবী। আমি আশরাফকে ছাড়া বাঁচবো না।

ভাবী : সুজনি তুমি পাঁচবাইর‍্যা যেতে পারবে না। তুমি হলে যুবতী মেয়ে। তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না।

সুজনি : আমি যাইবো ভাবী আশরাফের কাছে গো।
আশরাফ আমার জানের জান

www.pathagar.com

আশরাফ আমার প্রাণের প্রাণ গো ভাবী
তারে না দেখিলে শুকায় আমার প্রাণ গো ।
আমি যাইবো ভাবী আশরাফের কাছে গো
আকাশের চান্দ রে যেমন
আশরাফ ভাইয়ের মুখ তেমন গো ভাবী ।
আমি যাইবো ভাবী আশরাফের কাছে গো ।

ভাবী : না না সুজনি, তুমি যেতে পারবে না । কারণ তুমি হলে যুবতি মেয়ে । পথে ঘাটে কত খারাপ লোকের আনাগোনা থাকে, তারা তোমার দিকে চোখ দিলে মান সম্মান কিছু থাকবে? তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর । ঐ পাড়ার এক ফকিনী চাচী আছে । তার কাছে একটা চিঠি লিখে দাও । সে ভিক্ষা করতে গিয়ে আশরাফের কাছে চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসবে ।

সুজনি : আমি তাই করবো ভাবি, আমি তাই করবো ।

ভাবী : চল সুজনি এবার আমরা ঘরে যাই ।
(সুজনি ও ভাবীর প্রস্থান । ভিখারিণীর প্রবেশ ।)

ভিখারিনী : যাই আজ দুইদিন ধরে ঘরে একমুঠ চাউলও নাই । যাই দেহি দুই চার গাও ঘুরে যদি কিছু পাই ।
(সুজনির প্রবেশ)

সুজনি : চাচী, ও চাচী, ঘরে আছ নাকি ।

ভিখারিনী : ওরে আল্লা সুজনি না? হাতির বাড়ি গরিবের পাড়া? তুই কিব্যায় আইলি?

সুজনি : আমি বিপদে পড়ে আইছি চাচী ।

ভিখারিনী : কী বিপদ অইল তোর আবার?

সুজনি : আশরাফ ভাই গেছে পাঁচবাইর্যা, সেখানে আশরাফ ভাইকে এই চিঠি টা দিয়ে আসবা । তোমাকে আমি এই ১০০ টাকাই দিলাম ।

ভিখারিনী : তর একশ ট্যাহার কাম বাচ্চে । তিন গাঁও ঘুরে এর চেয়ে বেশিই পামু ।

সুজনি : তুমি চিন্তা কইরো না, তুমারে আরো দিবো । তুমি পৌঁছাই দিয়ে আস ।

ভিখারিনী : কি যে কস তরা । আচ্ছা শোন সজনি মা, কি আর কমু, তর চাচা আমারে একটা বুলাউজও কিনে দিতে পারে নাই । তুই আমারে তোর বিয়ের সুময় একটা পাছা পাইর্যা শাড়ি দিস ।

সুজনি : আচ্ছা তাই দিব চাচী, তাই দিব ।
(সুজনির প্রস্থান)

ভিখারিনী : ধনী মানসের বেটি হলে কী হবে কিপটা আছে । যাই, আল্লায় যেদ্দুর নেয় সেদ্দুরই যামু ।
(ভিখারিনীর প্রস্থান । আশরাফের প্রবেশ । আশরাফ খেতের আইল দিয়ে হাঁটছে । ভিখারিনী চাচীর প্রবেশ)

www.pathagar.com

চাচী : ওডা কেরা? আমা গো আশরাফ না?

আশরাফ : চাচী, তুমি আইছ? আমার সুজনির কোন খবর জান?

চাচী : খবর নিয়েই আইছি বাবা? এই নে। (চিঠিটা বের করে দিবে। আপন মনে কথা বলতে বলতে চাচী প্রস্থান করবে। আশরাফ চিঠি নিয়ে পড়তে থাকবে। আশরাফ ভাই আজ ভোর রাতে তুমি আসবে আমার ঘরের পাশে। আমরা দুজন দূরে পালায়ে যামু।)

আশরাফ : ঠিক আছে সুজনি তাই হবে। আমি আইতাছি সুজনি। আমি আর ঐ বাঘু মুগুলকে ভয় পাই না। বাঘু মুণ্ডল কেন পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে আটকাতে পারবে না। আটকাতে পারবে না।

বয়াতি : আরে তেল ছাড়া বাতি জলে
বাঘু মিয়ার ঘরেতে
যায় গো আশরাফ বাঘুর বাড়িতে।
আর কতেক দূর হইতে আশরাফ আর কতেক দূর গেল
বাঘার বাড়ি যাইয়ে আশরাফ উপনীত হইল।
আরে তেল ছাড়া বাতি জলে
বাঘু মিয়ার ঘরেতে
যায় গো আশরাফ বাঘুর বাড়িতে।

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান : বাঘু মণ্ডলের বাড়ি
(আশরাফ চুপে চুপে এগিয়ে যায় সুজনির ঘরের জানালার পাশে। ডাক দেয় সুজনিকে।)

আশরাফ : সুজনি, সুজনি, সুজনি।
(সুজনির ঘুম ভাঙবে। আশরাফের ডাক শোনে বাইরে আসবে।)

সুজনি : আশরাফ ভাই।

আশরাফ : সুজনি।

সুজনি : আশরাফ ভাই তুমি এসেছো? আশরাফ ভাই।

আশরাফ : হ্যাঁ সুজনি। আমি এসেছি। চল সুজনি আর দেরি করা ঠিক হবে না।

সুজনি : তাই চল।
(চুপি চুপি হেঁটে উভয়ের প্রস্থান)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

স্থান : খেয়াঘাট
(মাহালির প্রবেশ। মাহালি খুড়িয়ে খুড়িয়ে হেঁটে নদীর বাতায় বসে। হাই তুলে। শরীর জুড়ে তার ঘুমের আবেশ।)

মাহালি : (হাই তুলে) আজকের রাতটা প্রচুর গরম। আজ আর বাড়ি যামু না নদীর বাতাতেই রাত কাটাইয়ে দিমু। ও আল্লাহ, ওম। আরামে

www.pathagar.com

ঘুমিয়ে পড়বে, নাক ডাকবে। ঘুমের ঘোরে মশা তাড়াবে, থাপ্পড় দিবে গালে পাছায়। এ সময় আশরাফ আর সুজনির প্রবেশ।)

আশরাফ : মাহালি ভাই, ও মাহালি ভাই (মাহালি নাক ডাকছে)। মাহালি ভাই, ও মাহালি ভাই।

মাহালি : (ঘুমের ঘোরে) কোন শালারে। (চোখ কচলিয়ে) কেড়া আশরাফ।

আশরাফ : হ, মাহালি ভাই আমি আশরাফ।

মাহালি : তোর সাথে ওডা কেড়া?

আশরাফ : সুজনি মাহালি ভাই। আমরা পালায়ে আইছি।

মাহালি : এ্যাঁ আমি তো আর নাই।

(মাহালি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। আশরাফ আর সুজনি ডাকবে, নদী থেকে পানি নিয়ে ছিটিয়ে দিবে।)

সুজনি : মাহালি ভাই, মাহালি ভাই।

মাহালি : তোদের এ বুদ্ধি কোন শালায় দিল।

আশরাফ : আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি মাহালি ভাই। আমি তোমাকে ১০০ টাকা দিচ্ছি তুমি আমাদেরকে পার করে দাও।

মাহালি : আমার ১০০ ট্যাহার দরকার নেই। আমি এহন ডাক দিমু বা... (আশরাফ মাহালির মুখ চেপে ধরবে। সুজনি ও আশরাফ দুজনই মাহালির পা জড়িয়ে ধরবে।)

মাহালি : তরা বুঝার চেষ্টা কর। বাঘা মুণ্ডল যদি শোনে যে আমার নৌকায় পার হইছস তাহলে আমাকে মেরে ফেলবে। (সুজনি ও আশরাফ গান গাবে।)

পার কর পার কর মাহালিরে
ও মাহালি পার কর আমারেরে
ঘাটের মাহালি মাহালিরে।
তুমি না পার করলে মাহালিরে
কি হবে উপায় ওরে মাহালি
মাহালিরে।

মাহালি : আচ্ছা উঠ। যা থাকে কপালে। উঠ নায়ে। এই মাঝিরা সবাই নৌকায় উঠ্। আকাশের অবস্থা ভাল না। জোরসে বইঠা মাইরো।

গান : ময়না উইরা যায়রে
ওরে সুন্দর ময়না
ময়না উইরা যায় তার ঘরে।
আইছ ভবে যাবারে কবে
যাবার মনে নাই।
করাল করিয়ারে আইছ
মালেক আল্লার ঠাঁইরে।
ময়না উইরা যায়রে

www.pathagar.com

ওরে সুন্দর ময়না
ময়না উইরা যায় তার ঘরে।
(দ্রুততালে) ঘোড়া জঙ্গম ছাড়া চলে না
পাগলা ঘোড়া লাগাম মানে না।
(নৌকা ঘাটে পৌঁছবে। মাহালি বলবে এই সবাই নাম আমরা ঘাটে আইসা পরছি। মাঝিরা নামবে। তারপর সুজনি ও আশরাফ নামবে।)

আশরাফ : আসি মাহালি ভাই। আমাদের বিয়েতে আইস। আর আমাদের জন্য দোয়া কইরো।

মাহালি : ঠিক আছে, তোদের প্রেম যেন কাঁঠালের আঠার মতো লেগে থাকে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্দশ দৃশ্য

স্থান : আশরাফের এক আত্মীয়ের বাড়ি
(সুজনি ও আশরাফের বিয়ের দৃশ্য। দুজনে বরকনে সেজে বসে থাকবে। গীত ও গান চলতে থাকবে। মেহমানদের আনাগোনা দেখা যাবে।)

গান : সুজনি সুন্দরির বিয়্যালো
সোনার চাক চালুন দিয়েলো।
তোরা হেলিয়া দুলিয়া চালুন খানি বর গো
মরি হায়রে।
কি ম্যান সেঁন্দূর আনছসলো
সিঅ সেঁন্দূরের রং কালা গো
তোরা হেলিয়া দুলিয়া চালুনখানি বর গো।
কি ম্যান বেশর আনছসলো
সিঅ বেশরের রং কালা গো
তোরা হেলিয়া দুলিয়া সোনার চালুন বর গো।
(কাজির প্রবেশ।)

কাজি : বেরাদরে ভাই ভগ্নি, মাতামাতি, পিটাপিটি, হাতাহাতি আসসালামু আলাইকুম। আপনেরা সবাই বিয়ে খাইয়্যা তো ভালই মোটা তাজা মাশআল্লা মাশআল্লা যা যা খায়ের উদ্দিন, বশির উদ্দিন।

জনৈক : আরে কাজি সাহেব নাকি। কাজি সাহেব, আসেন বসেন।

কাজি : কই, হেলে মেয়ে কই, যাদেরকে বিসমিল্লাহ আল্লাও আকবার করতে আইছি। তারা কই।

জনৈক : বিয়ে করাবার আইয়্যা আপনে জবাই করবেন? হায় হায় রে। কি ডাকাতি।

www.pathagar.com

কাজি : আরে বিয়ে, বিয়েই পরামু আপনে চিন্তা কইরেন না। তাগর কাছে আমারে নিয়ে চলেন।

জনৈক : এই যে ছেলে আর এই যে মেয়ে।

কাজি : (উল্টা দেখিয়ে বলবে) এই যে ছেলে আর এই যে মেয়ে।

জনৈক : আরে না না, এই যে ছেলে আর এই যে মেয়ে।

কাজি : ডেঙ্গারগর নিবাসী মো. লালমিয়ার ছেলে আশরাফ ১ লাখ ১ টাকা দেন মোহর দিয়া বিয়ে করতে আসিয়াছে, সুজনি মা বল কবুল।

সুজনি : (স্বভাব সুলভ লজ্জায়) কবুল।

কাজি : হালহামদু লিল্লাহি রব্বানা, ইয়া রব্বানা। আপনারা সবাই বলেন কবুল। হালহামদু লিল্লাহি রব্বানা, ইয়া রব্বানা। (কাজি মোনাজাত ধরবে) আল্লাহুম্মা আমিন। (কিছু আরবি ভাষার মত কিছু শব্দ উচ্চারণ করে) এই বিয়েকে তুমি কবুল কর। সুজনি ও আশরাফ তুমি মাফ করে দাও। তারা না জেনে না শোনে এই ফাঁদে পা দিয়েছে আল্লাহ, তাদেরকে তুমি কবুল করে নাও আল্লা। তাদের দুজনকে তুমি কাঁঠালের আঠা দিয়ে মজবুত করে জোড়াতালি দিয়ে রাইখো আল্লা। এদেরকে তুমি কাল কিয়ামতের সময় লাইলি মজনু, শিরি ফরহাদ, ইউসুফ জোলেখার কাতারে বসাইও ইয়া আল্লা আর সেদিন আমাদের মত কিছু গণ্যমান্য অসভ্যদেরকেও বিমুখ করিওনা আল্লা। (বিয়ের আসরে সবাই মোনাজাত ধরে সবাই কাঁদতে থাকবে। শেষে আরো কিছু অর্থহীন আরবি উচ্চারণ) হালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। (মোনাজাত শেষে) ভাই আমার পাওনা দাওনাডা কেরা দিব। ভাই তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন আমি একটু টাট্টি ঘরে যামু ভাই, জুলুম হইছে। (একজন এসে টাকা দিবে। টাকা নিয়ে কাজি প্রস্থান করবে।)

(কন্যা বিদায়ের পালা)

সুজনি : পিতা ছাড়লাম মাতা ছাড়লাম রে (২)
ছাড়লাম দেশের মায়া
কোথায় গেলে পাব আমি গো (২)
ও হায় দয়াল ভাইয়ের দেখারে
আহারে দারুণ বিধিরে।

আশরাফ : ঐ কথা কইও না সুজনি গো ২
সুজনি বলি যে তোমারে
আমার মায়ে দেখলে তোমায় গো
সুজনি তুইলা নিব কোলেরে
আহারে দারুণ বিধিরে।
কেন্দনা কেন্দনা সুজনি গো ২

www.pathagar.com

সুজনি কান্দিলে কী হবে
তোমায় লইয়া চইলা যাব গো ২
সুজনি ঢাকার শহরেরে
আহারে দারুণ বিধিরে।

তথ্যসূত্র : বয়াতি মো. বাবুল আক্তার বাবু, গ্রাম : খলসেকুড়ি (পশ্চিম ডেঙ্গারগড়), থানা-ইসলামপুর, জেলা-জামালপুর

৪. বেহুলা নাচাড়ি

চরিত্রসমূহ

চান্দু সদাগর, সাইমন সদাগর, রামসিংহ, মাস্টার, ঘটক, বেহুলা, লখিন্দর, সোনাই, কালু, মাঝি, বিশ্বকর্মা, ব্রাহ্মণ ও পদ্মাদেবী।

বন্দনা

আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
পরথমে বন্দনা গো করি আল্লাজির চরণেরে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
তারপরে বন্দনা গো করি রাসুলের চরণরে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
তারপরে বন্দনা গো করি ফাতেমার চরণরে।
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
তারপরে বন্দনা গো করি ইমাম আর হোসেনরে।
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
উত্তরে বন্দনা গো করি হিমালয় পর্বতরে
ওরে এইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
সেই দেশের হাওয়ায় গলে এই দেশের পাথররে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
পুর্বেতে বন্দনা গো করি ভানু বাদশার ঘররে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
একদিক হইতে উদয় গো ভানুর চৌন্দিকে পসররে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
দক্ষিণে বন্দনা গো করি ক্ষীর নদী সাগররে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
সেই সাগরে চালায় গো ডিঙ্গা সাহু সাদাগররে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
পশ্চিমে বন্দনা গো করি হজ মক্কার ঘররে
ওরে এইস পদ্মা মাগো বড়ই আমরে।
সেই ঘরেতে পড়ে গো নামাজ যত হাজিগণরে

www.pathagar.com

ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।

স্বর্গেতে বন্দনা গো করি স্বর্গের দেবগণরে
ওরে এইস পদ্মা মাগো বড়ই আসরে।
পাতাল বন্দনা গো করি বাসুকির চরণরে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
চারকোণা পৃথিবী গো বন্দি মধ্যে করলাম স্থানরে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড়ই

গানের ওস্তাদ বইন্দ্যা গাব ফজল মিয়া নামরে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।
এই আসরে গাব গো আমরা ভাসান যাত্রা গানরে
ওরে আইস পদ্মা মাগো বড় এই আসরে।

শিবের দেশভ্রমণের গান

ওকি হায়গো
যায়রে শিবরে দেশ ভরমন করিতে।
শিব যায়রে কৈলাসেতে
হায়গো রথে কইর‍্যা ভর
দুই ফোঁটা বীর্যের গো মনি
পইল সরলবনে।

পৈরনেতে নতুন গো ধূতি
আবার কান্ধে ভিক্ষার ঝুলি
হাতে ছাতা নৈয়্যাগে যায়রে
শিষ্যের না বাড়ি।
ওকি হায়গো
যায়রে শিবরে দেশ ভরমন করিতে।

পাখিদের আধার গ্রহণের গান

ওকি হায়গো
কানছে পাখি আধারের নাগিয়া।
পাখিগণে ডাইক্যারে বলে
ঐ পাখি রাজার কাছে
তিনদিন ধইর‍্যা খাইন্যা গো খানা
খেতে দেও আমারে।
ওকি হায়গো
কানছে পাখি আধারের নাগিয়া।

www.pathagar.com

পাখিরাজা ডাইক্যারে বলে
ঐ পাখিগণের কাছে
তোমরা যাইয়্যা কর গো আহার
সরল বনের মাঝে।
ওকি হায়গো
কানছে পাখি আধারের নাগিয়া।

পাখিগণে ডাইক্যারে বলে
ঐ পাখি রাজার কাছে
কি ম্যান আধার খাইলাম গো আমরা
অন্তর যায় জলিয়া।
ওকি হায়গো
কানছে পাখি আধারের নাগিয়া।
পাখির রাজা ডাইক্যারে বলে
ঐ পাখিগণের কাছে
ঐযে ওখানে কইরাছো গো আধার
সেইখানে যাও চইলে।
ওকি হায়গো
কানছে পাখি আধার খাইয়া।
ওকি হায় গো

পদ্মাদেবীর জন্মের গান

পদ্মার জনম বাসুকিনীর ঘরে।
পাতাতে থাকিয়ারে মনি
ঐ পাতালেতে গেল
ঐ বাসুকিনীর ঘরে গো যাইয়্যা
পদ্মার জন্নম হইল।
ওকি হায়গো
কানছে পাখি আধারের নাগিয়া।
পদ্মার জনম বাসুকিনীর ঘরে।

ছক্কি গান : (ফজল বয়াতি)
এই প্রেমের সাগরে কে দিল সাঁতার
যে দিল সাঁতার সে যে পাইল দিদার
শাহ জালাল বড়পির সিলেটের মাজার
এই প্রেমের সাগরে কে দিল সাঁতার।
যে জন দিয়াছে সাঁতার সে যে পাইল দিদার
শাহ জালাল বড়পির সিলেটের বাজার।
এই প্রেমের সাগরে কে দিল সাঁতার।

www.pathagar.com

সে যে পাইল দিদার, সে যে হইল নদীপার
শাহ জালাল বড়পির সিলেটের মাজার
এই প্রেমের সাগরে কে দিল সাঁতার।
যে দিল সাঁতার সে যে হয়ে গেল পার
হায়রে যে দিল সাঁতার সে যে হইল নদী পার
শাহজালাল বড়পির সিলেটের মাজার
এই প্রেমের সাগরে কে দিল সাঁতার।

যে দিয়াছে সাঁতার সে হইয়া গেল পার
শাহকামাল বড়পির ইসলামপুর মাজার
এই প্রেমের সাগরে কি দিল সাঁতার।
এই প্রেমের সাগরে কে দিল সাঁতার।

(চাঁদ সদাগরের প্রবেশ)

চান্দু সদাগর : সোনাই, সোনাই, আরে ও সোনাই।
সোনাই : হ্যাঁ স্বামী, আমাকে কিসের জন্যে ডাকছেন।
চান্দু সদাগর : আমি যাব দক্ষিণ সিংহলে বাণিজ্য করতে এজন্য তোমাকে ডাকছি।
সোনাই : তাহলে আমি কী করব স্বামী।
চান্দু সদাগর : তোমার কী মতামত?
সোনাই : রাজা বাদশরাইতো বাণিজ্য করতে যায়।
চান্দু সদাগর : তাহলে শোন, ট্যাকায়ে পাঁচ টাকা লাভ। তারপরে একজোড়া নারকেল।
সোনাই : তারপরে,
চান্দু সদাগর : তুমি অতিশীঘ্র পোলাপানকে সাজন কর। আমি চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরের সাজনের ব্যবস্থা করি।
সোনাই : তাহলে আমি আমার পুত্রদের সাজন করে নিয়ে আসি।
চান্দু সদাগর : তাই চল।
(চান্দু সাদাগর, কর্ণধার মাঝির বাড়িতে গেল তাকে ডাকতে)
চান্দু সদাগর : কর্ণধার মাঝি, কর্ণদার মাঝি, আরে ও কর্ণধার মাঝি বাড়িতে আছে নাকি? (হন্ত দন্ত হয়ে কর্ণধার মাঝি বেরিয়ে আসবে, তার চোখে ও দেহে ঘুম ঘুম ভাব গান ধরবে কর্ণধার মাঝি।)
মাঝির গান : কর্ণধার কর্ণধার বলে কে ডাকিল মোরে হে (২)
কর্ণধার কর্ণধার বলে।
আইল্যা ঝাইল্যা পটাইয়িলাম যা করে খোদায়েরে
কর্ণধার কর্ণধার বলে কে ডাকিল মোরে হে
কর্ণধার কর্ণধার বলে।
কি বলিব দুঃখের কতা দুঃখে মইর্‌্যা গেলামরে।
কর্ণধার কর্ণধার বলে কে ডাকিল মোরে হে

www.pathagar.com

কর্ণধার কর্ণধার বলে ।
অতি সুখে শুইয়্যাছিলাম নাইলে ক্ষেতের আইলেরে
কর্ণধার কর্ণধার বলে কে ডাকিল মোরে হে
কর্ণধার কর্ণধার বলে ।
বড় সুখে শুইয়্যা ছিলাম গিন্নিবুকে নিয়েরে ।
কর্ণধার কর্ণধার বলে কে ডাকিল মোরে হে
কর্ণধার কর্ণধার বলে ।

চান্দু সদাগর : শোন কর্ণধার মাঝি, আমার চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর । ঐ কালিদহ সাগর থেকে উঠানোর ব্যবস্থা করে দেও । আমি যাব ঐ দক্ষিণ সিংহলে বাণিজ্য করতে ।

মাঝি : তাই নাকি সদাগর মহাশয় ।

চান্দু সদাগর : হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! তাই ।

মাঝি : কিন্তু আমি যে এই বৃদ্ধ বয়সে এ কাজ করতে পারবো না সদাগর মহাশয় ।

চান্দু সদাগর : তোমাকে করতেই হবে কর্ণধার মাঝি ।

মাঝি : আমি কী করে করি, সওদাগর মশায় ।

চান্দু সদাগর : এ কাজ তুমি না করলে অন্য কেউ করতে পারবে না ।

মাঝি : তাহলে এ কাজ আমাকে করতেই হবে?

চান্দু সদাগর : হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! তোমাকে একাজ করতেই হবে ।

মাঝি : তাহলে বেতন?

চান্দু সদাগর : তোমাকে উপযুক্ত বেতন ও পুরস্কারই দিবো । তবে তুমি কত চাও?

মাঝি : আমি তো একা পারবো না । আমার সাথে আমার নাতি ছেরা আছে । তাকে সঙ্গে নিবো এবং বেতন আমাকে উচিত মত দিতে হবে ।

চান্দু সদাগর : আমি তাই দিবো । তোমার কাজ তুমি শুরু কর ।

মাঝি : আমি তাই শুরু করি, দেখি আমার নাতি ছেরাডা বাড়িতে আছে কিনা । ছেরাডা খুবই ভেজাইল্যা সময় থাকে সময় বাড়িতে থাকে না । একটা ডিম পাইলে ইস্টিশনে নিয়্যা বেইচ্যা বিড়ি কিন্যা টাইন্যা খায় । বিড়ির পুটকি থাক আর না থাক টানতেই থাকে । যাই হোক আগে নাতি ছেরাডাকে ডাকি । এই ঐ ছেরা, কালু, আরে ঐ কালু ।

কালু : ও দাদা দাদা?

মাঝি : তোরে ডাকতাছিনা, তুই কই থাহস ঐ ছেরা ।

কালু : দাদা একটু ঐ পাড়ে গেছিলাম ।

মাঝি : ক্যা কি জন্য?

কালু : বুটকালাই কিনব্যার গেছিলাম দাদি খাবার চাইছে ।

মাঝি : তোর দাদি খালি খাবারই চায়, খালি খাবারই চায় । হুন আমাগরে উত্তরপাড়ার ঐ সদাগর আছে না?

www.pathagar.com

কালু : ঠসা মুগুল তো মইর‍্যাই গ্যাছে গা হুনছি।
মাঝি : ঠসা না ঠসা না ঐ সদাগর। চান্দু সদাগর।
কালু : কী দিবো?
মাঝি : অ্যা তোমারে কি দিবো, ট্যাকা দিবো পয়সা দিবো।
কালু : আমার বেতন দিবে ক্যারা।
মাঝি : আচ্ছা আচ্ছা বেতনও দিবো। এহ্ন আয়।
গান : ওরে যায়রে কর্ণধার কালিদহ্ সাগরে
ওকি হায়রে যায়রে কর্ণধার কালিদহ্ সাগরে।
গান : ডিঙ্গা ভাসিলরে ভাসিলরে
কালিদহ্ সাগরে ডিঙ্গা ভাসিলরে।
পরথমে ভাসিল ডিঙ্গা নামে মধুকর
ডিঙ্গা ভাসিলরে ভাসিলরে
কালিদহ্ সাগরে ডিঙ্গা ভাসিলরে।
ছয়মাইল দূরে থাইক্যা দেখা যায় তার গলুই
ডিঙ্গা ভাসিলরে ভাসিলরে
কালিদহ্ সাগরে ডিঙ্গা ভাসিলরে।
ওরে তারপর ভাসিল ডিঙ্গা নামে খালইপেঁচা
ডিঙ্গা ভাসিলরে ভাসিলরে
কালিদও সাগরে ডিঙ্গা ভাসিলরে।
মাঝি : কোথায় কোথায় সদাগর মশায়?
চান্দু সদাগর : কী হল কর্ণধার মাঝি, তোমার কাজ শেষ হয়েছে?
মাঝি : অবশ্যই শেষ হয়েছে। চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর সাজন করা হয়ে গেছে। আপনি আপনার ছয়পুত্র নিয়ে সাজন করে আসেন। আমরা মাঝি... প্রস্তুত। আপনি চলে আসেন।
চান্দু সদাগর : তুমি এখানে দাঁড়াও আমি এখনই ব্যবস্থা করছি। সোনাই সোনাই, চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর প্রস্তুত। অতিশীঘ্র তোমার পুত্রদের সাজন করে নিয়ে আইস।
সোনাই : নেন এই যে আমি আমার পুত্রদের সাজন করে নিয়ে আইছি।
চান্দু সদাগর : তাহলে কোথায় কর্ণধার মাঝি? তুমি এখনই যাত্রা কর। দক্ষিণ সিংহলে বাণিজ্য করতে।
গান : ডিঙ্গা ছাড়িলরে ছাড়িলরে
কালিদহ্ সাগরে ডিঙ্গা ছাড়িলরে।
এই যে ছয়পুত্র নিয়্যা সদাগর বাণিজ্যতে যায়
ডিঙ্গা ছাড়িলরে ছাড়িলরে
কালিদহ্ সাগরে ডিঙ্গা ছাড়িলরে।
আর কতেক দূর যাইয়্যা সদাগর ত্বরিত গমন

www.pathagar.com

ডিঙ্গা ছাড়িলরে ছাড়িলরে।
কালিদহ সাগরে ডিঙ্গা ছাড়িলরে।

পদ্মাদেবী : কিহে সদাগর। কালিদহ সাগর দিয়ে তুমি যাও বাণিজ্যে। আমার পূজার ব্যবস্থা কি করে এসেছ?

চান্দু সদাগর : তুমি কি পদ্মা?

পদ্মাদেবী : হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমি পদ্মা। পূজার কি করেছ তাই বল।

চান্দু সদাগর : পূজা তো দূরের কতা একটা সিদুঁরের ফোটাও দিব না।

পদ্মাদেবী : যদি তুমি সিঁদুরের ফোটাও না দেও তাহলে এই কালিদহ সাগর দিয়ে বাণিজ্যে যেতে দিব না।

চান্দু সদাগর : তাই নাকি? তাহলে আমিও দেখে নেব।

পদ্মাদেবী : দেখ সদাগর আমি পূজার জন্য তোমাকে কাকুতি মিনতি করছি। পূজা না দিয়ে কোনভাবেই বাণিজ্যে যেতে পারবা না। কারণ এ কালিদহ সাগরের মালিক আমি নিজে। তাই আমি তোমাকে বলছি আমার পূজা দিয়ে বাণিজ্যে যাও। তা না হলে তোমার অমঙ্গল হবে।

চান্দু সদাগর : বলেছি তো পূজা তো দূরের কতা, একটা সিঁদুরের ফোটাও দিব না।

পদ্মাদেবী : তাহলে তুমি জেনে রাখ, আমি তোমার বংশ নির্বংশ করে দেব। তাই আমি তোমাকে আবার বলছি আমাকে পূজা দিয়ে বাণিজ্য করতে যাও।

চান্দু সদাগর : অসম্ভব যে হাতে পূজেছি আমি শিবকে, সে হাতে পূজব না ব্যাঙ খাইক্যা কানিকে।

পদ্মাদেবী : সদাগর তুমি জান না আমি কে। যদি বাহুবলে চাও বাণিজ্য যেতে, তাহলে আমিও দেখে নেব কত শক্তি আছে তোমার বাহুতে।

চান্দু সদাগর : আমিও দেখে নেব।

গান : চান্দু সদাগর বাণিজ্যে যায়
হায়রে মাঝি মাল্লা রঙের বৈঠা বায়।
ওরে চান্দু সদাগর বাণিজ্যে যায়
হায়রে মাঝি মাল্লা রঙের বৈঠা বায়।

চান্দু সদাগর : সাবধান হওরে ও পদ্মাদেবী
পদ্মাকে মারিব বলে আশা ছিল মনেরে
ওরে সাবধান হওরে ও পদ্মাদেবী।

পদ্মাদেবী : সাবধান হওরে চান্দু সদাগর
চান্দুকে মারিব বলে আশা ছিল মনেরে
ওরে সাবধান হওরে চান্দু সদাগর।

চান্দু সদাগর : ওরে সাবধান হওরে ও পদ্মাদেবী।

গান : ডিঙ্গা টলমল করেরে ডিঙ্গা টলমল।
ডিঙ্গা টলমল টলমল করেরে।
ডিঙ্গা টলমল।

www.pathagar.com

পদ্মাদেবী : আরে ও চান্দু সদাগর, তোমার তো বাহাদুরি শেষ। তোমাকে আমি বলে দিলাম আমাকে পূজা না দিয়ে বাণিজ্যে যেতে পারবা না। গানের জোরে বাণিজ্য করতে এসেছো। তাই তোমার চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর এবং ছয়টি পুত্র এই কালিদহ সাগরে নিক্ষেপ করে দিয়েছি। তোমার নৌকার পাটাতন ধরে কোনমতে বেঁচে তোমার দেশে চলে যাও। কারণ তোমাকে যদি মেরে দেখি, খেলা করবো কার সাথে। তাই জীবিত রেখেছি তোমাকে।

চান্দু সদাগর : যা হবার হয়েছে। আমার দেহে এক ফোটা রক্ত থাকতে পূজা তো দূরের কথা তোমাকে আমি সিঁদুরের ফোটাও দিব না, সিঁদুরের ফোটাও না। (চান্দু সদাগরের আলুথালু বেশ। রাখালরা পাগল মনে করে ঢিল ছুঁড়তে থাকলে চান্দু গান গাবে)

চান্দুর গান : আমায় ডেলাইসনেরে রাখালগণ
ওরে ছয় পুত্রের শোকে আমি
হইয়াছি পাগল।
তোমরা কোন দেশের সখিগণ
আমরা এদেশের সখিগণ
ওরে কোন বা রাস্তায় যাব আমি
চাম্পাইনগর।
তোমরা কোন দেশের রাখালগণ
আমরা এই দেশের রাখালগণ।
কোন বা রাস্তায় যাব আমি
চাম্পাইনগর।
ওরে চিনি না চিনি না আমরা
চাম্পাইনগর।

চান্দু সদাগর : এই ছিল আমার ভাগ্যের লেখা। এই অন্ধকার রাতে আমি কেমন করে যাব ঐ চাম্পাইনগরে। কেমন করে যাব। এই রাত এখানেই কাটাতে হবে। সকাল হলে রাস্তা খুজে বের করে যাব চাম্পাইনগর।

সোনাই : আমি ভাবতাছি বসে বসে। আজ ছয়মাস গত হয়ে গেছে। আমার স্বামী গেছে লঙ্কার বাণিজ্যে। বাড়ির সামনে কলার বাগান। এ কলার বাগানে পাহারা বসাতে হবে। না হলে কলা চোরে গেলে স্বামী কে কী জবাব দিব। এ জন্য দুজন পাহারাদার ডেকে আনাই।

কোথায় : রামসিং, কোথায় রামসিং, ও রামসিং।

রামসিং : গান
রামসিং জমাদার বলে কে ডাকিল মোরে হে
রামসিং জমাদার বলে।
খিদ্যার জ্বালায় জ্বইলা মরি
হারমনি বাজাইয়্যরে।

www.pathagar.com

রামসিং জমাদার বলে কে ডাকিল মোরে হে
রামসিং জমাদার বলে।
অতিসুখে শুইয়্যা দিলাম গিন্নি বুকে নিয়েরে
রামসিং জমাদার বলে কে ডাকিল মোরে হে
রামসিং জমাদার বলে।

সোনাই : তোমার গান শোনার জন্য ডাকি নাই। আমি ডাকছি কলার বাগান পাহারা দিতে।

রামসিংহ : পাহারা দিতে?

সোনাই : হ্যাঁ, তোমায় আমি উচিত মূল্য দিব।

রামসিংহ : তাই নাকি? তবে সাউ সদাগরের বাড়িতে আসলে আমাদের নিয়ে দুই একটি গান হইয়েই থাকে।

গান : অতি সুখে শুইয়্যা দিলাম নাইল্যা ক্ষেতের বাতরে।
রামসিংহ জমাদার বলে।
কে ডাকিল মোরে হে।

রামসিংহ : আরে ও রানিমা।

সোনাই : হ্যাঁ।

রামসিংহ : তাহলে কী করতে হবে।

সোনাই : আমার ঐ কলার বাগান পাহারা দিতে হবে।

রামসিংহ : আরে ও রানিমা।

সোনাই : হ্যাঁ।

রামসিংহ : তাহলে কী করতে হবে।

সোনাই : আমার ঐ কলার বাগান পাহারা দিতে হবে।

রামসিংহ : কলার বাগান পাহারা দিতে হবে?

সোনাই : জি।

রাম : আমার তো ভয় করে মা, বুড়া বয়সে।

সোনাই : ভয় করলেও পাহারা দিতেই হবে।

রামসিংহ : দিতেই হবে।

সোনাই : আমার যে সদাগর গেছে ছয় মাস ধরে বাণিজ্যে। আমার সদাগর এখনও ফিরে আসেনি। তাই আমার কলার বাগান ঠিকমত পাহারা দিতে হবে।

রাম : ঠিকই পাহারা দিব তবে আমার বেতন দিতে হবে।

সোনাই : আমি তোমার বেতন ঠিকই দিব। তুমি যে বেতন চাও আমি তাই দিব।

রামসিংহ : শুধু বেতন না একটা লাইট দিতে হবে।

সোনাই : লাইটও দিব।

রামসিংহ : আমার সাথে আমার একটা নাতি ছেরা আছে। তাকেও বেতন দিতে হবে।

www.pathagar.com

সোনাই : আচ্ছা ঠিক আছে। তাকেও বেতন দিব।

রামসিংহ : তাহলে আমি ভাল করে পাহারা দিব। ভালো করে পাহারা দিব। দেখি আমি নাতি ছেরাডাকে ডাকি। ও নাতি ছেরা ঐ ছেরা। দেখি, দেখি কলার বাগানে কে যাচ্ছে। একি, একি শালা চোরা, কলার বাগানে কলা চুরি করে খাও আর বিচি বিচি হাগ। হাগতে হাগতে কলার বাগানটাকে তো শেষ করে দিয়েছ। এবার চোরাকে ধরেছি। চল রানিমার কাছে।

চান্দু সদাগর : (গান)
ওরে আর সহে না বন্ধনের গো জ্বালা
চোর নহে চোর গো নহে
আমি সদাগররে
ওরে আর সহে না বন্ধনের গো জ্বালা।

সোনাই : একি রামসিং, তুমি কাকে ধরে এনেছো? এতো আমার সদাগর।

চান্দু সদাগর : সোনাই সোনাই, আমি যে তোমার কাছে কোন জবাব দিতে পারবো না সোনাই।

সোনাই : কেন তোমার এ অবস্থা সদাগর।

চান্দু সদাগর : আমার দুঃখের কথা শোনলে সদাগর।

চান্দু সদাগর : আমার দুঃখের কথা শুনলে সোনাই তুমিও স্থির থাকতে পারবে না সোনাই। আমি যে সাহস পাচ্ছি না সোনাই আমার দুঃখের কথা বলতে। কারণ তোমার ছয়পুত্র আর চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর ঐ সাগরে নিক্ষেপ হয়ে গেছে।
(সোনাই চান্দু সদাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে)

সোনাই : একি শোনাইলেন সদাগর?

গান : আমায় কি শোনইল্যা সদাগর ছয়পুত্রের শোকে আমি হইয়াছি পাগল। আমায় কি শোনইল্যা সদাগর।
(গান চলতে থাকবে)

চান্দু সদাগর : তুমি শান্ত হও সোনাই। আমার চোখের সামনে আমার ছয়পুত্র আর চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর একসাথে ঐ কালিদহ সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ দৃশ্য আমি সইতে পারছি না সোনাই। তুমি শান্ত হও। চল আমরা প্রসাদে ফিরে যাই।

বয়াতি : (ছক্কি গান)
ওরে আশ্বিন মাসে কাটিলাম সুইতা
কার্তিক মাসের পহেলা।
বাড়ির বুগলে নতুনডে তাতুইয়্যা
শাড়িখান বুইন্যাইয়্যা দে।
একদিন বউ গেল তাতেইয়্যার বাড়িতে
তাতেইয়্যা মনে মনে গোসাইছে

www.pathagar.com

কি বা রঙ্গের বুইনেব শাড়ি
বউমা দেখাইয়া দে।
আশ্বিন মাস ... দে।
সেই শাড়ি পরিয়া বউমা
গেল গোলাপগঞ্জের বাজারে
গোলাপের বাজারে গোলাপির ব্যাপারি
অঞ্চল টানিয়াছে
শ্বশুর আমার গেরামের মাতব্বর
ভাসুর আমার দেওয়ানি
তাগরে হুকমে আইসাদি বাজারে
অঞ্চল ছাড়িয়া দে।

চান্দু সদাগর : ঠাকুর মশায়, ঠাকুর মশায় আরে ও ঠাকুর মশায়। বাড়িতে আছেন নাকি?

ব্রাহ্মণ : হ হ হ, কেন ডেকেছেন আমায়। নমস্কার নমস্কার।

চান্দু সদাগর : আশীর্বাদ আশীর্বাদ। তোমাকে যে স্মরণ করেছি একটা বিশেষ দরকারে।

ব্রাহ্মণ : কেন কী দরকার হয়েছে আপনের।

চান্দু সদাগর : আমাদের সংসারে কোন পুত্র কন্যা নেই। তুমি গণনা বাছাই করে দেখ। আমার সোনাইর গর্ভে কোন সন্তান আছে কিনা।

ব্রাহ্মণ : ও তাই করতে হবে নাকি। আচ্ছা আমি তাই দেখবো। আমি খাতাপত্র নিয়ে গণনা করে দেখি আপনার ঘরে সন্তান আছে কি না।

চান্দু সদাগর : ঠিক আছে তাই হোক তোমাকে আমি উপযুক্ত পুরস্কারই দিবো। যদি আমার গর্ভে কোন সন্তানাদি থাকে।

ব্রাহ্মণ : ও ও সদাগর মশায়। হ্যাঁ পেয়েছি, পেয়েছি।

চান্দু সদাগর : কি পেয়েছ তা খুলে বল।

(গান) : ওরে কি ম্যান হাওয়া লাগল রানির গায়।
এক মাস দুই গো মাস তিন মাস হইলরে।
ওরে কি ম্যান হাওয়া লাগল রানির গায়।
তিন মাস চার গো মাস পঞ্চমাস হইলরে
ওরে কি ম্যান হাওয়া লাগল রানির গায়।
পঞ্চমাস ছয় গো মাস সাত মাস হইলরে।
ওরে কি ম্যান হাওয়া লাগল রানির গায়।
সাত মাস আট গো মাস নয় মাস হইলরে।
ওরে কি ম্যান হাওয়া লাগল রানির গায়।
দশ মাস দশ গো দিন ছেলে ভূমেতে পড়িলরে
ওরে কি ম্যান হাওয়া লাগল রানির গায়।
শোনেন গো সদাগর খুশির অই খবর

www.pathagar.com

আপনের ঘরে নাইছে গো জনম স্বর্ণের লখিন্দররে
শোনেন গো সদাগর খুশির অই খবর।
দেখিলে ছাইলের মুখ চান্দের মুখ হেরিরে
শোনেন গো সদাগর খুশির অই খবর।
আপনাকে দিলাম খুশির গো খবর
আমার দিবেন কিও গো।
শোনেন গো সদাগর খুশির অই খবর,

চান্দু সদাগর : বেশ ভাল কথা। তুমি আমার যে সংবাদ শোনিয়েছ তার জন্য মন থেকে একটা ফুলের মালা দিয়ে দিলাম।

গান : ওকি হায় গো
সদাগর মিয়া বড়ই ভাগ্যমান।
চাম্পাইনগরে চান্দুরে সদাগর
ও বড়ই ভাগ্যমান
ও দাসির মুখে খবর গো শুইন্যা
মালা করল দান।
ওকি হায় গো
সদাগর মিয়া বড়ই ভাগ্যমান।
চান্দু করলেন মালা দান গো ও ও
আমি দিব কি অ।
রেশমি রুমাল দিয়ে মুছায়ে দিব মুখ
ওকি হায় গো
সদাগর মিয়া বড়ই ভাগ্যমান।

চান্দু সদাগর : মাস্টার সাহেব, মাস্টার সাব, স্কুলে আছেন?

মাস্টার : ইয়েস, আছি।

চান্দু সদাগর : তাহলে আমার পুত্র স্বর্ণের লখিন্দরকে আপনের স্কুলে ভর্তি করার জন্য এসেছি। আপনের কি মতামত।

মাস্টার : আচ্ছা ভালোকথা। পরীক্ষার ফিস অইল ১২ টাকা, ভর্তির ফিস অইল ১৬ টাকা এই মোট ২৮টি টাকা নিয়ে আইসেন। তাহলে স্বর্ণের লখিন্দরকে ভর্তি করে নিবো।

চান্দু সদাগর : ঠিক, বেশ, আপনকে আমি তাই দিবো।

মাস্টার : তাহলে আপনর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি কইর‍্যা থুইয়্যা যান।

চান্দু সদাগর : ঠিক আছে। এই যে আমার ছেলেকে আপনার স্কুলে ভর্তি কইর‍্যা থুইয়্যা গেলাম। আপনার নিজের ছেলের মতো, স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে মানুষ করে তুলবেন, এই আমার আবেদন।

বয়াতি : যাই হোক, স্বর্ণের লখিন্দরকে ভর্তি করাইয়্যা রাইখ্যা গেলে, পড়া পারে না বিধায় তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বের করে দিল স্কুল থেকে। লখিন্দর বলছে আমি এখন উপায় করি কী? আমি আজ বাড়িতে যাইয়া ভাত খাব না, মায়ের কথাও শোনব না তালা চাবি মাইর‍্যা শুব,

www.pathagar.com

আমার বাপ যে পথে গিয়েছে। আমিও সেই পথে যাবো, না হলে ঘরের দরজা আর খুলব না। আমি লঙ্কার বাণিজ্যে যাব। যাবার পথে মাস্টার সাবকেও বলে যাই।

লখিন্দরের গান : আমার বের করে দেয় স্কুল হইতে
কি অপরাধ করছি গো মাস্টার
ক্ষমা করেন মোরে গো
আমায় বের করে দেয় স্কুল হইতে
বাড়িত যাইয়্যা মাকে বলবো
যাব বাণিজ্য করতে
আমায় বের করে দেয় স্কুল হইতে।

বয়াতি : লখিন্দর বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়িতে যাইয়্যা কোন কাজ করিলেন? যাইয়্যা পালঙ্কে শুইয়া পড়লেন। তার দাদিমা ছিল। দাদি পড়াপড়শি ছেরাছেরিদের বলতেছে, কিরে আমার নাতি স্কুলে গেছে, সে কি আসে নাই? তারে যে দেখি না, সে কোথায়? কয় তোমার নাতি তো বেলা থাকতেই আইয়্যা পড়ছে। ঘুরতে ঘুরতে যাইয়্যা দেখে যে ঘরের দরজা মাইয়্যা শুইয়্যা রইছে। দাদি ডাকতেছে আরে লখাই তুই কেন শুইয়ে আছস। লখাই বল, দাদি ও কথা বইল না, আমাকে মাস্টার সাব ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে। দাদি বলে, বের করে দিছে, এহন কি করণ যাব। লখাই বলে, আমি লঙ্কার বাণিজ্যে যাব। যদি যেতে না দাও, ভাতও খাব না দরজাও খুলব না। দাদিমা বলল দেখা যাক কী করা যায়। তখন আবার কর্ণধার মাঝিকে নিয়ে আয়োজন করল লঙ্কার বাণিজ্য যাবার। ধীরে ধীরে যায় লখাই ত্বরিত গমন, সামনেতে যাইয়্যা লখাই দিল দরশন। আর কিছুদর যাইয়্যা দেখিবানি পায় কলসি কাক্ষে পঞ্চদাসীসহ সুন্দরি জল ভরিতে যাইতাছে তাই দেখা যায়।

গান : কলসি কাক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যার যমনুার ঘাটে করে
ওরে কলসি কাক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাক্ষে।
আগে পিছে পঞ্চ না দাসী
হায়রে মদ্দে বেহুলা সতীরে
ওরে কলসি কাক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাক্ষে।
ঐ পঞ্চদাসি লইয়্যারে বইল্যা
হায়রে যায় যমুনারা ঘাটেরে

www.pathagar.com

ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে।
পাতা জলে নাইম্যা না বেইল্যা
হায়রে পাতা মাঞ্জন করেরে।
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে।
•হাঁটু জলে নাইম্যা না বেইল্যা
হায়রে হাঁটু মঞ্জন করেরে।
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে।
কোমর জলে নাইম্যা না বেইল্যা
হায়রে কোমর মাঞ্জন করেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে।
গলা জলে নাইম্যা না বেইল্যা
গলা মাঞ্জন করেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে।
মাথা জলে নাইম্যা বেইল্যা
হায়রে সাঁতার না খেলেরে।
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে।
ও ওপার তনে ভরায়ে কলসি তার
হায়রে মিষ্টি মিষ্টি হাসেরে।
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে লইয়ারে বেইল্যা
যায় যমুনার ঘাটেরে
ওরে কলসি কাঙ্ক্ষে।

বড়শি ফেলার ঘটনা

বয়াতি : স্বর্গের লখিন্দর দাসী-বান্দিসহ একটি মেয়ে দেখিবার পায়। এই পার তনে মাঝি মাল্লারে বলছে ও মাঝি ভাই, তোমরা নৌকা ঐ ঘাটে চাপাও। মাঝিরা বলল, আমরা তাই করতাছি। নৌকা ঘাটে চাপাল।

www.pathagar.com

বেইল্যা দাসি বান্দি নিয়ে চলে গেলেন। লখিন্দর ভাবল আজ তো চলে গেল, দেখি কোথায় যায়। পরের দিন সকাল বেলা নাস্তাপানি খাইয়্যা লখিন্দর কোন কাজ করিল। পাড়ার মাঝে যাইয়্যা সান্দইল। পাড়ার ভিতর যাইয়্যা দেখিবার পায়। বাঁশ গাছের আগালে কইঞ্চ্যা আছে তাই দেখা যায়। কইনচ্যা দেখিবার পায়, দাও একটা হাতে নিয়্যা কইনচ্যা কাটল, তাই দেখা যায়। কঞ্চি কাইট্যা বড়শির শিপ বানাইল, শিপ্প বানাই নিয়া ঐ ঘাটে পাইনছে গেল। তখন দাসী-বান্দি নিয়ে সুন্দরি কুমারি চান করবার নাইগে আসল।

গান : পান মুখে স্বর্ণের কলসি কাঙ্ক্ষে
বেইল্যা যায় যমুনার ঘাটে।
আগে দাসি পিছেও দেখি দাসী গো
আবার মধ্যে বেইল্যা সতী গো।
পান মুখে স্বর্ণের কলসি কাঙ্ক্ষে
বেইল্যা যায় যমুনার ঘাটে।
আর কত দূরে যাইয়্যা বেইল্যা সতী গো
বেইল্যা পঞ্চদাসী লইয়্যা গো
পান মুখে স্বর্ণের কলসি কাঙ্ক্ষে
বেইল্যা যায় যমুনার ঘাটে।
দুলিতে দুলিতে যায় বেইল্যা সতী গো
বেইল্যা গেল জলের ঘাটে
পান মুখে স্বর্ণের কলসি কাঙ্ক্ষে
বেইল্যা যায় যমুনার ঘাটে।

বয়াতি : যাই হোক বেহুলা সুন্দরি ঘাটে যাইয়্যা পৌনছিল। পৌনছে দেখিবার পায়, সুন্দর একটা পুরুষ বইস্যা তাই দেখা যায়।

বেহুলা : ও পুরুষ
লখিন্দর : ও
বেহুলা : তুমি এখানে ক্যান?
লখিন্দর : বড়শি বাইতাছি।
বেহুলা : বড়শি বাইতাছ।
লখিন্দর : হ বড়শি বাইতাছি।
বেহুলা : এ ঘাট থেকে হইর‍্যা অন্য ঘাটে যাও।
লখিন্দর : আমি অন্য ঘাটে যাইতে পারমু না। এইডাই ঘাট।
বেহুলা : এড্যা কি তোমার বাপের ঘাট?
লখিন্দর : না তোমারাই বাপের ঘাট?
বেহুলা : তাহলে দাসী চল আমরা অন্য ঘাটে যাই।
লখিন্দর : আমি ঐ ঘাটেই যাব।
বেহুলা : এড্যা কি ব্যা লোকরে?

www.pathagar.com

(গান)

বেহুলা : তুমি ওদিকে সইর‍্যা ফেলাও না বংশী ভাল লখাইরে।
লখিন্দর : তুমি ওদিক সইর‍্যা ভরাও না কলসি ভাল কন্যা হে।
বেহুলা : তোমার বংশীর খুট যেন নাগে না আমার কেশেতে ।
লখিন্দর : তোমার কলসির ঢেউ যেন নাগে না
আমার বড়শিতে।
যেইনা সতী অসতী হবে গো
জলের ঘাটেরে।
আমি ভাইঙ্গা দিছি মাটির কলসি
আমি দিব স্বর্ণের কলসি হে।
বাড়িতে গেলে গালি না দিব গো
বেইল্যার মাইয়ে হে।
বাড়িত গেলে গালি না দিব গো
আমার বাপে হে।
ভাইঙ্গ্যা দিছি মাটির কলসি
দিব স্বর্ণের কলসিরে।
বেহুলা : তাহলে দাসী চল আমরা বাড়িত চইল্যা যাই।
এখানে কোন কুমার বাড়ি নাই।
লখিন্দর : হ্যাঁ ঐ যে, সীতারাম পালের কুমার বাড়ি। ওখানে যাইয়্যা কলসি বানাতে পারো। ও সীতারাম সীতারাম পাল বাড়িত আছো নাকি।
(সীতারাম মঞ্চে প্রবেশ এবং গান)
সীতরাম সীতরাম বলে কে ডাকিল মোরে হে (২)
সীতরাম সীতা রাম বলে।
এই অতিসুখে শুইয়্যা ছিলাম গিন্নি বুকে লইয়্যারে
সীতারাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
আরেক সুখে শুইয়্যাছিলাম মালগাড়ির তলেরে
আরেক সুখে শুইয়্যাছিলাম নাইল্যা খেতে যাইয়্যা রে।
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
নাইল্যা খেতের ফাইল্যা মাতা কী ম্যান জাইরার জাইর‍্যারে
এই পুটকির মাঝে দিছে কামুড় মাতা ফুইল্যা গেছেরে।
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
বেহুলা : আরো সীতারাম আমি তোমাকে গান গাইতে ডাকি নাই।
সীতারাম : কিয়ের জন্য ডাকছেন?
বেহুলা : আমার একটা পাতিল বনাইয়্যা দিতে হবে।

www.pathagar.com

(গান) : বৈশাখ মাস চাক ঘুরে না হইয়াছে বেতালরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
বৈশাখ গেল জৈষ্ঠ্য গেল আষাঢ় গেল শুইয়্যারে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
শাওন গেল, ভাদ্র গেল আশ্বিন গেল বেড়াইয়্যারে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
কার্তিক গেল আগুন গেল পুষ গেল খাড়াইয়ারে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
মাঘ গেল ফালগুন গেল ফিরে বৈশাখ আইলরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
এই বৈশাখ মাসে চাক ঘুরে না হইয়াছে বেতালরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।

সীতারাম : শোন, বৈশাখ মাসে তো চাক ঘুরে না।
বেহুলা : আমার তো এই পাতিল বানাইয়া দিতেই হবে।
সীতারাম : বানাইয়্যা দিতেই হবে?
বেহুলা : হ্যাঁ, দিতেই হবে।
সীতারাম : তাহলে তোমরা যাও আমি আসতাছি।

(গান) : ওরে কুমারনীরা কলসি গড়ায়।
পরথমে গড়াইলরে কুমারনী
কলসির গলারে।
ওরে কুমারনীরা কলসি গড়ায়।
তারপরে গড়াইলরে কুমারনী
কলসিরও তলারে
ওরে কুমারনীরা কলসি গড়ায়।
তার শেষে গড়াইলরে কুমারনী
কলসির পেটরে
ওরে কুমারনীরা কলসি গড়ায়।

বেহুলা : কুমার আমার ঐ কলসি গড়া হয় নাই। আমার কলসির গায়ে নাম লিখে দিতে হবে।
সীতারাম : তাই নাকি। হায়রে হাউসের হাউস গো।
(গান) : আঠার খান কলস ভাঙ্গলাম নাম খানি লিখিতেরে

www.pathagar.com

সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
কোথায় তলে সদাগর আইস্যা আমায় বললরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
চিন্তারণের বড় জ্বালা কেউ না সইতে পারে রে।
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
কলসির পৃষ্ঠে লিইয়্যা দিলাম বঙ্গবন্ধুর নামরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
কলসির গায়ে লেইখ্যা দিও বেইল্যার বাপের নামরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
অপর পৃষ্ঠে লেইখ্যা দিও বেইল্যা সতীর নামরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
অপর পৃষ্ঠে লেইখ্যা দিয়ো লখিন্দরের নামরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
সীতরাম কী করিল লেখিতে লাগিলরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।
সত্তর টাকা ক্ষয় হইল ঐ কলসি লেখিতেরে
সীতরাম সীতারাম বলে কে ডাকিল মোরে হে
সীতারাম সীতারাম বলে।

বয়াতি : যাই হোক, চান্দু সদাগরের ছেলের বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল। খাটো মঙ্গলবার ৬ তারিখ। একবেলা রোদ আর একবেলা বৃষ্টি। তার নাম অইল খাটো মঙ্গলবার। সদাগরকে বুঝাইয়া দিল। সদাগর বুঝ পাইল। খাটো মঙ্গলবার আমি জীবনেও হুনি নাই। আজ তোমার কাছে হুনতাছি। থাক তাই যদি হয় বিবাহের দিন তারিখ মঙ্গলবারেই দেও। হ্যাঁ খাটো মঙ্গল বারেই দেখাইয়্যা ছিল। বাড়িত চলে গেল। বাড়িত যাইয়্যা বলতাছে...

চান্দু সদাগর : ও সোনাই, সোনাই।

সোনাই : কী স্বামী।

চান্দু সদাগর : সুখবর। খাটো মঙ্গলবারের দিন লখিন্দরের বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করেছি।

www.pathagar.com

সোনাই : খাটো মঙ্গলবার, এড্যা আবার কোন বার। এরকম তো শুনি নাই।

চান্দু সদাগর : এড্যা মঙ্গল বারই তবে ঐদিন একবেলা রোদ আর একবেলা বৃষ্টি থাকবে তাই। ঐ বারের নাম খাটো মঙ্গলবার। সোনাই তুমি বিয়ের আয়োজন কর, আমি বিয়ের দিন তারিখ দিয়া আসি।
ধীরে ধীরে যায় ত্বরিত গমন বাড়িতে যাইয়্যা সদাগর দিল দরশন সদাগর বলতাছে সোনাই, তুমি তাড়াতাড়ি কর। চান্দু সদাগর নাপিতেরে বলল তাড়াতাড়ি করে ছেলের চুল কাটতে।

(গান) : আজি ভাল কইর‍্যা কইররে খেউনি নাপিত হে
ছেলের মাতা যেন কাটে না গো নাপিত হে।
আজি ভাল কইর‍্যা কইররে খেউনি নাপিত হে।
ছেলে মাতায় না দিব মুটুক গো নাপিত হে।
আজি ভাল কইর‍্যা কইররে খেউনি নাপিত হে।
ছেলের গায়ে দিব চাদর গো নাপিত হে
আজি ভাল কইর‍্যা কইররে খেউনি নাপিত হে।
ছেলে বিয়ে করতে যাব গো নাপিত হে।
আজি ভাল কইর‍্যা কইররে খেউনি নাপিত হে।

বয়াতি : যাই হোক ভাল করে চুল কাইট্যা দিল। ৫০ টাকা বেতন দিল। চলে গেলে বাড়িতে এই মিয়্যা বিয়ের আয়োজন শুরু কইর‍্যা দিল। নিশানি নগরে ঘর, নামে সাইমন সদাগর। তাহার বাড়িতে যাইয়্যা দিল দরশন ঘটক সাব। যখন দরশন দিল, বিয়ের কতাবার্তা বলে ব্রাহ্মণ ডেকে গণনা করে মঙ্গলবারে দিন তারিখ দিল। মঙ্গল ডঙ্গল, বুধে হাহাকার, বৃষতে যাত্রা মানা, শুক্করে জুমাবার, শনিবার খরবার, রবিবারে কুড়ালই কাটে না। সোমবারে দুনিয়াই সৃষ্টি ইয়াছে। এর পরে মঙ্গল বার। এড্যা খাটো মঙ্গল। এই মঙ্গল বারের তারিখ নিয়ে ঘটক চলল নিশানি নগর। নিশানি নগরে ঘটক গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরে চলল চম্পাইনগর।

(গান) : ঘটক চলিল চলিল চম্পাইনগর
ঘটক চলিল।
আর কতকদূর যাইয়্যা ঘটক
করিল গমন।
এই যে চম্পাইনগরে ঘটক দিল দরশন

ঘটক : কোথায় সদাগর মশায়।

সদাগর : ও

ঘটক : আমি যে আপনের কাছে আবার চলে আসলাম।

চান্দু সদাগর : কেন কেন চলে আসলা।

ঘটক : দিন তারিখ দিছে। কিন্তু আমারে অনেক অপমান করে দিছে।

চান্দু সদাগর : কি অপমান করেছে আপনাকে?

www.pathagar.com

ঘটক : অপমান তো করছে করছে, আমাকে ঘাড় ধরে বের করে দিছে।

চান্দু সদাগর : কী এতবড় সাহস। আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে, আর আপনাকে ঘাড় ধরে বের করে দিল।

ঘটক : হ্যাঁ হ্যাঁ।

চান্দু সদাগর : তাহলে দেখা যাক, কী হয়। প্রয়োজন হলে আমি নিজেই যাব।

(গান) : সদাগর চলিল, চলিল গো নিশানি নগরে গো
সদাগর চলিল।
ধীরে যাচ্ছে সদাগর ত্বরিতে গমন
সদাগর চলিল, চলিল গো নিশানি নগরে গো
সদাগর চলিল।

চান্দু সদাগর : বেয়াই সাহের বাড়িতে আছেন নাকি। বেয়াই সাহেব।

সাইমন সদাগর: কে বেয়াই সাহেব? গরিবের বাড়ি হাতির পাড়া।

চান্দু সদাগর : তাই নাকি? আমি কি হাতি হয়ে গেছি। না কথায় বলে না? সে রকম আর কি? আপনেকে তো হাতি বানাই নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি যে ঘটক পাঠিয়েছিলাম তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিছেন। তার কী কারণ?

সাইমন সদাগর: শোনেন বেয়াই সাহেব, আপনার ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ের আলাপই করব না। তার কারণ? একে একে ছয়টি মেয়ে আপনার ঘরে বিয়ে দিয়েছিলাম। তারা একে একে সবাই কাঞ্চাচুলের আড়ি হয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। এখন ঘরে আমার অবিবাহিত একটি মেয়ে আছে। তাকেও বিয়ে দিয়ে কাঞ্চচুলের আড়ি করাতে পারব না।

চান্দু সদাগর : শোনেন বেয়াই সাহেব, আমার একখান কথা, আমি ঘটক সাহেবকে পাঠিয়ে দিলাম আমার ছেলের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। সে ঘটককে আপনে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি নিজেই এসেছি। আমাকেও আপনি অপমান করতে চাইছেন। জেনে রাখেন বেয়াই সাহেব, আপনার মেয়েকে পুত্রবধূ করেই ছাড়ব। জেনে রাখেন বেয়াই সাহেব আপনার মেয়েকে পুত্রবধু করে না নিয়ে এখান থেকে যাব না।

সাইমন সদাগর: তা বেশ, আপনি কিভাবে নিয়ে যান তাই দেখব। বাড়ির সামনের একটা পুকুর আছে সেই পুকুর দুধ দিয়ে ভরে দিতে হবে।

চান্দু সদাগর : আচ্ছা ঠিক আছে। আমি চললাম। আপনার মেয়ে আমার বিয়ে করানো দরকার নেই।
(বেহুলার প্রবেশ ও গান)
শোনেন তাউই যান, রাগ কমান
বেজার হবে না।
শোনেন তাউই যান।

www.pathagar.com

চান্দু সদাগর : শুন, মা বেহুলা তোমার বাপে শর্ত দিয়েছে তোমাদের বাড়ির সামনের পুকুর গাভীর দুধ দিয়ে ভরে দিলে তোমাকে বিয়ে দিবে। এত দুধ আমি কোথায় পাব?

বেহুলা : শোনেন তাউই সাব আপনার বাড়িতে গাভী নাই?

চান্দু সদাগর : গাভী তো অনেক গুলোই আছে। আমাকে এই এক পোয়া দুধ দিলেই চলবে। আমার পিতার কাছে স্বীকার হয়ে যান।

চান্দু সদাগর : তাই নাকি?

চান্দু সদাগর : বেয়াই সাহেব বেয়াই সাহেব। (স্বগত মেয়ে যে কথা বলেছে তাতে সাতটা পুকুরও দুধে ভরে দেওয়া যাবে) ও বেয়াই সাহেব।

চান্দু সদাগর : শোনেন বেয়াই সাহেব। আপনের একটা পুকুর। কেন সাতটা পুকুরও দুধ দিয়ে ভরে দিতে পারব। আমি আপনার শর্তে রাজি। আপনি রাজি হয়ে যান।

সাইমন সদাগর: তাই নাকি?

চান্দু সদাগর : হ্যাঁ

সাইমন সদাগর: তাইলে আপনি একটু বসেন, আমি বাড়ির ভেতর থেকে একটু আসি।

চান্দু সদাগর : ক্যা বুঝতে যাবেন?

সাইমন সদাগর: হ্যাঁ

চান্দু সদাগর : আপনি কি মাগি হাইদে?

সাইমন সদাগর: আরে দূর, মাগি হাইদ্যা না; মেয়াডা তো আমার একলার না।

চান্দু সদাগর : আচ্ছা যান তাড়াতাড়ি আসেন।
(ফিরে এসে সাইমন)

সাইমন সদাগর: বেয়াই সাহেব, আপনার ছেলের কাছে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি এক শর্তে।

চান্দু সদাগর : আবার কি শর্ত।

সাইমন সদাগর: আমার বাড়ি থেকে আপনার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করে দিতে হবে। মাঝে মাঝে দিতে হবে পরীর খাম্বা। যদি পারেন মেয়ে বিয়ে দেব নচেৎ না। দন্তেন নয়ে আকারে না। একে বারেই না।

চান্দু সদাগর : বেয়াই সাহেব, আপনি তো মেয়ে বিয়ে দিবেন না, এভা আমর সাথে ঠাট্টা করতেছেন। আমার আর দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।

সাইমন সদাগর: হ্যাঁ, তাই যান।
(চান্দুর গান)
আমি এতই কড়ি কোথায় পাই
ওরে কাজ নাই, আমার ছেলের
দেশে চলে যাই।
(বেইল্যার প্রবেশ ও গান)

www.pathagar.com

শোনেন তাউইজান রাগ কমান
বেজার হবেন না
শোনেন তাউইজান।

বেহুলা : আপনারই ঘরে কি একটু স্বর্ণ নাই?
শোনেন তাউইজান রাগ কমান
বেজার হবেন না
শোনেন তাউইজান।
আমারই পিতার কাছে
স্বীকার হয়ে যান
শোনেন তাউইজান।

চান্দু সদাগর : মা তুমি তো ব্যারা ব্যারা কর, তোমার বাপ তো তোমাকে বিয়ে দিতে চায় না।

বেহুলা : আপনার ঘরে কি একটু সোনাও নাই!

চান্দু সদাগর : একটু কেন অনেক সোনা আছে।

বেহুলা : তাহলে আপনি স্বীকার হয়ে যান।

চান্দু সদাগর : তাহলে মা তুমি ম্যান বেতাল কর?

বেহুলা : আপনি স্বীকার হয়ে যান।

চান্দু সদাগর : ঠিক আছে। কোথায় বেয়াই সাহেব।
(সাইমন ঢুকবে দুইজনের ধাক্কা খাবে)

সাইমন সদাগর: আরে বেয়াই সাহেব নাকি, আবার ফিরে আসছেন?

চান্দু সদাগর : ফিরে আসব না মানে, আপনি মনে করেছেন চান্দু সদাগর দুর্বল? আপনি যা চেয়েছেন আমি তাই দিব।

সাইমন সদাগর: তাই নাকি?

চান্দু সদাগর : হ্যাঁ,

সাইমন সদাগর: শোনেন, একটু বসেন, আমি বাড়ির ভিতর থেকে আসি।

চান্দু সদাগর : আবার বসব?

সাইমন সদাগর: জি!

চান্দু সদাগর : আসলেই আপনি মাগা হাইদ্যা।

সাইমন সদাগর: আরে মাগা হাইদ্যা না। মেয়েতো মেয়ের মায়েরও; তার সাথে বুঝ পরামর্শ করতে হয়।

চান্দু সদাগর : আচ্ছা যান, আমি বসতাছি, আপনি তাড়াতাড়ি আইসেন।
(সাইমান ফিরে আসে)

সাইমন সদাগর: ও বেয়াই সাহেব।

চান্দু সদাগর : কী বলেন, বেয়াই সাহেব।

সাইমন সদাগর: শোনেন আর একটি কথা। আপনার ছেলের সাথে বিয়ে দিতে পারি আর একটি শর্তে।

চান্দু সদাগর : আবার শর্ত!

সাইমন সদাগর: হ্যাঁ,

www.pathagar.com

চান্দু সদাগর : কী সেই শর্ত।
সাইমন সদাগর: আমার মেয়ের ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ দিতে হবে।
চান্দু সদাগর : (চান্দু রেগে যাবেন) দূর বেয়াই সাহেব। মেয়ে বিয়ে দিবেন না দিবেন না, এডা ঐড্যা করেন ক্যা?
সাইমন সদাগর: হ্যাঁ হ্যাঁ করবই। মেয়েডা তো আপনের না। মেয়েডা আমার।
চান্দু সদাগর : আচ্ছা ঠিক আছে মেয়ের ওজনের কী চাইতেছেন?
সাইমন সদাগর: স্বর্ণ চাইতাছি।
চান্দু সদাগর : স্বর্ণ চাইতাছেন।
সাইমন সদাগর: জী।
চান্দু সদাগর : (গান) বেয়াই এতই স্বর্ণ কোথায় পাই
ওরে কাজ নাই মোর ছেলের বিয়ার
বেয়াই দেশে চইলে যাই।
(বেইল্যার প্রবেশ)
শোনেন তাউইজান রাগ কমান
বেজার হবেন না।
শোনেন তাউইজান।
আমারই পিতার কাছে স্বীকার করে যান
শোনেন তাউইজান
শোনেন তাউইজান রাগ কমান
বেজার হবেন না।
চান্দু সদাগর : মেয়াগো, তুমি খালি ব্যারা ব্যারা কর। তোমার বাপ তো এড্যা ওড্যা করতাছে।
বেহুলা : শুইনেন তাউইসাব। আপনে ভয় পাবেন না। আপনের ঘরে একতোলা স্বর্ণ নাই?
চান্দু সদাগর : একতোলা কেন অনেক সোনা আছে। তবে তোমার ওজনের সোনা নাই।
বেহুলা : আমার ওজনের সোনা নাগবো না। একতোলা স্বর্ণ অইলেই অব। আপনি একতোলা দিবেন, বাকীটা আমি দিব। আপনি রাজি হয়ে যান।
চান্দু সদাগর : সাবাশ মেয়ে। শুন তোমার কথায় কিন্তু রাজি হলাম। তুমি ম্যান বেতাল ফেলাও? তুমি বেতাল ফেলাইলে যে বেতালে আমারেও ধরবে।
বেহুলা : কোন বেতাল হব না, আপনে রাজি হয়ে যান।
চান্দু সদাগর : বেয়াই এবার আপনে কই যাবেন। আপনে কি দুর্বল মনে করছেন আমারে?
সাইমন সদাগর: (মঞ্চে প্রবেশ করতে ধাক্কা লাগবে বেয়ায়ের সাথে)
ও বেয়াই সাহেব, আপনে আবার এসেছেন।

www.pathagar.com

চান্দু সদাগর : আবার আসবো না কেন? আপনি কি আমাকে দুর্বল পেয়েছেন নাকি? আপনি এক থেকে শুরু করে তিনবার আমাকে অপমান করেছেন।

সাইমন সদাগর: তাই কী হয়েছে? কী বলতে চান আপনে?

চান্দু সদাগর : আমি স্বীকার। আপনি যা যাইছেন আমি তাই দিব। এখন আপনে এখন বিবাহ দিবেন কি না?

সাইমন সদাগর: এখন তো দেওনই লাগব যখন স্বীকার হইছেন। আচ্ছা এগুলো কিন্তু আমি পরীক্ষা করে নিবো।

চান্দু সদাগর : আচ্ছা আরাডা কতা মুন অইছে।

সাইমন সদাগর: কী কন।

চান্দু সদাগর : আপনের কী আরো চাবার কিছু আছে?

সাইমন সদাগর: না, আর কী চাব? চাবার কিছু নাই।

চান্দু সদাগর : না, যদি বেয়াইনের জন্য কিছু চান।

সাইমন সদাগর: হেডা বেয়াই আর বেয়াইন বুঝবো।

চান্দু সদাগর : তাহলে বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করেন।
(ব্রাহ্মণ ডেকে দিন তারিখ করবে)
(দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেলে খাওয়া দাওয়ার প্রসঙ্গে।)

সাইমন সদাগর: আরে বেয়াই সাব খাওয়া দাওয়া করবেন না?

চান্দু সদাগর : আর খাওয়া দাওয়া আপনে আমারে যে হয়রানডা করাইল্যান, আমার প্রেসারই বাইড়া গেছিল।

সাইমন সদাগর: কী খাবেন বলেন?

চান্দু সদাগর : আমি তো প্রেসারআলা মানুষ, আসার সময় আপনের বেয়াইন আমার পকেটে কিছু লোহার কালাই দিয়ে দিয়েছিল। এই যে, এগুলো সিদ্ধ করে দিলে আমার খাওয়া হবে। নচেৎ নয়।

(গান) : আষ্ট গাড়ি কাষ্ঠের গো খড়ি
এই যে পুইর‍্যা করলাম ছাই
তবু নাহি সিদ্ধ গো হইল
লোহার মাষ কালাই
ওকি হায়গো মনের দুঃখ
বলবো কার কাছে।
মাগো সইর‍্যা বসেন জননী
ওরে আড়াই খুরা জ্বালে করব সিদ্ধ
লোহার মাষ কালাই।

চান্দু সদাগর : ব্রাহ্মণ মশাই বাড়িতে আছেন নাকি, ও ব্রাহ্মণ মশাই।

ব্রাহ্মণ : আমাকে কে ডাকল?

চান্দু সদাগর : আমি ডাকছি।

ব্রাহ্মণ : আরে সদাগর মশায় নাকি। আরে গরিবদের বাড়িতে হাতির পারা। নমস্কার, নমস্কার।

www.pathagar.com

চান্দু সদাগর : আশীর্বাদ, আশীর্বাদ।

ব্রাহ্মণ : তা হঠাৎ কী মনে করে?

চান্দু সদাগর : আমি এসেছি তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে। কাজটা সমাধা করে দিতে হবে।

ব্রাহ্মণ : কি কাজ সদাগর মশায়?

চান্দু সদাগর : বিয়ে পরিয়ে দিতে হবে। আমার ছেলে লখিন্দর ও বেহুলার মধ্যে বিয়ে পরাইতে হবে।

ব্রাহ্মণ : ও সেই কথা।

চান্দু সদাগর : হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কতা, সেই কতাই।

ব্রাহ্মণ : আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা।
(বিয়ের আসরে ছেলে ও মেয়ে পাশাপাশি বসে থাকবে।)

ব্রাহ্মণ : এই ছেলে আর এই মেয়ে?

চান্দু সদাগর : না না না, এই ছেলে আর এই মেয়ে?

ব্রাহ্মণ : ও, তাহলে আমারই ভুলই হয়েছে। তাহলে এই মেয়ে আর এই ছেলে?

চান্দু সদাগর : আরে ব্রাহ্মণ না না, তুমি ঠাট্টা করছো নাকি?

ব্রাহ্মণ : আরে না। ঠাট্টা করবো কেন, গণনা বাসনা ভাল মতো করতে হবে না? হিসেবের ব্যাপার তো নাকি? তাহলে এই মেয়ে এই ছেলে?

চান্দু সদাগর : হ-হ-হ, এখন হয়েছে। তোমার পঞ্জিকা দেখ।

ব্রাহ্মণ : এ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার পঞ্জিকাখানা দেখছি।
অ্যা নম নম দাস্য।
অ্যা হরি হরি বল বইস্য।
এই যে সদাগর মশায় পাঞ্জিকায় তো পেয়ে গেলাম। দিন তারিখ তো ঠিক করতেই হয়।

চান্দু সদাগর : অবশ্যই ঠিক করতে হবে।

ব্রাহ্মণ : প্রথমে...তারপরে ... সামনে ফাল্গুন মাস, ১৩ই বৈশাখ।

চান্দু সদাগর : ইড্যা আবার কী কইতেছেন ব্রাহ্মণ সাহেব?

ব্রাহ্মণ : ঐ আমার পঞ্জিকার তালিকার হিসাবই বলতেছে।

চান্দু সদাগর : আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে।

ব্রাহ্মণ : তাহলে পয়লা বৈশাখই তারিখটা থাকুক।

চান্দু সদাগর : আচ্ছা।

ব্রাহ্মণ : পয়লা বৈশাখেই বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করা অইল।
(বিয়ে পড়ানো)

ব্রাহ্মণ : কেগো তোমার নাম জানি কী?

বেহুলা : বেহুলা।

ব্রাহ্মণ : ও বেহুলা। আর তোমার নাম যেন কী?

লখিন্দর : স্বর্গের লখিন্দর।

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ : ও স্বর্ণের লখিন্দর। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা কওছে দেহি হাড়ি মদে আওয়া যাওয়া।
বেহুলা : হাঁড়ি মদে আওয়া যাওয়া।
ব্রাহ্মণ : ইনি তোমার বুইর্য্যা বাবা।
জনৈক : এড্যা কি বিয়্যা পড়ান হইল নাকি?
ব্রাহ্মণ : এডাই তো সৎ ব্রাহ্মণের লক্ষণ। খালি ভেজাল করতাছে। আচ্ছা তুমি বলতো দেখি, পির্য্যার তলে দুয়ানি।
লখিন্দর : পির্য্যার তলে দুয়ানি।
ব্রাহ্মণ : বেহুলা হইল তোমার আসল সোয়ামী।
জনৈক : হেইরু মিয়া এড্যা কি পরাইতাছে?
ব্রাহ্মণ : পঞ্জিকার হিসাবে তা বলতাছে সদাগর মশায়।
চান্দু সদাগর : তোমার বাপ কি কোনদিন বিয়ে করছে নাকি?
ব্রাহ্মণ : তাইলে আমি হলাম কেমন করে?
চান্দু সদাগর : তাইলে এরকম উল্টাপাটা করতাছ কিসের জন্য।
ব্রাহ্মণ : এই সোজা কইর্য্যাই বলতাছি। বলতো পির্য্যার তলে দুয়ানি।
বেহুলা : পির্য্যার তলে দুয়ানি।
ব্রাহ্মণ : এই লোকটাই তোমার আসল সোয়ামী। বল কবুল।
বেহুলা : কবুল।
ব্রাহ্মণ : আচ্ছা। (লখিন্দরকে) তুমিও বল কবুল, আপনারা সবাই কবুল বলুন। (আনন্দ হৈ চৈ, ওলু ধ্বনির মধ্য দিয়ে গিয়ে সম্পন্ন হল)
ব্রাহ্মণ : আচ্ছা সদাগর আপনি ছেলের বিয়ের কাজ শেষ।
চান্দু সদাগর : হ্যাঁ হ্যাঁ?
ব্রাহ্মণ : আপনাকে একটা লোহার বাসরঘর বানাতে হবে। সাঁওতালিপর্বতে।
চান্দু সদাগর : কী লোহার বাসরঘর, আবার সাওতালিপর্বতে?
ব্রাহ্মণ : হ্যাঁ হ্যাঁ! এই বাসরঘর বানালেই মঙ্গল, আর না বানালে অমঙ্গল। এটাও আমার পঞ্জিকার কথা, বলে গেলাম।
চান্দু সদাগর : আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে সাঁওতালিপর্বতে লোহার বাসরঘরটা তৈরি করি।
ব্রাহ্মণ : ভাল একজন কর্মকার ডেকে সেই বাসরঘর তৈরি করুন। (চান্দু সদাগর বাড়িতে গেল।)
চান্দু সদাগর : সোনাই সোনাই ও সোনাই।
সোনাই : আমায় ডাকছ কেন স্বামী। কী হয়েছে।
চান্দু সদাগর : তোমাকে যে স্মরণ করছি, বেহুলা-লখিন্দরের জন্য সাঁওতালিপর্বতে লোহার বাসরঘর তৈরি করতে হবে।
সোনাই : তাইলে আমি কী করবো?
চান্দু সদাগর : তুমি জায়গাটা দেহাইয়া দেও, কোন খানে বাসরঘর। বানাতে হবে?
সোনাই : তাহলে এই খানে বাসাতে হবে।

www.pathagar.com

চান্দু সদাগর : আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিশ্বকর্মাকে ডেকে আনছি।
(বিশ্বকর্মার বাড়িতে গিয়ে)
চান্দু সদাগর : বিশ্বকর্মা, ও বিশ্বকর্মা, বাড়িতে আছ নাকি।
(বিশ্বকর্মার মঞ্চে প্রবেশ ও গান)
বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা বলে কে ডাকিল মোরে হে
বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা বলে।
বড় সুখে শুইয়্যা ছিলাম আপনার মন্দিরে রে
বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা বলে কে ডাকিল মোরে হে
বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথ বলে।
বিশ্বকর্মা : আরে সদাগর মশায়, আপনে আমাকে কিসের জন্য স্মরণ করেছেন?
চান্দু সদাগর : তোমাকে স্মরণ করিয়াছি, সাঁওতালিপর্বতে একটি লোহার বাসরঘর তৈরি করে দিতে হবে।
বিশ্বকর্মা : লোহার বাসর ঘর বেন্ধে দিতে হবে?
চান্দু সদাগর : হ্যাঁ হ্যাঁ, লোহার বাসরঘর বেন্ধে দিতে হবে।
বিশ্বকর্মা : আমি এ বৃদ্ধ বয়সে কখনো একাজ করতে পারবো না সওদাগর মশায়।
চান্দু সদাগর : এ কাজ যে তোমাকে করতেই হবে।
(গান) : আমি পারবো না হে সদাগর
আমার গায়ে আইছে পাগলারে জ্বর
ওরে কেমন করে বানব রে আমি লোহর বাসরঘর।
আমার হাত গেছে গা পড়িয়া
আমার পা গেল গা পড়িয়া
ওরে কার্তিক মাসের রোগে আমার বউ গেছে মরিয়া।
ওরে কেমন করে বানব রে আমি লোহর বাসরঘর।
চান্দু সদাগর : শোন বিশ্বকর্মা আমি তোমার গান শোনতে এখানে আসি নাই।
বিশ্বকর্মা : সদাগর মশায়, আমি এ বৃদ্ধ বয়সে একাজ আমি পারবো না, এজন্যই আমি বলছি সদাগর মশায়।
চান্দু সদাগর : তুমি যতই না করো না কেন, এ কাজ তোমাকেই করতে হবে।
(পীড়াপিড়িতে বিশ্বকর্মা বাধ্য হয়ে রাজি হয় লোহার বাসরঘর বানাতে।)
বিশ্বকর্মা : তাহলে বানাইতে হবে?
চান্দু সদাগর : হ্যাঁ বানাইতে হবে।
বিশ্বকর্মা : কোথায় বানাতে হবে?
(সাঁওতালিপর্বতে গিয়ে জায় গা দেখিয়ে বলে।)
চান্দু সদাগর : এই যে এখানে।
বিশ্বকর্মা : আচ্ছা ঠিক আছে।
(গান) : বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।

www.pathagar.com

পরথরে বান্ধিব বাসরঘরের চৌধার
বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।
তারপরে বান্ধিব বসরঘরের কেওয়ার
বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।
উত্তরে বান্ধিব বাসর হিমালয় পর্বত
বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।
আমি পূর্বেতে বান্ধিব বাসর ভানুয়ার বাসর
বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।
দক্ষিণে বান্দিব বাসর ক্ষীর নদী সাগর
বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।
পশ্চিমে বান্ধিব বাসর হজ মক্কার ঘর।
বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।
উপরেতে লোহার চাল নিচে লোহার মাটি
বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।
ও সেই ঘরেতে বসত করব বেউল্যা লখিন্দর।
বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম লোহার বাসরঘর।
বাসর বান্ধিলাম।
(বাসরঘর তৈরি হয়ে গেলে)

বিশ্বকর্মা : কোথায় সদাগর মশায়, কোথায়?

চান্দু সদাগর : বল, কী তোমার সংবাদ?

বিশ্বকর্মা : আমার সংবাদ ভাল। আমি ভাল করে লোহার বাসরঘর তৈরি করেছি। আমার বেতন দেন চলে যাই।

চান্দু সদাগর : তোমাকে বেতন দিব। তার আগে আমার কথা আছে। বাসরঘরে ধূম পরীক্ষা করে দিতে হবে।

বিশ্বকর্মা : অবশ্যই ধূম পরীক্ষা দিব। যার বেতন নিয়েছি, যার নুন খেয়েছি তার গুণ অবশ্যই গাব। আমি বাসরঘর ধূম পরীক্ষা করেই দিব।

চান্দু সদাগর : ঠিক আছে তাই দাও।
(ধূম পরীক্ষা করবে)

চান্দু সদাগর : খুব সুন্দর হয়েছে। তুমি বেতন কত চাও?

বিশ্বকর্মা : কত চাই, সাউ সদাগরের কাছ থেকে কি বেতন চাইয়্যা নেওয়া যায়। আমাকে কিছু চাউল, ডাউল কিছু কাঁচকলা দিলেই যথেষ্ঠ।

www.pathagar.com

চান্দু সদাগর : ঠিক আছে এই যে তোমাকে টাকা দিলাম, চাউল ডাউল দিলাম আর এই যে কাঁচকলা দিলাম। তুমি কি সন্তুষ্ট?

বিশ্বকর্মা : অবশ্যই সন্তুষ্ট। নমস্কার।

চান্দু সদাগর : আশীর্বাদ, আর্শীবাদ।

বিশ্বকর্মা : চান্দু সদাগর আমাকে ভাল পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন। আমি বাড়িত চলে যাব। চাউল ডাউল দিয়েছে আমি তাই নিয়ে চলে যাব। তবে যাবার পথে তার একটি গুণগান আমি গেয়ে যাব।

(বিশ্বকর্মার গান)

চান্দে চাল দিল চাল আকাড়া
চান্দে চাল দিল চাল আকাড়া।
ওরে তরকারি খাইয়ে দিল বাটা কাঁচকলা
লখাইর বাসর বান্দা হইল সারা।
ওরে শুইয়্যা থাইক্যা গুণব লখাই
আসমানের তারা।

বিশ্বকর্মা : যাই হোক, চাউল ডাউল পেয়েছি। আমি এখন বাড়িতে যাই। বাড়িতে যাব রান্না করে খাইয়্যা শান্তিতে ঘুমাব।

(এই বলে বাড়িতে রওয়ানা হবে। পথে পদ্মাদেবীর সাথে দেখা।)

পদ্মাদেবী : কি হে বিশ্বকর্মা, তুমি কোথায় গিয়াছিলা?

বিশ্বকর্মা : কোথায় গিয়ছিলাম, তাতে তোমার কি?

পদ্মাদেবী : আমার দরকার আছে, তুমি বল কোথায় গিয়াছিলা?

বিশ্বকর্মা : আমার মন যেথায় যায় আমি সেখানে গিয়াছিলাম।

পদ্মাদেবী : তুমি সাঁওতালিপর্বতে চান্দু সদাগরের পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য লোহার বাসরঘর বাইন্ধে থুয়ে আইলা।

বিশ্বকর্মা : হ্যাঁ, আমি লোহার বাসরঘর বানাতে গিয়েছিলাম। তবে একথা যদি তুমি আর একবার উচ্চারণ কর তাহলে তোমার অমঙ্গল হবে।

পদ্মাদেবী : অমঙ্গল আমার হবে না, অমঙ্গল হবে তোমার যদি তুমি ঐ বাসরঘরে কালনাগিনীর ঢোকার পথ না রেখে থাক। তবে তোমার বংশ নির্বংশ হবে।

বিশ্বকর্মা : আমি যার নুন খেয়েছি। তার কাজ করেছি। তার অন্যায় কোনদিন করতে পারবে না, তুমি যা পার কইরো। আমি বাড়িত যাচ্ছি।

পদ্মাদেবী : ঠিক আছে যাও, বাড়িত গেলেই বুঝতে পারবে।

(বিশ্বকর্মা বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমায়। ঘুমে স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ওঠে।)

বিশ্বকর্মা : একি, একি। আমি যে স্বপ্নে দেখলাম, আমার ঘরে সাপ ঢুকেছে। ঘরে বাইরে ভিতরে, ঘরের রোয়ায়, কোণায় কোণায় সাপ ফণা তুলে

www.pathagar.com

আছে। আমাকে দংশন করবে বলে। আমি বুঝতে পারছি, এটা পদ্মাদেবীর কারসাজি। আমি কী করবো, আমি যে নিরুপায়, আমাকে যে পদ্মা মায়ের কাছে যেতে হবে।
(পদ্মার কাছে গেল)

বিশ্বকর্মা : কোথায় পদ্মা মা? নমস্কার, পদ্মা মা।

পদ্মাদেবী : আশীর্বাদ, আশীর্বাদ। কী হে বিশ্বকর্মা, তুমার ভুল ভাঙছে?

বিশ্বকর্মা : হ্যাঁ, অবশ্যই ভাঙছে।

পদ্মাদেবী : শোন, তুমি ঐ বাসরঘরের কোণায় কালনাগিনীর প্রবেশের রাস্তাডা রেখে আস।

বিশ্বকর্মা : তুমি বললে রেখে দিয়ে আস। আমি কীভাবে যাব। আমি তো বুঝি না।

পদ্মাদেবী : তুমি সদাগরের কাছে গিয়ে বলবে, শোনেন চাঁদ সদাগর আমার বাপ দাদা কালাইন্যা টাঙ্গা বাটালি ভিতরে রাইখ্যা আসছি। ঐ টাঙ্গা বাটলি না নিলে আমার সংসার চালাতে পারব না। কাজে কাজেই ঐ টাঙ্গা বাটাইল আমার নিতেই হবে। তুমি এই সুযোগে গিয়ে দক্ষিণের কোণায় একটা ছিদ্র করে আসবে ছিদ্রের মুখে পান খেয়ে একটা পানের বোটা ফেলে চুন লেপে দিয়ে থুইয়্যা আসবা। বুঝছ? যাও করে দিয়ে আস।
(পদ্মার প্রস্থান)

বিশ্বকর্মা : বালা মিয়া করা কতা বলল। কইল তার অইল, আর অনমি গেলাম। সুন্দরভাবে তো কইল, এখন যে আমার কেমন ঠেকতাছে তা আমি জানি। কোথায়, কোথায় সদাগর মশায়। আরে ও সদাগর মশায়।

চান্দু সদাগর : আবার যে ফিরে আসলা? কারণ কী?

বিশ্বকর্মা : আমি নিরুপায় হয়ে আপনের কাছে ফিরে এসেছি। আমার বাপ দাদা কালানের হাতুড়ি ও টাঙ্গাবাটাল ঐ বাসর ঘরে রাইখে আইছি। ঐ টাঙ্গা বাটাল দিয়ে কাজ করে যা পাই তাই দিয়ে সংসার চালাই। ঐ টাঙ্গা বাটাল না পেলে আমার বাল-বাচ্চা না খেয়ে মারা যাবে। তাই আপনি দয়া করে ঐ গুলো নিয়ে আসার অনুমতি দেন।

চান্দু সদাগর : না কখখোনা না। তোমাকে একটা বাটালের বদল ১০০ টা কিনে দেব; তবু আমি তোমাকে ঐ বাসরঘরে প্রবেশ করতে দিব না।

বিশ্বকর্মা : শোনেন সদাগর মশায় আমি বৃদ্ধ বয়সে আপনার ছেলের জন্য লোহার বাসরঘর বানাইছি। আপনি আমার এই একটা কথা রাখতাছেন না একটু ভাইব্যা চিন্ত্যা দেখবেন। ঐ হাতুড়ি বাটল ছাড়া আমার সংসার চলবে না।

চান্দু সদাগর : আমি তো তোমাকে ১ টার বদলে আমি ১০০টা দেব।

বিশ্বকর্মা : শোনেন সদাগর মশায় ঐ টাঙ্গা বাটাল আমার বাপ দাদা কালানের। ঐ রকম জিনিসি বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

চান্দু সদাগর : আচ্ছা, তুমার ঐ টাঙ্গা বাটালই চাই?
বিশ্বকর্মা : জী, আমার ঐ টাঙ্গা বাটালই চাই।
চান্দু সদাগর : তাহলে আমার একটা কথা আছে।
বিশ্বকর্মা : বলেন, কী কথা?
চান্দু সদাগর : তোমার ঐ বাসরঘর থেকে বের হবার পর আমি আবার ধূম পরীক্ষা করবো।
বিশ্বকর্মা : ঠিক আছে সদাগর মশায়। আপনি আবার ধুম পরীক্ষা করুন। তবুও আমাকে জিনিসটা আনার অনুমতি দেন দয়া করে।
(বিশ্বকর্মা বাসরঘরে ঢুকল। টুরুস করে একটা বাড়ি দিল। বারি দেওয়ার সাথে সাথে ছোট একটা ছেদা হয়ে গেল। পদ্মাদেবীর কথামতো পানের বোটা দিয়ে চুন দিয়ে নেপ দিয়্যা বাইরে বেরিয়ে আসল।)
বিশ্বকর্মা : কোথায়, কোথায় সদাগর মশায়।
চান্দু সদাগর : তোমার কাজ কী সমাধান হয়েছে?
বিশ্বকর্মা : হ্যাঁ। অবশ্যই সমাধান হয়েছে।
চান্দু সদাগর : তাহলে ধূম পরীক্ষা করে নিই।
বিশ্বকর্মা : অবশ্যই করে নেন। (ধূম পরীক্ষা করা হল)
চান্দু সদাগর : ঠিক আছে খুব সুন্দর হয়েছে। তুমি এখন যেতে পার।
বিশ্বকর্মা : নমস্কার, সদাগর নমস্কার।
চান্দু সদাগর : আশীর্বাদ, আর্শীবাদ।
বিশ্বকর্মা : আমি নিরূপায়, আমি পদ্মার নির্দেশে যা করলাম তাতো অন্যায়। এ আমি কী করলাম, এখন আমার মরণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। এখন আমি কী করি, কী করি।
(গান) : আর কীম্যান গুরু গো
সাক্ষী থাইকো তুমি। (২)
পান খাইলাম সুপারি খাইলাম গো
আমি চান্দু সদাগরের
কী জবাব দিব আমি হিসাবের কালে
পান খাইলাম সুপারি খাইলাম গো
আরো খাইলাম চুন
সদাগরের বাসরঘরে যে কইর‍্যা আইলাম খুন।
আর কিবা গুরু গো
সাক্ষী থাইকো তুমি।
চাল খাইলাম ডাল খাইলাম গো
আমি চান্দু সদাগরের।
কী জবাব দিবরে আমি হাশরের কালে
সাক্ষী থাইকো চন্দ্র সূর্য গো সাক্ষী রাখিলাম তোমারে
কলঙ্ক বাধাইল গো পদ্মায় জগত জুড়ায়ে

www.pathagar.com

পদ্মা হইল দুর্জন জাতি গো
দয়া নাই শরীরে
কলঙ্ক বাধাইছেরে পদ্মায়
জগৎ জুড়ায়ে ।

বয়াতি : যাই হোক, বিশ্বকর্মা বাড়িত চলে গেল । দিনের পরে দিন এইভাবে গুণাবাছা করা শুরু করল । এখানকার কথা এখানেতে রইল । বিয়ের বাদ্য বাজন শুরু করে দিল ।

(গান) : বেইল্যার শিরে দিয়্যা হাত
বাপে করে আশীর্বাদ
বেইল্যার শিরে দিয়া হাত
মায়ে করে আশীর্বাদ ।
ও মোর মাও গো
ভালো কইর‍্যা কইরো স্বামীর ঘর
মরি হায়রে হায় ।
ও মোর মাও গো
ভলি কইর‍্যা কইরো শ্বশুরের ঘর
মরি হায়রে হায় ।
বেইল্যার শিরে দিয়্যা হাত
বাপে করে আশীর্বাদ
বেইল্যার শিরে দিয়া হাত
মায়ে করে আশীর্বাদ ।

সাইমন সদাগর: মা হাসি মুখে তোমাকে বিদায় দিলাম । শ্বশুর শাশুড়ির সেবা যত্ন কইরো ।

বেহুলা : (গান)
আব্বা হসি মুখে করবেন ঐ না গো বিদায়
আব্বা চলছি শ্বশুর বাড়ি গো ।
আম্মা হাসি মুখে করবেন ঐ না গো বিদায়
আম্মা যাব স্বামীর ঘরে গো ।
আম্মা কতই ভাত খাইছি ঐ না গো আম্মা
আম্মা দূরেই দিলেন বিয়া গো
আম্মা এখন কেনে কান্দেন ঐ না গো আম্মা
আম্মা মুখে রুমাল দিয়্যা গো
আম্মা এখন কেনে কান্দেন ঐ না গো আম্মা
আম্মা মুখে চোখে আঁচল দিয়্যা গো চোখে আঁচল ।

চান্দু সদাগর : যাক তাহলে মা, এখন চল, আমরা রওয়ানা হই ।

(গান) : শ্বশুর ঐ যে দেখা যায় উইচে নাগো ভিটা
শ্বশুর ঐটা কোন ম্যান দেশ গো ।

www.pathagar.com

বউমা ঐ যে দেখা যায় উইচে না গো ভিটা
বউমা ঐটা তাতোইয়্যার পাড়া গো।
ঐ না তাতিয়ার কাপড় গো দিয়া
বউমা তোমার হইছে বিয়া গো।
শ্বশুর ঐ যে দেখা যায় উইচে নাগো ভিটা
শ্বশুর ঐটা কোন ম্যান দেশ গো।
বউমা ঐ যে দেখা যায় উইচে না গো ভিটা
বউমা ঐটা কোচের পাড়া গো।
ঐনা কোচের পাটি দিয়া তোমার হইছে বিয়া গো।
শ্বশুর ঐ যে দেখা যায় উইচে নাগো ভিটা
শ্বশুর ঐটা কোন ম্যান দেশ গো।
বউমা ঐ যে দেখা যায় উইচে না গো ভিটা
বউমা ঐটা ঢুলু পাড়া গো।
ঐ না ঢুলুদের ঢোল গো বাজাইয়া
বউমা তোমার হইছে বিয়া গো।
শ্বশুর ঐ যে দেখা যায় উইচে নাগো ভিটা
শ্বশুর ঐটা কোন ম্যান দেশ গো।
বউমা ঐ যে দেখা যায় উইচে না গো ভিটা
বউমা ঐটা চাম্পাইনগর গো।
ঐ না নগরের ছেলে গো দিয়া
বউমা তোমার হইছে বিয়া গো।

(বাসরঘরে ঘুমন্ত লখিন্দরকে সাপ দংশন করলে বিষের জ্বালায় ছটফট করতে করতে থাকবে।)

লখিন্দরের গান : জাগো বেহুলা তোলরে গাও
ডাক দে কালুনির মাও মরি আহারে
আরে ও কিরে
ডাক দে কালুনি মায়ের দেখি চন্দ্রমুখ
মরি আহারে।
দশ মাস দশ দিন
রাইখাছে মায়ের উদরে মরি আহারে
আরে ও কিরে
না শুধিতে পারলাম আমি মায়ের দুগ্ধের ধার
মরি আহারে।

(আর্তনাদ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে বেহুলার ঘুম ভাঙবে। বেহুলার কান্নায় সবাই আসবে দেখতে। বেহুলাকে কুলটা ভেবে তারা ত্যাগ করবে তাকে। বেহুলা নিজের সতীত্বের পরীক্ষা

www.pathagar.com

দেওয়ার জন্য লাশ পুড়াতে দেয় না। কলার ভেলায় সে ভাসতে ভাসতে দেবপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।)

বেহুলার গান : পতি জাগো জাগো আমার পতি গো
পতির চুলগুলি খসিয়াই না গো পইল
যেমন নীলাকাশের আবরে
পতির চোখখানি খসিয়া না পইল।
যেমন নীলাকাশের তারা গো।
পাতি জাগ জাগ আমার পতি গো।
প্রভুর নাক খানি না খাসিয়া গো পইল
যেমন কৃষ্ণের হাতের বাঁশি গো।
পাতি জাগ জাগ আমার পতি গো।
প্রভুর মুখখানা খসিয়া না গো পইল
যেমন আয়না বান্ধা ঘাটরে।
প্রভু জাগ জাগ আমার প্রভু গো।
প্রভুর দাঁতগুছি খসিয়া গো পইল
যেমন ডালিমেরই ছড়া গো
প্রভু জাগ জাগ আমার প্রভু গো।
প্রভুর হাত দুটি খসিয়া না গো পইল
যেমন বড় নায়ের বৈঠা গো
প্রভু জাগ জাগ আমার প্রভু গো।
পতির পিঠখালা খসিয়া না গো পইল
যেমন ধোপাঘাটের পিরা্যা গো।
পতি জাগ জাগ আমার পতি গো।
পতির পেটখানি খসিয়া না গো পইল
যেমন সারিন্দার খোল গো।
পতি জাগো জাগো আমার পতি গো।

তথ্যসূত্র : বয়াতি মোহাম্মদ ফজল ও মোহাম্মদ সাজাহান, গ্রাম : তাইরে পাড়া, ডাকঘর ও থানা : সরিষাবাড়ি, জেলা : জামালপুর

খ. লোকনৃত্য

গীতি আলেখ্য

বিয়ে

১.

কনেপক্ষ : ডালা আমার রংমালা, ডালা আমার ফুলমালা
ডালা আমার হরিণ ফুলের মালা গো। ২
ডালা দেখিয়া মায়ে কান্দে ডালা দেখিয়া বাপে কান্দে
ডালা দেখিয়া তক্তার কন্যে কান্দে গো। ২

www.pathagar.com

মায়ের আদরের বেটা জারে কষ্ট পাব ।
কতই ঢালো গো আইয়ো সমঝে ঢাইল পানি
মায়ের আদরের বেটা শীতে কষ্ট পাব ।

৩.

কনেপক্ষ : এতদিনতো ছিলারে মেন্দি গাছের ডালেতে
আজ কেন আইলারে মেন্দি সোহাগির হাতের কিনারে
এতদিনতো ছিলারে হলদি আলানে পালানে
আজ কেন আইলারে হলদি সোহাগির বদন কিনারে
এতদিনতো ছিলারে আলতা বানিয়ার দোকানে
আজ কেন আইলারে আলতা সোহাগির পায়ের কিনারে
এতদিনতো ছিলারে বেশর সোনারুর দোকানে
আজ কেন আইলারে বেশর সোহাগির নাকের কিনারে
এতদিনতো ছিলারে চুড়ি ছান্দারের দোকানে
আজ কেন আইলারে চুড়ি সোহাগির হাতের কিনারে
এতদিনতো ছিলারে মেন্দি গাছের ডালেতে
আজ কেন আইলারে মেন্দি সোহাগির হাতের কিনারে
বরপক্ষের প্রবেশ

কনেপক্ষ : বর আইছে গো বর আইছে । এই তোরা আয় সবাই ।

৪.

কনেপক্ষ : ঢেল ভাইংগে আইলিরে দামান নিয়র ভাইংগে আইলি
যুদিলম্যান আইলিরে দামান বাইডেগ হইলি খাড়া ।
বাইডেগদিহি চাইসনে লো দামান বাইডেগ ঝিলমিল করে
তরি ভাইয়েরা মাইটেল মাটি কাটিয়াই খাইছে ।

বরপক্ষ : রাস্তা নাই ঘাট নাই ফুইটে বালুর মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কাম সারা । আবার কয় ঢেল ভাইংগে আইলি । এই ধর দেহি আমরাও এডা কই ।

৫.

বরপক্ষ : উত্তর তনে আইলামগো আমরা নারিকেল খাবার আশায় হারে
গাছের নারিকেল গাছতই ঝইলমইল করে হারে । (২)
কন্যের বইনগো সাজিয়ে বারাইল আশি বছরের ছেরি হারে । (২)
হাতে নাইকে টেকাগো পয়সা কি দিয়ে রাইখে দিমু তারে হারে । (২)
হাতে আছে ফুলতোলা রুমাল তাই দিয়ে রাইখে দিমু তারে হারে । (২)

কনেপক্ষ : এই যে আপনেরা চুপ করেন । নওশা যে ঘাইমে গেছে গা । তারে বাতাস করন নাগব না?

কনেপক্ষের কোন একজন : কয় বিছন? ইনতিইতো থুইছিলাম । ও নওশার বইনত ইনু বইয়ে আছিল, হেইমেন চুরি করছে ।

৬.

কনেপক্ষ : দাঁতে তুলিলাম চিকনগো বেতি হাতে বুনিলাম বিছন

www.pathagar.com

ইনতি আছিল হাওশেরগো বিছন কেরাই করিল চুরি।
ইনতি আছিল দামান্দের বইনতে সেইবেন করিল চুরি।
বিয়ের রাইতে নামটিগো বারাইল বিছুন চুরের শালা।

বরপক্ষ : কি ! আমরা চুর? সামান্য এডা বিছুনের জন্যে আমাগরে চুর ডাহে!
এই চল আমরা বিয়েই করমু না।

কনেপক্ষ : হুনেন হুনেন, কি কইতে কি কইয়ে ফেলাইছি, মাপ কইরে দেন।

বরপক্ষ : না না, মাপ টাপ অব না। বর দেহি আমরাও কমু।

৭.

বরপক্ষ : নয়ামাটির কইল্যাগো আমার কইল্যা ঝুকা ঝুকা। (২)
কইন্যের বইন ছেচুন্নিগো, আমার কইল্যা চুরি করছে। (২)
কিল গুরি দিয়েগো আমার কইল্যা আদায় করমু।
চুলের মুষ্টি ধইরে গো আমার কইল্যে আদায় করমু।

কনেপক্ষ : আছফটাং তো মেলাই হুনলাম, দেহি হিংরেনি কিবে আনছে।
এ...ছ্...ছি! এইল্যে এডা হিংরেনি অইল।

৮.

কনেপক্ষ : উত্তর তনে আইলি নওশা মিয়া নাল ঘোড়া দাবড়াইয়ে
কি কি জেহার আনছস নওশা মিয়া বিটকেছ খুলছেন দেহি।

বরপক্ষ : বেমাক জেহার আনছি সোহাগী তোর সিথির সেঁন্দূর ছাড়ছি। (২)

কনেপক্ষ : ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাইয়ে নওশা তোর বইনেক করগা বিয়ে। (২)

কনেপক্ষ : উত্তর তনে আইলি নওশা মিয়া নাল ঘোড়া দাবড়াইয়ে
কি কি জেহার আনছস নওশা মিয়া বিটকেছ খুলছেন দেহি।

বরপক্ষ : বেমাক জেহার আনছি সোহাগী তোর নাকের বেশর ছাড়ছি। (২)

কনেপক্ষ : ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাইয়ে নওশা তোর ভাবিক করগা বিয়ে। (২)

বরপক্ষ : বেমাক জেহার আনছি সোহাগী তোর হাতের শাখা ছাড়ছি। (২)

কনেপক্ষ : ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাইয়ে নওশা তোর নানিক করগা বিয়ে। (২)

৯.

কনেপক্ষ : আটালু না বাটালু মুখভরা তার চাটালু। (২)
এই ঘরেতে কইয়ে গেছে শাড়ি দেওনের কতা।
আমিতো জানিনে নওশার বইনতে ছোছা
কলাগাছের মুতা দিয়ে ভাইঙ্গে দিমু থোতা
আটালু না বাটালু মুখ ভরা তার চাটালু
এই ঘরেতে কইয়ে গেছে নাকফুল দেওনের কতা।
আমি তো জানিনে নওশার বইনতো ছোছা
ঢেঁকির মনি দিয়ে ভাইঙ্গে দিমু থুতা।

১০.

বরপক্ষ : ছিঃ ছিঃ লো ছিঃ! ও ছিঃ! পরার জিনিসের নেলছি।

www.pathagar.com

এই গিরামের মাইনসের শাড়ি কিবা চিনে না।
ছিঃ ছিঃ লো ছিঃ! ও ছিঃ! পরার জিনিসের নেলছি।
এই গিরামের মাইনসের নাকফুল কিবা চিনে না।

১১.

কনেপক্ষ : একেলা একেলা পাঠাইছস চিটে বাতাসে সুজন উইড়েইছস
তর কি দেশে বড় বইতে নাই সঙ্গে করিয়া সুজন আনস নাই।
বরপক্ষ : আছে বইনতের মাথা নাই, শরমের খাতিরে বইনতে আনি নাই।
কনেপক্ষ : তর কি দেশে বেলের খাপরা নাই, মাথা বানাইয়া কেন আনস নাই।
তর কি দেশে নানাও নাই সঙ্গে করিয়ে বালি আনস নাই।
বরপক্ষ : আছে নানার ঠ্যাংগ নাই, শরমের খাতিরে নানা আনি নাই
কনেপক্ষ : তর দেশে টল্লা বাঁশ নাই, ঠেংগা বানাইয়া কেন আনস নাই।
একেলা একেলা পাঠাইছস চিটে বাতাসে সুজন উইড়েইছস

১২.

বরপক্ষ : রৌ মাছের মিরকেগো মাছের ঝাইপেলি খেলা
ও আল্লা রৌ মাছের মিরকেগো মাছের ঝাইপেলি খেলা
আল্লা সোহাগীর লাইগে আনছিগো সেঁন্দূর, ভাবীজান নিবের চায়
আল্লা সুন্দর সোনা নানিগো হইয়ে সতিন অবার চায়।

কনে পক্ষের সংলাপ : অইছে অইছে গীত গান মেলা অইছে, এহন আপনেরা বর আনেন, আমরা কইন্যে তুইলে দিমু।

১৩.

কন্যার গীত : নদীর বাতায় বাতায় ময়না পাখির বাসা,
হায় মোর বিষম জ্বালা
আগে তনা কইছিলাম আব্বাগো দূরে না দিবেন বিয়ে
হায় মোর বিষম জ্বালা
এখন কেনে কান্দেন গো আব্বা মুখে গামছা দিয়ে
হায় মোর বিষম জ্বালা
আগে যে কইছিলাম আম্মা গো দূরে না দিবেন বিয়ে
হায় মোর বিষম জ্বালা
এখন কেন কান্দেন গো আম্মা মুখে আচল দিয়ে
হায় মোর বিষম জ্বালা।

১৪.

মায়ের গীত : বাড়ির শোভা বাগ গো বাগিচা
ঘরের শোভা বেটি গো
এতদিন পালিলাম ময়না গো ঠোঁটের আদার দিয়ে গো
সুন্দর ময়না গো
বাপে ডাকে ময়না গো ময়না, ময়না নাই মোর ঘরে গো

www.pathagar.com

বাবার গীত : মায়ে ডাকে তোতা গো তোতা, তোতা নাই মোর ঘরে গো
সুন্দর ময়না গো
ঘর ভরা আয়ো গো থাকিতে ময়নাক করল চুরি গো
সুন্দর ময়না গো

১৫.

গীত : বরযাত্রী বিয়ের পাত্রি নিয়া চলে গাড়ি
শ্বশুরবাড়ি যাইরে ময়না বাপের ভিটা ছাড়ি ।

তথ্যসূত্র : জিল্লুর রহমান রতন, সদস্য, উত্তরণ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, মেলান্দহ, জামালপুর, সংগ্রহের তারিখ : ১লা বৈশাখ ১৪১৮/১৪ এপিল ২০১১

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

মানুষ শুধু কাজ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। কাজের ফাঁকে তাদের অবসর প্রয়োজন। আবার শুধু বিশ্রাম শরীর ও মনকে বিষিয়ে তুলতে পারে। তাই মানুষ অবসর সময়ে একটু আনন্দ ফূর্তির উপায় খুঁজে। নাচগান, ভ্রমণ, শিকার ও খেলাধুলা ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। বৈচিত্র্যের দিক থেকে শরীর ও মন চাঙ্গা রাখার জন্য খেলাধুলাই উত্তম। গ্রাম প্রধান জামালপুরে অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে কিংবা বয়স্করাও বিভিন্ন লৌকিক খেলায় অংশ গ্রহণ করে আমোদ ফূর্তির উপায় খুঁজে পায়। এ অঞ্চলে বহু ক্ষণজন্মা ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল। মাদারগঞ্জে ফসি কাপ আর বাসাতুল্লাহ কাপ নামে নিজস্ব দুটি টুর্নামেন্ট হতো। আর মৌলবি ব্রাদার্স এবং বর্মণ ব্রাদার্স নামে দুটি ফুটবল ক্লাব ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য লৌকিক খেলাধুলার মধ্যে আছে– হাডুডু, গোল্লাছুট, দারিয়াবান্ধা, পাঁচগুটি, হাঁসাহাঁসি বা তই তই, বলাই, কুমির খেলা, ঘুড়িখেলা ইত্যাদি।

১. হাডুডু

হাডুডু এখানকার একটি জনপ্রিয় খেলা। এ খেলায় দুটি দল দুটি ঘরে অবস্থান নেয়। প্রত্যেক দলে আটজন করে খেলোয়াড় থাকে। প্রতি দলের খেলোয়াড় একের পর এক দমছাড়া আবৃত্তি করে বিপক্ষ দলের ঘরে গিয়ে কাউকে ছুঁতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিপক্ষ দলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজেকে যে মুক্ত করে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারে না সে খেলোয়াড় মৃত বলে বিবেচিত হয়। আর বিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁয়ে নিজের ঘরে দম নিয়ে ফিরে আসতে পারে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় মৃত বলে গণ্য হবে।

ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলা

এভাবে একটি দলের সকল খেলোয়াড় মৃত না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে । কোন পক্ষ প্রথম খেলবে তা টর্চের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। খেলার সময় পক্ষ বিপক্ষ দলের

www.pathagar.com

খেলোয়াড়েরা হাডুডু, কপাটি কপাটি প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি আবৃত্তি করে। এ খেলায় দুটি কোর্ট থাকে। এ কোর্টের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২১ × ১৪ বর্গ হাত। এ ঘরটির মাঝখানে একটি সরল রেখার সমান দুভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণত বর্ষাকালে হাডুডু খেলার উপযুক্ত সময়। এ সময় মাটি নরম থাকে বলে বর্ষাকালে এ অঞ্চলে হাডুডু খেলার প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিত দলের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

২. গোল্লাছুট

গোল্লাছুট এখানকার একটি গ্রামীণ খেলা। সারা বছরই এ খেলা গ্রামের সর্বত্রই কিশোর কিশোরীরা খেলে থাকে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয় এবং খেলোয়াড়ের অনুপাতে মাঠ ছোট বড় হতে পারে। দ্রুতগতি দৌড়ের উপর এ খেলার সাফল্য নির্ভর করে। তবে ছোঁয়াছুঁয়ির একটা ব্যাপার এ খেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এ খেলার খেলোয়াড়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত দুজন দলনেতার দ্বারা খেলোয়াড়কে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রীয় সীমারেখা ধরা হয়। ৪০ থেকে ৫০ হাত দূরে কোন গাছ বা ইট পাথর বহির্সীমানা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় গর্ত হতে ছুটে গিয়ে দূর সীমানার ইট পাথর বা গাছটি ছুঁয়ে দেওয়ায় এ খেলার মূল উদ্দেশ্য। এ গর্ত বা গোল্লা থেকে খেলোয়াড়দের ছুটে যেতে হয় বলেই এর নাম গোল্লাছুট হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। খেলোয়াড় এবং দলনেতা টর্চের মাধ্যমে বিজয়ী দলের নেতা গর্তের ভিতরে পায়ের গোড়ালি স্থাপন করে। অন্যান্য খেলোয়াড়েরা হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে গর্তকে লক্ষ্য করে ঘুরতে থাকে। বিপক্ষে দলের খেলোয়াড়েরা ওৎ পেতে থাকে। খেলোয়াড়েরা চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে যার হাত ছুটে যাবে সে দ্রুত ছুটে গিয়ে নির্দিষ্ট করা ইট পাথর বা গাছটি ছোঁয়ার জন্য দৌড়ে যায়। বিপক্ষ দল সেই ছুটে যাওয়া খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দেয়। বিপক্ষ দলের ছোঁয়া এড়িয়ে সীমান্তে পৌছতে পারলে সেই খেলোয়াড় গোল্লা বা গর্তে এসে দাঁড়ায়। বিপক্ষ দলও খেলোয়াড়কে ছুঁতে পারলে মৃত বলে বিবেচিত হয়। এভাবে সবাই মৃত হলে বিপক্ষ দলের অপর পক্ষ তখন গোল্লায় পা দিয়ে খেলা শুরু করে। তবে বিপক্ষ দলের সবাই যদি ছোঁয়া এড়িয়ে নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে পারে তাহলে এক গেম বলে এগিয়ে যাবে।

৩. পাঁচগুটি

পাঁচগুটি এ অঞ্চলের ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা। পাঁচটি ইটের টুকরো বা ছোট পাথর এ খেলার প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাঁচগুটি খেলায় দুজন খেলোয়াড় মুখোমুখি বসে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারপর একটি গুটি হাতে নিয়ে তা উপরে ছুঁড়ে দেয়। ছুঁড়ে দেওয়া গুটি মাটিতে পড়ার আগেই উক্তগুটিসহ মাটিতে ছড়ানো গুটিগুলো তুলতে হয়। এভাবেই দুটি, তিনটি ও চারটি একসঙ্গে গুটি তলতে থাকে। অবশেষে বিশেষ কৌশলে পাঁচটিগুটি হাতের পিঠে সওয়ার করার চেষ্টা করে। যে কয়টা গুটি হাতের পিঠে উঠাতে পারে সেই কয়টা গেম বলে গণ্য হয়। খেলা চলাকালীন কোন গুটি হাত থেকে পড়ে গেলে উপর পক্ষ খেলার সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

৪. হাঁসাহাঁসি বা তইতই খেলা

হাঁসাহাঁসি বা তই তই খেলা অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। কয়েকজন ছেলেমেয়ে একত্রিত হয়ে এ খেলায় অংশ গ্রহণ করে। উঁচু-নিচু জায়গা এ খেলার উপযুক্ত স্থান। ছেলেমেয়েরা লম্বা লাইনে বসে উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে হাঁসাহাঁসির মত হাঁটে আর কৎ কৎ শব্দ উচ্চারণ করে। যেভাবে হাঁসাহাঁসি কৎ কৎ শব্দ করে খাল, বিল, পুকুর, ডোবার জলে নেমে পড়ে। একজন খেলোয়াড় তাদের উদ্দেশ্যে ছড়া কাটে। হাঁসাহাঁসির অভিনয়ে খেলোয়াড়েরাও ছড়ার মাধ্যমে উত্তর দেয়।

প্রশ্ন- হাঁসাহাঁসি ভাই কই যাও?
উত্তর- পেক খাই, গদ গদাই বালুর চর।
প্রশ্ন- একটা হাঁস দিয়েই যাও?
উত্তর- পাছেরটা নিয়ে যাও।

হাঁসাহাঁসির অভিনয়ে বসা খেলোয়াড় দলের লম্বা লাইন থেকে পেছনের একজন একজন করে উঠে পড়ে। এভাবে সর্বশেষ খেলোয়াড়টিও উঠে দাঁড়ায়। আবার নতুন করে খেলা শুরু হয়। এ খেলায় ছোট ছেলেমেয়েরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে।

৫. কুমির খেলা

বকশীগঞ্জ উপজেলার অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধভাবে কুমির কুমির খেলে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। এ খেলায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না। উঁচু-নিচু জায়গা এ খেলার উপযুক্ত স্থান। প্রথমে একজন কুমিরের ভূমিকায় নিচু স্থানে ওৎ পেতে থাকে। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা গোছল করতে নিচে নামে। তারা কুমিরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে 'কুমির তর পানিত নামছি'। কুমির সুযোগ বুঝে তাদের উপর হামলা করে। তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টায় দৌড়াতে থাকে। যে ধরা পড়ে সে পরের খেলায় কুমিরের ভূমিকায় অভিনয় করে। এভাবেই কুমির কুমির খেলা চলতে থাকে।

৬. বলাই খেলা

বলাই পানির খেলা। তিন চারজন কিশোর কিশোরী এ খেলায় অংশগ্রহণ করে। বলাই খেলোয়াড়দের সাঁতার জানতে হয়। এ খেলায় মাথা ছোঁয়ার একটা ব্যাপার আছে। চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে পুকুর বা নদীর মধ্যে নেমে তিনজন বলাই দেয় এবং একজন বলাই নেয়। তিনজন খেলোয়াড় একজনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে 'বলাই আমি পালাই' বলে পানিতে ডুব দেয়। বলাই বলাই করে তারা পানিতে ডুব দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। বলাই নেয়া খেলোয়াড়টি ওদের খুঁজে মাথা ছোঁয়ার চেষ্টা করে। অন্যান্য খেলোয়াড়েরা তাকে এড়িয়ে পানির ভিতরে ছুটতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত বলাই ঐ তিনজনের মাথা ছুঁতে না পারে বলাই খেলা চলতে থাকে। বলাই নেয়া খেলোয়াড় ঐ তিনজনের মাথা ছুঁয়ে দিতে পারলেই খেলা শেষ হয়।

৭. রান্নাবান্না খেলা

রান্নাবান্না খেলা অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের প্রিয় খেলা। ঘর গৃহস্থালির কাজ অনুকরণ করে ছোট ছেলেমেয়েরা এ খেলা খেলে থাকে। তারা পাটখড়ি বা কঞ্চি দিয়ে ঘরের

www.pathagar.com

খুঁটি ভাঙ্গা ইট দিয়ে চুলা তৈরি করে। গাছের পাতা কিংবা ভাঙ্গা হাঁড়ি দিয়ে থাল-বাসন তৈরি করে রান্নাবান্নার করে থাকে। পাশের ঝুপঝাঁপ থেকে বাজার করে। নানা কাল্পনিক সওদা বয়ে এনে দারুণ আনন্দ উপভোগ করে। খাবার নিয়ে ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে এক ধরণের শব্দ করে খাবার অভিনয় করে থাকে। খাবার শেষে রাত ভেবে বাতি নিভিয়ে ঘুমায়। আবার হৈ হুল্লোড় করে জেগে উঠে।

৮. পুতুল খেলা

শিশুদের আরেকটি প্রিয় খেলা পুতুল। বাজারে কিংবা মেলায় হরেক রকম পুতুল পাওয়া যায়। এসব খেলনা পুতুল পেয়ে শিশুরা অত্যন্ত খুশি হয়। শিশুরা পুতুল নিয়ে নানা রকম খেলা খেলে থাকে। আবার কেউ কঞ্চি বা পাটখড়ি দিয়ে পুতুল তৈরি করে। কাপড়ের ছোট টুকরো কঞ্চি বা পাটখড়ি পেঁচিয়ে বউ পুতুল বা বর পুতুল বানিয়ে বিয়ের আয়োজন করে। পুতুলের বিয়েতে বর ও কন্যা পক্ষদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়। হাসি তামাশা হৈ হুল্লোড় আমোদ প্রমোদ পুতুল খেলায় প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাস্তব বিয়ে শাদির অনুকরণে বিদায়ের মধ্য দিয়ে খেলার সমাপ্তি ঘটে।

৯. ঢেঁকি খেলা

এখানে সব বয়সী লোকের প্রিয় ঢেঁকি খেলা। এটি এখানকার একটি আঞ্চলিক খেলা। এখানে কয়েকজন পেশাদার ঢেঁকি খেলোয়াড় আছে। সাধারণত ধান কাটার পর পৌষ মাসে গ্রামাঞ্চলে এ খেলা হয়। ঢেঁকি খেলোয়াড় একটা সেন্টু গেঞ্জি ও শর্ট প্যান্ট পরে এ খেলায় অংশ গ্রহণ করে। ঢেঁকি খেলোয়াড় আস্ত একটি ঢেঁকি তার কপালে হাতে ও পায়ে লম্বালম্বি রেখে বিভিন্ন রকম চমৎকার খেলা প্রদর্শন করে। গ্রামের লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এ খেলা উপভোগ করে দারুণ আনন্দ পায়। ঢেঁকি খেলোয়াড় পাড়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেলা দেখিয়ে ধান, চাউল, টাকা সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কামালপুর মৃধাবাড়ির খোকা মিয়া একজন ঢেঁকি খেলোয়াড় হিসাবে সুপরিচিত।

১০. ঘুড়ির খেলা

বকশীগঞ্জ উপজেলার কিশোর যুবকরা শখের বশে ঘুড়ি উড়ায়। ঘুড়ি অন্তরীক্ষের খেলা। এটি এ অঞ্চলের একটি আকর্ষণীয় জনপ্রিয় খেলাও বটে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘুড়ি খেলার ধুম পড়ে যায়। লাল, নীল, সাদা, কালো, হলুদ, সবুজ কাগজের ঘুড়িতে এ সময় আকাশ ছেঁয়ে যায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দের সঙ্গে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি খেলার দৃশ্য উপভোগ করে। ময়দা, তুঁতে ও কাঁচগুড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে রান্না করে আঠালো করা হয়। এ আঠালো জিনিস টোটা সুতায় মাখিয়ে ধারালো করার নাম মাঞ্জা। মাঞ্জা এ অঞ্চলের কথ্যভাষা। মাঁজা সুতা নাটাইয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়। মাঁজা দিয়ে সুতা এমন ধারালো করে যাতে অন্য ঘুড়ির সুতা লাগা মাত্র কেটে যায়। একজনের ঘুড়ির সুতা দিয়ে অন্য ঘুড়ির সুতায় প্যাঁচ লাগিয়ে কেটে দেওয়ায় ঘুড়ি খেলার প্রধান আকর্ষণ। যার সুতায় যত বেশি ধার হয় সে অন্যের ঘুড়ির সাথে প্যাঁচ

www.pathagar.com

লাগিয়ে ঘুড়ির সুঁতো কেটে দেয়। সুতা কাটা ঘুড়ি এক থেকে দুই কি.মি. পর্যন্ত দূরে গিয়ে পড়ে। এ সুতো কাটা ঘুড়ি উদ্ধার করতে অনেকেই পিছু ছুটে যায়। সুতো কাটা ঘুড়ি ধরাতেও আনন্দ আছে।

বকশীগঞ্জের কোরকা মেলায় ঘুড়ি খেলার প্রতিযোগিতা হয়। বৈশাখ মাসের তের ও ষোল তারিখে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কোরকা মেলার আকাশে নানা রঙের নানা প্রকারের ঘুড়ি পাখির মত উড়তে দেখা যায়। এখানে নানা প্রকার ঘুড়ি বেচা কেনাও হয়। বকশীগঞ্জে নানা রঙের ঘুড়ি আকাশে উড়তে দেখা যায়। যথা- চঙ্গবাট, চিলঘুড়ি, ডোলঘুড়ি, সাপঘুড়ি, বাইরেঘুড়ি। বকশীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী কোরকা মেলায় এখনো ঘুড়ি খেলার প্রতিযোগিতা হয়। উড়ন্ত ঘুড়ির সুতা কাটাকাটি খেলায় এখানকার কিশোর, যুবক ও বয়স্কদেরও মনে প্রচুর আনন্দ বিনোদনের খোরাক যোগায়।

গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখন শহরে ছেলেমেয়েদের মত পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। যারা পড়াশুনা করে না তারা বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আবার অনেক ছেলেমেয়েরা বাল্যকাল পার হতে না হতেই শহরের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজে চলে যাচ্ছে। লোকখেলা প্রচলন কমে যাচ্ছে। এর মধ্যেও গ্রামের ছেলেমেয়েরা যেসব লোকখেলা খেলে থাকে সেসব খেলাধুলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেলাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ।

ইচিং বিচিং খেলা

ছিরকল ছিরকল, পুকুরপাড়-ভিতর বাহির, পণ্ডিত-উপর নিচ, অপেন্টি বাইস্কোপ, ইচ্চন বিচ্চন দাড়কি কিচ্চন, বাঘ-ছাগল, ফুলন ফুলন, বউছি, কুতকুত, হাডুডু, কাবাড়ি, ষোলগুটি, বত্রিশগুটি ইত্যাদি। কিছু খেলা এখন বিলুপ্তির পথে। এগুলো হলো– বদন, ইচিং বিচিং, হাঁসহাঁস, গোল্লাছুট, ভাইটাবারি ইত্যাদি।

১১. লাঠিখেলা

জামালপুরে লাঠিখেলা প্রচলিত ছিল। অধুনা প্রায় বিলুপ্ত, আগে সারা বছরই লাঠিখেলা হত। তবে মহরম মাসে এ খেলার আয়োজন বেশি হত। এলাকা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা

www.pathagar.com

হত। ভাল পালোয়ানগণ বিভিন্ন দলে খেলত। অনেক সময় খেলা নিয়ে নানা অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটত।

১২. ঘোড়দৌড়

এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় ঘোড়দৌড়ের আয়োজন বেশি হত। বিভিন্ন জেলা থেকে তেজী ঘোড়া এনে সমাজের বিত্তবান ও সৌখিন মানুষেরা এসব খেলার আয়োজন করত। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এসব ঘোড়দৌড় উপভোগ করার জন্য আসত। এ উপলক্ষে জেলার আসর বসত।

১৩. নৌকাবাইচ

নদী মাতৃক জামালপুর জেলায় বর্ষাকালে নৌকাবাইচ হত। বিভিন্ন থানার মধ্যে প্রতিযোগিতা হত। বর্ষাকালে মানুষ ঘরে অলসভাবে বসে না থেকে নৌকাবাইচকেই চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিত।

১৪. কলার আটি কলার ডুম

বাড়ির আঙিনা বা বিদ্যালয়ের মাঠে পাঁচ ছয়জনে মিলে খেলাটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ খেলাটি খেলে থাকে। চার পাশে চারটি এবং মাঝখানে একটি গোল দাগে এক একজন করে দাঁড়ায়। মাঝখানে যে থাকে তাকে চোর বলে। চারপাশে থাকা খেলোয়াড় যে ছড়াগুলো বলে দম দেয় সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো।

১.

ডা ডা ডাডুমবা।

২.

কলার আটি কলার ডুম।

৩.

খসখসা পাতা ডগডগা ফুল
সন্ধ্যা রাতে গোলাপ ফুল।

৪.

চুনের কাতি চুন দে
এক পোয়া চুন কিনে দে।

৫.

সরগ থুইলাম বেল
গড়গড়িয়ে গেল।

৬.

পির্যার তলে আণ্ডা
বউটা আমার ঠাণ্ডা।

৭.

পির্যার তলে নুছুনি
বউডা আমার ছুচুনি।

www.pathagar.com

৮.
হাসনা বিবি নাচনা দেন
জামাই আইলে বিছনা দেন।
৯.
রাজার বাড়ির ন্যাংটা বিলাই
ধইরে আইনে পান্তা খিল্যাই।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ছড়াগুলোর কথক সাদাভ সাইয়ারা ঋদ্ধি, পিতা মো. এনামুল হক, গ্রাম-দেউলাবাড়ি, উপজেলা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর, তাং ০২-১১-২০১২

১৫. একতালি বাই বল্টু

একজন উপুড় হয়ে হাঁটুতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে আর চারজন তার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে যাবে আর নিচের ছড়া গুলো বলবে।

একতালি বাই বল্টু,
দুইয়ে ডাবল জিরো।
তিনে তিন ঘোড়াত চড়ি,
চারবারে চেপ্টা গুটি।
পাঁচে পাঁচ কদমতলা,
ঝুমকো মালা।
ছয়ে ছয় মিলে যায়,
প্রজাপতি উড়ে যায়।
সাতে সাতবার যায় হনহন,
মাথা ঘোরে বনবন।
আটে আসেনতো দুলাভাই বসেনতো চেয়ারে,
কি কি লাগে শরবত বানাতে–
এক পোয়া চিনি একসের পানিতে।
নয় এ উপরেতে গেছিলাম,
একটা সুপারি পাইছিলাম,
খোঁপা মদে থুইছিলাম
খোপা মদে লেখা
ভাবীর সাথে দেখা।
দশের দেশ
খাও পানির গিলেস।

তথ্যসূত্র : এই ছড়াটি ০৯-১২-২০১১ তারিখে তেলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সেই স্কুলের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র শিপন ও তার দলের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়

১৬. হলদি গাছতলে নিমপাখি

খেলাটি একতালি বাই বল্টুর মত। এটি খেলার সময় নিচের ছড়াটি প্রথমে একটি করে লাইন উচ্চারণ করে পরে পুরো ছড়াটি একদমে সবাইকে বলতে হয়।

www.pathagar.com

হলদি গাছতলে
নিমপাখি ডাকে,
এত ডাকন ডাইক না
সান গলা ভাইঙ্গ না,
সান গেছে বিদ্যাশে,
একটা শাড়ি পাঠাইছে।
এই শাড়ি নিমু না,
বেয়াইনের বাড়ি যামু না।
বেয়াইন করছে গোসসা,
চুল ধইরা দে ঠোসসা।
দুই মিয়্যা দুই কলার ছড়ি দুই বাদুরে খায়
ছোট কাক্কুর বউয়েরে চোরে নিয়া যায়।

তথ্যসূত্র : ১২-০১-২০১২ তারিখে তেলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী হাফিজা আক্তার মিশুর কাছ থেকে এই ছড়াটি সংগ্রহ করা হয়েছে

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

সমাজে নানা পেশাজীবী লোক বসবাস করে। তারা সমাজের বিভিন্ন শ্রমসাধ্য কাজে জড়িত। অনেকে পুরুষানুক্রমে এসব পেশায় নিয়োজিত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। যথা- সোনার, চামার, কামার, কুমার, জেলে, মুচি, মিস্ত্রি বা ছুতার, কুলু বা তেলি, তাঁতি, গাছি ইত্যাদি। তারা স্ব-স্ব কাজের বিনিময়ে আয় রোজগার করে থাকে। কাঠের আসবাবপত্রে ছুতারের কারুকার্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। কামার ও কুমার গেহস্থালির উপকরণ তৈরি করে। তাঁতি কাপড় বুনে এবং কুলু সরিষার তৈল উৎপাদন করে। গাছিরা গাছ পরিষ্কার করে। চামার জুতা সেলাই করে এবং সোনার বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার বানিয়ে লোকসমাজের সেবা দিয়ে থাকে। এ জেলার মিস্ত্রি বা ছুতার, কুলু বা তেলি, জেলে, কামার ও গাছি ইত্যাদি লোক পেশাজীবী শ্রেণি সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. মিস্ত্রি বা ছুতার

সমাজে নানা পেশার লোক বাস করে। মিস্ত্রি বা ছুতার কাঠ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। বকশীগঞ্জ উপজেলায় তিন শ্রেণির মিস্ত্রি বা ছুতার আছে। এক শ্রেণির ছুতার গৃহনির্মাণের কাজ করে থাকে। আরেক শ্রেণির মিস্ত্রি বা ছুতার গৃহে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করে। যথা-খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, ওয়ারড্রপ, কারুকার্যময় জানালা, দরজা, সুকেস, আলনা, সোফা ইত্যাদি। এখানকার কাঠের আসবাবপত্রে মিস্ত্রিদের কারুকার্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। বিশেষ করে কাঠের খাট-পালঙ্ক, চেয়ার, জানালা, দরজা, সুকেস ও ড্রেসিং টেবিলের খোদাইকৃত শৈল্পিক কারুকার্য মনোমুগ্ধকর। এখানে সৌখিন গেহস্থের ঘরে সিংহপায়া খাট-পালঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন আসবাবপত্রে চিত্র না থাকলেও জ্যামিতিক ছক বা লতাপাতার নকশা আঁকা হয়। এছাড়াও এখানে গরুগাড়ি ও বিভিন্ন প্রকার নৌকা তৈরির এক শ্রেণির ছুতার কোনমতে টিকে আছে। এখানে বর্ষার সময় ছুতাররা নৌকা মেরামত ও দুই চারটি নৌকা তৈরি করে থাকে। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন যানবাহন কাঠের চাকার গরুগাড়ি হঠাৎ চোখে পড়ে।

২. কুলু বা তেলি

কুলু বা তেলি ঘানিশিল্পের সাথে জড়িত। এরা কাঠ ও বাঁশের তৈরি ঘানি গাছের ভিতর সরিষা মাড়াই করে তৈল উৎপাদন করে। এ তৈল হাট-বাজার ও গ্রামগঞ্জে বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে ঘানিকে কুলুগাছ বলা হয়। ঘানি গাছের উপরের

www.pathagar.com

গোলাকৃতি খোলা অংশে সরিষা দিয়ে মাড়াই পদ্ধতিতে তৈল বের করে থাকে। ঘানি গাছের উপর থেকে সামান্য নিচের অংশে একটি ছিদ্র বেয়ে সরিষার তৈল বের হয়। ঘানির সাহায্যে গরু দ্বারা সরিষা ভাঙানোর কাজ প্রাচীনকালের। পাঁচ কেজি সরিষা থেকে ১.৭৫ কেজি সরিষার তৈল হয়। গৃহস্থেরা সরিষা মাড়াইয়ের উচ্ছৃষ্ট খইল জৈবিক সার হিসাবে ব্যবহার করে। গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও খইল ব্যবহৃত হয়। বকশীগঞ্জ উপজেলায় মাত্র কয়েকটি পরিবার পুরুষানুক্রমে এ প্রাচীন ঘানিশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে সরিষা তৈলের ক্ষুদ্র মিল কারখানা থাকায় ঘানিশিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে কুলু বা তেলি সম্প্রদায় এ পেশা থেকে সরে গেছে।

৩. জেলে

বকশীগঞ্জ উপজেলার পাশ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র, দশানী ও জিঞ্জিরাম নদী বয়ে গেছে। এ উপজেলায় রয়েছে কয়েকটি বিল। বিলগুলোর মধ্যে কোরকা, সিংঙ্গিডাঙ্গা, কুড়ি, দুর্গাদহ উল্লেখযোগ্য। এ উপজেলার নদনদী খালবিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। নদীতে বোয়াল, রুই, কাতলা, কালবাউস, কর্তি, চিতল, বাঁশপাতারি, বাতাসি, ঘাইরে, চেলা, মলা প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। খাল বিলগুলিতে মাগুর, কই, সিংঙ্গি, খলসে, পুটি, চান্দা, বউ মাছ, টাকি, চেং, বইটে, গতা, বাইম, কাকলে প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্ষাকালে নদনদী ও খালবিলের পানিতে জেলেরা মনের আনন্দে জাল দিয়ে মাছ ধরে হাট বাজারে বিক্রি করে। এছাড়া সারা বছর মালিকানা পুকুর বা ইজারাকৃত খালবিলে জেলেরা ছিপজাল ও মশারিজাল দিয়ে চুক্তিভিত্তিতে মাছ ধরে সামান্য আয়-রোজগার করে থাকে। এখানে অধিকাংশ নদনদী, খালবিল ভরাট হয়ে ফসলি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্ষীণধারায় প্রবাহিত কয়েকটি খালবিলে তেমন মাছ নেই। এ কারণে জেলে সম্প্রদায়ের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বকশীগঞ্জ উপজেলায় শতাধিক জেলে পরিবার কোনমতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

৪. কামার

প্রবাদে আছে, সোনারের ঠকঠকানি/কামারের একবারি। কামার লৌহশিল্পের সাথে জড়িত। এরা ভাতির সাহায্যে হাওয়া দিয়ে লোহা গলিয়ে দা, বটি, কুড়াল, কোদাল, কাঁচি, পাসুন বা খুড়কি, খন্তা, চাকু, ছর্তাসহ নানা প্রকার গেহস্থালির জিনিসপত্র তৈরি করে থাকে। বকশীগঞ্জ উপজেলায় পঁচিশটি পরিবার এ প্রাচীন পেশার সাথে পুরুষানুক্রমে কোন মতে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

৫. গাছি

বকশীগঞ্জ উপজেলার কিছুলোক এ পেশার সাথে জড়িত। গাছগাছালি পরিষ্কার করে বলে এদের নাম গাছি। এখানে গাছিরা সাধারণত নারিকেল গাছ ও তালগাছে উঠে

www.pathagar.com

অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করে। নারিকেল সারা বছর ধরে। নারিকেলের শাঁস দিয়ে নাড়ু ও চিঁড়া পিঠা তৈরি করা হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে তালের পিঠা গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রিয় খাবার। তালগাছের রস নেশাযুক্ত পানীয়। শীতকালে খেজুর গাছের মাথার একটু নিচের অংশ বিশেষ কৌশলে কেটে চেঁছে তাতে ছিদ্র করে কলসি বেঁধে রাখা হয়। সারারাত খেজুর গাছের রস পড়ে কলসি ভরে যায়। খেজুর রস খেতে সুস্বাদু। শীতকালে হাট বাজারে এক শ্রেণির লোক খেজুরের রস বিক্রি করে। আবার খেজুর গাছের রস দিয়ে গুড় তৈরি করা যায়। এখানে গাছিরা চুক্তি ভিত্তিক গাছ পরিষ্কার করে কোন মতে টিকে আছে।

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। পণ্ডিতরা বলেন ধন্দ শব্দ থেকে ধাঁধার উৎপত্তি। ধাঁধায় দু পক্ষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। একপক্ষ ধাঁধা বলে অন্য পক্ষকে উত্তর দিতে হয়। আগে থেকে ধাঁধা সম্পর্কে না জানলে উত্তর দেওয়া যায় না। সাধারণত ছড়াকৃতি ধাঁধা বলা ও উত্তর দেওয়ার মধ্যে একটা চমকপ্রদ কৌতূকপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। নানা বিষয় বৈচিত্র্যের সমাহারে ধাঁধা বুদ্ধিমত্তার চমৎকার পরিস্ফুটন ঘটে। আনন্দের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য ধাঁধা সবাইকে আকৃষ্ট করতে পারে। রহস্যগন্ধি কথার মারপ্যাঁচে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে নির্মল আনন্দ বিনোদনই ধাঁধার প্রধান উদ্দেশ্য। জামালপুরে ধাঁধা কে শিলং বলে। এখানে প্রচলিত ধাঁধায় সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়। নানা বিষয় বৈচিত্র্যে এসব ধাঁধায় তাদের কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, বস্তুজ্ঞান, সৌন্দর্যচেতনা, কৌতূকবোধ ও চিত্ত-স্ফূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জামালপুর অঞ্চলে বহুল প্রচলিত কিছু ধাঁধা নিম্নে দেওয়া হলো।

ক. বকশীগঞ্জ উপজেলার ধাঁধা

১.

এল্লাখানি পুষ্কুনী জল টলমল করে
এল্লাডা কুড়া পড়লে সর্বনাশ করে ।
উত্তর - চোখ।

২.

আকাশ থেকে পড়লে গোডা
গোডার মধ্যে নউ,
এই শিলং যে না ভাঙ্গাইছে
সে আমার বউ।
উত্তর - কালো জাম।

৩.

ছোটকালে কাপড় পরে
বড় হইলে নেংটা থাকে
উত্তর - বাঁশ।

৪.

আইল দিয়ে বদল যায়
নেংগুরে ঘাস খায় ।
উত্তর-সুই।

www.pathagar.com

৫.

ঘরের ভিতর ঘর,
হাত বাড়াইয়া ধর ।
উত্তর - মশারি ।

৬.

মায়ের দুধ খায় না
মায়ের পাছ ছাড়ে না ।
উত্তর - মুরগির ছানা ।

৭.

উপরে কাডা,
ভিতরে আডা ।
উত্তর - কাঁঠাল ।

৮.

তিন অক্ষরের নাম যার,
পানিত বাস করে
মধ্যের অক্ষর টান দিলে,
আকাশে বাস করে ।
উত্তর - চিতল মাছ ও চিল ।

৯.

আল্লার কী কাম
এক ঘরে এক খাম ।
উত্তর - মানকচু ।

১০.

রাঙ্গা বাবু হাটে য়ায়,
একশ একটা জামা গায় ।
উত্তর - কলার থুর ।

১১.

এল্লাখানি পাখি নয়
ঘুরতে ঘুরতে বড় হয় ।
উত্তর - রুটি ।

১২.

চলে কিন্তু হাঁটে না,
জিনিসটা কি বল না ।
উত্তর - টাকা ।

www.pathagar.com

১৩.

ঘরের পাছে মইচের গাছ,
টুকা দিলে সর্বনাশ।
উত্তর - ভীমরুল।

১৪.

চার পায়ে বসে,
দুই পায়ে দাঁড়ায়।
উত্তর - মাছি।

১৫.

রাজার বউ কাপড় কাঁচে,
দুই পাশে দুই বানর নাচে।
উত্তর - স্তন।

১৬.

এক গাছে দুই মাথা,
শুনছেকে এ আজগবি কথা।
উত্তর - নৌকা।

১৭.

বাঘের নাহাল ঝাঁপ দেয়,
কুত্তের নাহাল বসে,
পাথথরের নাহাল শক্ত হয়,
সোলার নাহাল ভাসে।
উত্তর - ব্যাঙ।

১৮.

পাতা আছে গাছ নাই,
কথা আছে মুখ নাই।
উত্তর - বই।

১৯.

উপরে মাটি
নিচে মাটি,
মধ্যেখানে বইসা আছে,
সোনার নাহাল বাটি।
উত্তর - ওল।

২০.

আকাশ থেকে পড়লো বুড়ি,
খেতা কাপড় লইয়া,
সেই না বুড়ি গপ্প করে,

www.pathagar.com

সোনার থালে বইয়া ।
উত্তর - বৃষ্টি ।

২১.

ছোট খাট পুষ্কুনী
কই গুর গুর করে,
রাজা আছে বাদশা আছে
তুলি সালাম করে ।
উত্তর - হুঁকা ।

২২.

সোনা পঙ্খি পানি খায়
দুনিয়াডাই দেহা যায় ।
উত্তর - আয়না ।

২৩.

মামাগরে বাড়ির পাছে
ঘাড় ভাঙ্গা বলদ নাচে ।
উত্তর - ঢেঁকি ।

২৪.

পৌনে চারশত মাথা
এক হাজার পাও,
বুঝে শুনে মিল করে উত্তর দাও ।
উত্তর- ১২৫ টি গরুর ৫০০ পা,
২৫০ টি পাখির ৫০০ পা ।
৩৭৫ টি ১০০০ পা

২৫.

আইলাম বকশীগঞ্জের হাটে
দেহি এক ছেলে দুই মায়ের পেটে ।
উত্তর - দরজার খিল ।

খ. সরিষাবাড়ি উপজেলার ধাঁধা ও বৈঠকী শোলক

প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধা

১. পৃথিবী বিধাতা সৃষ্টি করল যে কালে
একখানা গাছ বানাইল বারখানা ডালে
এক পৃষ্ঠে সাদা তার আর এক পৃষ্ঠ কালা
এই শিলং যে না ভাঙাতে পারবে সে আমার শালা ।
- বছর, মাস, রাত-দিন ।

www.pathagar.com

২. একটা ঘরে বারটা খুপ
তিনটি পেসেঞ্জার
কাজ কোনটা কার।
-ঘড়ি।

৩. ঝাঁপরি ঝুঁপরি গাছটি
ফল ধরে বারটি, পাকলে হয় একটি।
-বৎসর।

৪. সৃষ্টি অবদান করল বিধি
একখানি বিরিখ।
বারখানি ডাল তার
পাতা তিরিশখানি।
এক পৃষ্ঠা কালা তার
আর এক পৃষ্ঠা ধলা।
শুনিলে আহ্লাদ বাণী
ঠাণ্ডা হবে হিয়া।
-বৎসর, মাস, দিন।

৫. ৩০টি ডিম, সাতটা কুসুম, বারটা বাচ্চা, একটা মোগরি।
-দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছর।

৬. একগাছ ঝাঁকি দিলে সব গাছ নড়ে
কুককুরু ডাক দিলে সমুদ্র নড়ে।
-ভূমিকম্প।

৭. এককাঠা সুপারি
গুনতে লাগে ব্যাপারি।
- আসমানের তারা।

৮. বড় বাড়ি বড় ঘর, বড় উইঠ্যান ভাই
কত ফুল ফুইট্যা রইছে তুলব্যার মানুষ নাই।
- আসমানের তারা।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ৮ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক তাজিনা, ৬ষ্ঠ, হরখালি উচ্চবিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ : মার্চ, ২০১২

৯. বড় বাড়ির বড় উঠান ঝাড়ু দিবার মানুষ নাই
এত সুন্দর ফুল ফুটেছে তোলব্যার মানুষ নাই।
- আকাশ, তারা।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক পরান মিয়া, ষষ্ঠ হরখালি উচ্চবিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ : মার্চ, ২০১২।

১০. শিশুকাল শিঙ্গা আবার বৃদ্ধ কালে শিঙ্গা।
-চাঁদ।

www.pathagar.com

১১. থালা ঝন ঝন থালা ঝন ঝন
থালা ঝন ঝন বাজে
কার এত সাহস আছে
থালা নিতে পারে।
-সূর্য।

১২. শিশুকাল ও শেষকালে দুইকান, যুবককালে নাই।
-চাঁদ।

তথ্যসূত্র : ১০ থেকে ১২ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক মিঠু মিয়া, পিতা- শামসুল আলম, শ্রেণি- দশম, হরখালি উচ্চবিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ : মার্চ, ২০১২

১৩. আশি হাত পানির নিচে কাতলে কাশে
ইন্দুরে ডোল বাজায় বান্দরে নাচে।
-ভূমিকম্প।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক আরিফুল ইসলাম, পিতা-মনিরুজ্জামান, মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ : মার্চ, ২০১২

মানুষ বিষয়ক ধাঁধা

১. এক সাথেই থাকে
তবু কেউ কাউরে না দেখে।
-চোখ।

২. আড়ার মইদ তনে বারাইল সাপ
লেঙ্গুর ধইর‍্যা মারল পাক।
-নাকের সিত।

৩. কোন, বন, বন না?
-জীবন।

৪. কোন লেজ লেজ না।
-কলেজ।

৫. কোন বিদ্যালয়ে মাস্টার আছে কিন্তু ছাত্র নাই।
-বালিকা বিদ্যালয়ে

৬. কোন চড় চর না?
-হাতের চড়।

৭. পাঁচজনে করে নাড়াচাড়া
চারজনে তুলে
বত্রিশ জনে করে থেরথ্যারা
একজন সমুদ্দুরে ফেলে।
-হাত, দাঁত, জিহ্বা দ্বারা খাবার গ্রহণ প্রক্রিয়া।

৮. আল্লাহর কী কাম
দুই ঘরের এক খাম।
-নাক।

www.pathagar.com

৯. মুগুলের বউ : ও মাঝি ভাই, আমাকে একটু পার করে দিবে?
মাঝি : তোমার স্বামীর নাম কী?
বউ : তিন তেরং দিয়া বার
নয় দিয়া যোগ কর।
মোর স্বামীর নাম এই
এবার পার করে দাও নায়র যাই।
-(১৩ × ৩) + ১২ + ৯ = ৬০ ষাট (অর্থাৎ ষাইটেল মুগুল)

১০. একটুখানি পুকুরটায় চামড়ার ছাউনি
মেঘ নেই বৃষ্টি নেই গড়িয়ে পড়ে পানি।
-চোখ।

১১. নাকটা চেপে বসে, কানটা ধরে টেনে জগৎখানা ঘুরে বেড়ায় বল না সে কে?
-চশমা।

১২. পাপিষ্ঠ মাথাটি
বিশ আঙ্গুল তার নাকটি
চক্ষু কর্ম নাই
এমন জীব, দেখছোনিরে ভাই?
-মানুষ।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ১২ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক সাবিহা বেগম বি.এসসি, শিক্ষক, হরখালি উচ্চ বিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ : মার্চ, ২০১২

১৩. আসতে আনিনি, এসে পেয়েছ
পেয়ে হারিয়েছি। আবার পেয়েছি।
এবার হারাইলে আর পাব না। -দাঁত।

সম্পর্ক বিষয়ক ধাঁধা

১. তোমারে দেখলে মনে হয় না ছাওয়ালের মাও
কার ছাওয়ালের ধোয়াও গাও?
যাহা ভাবছ তাহা নয়
ছেলে কিন্তু আমার নয়।
ছেলের বাপ যার শ্বশুর
তার বাপ আমার শ্বশুর।
-ভাই-বোন।

২. আমার মামার ভাগ্নী জামাই আমার কী হয়?
-ভগ্নিপতি বা স্বামী।

৩. স্বামী এবং স্ত্রী বাড়িতে উপস্থিত হলো। বাড়ির ভেতর থেকে এক মহিলা এসে পুরুষ লোকটিকে পায়ে সালাম করল। স্ত্রী গিয়ে ঐ মহিলার পায়ে সালাম করল। তাহলে দুই মহিলার মধ্যে সম্পর্ক কী?
-সতীন।

www.pathagar.com

৪. একই দামে একই রঙের ২টি শাড়ি কিনে নিয়ে দুই জন মহিলাকে দেয়া হল। ঐ দুই মহিলার মধ্যে সম্পর্ক কী?

-সতীন।

৫. আমরা দুই জন শ্বশুর জামাই
তোমার দুইজন ভাই।
গাছে আছে তিনটা নারকেল
জুনাজুতে চাই।
-এখানে লোক তিন জন। শ্বশুর, জামাই ও চাচা/জেঠা শ্বশুর

৬. তোমার দুইজন মাজাই শ্বশুর আমরা দুটি ভাই
গাছে আছে তিনটি নারকেল জুনাজুতে চাই।
-দুই ভাই, এক জামাই।

পোশাক বিষয়ক ধাঁধা

১. বুক আছে, পিঠ আছে, হাত দুইখান
ঠ্যাং নাই মাথা নাই মানুষ গিলে খান।

-পাঞ্জাবি।

২. এই ঘর থেকে ঐ ঘরে যায়
খুটে খুটে চট খই খায়।

-খরম।

৩. হাত আছে পা নাই
পেট আছে তার ভুঁড়ি নাই।

-শার্ট।

৪. দিতে গেলে কষাকষি
দেওয়া হইলে হাসাহাসি

-চুড়ি।

৫. হাত আছে পা নাই
মাথা তার কাটা
আস্ত মানুষ গিলে খায়
বুক তার ফাটা।

-শার্ট।

৬. আসলেই বসে
দিব্যার সময় খুব ঘষাঘষি
ভিতরে গেলেই হাসে।
যদি হয় ভণ্ড, ১০ টাকা দিমু আমি দণ্ড।

-ছান্দানি, চুড়ি।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ৭ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক মোহাম্মদ মোকছেদ, বয়স-৮৫, তারিখ ২২-০২-২০১২, মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

www.pathagar.com

৮. দাদা দেয় একবার
দাদি দেয় বারবার।
-সিঁদুর।

৯. চাইল্যা দেইখ্যা পাইল্যা
আর নাইক্যা দেইখ্যা দিলাম
থাকলে দিতাম না।
-সিঁদুর, হিন্দুর স্ত্রী।

১০. ঘর আছে দরজা নাই
মানুষ আছে তো কথা নাই।
-কবর।

অন্ধ বন্ধ চারকানি বন্ধ।
-কবর।

১১. আয় মাই ঘর যাই
ঘর আছে দিয়ের নাই।
-কবর।

১২. কাটলে বাঁচে না কাটলে মরে
এমন ফল কোন জায়গায় ধরে।
-মা ও শিশু।

১৩. লগে যায় লগে আসে
হাটে যাইয়্যা পেটে ভরে।
-বাজার ব্যাগ।

১৪. কাঁচা তুক তুক পাকা সেন্দূর
যে না কবার পাব
তার বাপ বুইব্যান এন্দুর।
-মাটির পাতিল।

১৫. এক ঘুঘুর দুই মাথা
ঘুঘু যায় কলিকাতা।
-নৌকা।

১৬. লগে যার, লগে আসে
বাজার থেকে পেট ভরে আসে।
-তেলের বোতল/বাজার ব্যাগ।

১৭. রাঙা বউটি হাটে যায়
চড় খেয়ে জীবন যায়।
-মাটির হাড়ি।

১৮. লাল বাবু হাটে যায় বিনি দোষে মার খায়।
-মাটির পাতিল।

১৯. লাল বুড়ি হাটে যায়
কানে মুখে চড় খায়।
-মাটির হাঁড়ি।

www.pathagar.com

২০. আগা ঝুম ঝুম গোড় মোটা।
-ঝাঁটা।

২১. রাতে চিতল দিনে শইল।
-পাটি।

২২. চিত কইর‌্যা ফেলাইয়্যা আপন কাজ করিয়া তেগা দিমু ছাড়িয়া।
-শিলপাটা।

তথ্যসূত্র : ৮ থেকে ২২ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক মিঠু মিয়া, পিতা-শামসুল আলম, দশম শ্রেণি, হরখালি উচ্চ বিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ ০২-০২-২০১২

২৩. শুতে গেলে দিতে হয়
না দিনে ক্ষতি হয়।
-দরজা।

২৪. মামাগরে এডা হাতি
দিনরাত খায় লাথি।
-ঢেঁকি।

২৫. ঘরের পিছে টেবরি গাই
যতই পানাই ততই পাই।
-টিউবওয়েল।

২৬. একটা ঘরে চারটা খাম
দুইজন গেলে অপমান।
-পায়খানা।

২৭. খায় না দায় না
লাথি ছাড়া ওঠে না।
-ঢেঁকি।

২৮. যতই তুমি সুন্দর হও আমার কাছে আসতেই হবে
ন্যাংটা হয়ে বসতেই হবে।
-বাথরুম/লেট্রিন।

২৯. লালমিয়া হাটে যায়
রোজ রোজ থাপ্পড় খায়।
-মাটির হাঁড়ি পাতিল।

৩০. চারপায়ে বসি আমি
আটপায়ে চলি
বাঘ নই কুমির নই
আস্ত মানুষ গিলি।
-পালকি।

৩১. শুবের গেলে দিতে হয়
না দিলে ক্ষতি হয়

www.pathagar.com

পণ্ডিতে কয়
যা ভেবেছ তা নয়।

-দরজা।

৩২. ভাবী শুইলে ভাই দেয়,
ভাই শুইলে ভাবী দেয়।
পাণ্ডিতে কয় যা ভাবছ,
তা নয়।

-দরজা।

৩৩. এক হাত পারে এক হাত নাড়ে
এক জনের গুয়ার পানি,
আরেক জনের গুয়ায় পরে।

-কলসি।

তথ্যসূত্র : ২৩ থেকে ৩৩ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক সেতু আক্তার, পিতা-মঞ্জু মিয়া, গ্রাম-গোবিন্দপুর, সরিষাবাড়ি

মাছ ও মাছ ধরার উপাদান বিষয়ক ধাঁধা

১. উড়িতে ঝন ঝন পড়িতে শুইয়ে
কোন পাখি আহার করে, নেঙ্গুর বান্ধিয়া।

-ঝাঁকি জাল/তৈরা জাল।

২. তুমি থাক খালে
আমি থাকি ডালে
তোমার আমার দেখা হবে
মরণের কালে।

-মাছ ও মরিচ।

৩. হায় আল্লাহ্ হল কী
ঘর পালাইল জানলা দিয়্যা
আমার উপায় কী?

-তৈরা জাল, পানি ও মাছ।

৪. আড়ায় থাকে পাড়ায় মিলে
মরা হয়ে-বর্তাডারে গিলে।

-বাঁশ, ভাইর, দাড়কি।

হুক্কা বিষয়ক ধাঁধা

১. অল্পটুকু পানির মদ্দে
কই ভুর ভুর করে
কার বাবার শক্তি আছে
জাল ফালাতে পারে।

-হুক্কা।

www.pathagar.com

২. ইল নাই পানি বিল নাই পানি
গাছের গোড়ায় পানি ।
-হুক্কা ।

৩. সমুদ্রের উপর কাঠের পুল;
তার উপর আগুনের বাসা
কেউ বা খাচ্ছে
কেউ বা করছে আশা ।
-হুক্কা ।

৪. ছোট্ট ছোট্ট পুকুরে
কই ভুরভুর করে
কার বাপের সাধ্য আছে
জাল ফালাইতে পারে?
-হুক্কা ।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক কৌশিক আহাম্মেদ, দশম শ্রেণি, হরখালি মুজিবুর রহমান উচ্চবিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ : ২২.০২.২০১২

বিবিধ বিষয়ক ধাঁধা

১. যত কাটিকে তত বাড়িবে
ওটা কী তা বলতে পারিবে?
-পুকুর খনন করা ।

২. যতটা টানে ততটা কমে
বলতে পার তার মানে?
-বিড়ি/সিগারেট ।

৩. বুড়াদের নয়বার ছয়বার
ছোকরাদের একবার ।
-সুইয়ে সুতা পরানো ।

৪. এক ভেড়ির নাম পার্বতী
নাচতে নাচতে গর্ভবতী ।
-সুতার নাটাই ।

৫. আইত খালাস দিন পেভুলি ।
-ফুল চাঙ্গি ।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বিষয়ক ধাঁধা

১. আকাশ থাইক্যা আইল বুড়ি
তেনা তুইন্যা পিন্দা
সেই বুড়ি গান গায়
সবার মদ্দে বইস্যা ।
-রেডিও ।

www.pathagar.com

২. নাই মুখ নাই মাথা
টিপ দিলে কয় কথা ।

-রেডিও ।

যোগাযোগ বিষয়ক ধাঁধা

১. মামারা একটা কাপড় দিছে
পেচঁতে পেঁচতে আর ফুরায় না ।

-রাস্তা ।

২. এতখানি একটা দড়ি, গোছাইতে গোছাইতে মরি ।

-রাস্তা ।

৩. গোল গোল টিপ আলা এক নখে চালা ।

-সাইকেলের বেল ।

৪. ধাই ধাই ধাই শত শত পাই
ঝড় গতি ছাড়ো অতি
দুনিয়া কাঁপাই ।

-রেলগাড়ি ।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক সেতু আক্তার, পিতা-মঞ্জু মিয়া, ষষ্ঠ শ্রেণি, হরখালি মজিবুর রহমান উচ্চবিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর তারিখ : ২২-০২-২০১২

৫. বড় একটা দড়ি, ঘুচাতে ঘুচাতে মরি ।

-রাস্তা ।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক পরান মিয়া, ষষ্ঠ শ্রেণি, হরখালি মজিবুর রহমান উচ্চবিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ : ২২-০২-২০১২

৬. লাফ দিয়্যা চরে
সামনের দুইট্যা ধরে
তল দিয়্যা করে ।

-সাইকেল ।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক আরিফুল ইসলাম, মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

অঙ্কের হিসাব বিষয়ক ধাঁধা

১. উব্বুৎ মাশ্‌ঠ্যাং
তিন পুটকি দশ ঠ্যাং ।

-লাঙ্গল, চাষি ও দুই গরুর দশ ঠ্যাং, চাষি ও দুই গরুর মোট তিনটি (পুটকি) পাছা ।

২. ছাগলের পোয়া পোয়া
গরুর সের সের
মহিষের পাঁচ সের
বিশটি জানোয়ার চাই
বিশ সের দুধ চাই ।

-১৬টি ছাগল, ৩টি মহিষ ১টি গরু ।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ২ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক পলাশ মিয়া, দশম শ্রেণি, হরখালি মজিবুর রহমান উচ্চবিদ্যালয়, সরিষাবাড়ি, জামালপুর তারিখ : ২২-০২-২০১২

৩. হাতুড়ি, বাটালি, বাইশাখানা
তিনটি চোরে নিলে
বাকি থাকে কয়খানা?
-কিছুই না।

৪. কুঁড়িতে জড়সড় জালেতে বাস
ফুল নাই ফল নাই ধরে বারমাস।
-পান।

৫. কাঁধে আসে কাঁধে যায়
বিনাদোষে মার খায়।
-ঢোল।

৬. তিরিশ শেয়ালের দেড়কুড়ি নেঙ্গুর। কয়টা করে লেজ?
-১টা করে।

৭. ঠক ঠক বগিলে
তিন কাল্লা দশ ঠ্যাং
কডাই দেখছিলে?
-হাইল্যা।

অক্ষর বিষয়ক ধাঁধা

১. কাগজে কলমে থাকি
কালে মোর বাসা
কার্তিকে দেখা দুইবার
বছরে নয় একবার।
-'ক' বর্ণ।

২. তিন অক্ষরে নাম যার
উপরে বাস করে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
নদীর জলে ভাসে।
-আকাশ, কাঁশ।

৩. তিন অক্ষরে নাম যার
সর্বলোকে খায়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
মেয়ে লোকে চায়।
-খিচুড়ি, চুড়ি।

৪. তিন অক্ষরের নাম যার জলে বাস করে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে উড়ে।
-কাঁকড়া, কাক।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ধাঁধাগুলো দেউলাবাড়ি, মেলান্দহ, জামালপুর থেকে সংগৃহীত

৫. তিন অক্ষরে নাম যার
গাছে বাস করে
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে
মাঠে গিয়ে নামে ।

-বকুল, বল ।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক আরিফুল ইসলাম, পিতা-মনিরুজ্জামান, গ্রাম-মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

৬. একটি পাখি আকাশেতে উড়ে
সে পাখির শেষ অক্ষর বাদ দিলে
তার নাম ধরে ডাকে ।

-কাক ।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক পলাশ মিয়া, গ্রাম-মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

রান্না ও খাদ্যবস্তু বিষয়ক ধাঁধা

১. ইট ঘুঘুর পিট কান
কোন ঘুঘুর তিন কান?

-চুলা ।

২. তিন জনে ধরে, একজনে করে, ফ্যানা তুইল্যা ছাড়ে ।

-চুলা ।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ২ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক আরিফুল ইসলাম, পিতা-মনিরুজ্জামান, গ্রাম-মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

৩. এক ড্রামের মধ্যে দুই রকমের পানি ।

-ডিম ।

৪. এক গ্লাসে দুই রকম পানি
যে না খাব তার
আমি বইনের স্বামী ।

-ডিম ।

৫. আহারে ভাই গুটা খাই
ফল আছে তার বোটা নাই ।

-ডিম ।

৬. খোসা আছে বোটা নাই
বলত কী জিনিস ভাই ।

-ডিম

৭. একটুখানি পুকুরটায় ইচ্ছার গড়ায় ভরা
একটা ইছা টিপ দিলে সব ইছা মরা ।

-ভাত ।

www.pathagar.com

৮. একটুখানি পুকুরটায় কৈএ ভগভগ করে
এমন বেটার সাহস নাই হাত দিয়া ধরে।
-ফুটন্ত ভাত।

৯. মামিগর বাড়ি গেছিলাম
অক্ত দিয়ে ভাত খাছিলাম।
-লালশাক।

১০. বাটির উপরে বাটি, তারে আমরা চাটি।
-চালতা।

তথ্যসূত্র : ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক আরিফুল ইসলাম, পিতা-মনিরুজ্জামান, গ্রাম-মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

ঘর-দরজা বিষয়ক ধাঁধা

১. শুইতে গেলে দিতে হয়
না দিলে ক্ষতি হয়,
যদি হয় ভণ্ড। হালগরু বেচে দিব দণ্ড।
-দরজার খিল।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক সুমি আক্তার, পিতা-মো বাবর আলী, মা- মোছা. সুফিয়া বেগম, মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

উদ্ভিদ/ফসল বিষয়ক ধাঁধা

১. সবুজ মিয়া হাটে যায়
হাটে খেয়ে চিমটি খায়।
-লাউ।

২. আগা খায় মধ্যেরটা পুড়ে
চামড়া বেইচে পয়সা করে।
-পাট।

৩. ইল নাই পানি ঝিল নাই পানি
গাছের আগাত্রে পানি।
-ডাব।

৪. উত্তর থাইক্যা আইল টিয়া
সোনার টুপি মাথায় দিয়া।
-কলার থুর।

৫. তিন অক্ষরে নাম যার কাটিলে মরা
শত শত বাচ্চা তার উদরে ধরা।
একটা করে বাচ্চার পেটে
ডিম একটা করে।
তাই শুনে পণ্ডিতের মনে লাগে দ্বন্দ্ব

www.pathagar.com

মিশাইতে লাগে ছন্দ।
উস্তাদরে বুঝাইতে গেলে লাগে ছয়মাস
মুর্খকে বুঝাইতে গেলে জীবনই নাশ।
-কাঁঠাল।

৬. এগাছ সাজে একগাছ বাজে, একগাছ মরা কাল্লা,
একগাছ জুলি খ্যাতা।
-ফাল্গুন-চৈত্রমাসে শিমুল গাছ, কড়ই গাছ, বেল গাছ, ও কলা গাছের অবস্থা।

কীটপতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধা

১. কালো কালো হরিণ
কালো বনে যায়
দশজনে দাবড়ায়
পাঁজনে ধরে
আর দুজনে মারে।
-উকুন।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক পলাশ মিয়া, মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

২. ইরিং বিরিং তিরিং ভাই
চোখ আছে তার মাথা নাই।
-কাকড়া।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ধাঁধার কথক কৌশিক আহাম্মেদ, পিতা-মহিউদ্দিন, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

বৈঠকি শোলক

১. রাজা ঘোড়া উজির চোরা
কুতুয়ালের মাথায় বাতি
সেই তীর্থে গিয়াছিল মাথামুইড়্যা তাঁতি।

এর অর্থ অইল এই, এক মহিলার কাছে রাজায় যায়, উজির যায়, কুতুয়ালে যায়, আর এই তাঁতিও যায়। ঐ মহিলা ছাড়া কেউ কারোডা জানে না। একদিন করছে কি, আগে রাজা গেছে, তার পরে পরেই গেছে উজির। মহিলা করছে কী রাজাকে উপুর করাইয়্যা খেতা দিয়া ভাইকে ঘোড়া বানাইয়ে থুইছে। এর পরে কুতুয়াল গেছে, তহন উজিরকে চকির তলে হারাইয়ে থুইছে। তার পাছে তাঁতিও গেছে। তখন কুতুয়ালের মাথার উপরে বাতি থুইছে। বাতির নিচে অন্ধকার না? মহিলা ভাবছে তাঁতি যাতে কুতুয়ালকে না দেখে। কিন্তু তাঁতি যাইয়্যা দেহে কুতুয়াল বইয়ে রইছে, তার মাথার উপরে বাতি দেখা যায়। এইড্যা দেইহ্যা তাড়াতাড়ি বাইর হবার নিছে। তাঁতির মুইড়্যা মাথার দিঘল্যা টিকি কপাটের চিপায় পড়ে ছিঁড়ে গেছে গা। তহন তাঁতি এই হাস্তর কয়।

www.pathagar.com

২. অবর তাঁতি খবর কও
বলদে মারদে জনা নও
উববাাই
সাতজন মারছে নাইর‍্যা গাই
বাপরে বাপ
চারজন মরছে চাপরে চাপ
কওকি ?
একুশ তাঁতির মদে ফিরে আইছি শুধু আমিতি ।

এর অর্থ অইল এই, ২১ জন তাঁতি তীর্থে রওয়ানা দিল । পথে পাইল একটা আইরে (এড়ে) গরু । এত মোটা গর্দান ফিরাইতে পায় না । দেইখ্যা তাদের মনে কইল যে, চল, এড্যা ধইর‍্যা তীর্থে নিয়া যামু । সবাই চারমিরা ঘিরা ধরল । ধরার জন্য চারমিরা চাইপ্যা যহন আইছে, তহন নয়জনকে গুতাইয়্যা মাইর‍্যা ফালাইছে । তহন আরডি বাগছে । ইড্যা তো দরন যাব না, মানুষ মাইর‍্যা হেলায় । পরে একজন যাইতে থাকল । দুই এক গ্রাম পার অওনের পরে সামনে পাইল একটা রিয়্যাইন্যা হুঅর (শুকর) । ঐড্যা দেইহ্যা কয়লে নেও এইড্যা নিয়্যা যাই । এড্যার শিংগা নাই, গুইত্যাইয়া মারতে পারব না । ধরার জন্য যহন সবাই চাইপে আইছে, তহন ঐ শুয়র সাতজনের ভুঁড়ি বাইর কইর‍্যা হেলাইছে । বাহিডি বাইগ্যা গেছে গা । আবার মেলা করছে । যাইতে যাইতে যমুনা নদী পরছে সামনে । ভাঙ্গন নাগছে, ইতিমত ভাঙতাছে নদী । নদী ভাঙ্গা যারা না দেখছে, তাগর কাছে এটা একটা তামশা । এই তামশা দেখতে দেখতে চার জুন চাপের তনে পইর‍্যা মইরে গেল । একজন থাকল সে তীর্থে গেল না । ফিরা বাইত আইল । সব তাঁতির বউয়েরা পাইল যে, অবর তাঁতি ফির‍্যা আইছে । তহন তারা সবাই এই অবর তাঁতির কাছে তাগর স্বামীর খবর জানতে চাইলে হাস্তরটি কয় ।

৩. রাজা আইছে চলক ঘড়ি
পাত্র আইছে তেমনি,
তাঁত ঘরেতে যাইয়্যা হাতি
ঘাড় পড়ছে এমনি ।

এর ব্যাখ্যা অইল এই, এক রাজার একটা হাতি ছিল । হাতিড্যা বুইর‍্যা অইয়্যা গেছে না । মরব মরব ভাব । উজিরে আইন করল হাতির মরার কতা যে কব তার একহাজার এক টাকা জরিমানা । তে হাতিডা তাঁতি বাড়ির তাঁত ঘরে গিয়া মরা গেল । তাঁতি তাঁতিনীরা কইল, নে আমরা জাইগ্যা । এক হাজার একটাকা আমগরে দিবার খ্যাম অব না, নও জাইগ্যা তাইতেনি চালাক । বলে যে, থও থও রাজার আতি মরছে আর আমরা জামু গা । সকালে পাঠাই দিছে রাজ দরবারে । যাইয়্যা কওগা -

রাজা আইছে চলক ঘড়ি
পাত্র আইছে তেমনি
তাত ঘরেতে যাইয়্যা হাতি
ঘাড় পড়ছে এমনি ।

www.pathagar.com

ঘাড় বেকা কইরা দেখাইয়ো। তাঁতিয় কতা শুইন্যা উজির কয় রাজা মশাই হাতি ম্যান তাইল্যা মইল। তাঁতি তাড়াতাড়ি কইরা কইতাছে রাজা মশাই, আমি কিন্তু কই নাই, উজির মশাই কিন্তু কইল। উজির আইন করল এখন হাজার এক টাহাই উজিরেরই জরিমানা দেওন নাগল।

৪. কথায় নাম ধন্ধি
বিনা ফাঁদে বগিলা বন্দি
কাইলকা ধইরা আনছি বগা
আইজ তরে খাই
তরে আটকাইছে যে
সে ছয়মাস ধইর‍্যা নাই।

এর অর্থে আইল এই, আমাদের দেশে আগে বড় বড় ছনের আখ (ক্ষেত) আছিল বুঝলাইন। এই ছুন কাইট্যা নিছে। কয়েক মাস পতিতই থাকছে। চৈত্রি মাসের দিনে ছন ছোট ছোটই থাকছে। জৈষ্টি-আষাঢ় মাস না আসলে বিষ্টি বাদল না পাইল্যা ছন বড় হয় না। ছোট ছোট থাকছে আর মদে পোকামাকড় থাকছে, এজন্য অর উপরে বক পড়ছে পোকা খাবার নাইগ্যা। এক গিরস্তের গরু মরছে, গরুডা ফালাইছে ছোনের আখে। বক এডা করছে কী, ব্যাঙ ধরবার নাইগ্যা তাড়া করছে। তহন ব্যাঙ লাফ দিয়ে গরুর কাল্লার উপর বইছে। মরা গরুর চোখ শকুন শিয়াল খেয়ে ফেলাতে চোখের জায়গাটা গর্ত হইয়্যা আছে। বক ঐ ব্যাঙ ধরতে ঠুকুর দিছে। ঠুকুর যাইয়্যা নাগছে ঐ গর্তের ভিতর। বক গেছে আইটকে। পাশে রাখালেরা ছিল, অরা আইস্যা ধইরা নিয়া বাড়িতে খাঁচায় বন্ধি কইরা রাখে। পরের দিন খাঁচা থেকে বককে বের করে জবাই করার সময় রাখাল এই হাস্তর দিল। তোরে যে আটকাইছে অর্থাৎ গরুটা ছয় মাস আগে মারা গেছে।

৫. ছি ছি তোমরা তো বালা মাইনসের ঝি
দিব্যার চাইয়্যা দিলে না
এডা করলা কী ?
তখন মেয়েডায় বলল যে
অচেনা মানুষ অইল্যা দিলামনি
আপনা বইলা দিলাম না।

স্বামী ও স্ত্রীর মইদ্দে কতাবার্তা এডা। স্বামী হাট থাইক্যা বাড়ি ফিরছে। বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই বউ সামনে পরছে। আচমকা বউ পরপুরুষ মনে কইরা ঘোমটা দিবার নিছিল। এমন সময় দেখল যে এডা তার স্বামীই। তখন ঘোমটার জন্য তোলা কাপড় ঘোমটা না দিয়ে ছাইরে দিল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তখন এই হাস্তরের কথাগুলো বলে।

৬. ছয়মাথা বার পাও, আট পায়ে চলে
দুই মুখ চাপচোপ চারমুখে বলে।
কালিদাস পণ্ডিত কয় শেয়ালেরই ক্ষণ
পাঁচটা ষাঁড় একটা বহন।

www.pathagar.com

আগের দিন পালকি দিয়ে বিয়ে কইর‍্যা নিয়্যা আইছে। চার বেহারা, নওশা ও পাত্রী নিয়ে মানুষ অইল মোট ছয় জন অর্থাৎ ছয়মাথা বার পাও। নওশা আর পাত্রী তো চোপচাপ, চার বেহারা চার মুখে হাইহোই করে পালকি নিয়ে চলে। চার বেহারা, নওশা মিলে পাঁচজন পুরুষকে ষাড় বলা হইছে এবং নববধূকে বহন (বকনা) বলা হয়েছে।

৭. যত চতুর তত ফতুর
বিচি গুনা কড়ি
মধুপুর কাঁঠল খাইল
গুআইয়্যা খাইল বাড়ি।

দুই বন্ধু গেছে মধুপুর টাউন দেকপের নাইগ্যা। দেখতে দেখতে খিদ্যা নাগল। দুপুর বেলা এডা কাঁঠাল কিনল খাবার জন্য। থালা নাই যে ভাগ করে খাবে। তখন বড় বন্ধু বলল যে বিচি গুনে যার বেশি বিচি হবে সে বেশি দাম দিবে। এই বলে খাওয়া শুরু করল। বড় বন্ধু চালাক করে বিচিসহ কোষ খাওয়া শুরু করল। ছোট বন্ধু কম খাইলেও দাম দিতে অইল বেশি। বাড়ি ফিরল। চাইরডে খাইয়্যা রাইতে ঘুমাইছে। রাইত দুপুরকালে পাইছে পায়খানা। এদিকে নামছে বরাক। ছাতি মাতাল নাই ঘরে বুঝলাইন। এহন পায়খানারও খুব বেগ। ওডা তো বুরাক মানব না। যহন বেশি উইরে-তারা করছে তখন ছালা মুড়া দিয়্যা ঘরের ছাইচে বইস্যা পায়খানা করছে। পায়খানা কইর‍্যা খাইয়্যা শুইয়া পড়ছে। সারারাতের বরাকে ছাইচের পায়খানা ধুয়ে খালি ঝকঝকে বিচিডি পইরে রইছে। সকালে বাড়ির কাছে বাজারে সে দোকান দিছে, সেখানে চলে যায়। তার বউ রান্নার জন্য ঘরের পাছে বেগুনগাছের বেগুন তুলতে গেছে। বেগুন তুইল্যা আসার পথে সে বিচিগুলো নজরে পড়ল। দেহে ঝকঝকে বিচি। বিচিডি খুইট্যা নিয়্যা আইছে। বেগুন আর সেইবিচি শুটকি দিয়া রান্না কইর‍্যা দোকানে পাঠায় দিছে। স্বামী খাইছে। খাইয়্যা নইয়্যা বলে যে কাঁঠাল তো বাড়িত নাই বিচি পাইল কুনু। বাড়িত আইয়্যা বউকে জিগায় বিচির কতা। তহন বলে যে, ঐ ছাঞ্চের মদ্দে কেডা জানি ঝকঝকা বিচি থুইয়্যা গেছে, হেড্যা আইনে পাক করছি। তখন ঐ হাস্তর কইল।

৮. অতি চালাকের গোদে দড়ি
বাইঙে খাইল পাণ্ঠির বারি
শইল মইল কোচের ঘায়
পানার উপর দিয়্যা ভেদা যায়।

পাহাড়ের কাছ দিয়ে আছে বংশ নদী। নদীডা চাপা। নদীর এপার ওপার বান (বাঁধ) দেওয়া। এই বানডা দিছে দুই জাতি মিল্যা। গারোরা আর শেখেরা। গারোরা পুবের মির‍্যা পহর দেয় শেখেরা পশ্চিম মির‍্যা পহর দেয়। এই বান্দের সামনে আটকিছে কী বড় বড় কাছিম, শইলমাছ, বাইঙমাছ, আর ভেদামাছ। এই কয়ডা আটকিছে। কাছিমতো পানামদ্দে যাইতে পারে না। ও আবার হুইগন্যা দিয়া যার হায়, বুলাইন। তখন পুবের মির‍্যা দিয়া করছে কী বানা থেকে পাঁচ ছয় হাত দূরে দিয়া কাছিম পার হইতেছিল। তহন গারোরা ছেদা করে ধইর‍্যা বাইন্দে থুইল। বেশি চালাকি করতে যাইয়্যা তার গোদে দড়ি পইল।

www.pathagar.com

আবার বাইঙ পানা মইদ্দে যাবার নেয় যাইতে পায় না। পুবের মির‍্যা বানা এক্কেরে হুইগনেতুরি বানা। পশ্চিম মিরা বানাডা একটু সর্ট। পাশ দিয়া ভেদরের মইদ্দে মেলা করছে। পহর দিতে ছিল শেখেরা, পান্ঠি দিয়্যা মারল বারি, আটকে গেল বাইঙ। এবার শইল ভাবল কী, বানা হাতাইয়্যা যামু যেহানে একটু নরম পামু, ওন দিয়্যা ভাইঙ্গ্যা যামুগা। বাইন্দ্যারা হলা পাইত্যা কোচ নিয়্যা বইয়ে রইছে। হইল হলা মদে যখন নাড়ানি দিছে ওব্যাই মারছে ঘাও। হইল আইটক্যা গেল গা। থাকল ভেদা। সারারাত ধইব্যা পানা আইছে, পানার দাড়ির মদ্দে যাইয়্যা ঘুমায় রইছে। এক রাইতে অনেক পানা জড়ো অইছে। এত পানা কি করে, পানা ঠেলে ঠেলে নামায় দেয়। এই বাবে পানির সাথে ভেদামাছ বাইচ্যা যায়। তাই বলে এই হাস্তর।

৯. বাঁশের ঘর কাপড় দিয়্যা ছাইয়্যা
আইটকাইলি তুই আমায় জাতি ভাই অইয়্যা ?
আড়ালে থাক তুমি সরলে কর রাও
এ সোনার নাখলা দুইড্যা চক্ষু থাকতে
ফান্দে দিল্যা পাও?
আমি যার নুন খাই
তার গুন গাই।

এর অর্থ অইল এই যে, কুড়া। পালা কুড়া আছে না? ওডার খাঁচা কইল কাপড় দিয়্যা ঢাইক্যা নেয়। শিকারে যখন বসায় তহন কাপড় উপরে তোলে। বাইরে তনে কুড়াকে তখন দেখা যায়। কিন্তু তার চাইর মির‍্যা যে ফান পাতা এড্যা দেহা যায় না। পালা কুড়াডায় তো ডাহন নিছে। বিলের মইদ্দে কুড়া থাকে অনেকগুলো, ডাহে এডাই। বিলের সর্দার-কুড়া পালা-কুড়ার ডাক হুইন্যা কয়, কোন শালায় আবার ইনু আইস্যা ডাহন নিছে। এ্যারে আহে মারবার নিগ্যা। বুলাইন, বিগেরের ঠেলায় আহে, চারিমিরা যে ফান পাতা। ভিতরে অইল খাঁচা। এই আইতেই ফান্দে আইটক্যা যায় গা। তখন আইটক্যা যাইয়া বিলের কুড়া কইতাছে, বাঁশের ঘর কাপড় দিয়্যা ছাইয়্যা আটকাইলি তুই আমার জাতি ভাই হইয়্যা ? তহন পলাডায় কইল, 'আড়ালে থাক তুমি...তার গুন গাই'।

১০. কাল কাল বর্ষা কাল
ছাগলে কাটে বাঘের গাল।
শুন কোকিল তরে কই
এই বিপদে পইরে কেবল ছাগলের গাল
চাটনসই।

একটা বাঘ চরের ভিতরে ঘুইর‍্যা ফির‍্যা খাইতে ছিল। এমন সুময় নদীর জোয়ার তনে এহেবারে বান আইয়্যা পইল। তহন ঐ বাঘ নদী আর পার অইয়্যার পারে নাই। ঐ চরের মইদে এটা ভিট্যা আছিল খুব টইয়্যা। পুইর‍্যানা চর তো আম কাঁঠালের গাছ উঠছে। উইচ্যা একটা ভিটা আছিল, উনু পানি উঠে নাই। একটা কাঁঠাল গাছে গোড়ায় খুঙ্গল আছিল। বাগডা যাইয়ে খোঙ্গলের ভিতরে না মরা না জিন্দা হইয়্যা পাইরে রইছে। বাইত পানি উঠছে বলে চইরেরা রাত পোয়াইলে নাও দিয়ে ছাগল ঐ ভিটার উপর থুইয়্যা আহে। সারাদিন থাহে হন্দে বেলা নাও দিয়্যা বাড়ি নিয়া যায়। এক

www.pathagar.com

বুইরেনি ছাগল করছে কী, পাতা খাইতে খাইতে বাঘের গালে দিছে চাটন। ঐ গাছের ডালে ছিল কোকিল। কোকিলের আর সহ্য অইল না। এড্যা দেইখ্যা সে বলে কাল কাল বর্ষা কাল, ছাগলে কাটে বাঘের গাল। এড্যা একটা অসম্ভব ব্যাপার না। তাহন বাগ বলে,শুন কোকিল তরে কই, এই বিপদে পইরে কেবল ছাগলের গাল চাটন সই। নইলে চটকানা দিয়ে ধইর‍্যা নিয়া গ্যালামনি গ্যা।

১১. আংখির মদ্যে পংখির বাসা
জলকে দিছে শালে
চার পায়ের উপরে নিপায়ে নাচে
দুপায়ে নিল ডালে।
শুন কন্যা বিবরণ
এঁন্দুরে বিলাই মারল কি কারণ?

ব্যাখ্যা : ছোনের আখর আছে না? ছোন কাটল ছোট ছোট রোখ বের হয়। শীতের সকালে ওর উপরে নিয়র পড়লে আগাল গুটা অইয়্যা থাহে না? সেডা রোদে ঝলমল করে, অইড্যা জলকে শালে। ছোনের আহের মদ্যে মরা গরুর কাল্লা পরে রইছিল। অরি চোখের মদে। পাখি বাসা করছে।

পানিতে গরু সাঁতরাইতেছিল, একটা পুঁটি মাছ ফাল মাইর‍্যা গরুর উপরে উঠে লাফাইতাছিল। ঐ সময় চিল এসে পুঁটি মাছ টারে ধরে ডানে নিয়ে গেল।

দোনা থুইছে ছিগের উপরে। বিলাই নিচে যাইয়্যা হা করে দেখতাছে যে কিভাবে খাওয়া যায়। ওদিকে উপর থেকে এঁন্দুরে ছিগ্যা দিছে কাইট্যা। দোনা বিলেইর উপর পইর‍্যা গেলে বিলাই মারা গেল।

১২. কপালে থাকিলে ধন বইসে মিলে সোনা
ঘরে স্ত্রী খাবার দিল তাতে মইল সাত জনা।
গাছতনে পইর‍্যা মইল রূপে গুণে শ্যাম।
রাড়িত যাইয়্যা দেখি অইছে একটি কাম।
খেরের পাল্লার তলে মইল সুরঞ্জিত
ও বাড়ির বুইর‍্যা বুড়ি প্যারপুর করে
এখন আমি উপায় করি কী?

এর অর্থ এই, একজন খড়িকাটা আছিল। তার অর্থ সম্পত্তি তেমন নাই। বাড়ির একজল্লা জমি। একজোড়া মইষ, একটা গাড়ি, আর একটা কুইর‍্যাল। আগের দিন পাহাড়ের যায়, পরের দিন আসে খড়ি কাইট্যা। আর বাড়ি বুগলে এডা বাড়ি আছিল। ওই বাড়ির একটা ছেলে আছিল নাম সুরঞ্জিত। ঐ ছেলে ওগোর বাড়িতে আহে। ছেলেডার হাতে খড়িকাটা বউয়ের খুব একটা বন্ধুত্ব। বন্ধুসুলভভাব এমন অইল খড়ির কাটার বউয়ে সুরঞ্জিতকে কইল, তুমি বিষ আন। পিঠার সাথে মিশায়ে খাওয়ায়ে খড়িকাটাকে মাইর‍্যা ফেলবো। তারপর তোমারে নিয়্যাই ঘর গেবাস্তি করমু। এই কতা হুইন্যা ছেলেডা কালপিন বিষ আইন্যা দিছে। ঐ মহিল্যা চাল ভিজাইছে, কুটছে, পিঠ্যা বানাইছে। বাড়িত যেগুইন্যা খাব, হেগুলিত বিষ মিশেয় নাই, কাঠুইরেকে যেগুইল্যা

www.pathagar.com

দিব হেগুলেত বিষ মিশাইছে। অবেলায় খাওয়া-দাওয়া করে ৮টা পিঠে নিয়ে খড়ি কাটতে রওয়ানা দিল। একটা পুকুর পাড়ে আম কাঠালের গাছ, একটা সমান জায়গায় গাড়ি ছাইড়্যা দিয়ে গাড়ির সাথে মহিষ জোড়া বাইন্দ্যা থুইল। গাড়ির নীচে কিছু খের-খড়ি দিয়ে পিঠের থলি মাথায় দিয়া শুইয়্যা ঘুমাইয়্যা পড়ল। অবেলায় খাইয়্যা গেছে, রাতে খায় নাই। মইষ যেখানে বাইন্দ্যা থুইছে তার উপরে কাঁঠাল গাছ। ঐ গাছের খোঙ্গালের মদে একটা বাঘ ছিল। বাঘটি ঝাপ দিয়ে পড়ছে মহিষের শিঙ্গের উপর। মহিষের শিং বাঘের পেটের ভিতর ঢুইকে বাঘ মারা গেল।

অন্যদিকে সাত চোরে চুরি করতে গেছে পাহাড়ের ওই পারে। চুরি কইর্যা আইবের সময় তারা দেহে যে খড়িকাটা ঘুমাইয়ে আছে। মাথার নিচে একটা টুকলা দেহা যায়। টুকলাডা পুকুরপাড়ে নিয়্যা সাত চোরে এডা এডা করে পিঠে নিয়্যা কামরাইয়ে খাইছে। খাইয়ে পানি খাওয়ার সাথে সাথে সাত চোর পুকুর পাড়ে মইরে রইল। খড়িকাটা চেতন পাইল। দেহে টুকলা নাই। টুকলা নিল ক্যারা। উদ্দিশ করতে করতে পুকুর পাড়ে দেহে টুকলা পইরে রইছে। খুলইন্যা দেহা যায়। পিঠা আছে এডা। আর সাতটা ক্যারা নিল। পুকুরের পানি নিচে গ্যাছে গা? না, দেহে সাতটা লোক মইরা রইছে। পিঠে হাতেই এক কামড় খাইছে আর মরছে। চোরদের চুরি করা সোনাদানা সব হাপটে নিয়ে গাড়ি ভইরে নিয়ে উপরে পাতাপুইত্যা দিয়্যা বাড়ি চলে আসে। অন্যদিন বাজারে যায়, দেরি হয়। আজ বেলা থাকতেই বাড়ির কাছে গাড়ি কেরত করে উঠল। খড়িকাটার বউ সুরঞ্জিতের হাতে শুইয়া লীলা খেলা করতাছিল। এহন কী করে সুরঞ্জিত বাড়ি থেকে বাইর অইতে পারে না বাইর অওনের একটাই পথ। তহন সুরঞ্জিত বাড়ির মদে যে খেরের পাল্লার মাচা ছিল, তার নিচে যাইয়্যা শুইয়্যা অইছে। ওদিকে এন্দুরে করছে কী মাচার খুঁটির নিচের মাটি হরাইতাছে। এতে খুঁটি ডাইব্যা গেলে পাল্লাসহ মাচা পইর্যা গেল গা সুরঞ্জিতের উপরে। সুরঞ্জিত চেপ্টা নাইগ্যা গেল। গাড়ি ছাইর্যা দিয়্যা বাড়ির মদে যইয়্যা খাওয়া দাওয়া করে, পান তামাক খাইছে। মইষ পাল্লার খের খাইতাছে। মইষের দিকে চাইতেই দেহে মাইনেসের পাও দেহা যায়। তহন সে খের খড়ি পাতাপুইত্যা দিয়ে ডাইহে থুইল। তহন সে বুজল এই ছেড়ার জন্যেই আমারে বিষ দিয়ে মারতে চাইছিল। পাশের বাড়ির সুরঞ্জিতের বুড়া বাপ-মা আইসে জিজ্ঞেস করে সুরঞ্জিতেরে দেখছ ? তখন খড়িকাটা এই হাস্তর কয়।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ১২ বৈঠকি শোলকগুলোর কথক মোহাম্মদ মোকছেদ, বয়স-৮৫, তারিখ ২২-০২-২০১২, মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি, জামালপুর

গ. দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ধাঁধা

১.

আসমানে কুড়িয়ে ঢুলে
বত্তা মানুষ খাড়ায় গিলে।
উত্তর - জামা।

২.

কলাগাছের কলকলানি
শিমুল গাছের মুতা

www.pathagar.com

এই শিলং যে না ভাঙ্গাইবে
তার মুখে মারমু জুতা ।
উত্তর -তেলের পিঠা ।

৩.
আমি গেলে দেয় না
তুমি গেলে দেয় ।
উত্তর -ঘোমটা ।

৪.
আই মাই ঘরে যাই
ঘর আছে দিয়ের নাই
উত্তর-কবর ।

৫.
মামাগরে এডা শাড়ি দিল
গোছাবের পাইলাম না পাইলাম না ।
উত্তর -পথ ।

৬.
রস খাই যার
ছাল ফেলাই তার ।
উত্তর -ইক্ষু ।

৭.
বালি হাঁসে ডিম পাড়ে
কোন বেডা গুণতে পারে
উত্তর -তারা ।

৮.
লাল বুড়ি সব খায়
উত্তর - আগুন ।

৯.
আল্লাহর কি কাম
দুই ঘরে এক খাম ।
উত্তর– নাক ।

১০.
জল কুমকুম পানিত ভাসে
হাড্ডি নাই তার মাংস আছে ।
উত্তর -জোঁক ।

১১.
পুকুর পারে তাল গাছ
হেলে দুলে পরে
এমন বাপের পুত নাই

www.pathagar.com

কাইটা দুভাগ করে ।
উত্তর –ছায়া ।

১২.

রাঙা বেড়া হাটে যায়
নিত্য হাটে চাপড় খায় ।
উত্তর -পাতিল ।

১৩ .

দাঁত আছে কামড়ায় না
জিবা আছে কথা কয় না ।
উত্তর – জুতা ও চিরুনি ।

১৪.

এইখান থেকে মারলাম ছুরি
ছুরি গেল পাতাল পুরী ।
উত্তর – কেঁচু ।

১৫.

মাঝি : সাজেনা ছেলে মা
কারবা ছেলের ধোয়াও গা ।
মেয়ে : ছেলের বাবা যার শ্বশুর
তার বাবা মোর শ্বশুর ।
উত্তর –ভাইবোন ।

১৬.

ছাগলের পোয়া পোয়া
গাভীর ১ সের
মহিষের ৫ সের
২০ টা জানোয়ার
আর বিশ সের দুধ চাই ।
উত্তর - ৩ মহিষের ১৫ সের
১ গাভীর ১ সের
১৬ ছাগলের ৪ সের

২০ টি জানোয়ারের ২০ সের দুধ

১৭.

চার কলসি মুঠিভরা
ঢাকনা নাই উপুড় করা
উত্তর – গরুর বাট ।

১৮.

খাইলে সোডা
না খাইলে মোডা ।
উত্তর – কলা ।

www.pathagar.com

১৯.
আমি গেলাম মামার বাড়ি
মামা করল দুয়ার বন্ধ ।
উত্তর– শামুক।

২০.
হাত নাই পাও নাই
গড় গড়ায়ে যায়
কাটলে তার গোশত নাই
সব লেকে খায় ।
উত্তর -পানি ।

২১.
তিন অক্ষরের নাম যার
পানিত বাস করে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে
টানাটানি করে ।
উত্তর – কাছিম, কচ্ছব ।

২২.
ছেব দিয়া লেপ দিয়া
টানিয়া টুনিয়া
খাড়া কইরে
ভিতরে দিলাম ঢুকাইয়া
উত্তর – সুই ও সুতা লাগানো।

২৩.
জংগল দিয়া উইড়া চলে
পিছন দিয়া আগুন জ্বলে।
উত্তর -জোনাকি।

২৪.
হারালে তালাশ করি
পাইলে তুলি না।
উত্তর-পথ।

২৫.
থাকলে ভালো হয়
না থাকলে ভালো নয়।
উত্তর- লজ্জা।

২৬.
আইল দিয়ে বদল যায়

www.pathagar.com

নেংগুরে ঘাস খায় ।
উত্তর-সুই ।

২৭.
নামে আছে কামে নাই
এমন জিনিস কি ভাই?
উত্তর – ঘোড়ার ডিম ।

২৮.
সবুজ বুড়ি হাটে যায়
আইতে যাইতে চিমটি খায় ।
উত্তর –লাউ ।

২৯.
বত্রিশটা তেঁতুল গাছ
একটা পাতা ।
উত্তর – জিব ।

৩০.
বন থাইকা আইলো টিয়ে
সোনার টোপর মাথার দিয়ে ।
উত্তর – আনারস ।

৩১.
ইলো নাই পানি
বিলো নাই পানি
গাছের আগালো পানি ।
উত্তর-নারিকেল,ডাব ।

৩২.
একটুখানি গাছে
লাল বুড়ি নাচে ।
উত্তর–মরিচ ।

৩৩.
তিন অক্ষরে নাম যার
ঘরে মধ্যে আছে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে
যায় না কেউ কাছে ।
উত্তর – বিদায় ।

৩৪.
এক মুরগির তিন মাথা

www.pathagar.com

পত্যি খায় লতাপাতা ।
উত্তর – চুলা , উনুন ।

৩৫.
আন্ধার ঘরে বান্দার নাচে
খেদাইলে আরো নাচে ।
উত্তর - জিব ।

৩৬.
খুলিয়া রইলাম
লাগাইয়া চললাম ।
উত্তর -জুতা ।

৩৭.
চুতুর মুরে আমুন
মধ্যে যায় গুরগুরি বামুন ।
উত্তর -নৌকা ।

৩৮.
আই মাই ঘরে যাই
ঘর আছে দুয়ার নাই ।
উত্তর -কবর ।

৩৯.
মুখ দিয়ে খায়
মুখ দিয়ে হাগে
বলতো কি তা ?
উত্তর –বাঁদুড় ।

৪০.
বিলের মধ্যে খুঁটি খাড়া
তার মুহে হাসি ভরা ।
উত্তর – পদ্মফুল ।

৪১.
এ ঘরে যায় ও ঘরে যায় ।
দুম্মত করে আছার খায় ।
উত্তর – ঝাঁটা ।

৪২.
রাতে আসে রাতে যায়
মধুর সুরে গান গায় ।
উত্তর –মশা ।

www.pathagar.com

৪৩.

দুই ঠেং কেলাইয়ে
মধ্যে দিলাম চালাইয়ে
জাতা দিলে কাম হয়
যাহা ভাবছ তা না ।
উত্তর –জাঁতি ও সুপারি ।

৪৪.

ঘরের পাছে মরা গাই
বারে বারে দেয়াবের যাই ।
উত্তর – পাতকুয়া ।

৪৫.

লাল লাল জামা গায়
লাল বুড়ি হাটে যায় ।
উত্তর – টমেটু ।

৪৬.

ছুতি ফেলানি গাছটা
গোড়া ধরে পাঁচটা
যদি এটা গোড়া লাল হয়
লক্ষ টাকা দাম হয় ।
উত্তর – ডালিম ।

৪৭.

গাঙ্গের পারে মইচের গাছ
টোকা দিলে সর্বনাশ ।
উত্তর – মৌচাক ।

৪৮.

খাঁচার মধ্যে পেঁচার ছাও
তিন মাথা ছয় পাও ।
উত্তর – বউও দুই বেহারাসহ পালকি ।

৪৯.

কোন জিনিসটা টানে টানে ছোট হয় ?
উত্তর –বিড়ি, সিগারেট ।

৫০.

বছরে আহে বছরে যায়
দিনে পাকে রাতে খায় ।
উত্তর – রোজা ।

www.pathagar.com

৫৩.

মালির হাঁসে আণ্ডা পাড়ে
কেউ না আণ্ডা গুণবের পারে।
উত্তর – তারা ও আকাশ।

ঘ. মাদারগঞ্জ উপজেলার ধাঁধা

১.

অমানুষ মানুষ হেলা করে, বসে হেলা করে ঝারি
জোনাই (জোনাকি) পোকা মানিক হেলা করে, এও দুঃখে তো মরি।

অর্থ : মানুষ হঠাৎ বড় লোক হয়ে গেলে অনেক কিছুই তুচ্ছ মনে করে। এখানে সে রকমই একটা দৃষ্টান্তের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'জোনাকি' পোকা যদি তার সামান্য উজ্জ্বল্যের জন্য মণি-মানিক্য হেলা করে, তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়? এক কথায় 'ছোট মুখে বড় কথা' বললে যেমন শোনায়, তেমন প্রবাদই এটা।

২.

চামড়ারে কয় মাল, মালেরে কয় সর্ষে
ছোট লোক বড় লোক হইছে, বড় লোক গেছে ফসকে।

অর্থ : এখানেও প্রায় একই রকম উদাহরণের কথা বলা হয়েছে। কোনো কারণে কোনো বনেদি পরিবারের যদি পতন হয় আর পাশপাশি যদি কোনো হতদরিদ্র এবং অযোগ্য মানুষ হঠাৎ পেয়ে বসে কোনো ক্ষমতার স্বাদ, তাহলে যেমন সবকিছু উলটপালট মনে হয়, তেমন তাৎপর্যই বহন করে উপর্যুক্ত প্রবাদটি।

৩.

জানসই তেলি, সেখানে কেন গেলি
গেলি গেলিই মুনের কতা কে কইলি।

অর্থ : যদি জানাই থাকে যে, একজন মানুষ খুব ব্যক্তি হিসেবে ভালো না এবং সেখানে গেলে অমঙ্গল হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই সেখানে যাওয়ার যে নেতিবাচক ফল, সেই অভিজ্ঞতাটি এভাবেই ধরা পড়েছে প্রবাদের মাধ্যমে।

৪.

বাপে দেহে নাই ঘোড়া ঘাট
বেটায় দেহে চন্দনই কাঠ।

অর্থ : মানুষকে তিরস্কার করার ভাষা এটা। কেউ যদি এমন কোনো কাজ করে, যে কাজ তার বাবার অবস্থানকেও নড়বড়ে করে দেয়। তখন এমন বলে ওই ব্যক্তিটিকে তিরস্কার করা হয়।

www.pathagar.com

৫.

পাজি কোনোদিন হয় না হাজি, একশ বার হজ করিলে
নিম কখনো হয় না মিঠে চিনি দিয়ে গাছ আজলে
ছোট লোক হয় না বড় চিকন ধুতি পরিলে।

অর্থ : এখানে খুব সহজ ভাষায় একটা শাশ্বত বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। মানসিকভাবে কেউ উন্নত না হলে, শুধু আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেই মানুষের মন-মানসিকতা উন্নত হয় না। সেই বিষয়টিই এখানে খুব সাবলীল ভাষায় বলা হয়েছে।

৬.

জঙ্গলে থাকি জঙ্গলে খাই জঙ্গলে করি বাস
মণ্ডলে বেড়া গোঁয়ার আইসে করল সর্বনাশ
হাত ভাঙল পা ভাঙল পিষ্টে করল ঘা
তোর যদি মরণ আইসে আমাক আইসে খা।

অর্থ : কাঁকড়া ধরে তার হাত-পা ছেঁটে পিঠে বড়শি বিঁধিয়ে মাছ ধরার জন্য নদীতে বড়শি ফেলা হয়েছে। তখনো কাঁকড়াটা জীবিতই আছে। ওদিকে মাছ কাঁকড়াকে খাওয়ার জন্য ঘুরছে। তখন মাছকে উদ্দেশ্য করে কাঁকড়ার উপর্যুক্ত উক্তিটি করেছে।

৭.

ইটখোলাক হেলা করে পাটখড়ির বেড়া
হস্তি-ঘোড়াক হেলা করে কানকাটা ভেড়া।

অর্থ : ইটকে উদ্দেশ করে পাটখড়ি বলছে, তোমাকে তো জোড়াতালি দিয়ে বেড়া বানাইতে হয়। আর আমাকে খাড়া করে দিলেই বেড়া হয়ে যায়। আর ভেড়া ঘোড়া আর হাতিকে উদ্দেশ করে বলছে, তুমি জীবনের কী দাম আছে যতই শক্তিশালী হও না কেন। আমি নদীর সাঁতরাতে পারি আর তোমরা তো পানিতেই নামতে পারো না।

৮.

চাইনে তোমার নাস্তাপানি
জবানেতে তুষ্ট আমি।

অর্থ : একজন সৎ লোক আরেকজনের উদ্দেশে বলছে, কোনো ভালো খাওয়া-দাওয়া নয়, বরং জবান মানে হচ্ছে, কথা দিয়ে কথা রাখাটাই বড় কথা। ভালো ব্যবহারটাই আসল কথা।

৯.

রূপের জন্য মরিনে আমি গুণের জন্য মরি
করলা ভাজি দিয়ে ভাত খাইয়ে মুরগের নাম করি।

www.pathagar.com

অর্থ : গুণটাই আসল রূপটা বাইরে দেখানোর জন্য। আন্তরিকতার সাথে মানুষকে অল্পতেই খুশি করা সম্ভব। অথচ শুধু বাইরের অবয়ব দেখিয়ে ভিতরটা সারশূন্য থাকে, তা বড়ই পীড়াদায়ক।

১০.

খুদের পেটও ভাত খুচ খুচ করে
আর নেছরালী শাড়ি পরে ঝুলুর ঝুলুর করে।

অর্থ : যে সারা জীবন শুধু খুত খেয়েছে, সে যদি ভালো কিছু খায়, সেই ভালো কিছু খাওয়ার জন্য তার পেটের পীড়া হতে পারে। আসলে মানুষ অভ্যাসের দাস। আর যে ভালো কোনো পোশাক পরেনি, সে যদি হঠাৎ কোনো ভালো পোশাক করে, তাইলে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না।

কথক : ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ধাঁধাগুলোর কথক আবদুল মান্নান ও আয়েশা খাতুন

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ লোকায়ত জীবনের কণ্ঠস্বর। প্রাচীনকালের আর্থ-সামাজিক জীবন ও ইতিহাস ঐতিহ্যের খণ্ডাংশ প্রবাদে লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যুগ যুগ ধরে একের অভিজ্ঞতা অন্যের মধ্যে অনুভব করেছে। নিজেকে চেনা জানার মধ্যে অন্যকে চেনা জানার অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত চিন্তন প্রবাদের মধ্যে সংহত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, প্রবাদ মানুষের অভিজ্ঞতা ও জীবন দর্শনের সংক্ষিপ্ত বাক্য। প্রবাদ দুটি থেকে চারটি চরণে অলংকার ও ছন্দের ভাষায় ব্যক্ত হয়। লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে প্রবাদ। এখানকার প্রবাদগুলোতে অশিক্ষার ছাপ থাকলেও সেগুলোর সহজ নির্মাণ শৈলী, প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়ের আকর্ষণীয় মাধুর্য সকল শ্রেণির পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে।

ক. সদর উপজেলার প্রবাদ-প্রবচন

১. কায়া দেখলে মায়া বাড়ে।
২. তুই কান্দিলে না মুই কান্দি, একলা একলা কত কান্দি।
৩. ভাত পায় না চা খায়, রিক্সা দিয়া পায়খানায় যায়।
৪. হাঁটুর মাংস কি আর বুকে লাগে।
৫. সিন্নিত বাড়া মোল্লাও খাড়া।
৬. মায়ের সাথে মামার বাড়ির গপ্প।
৭. এই দিন নয় আরো দিন আছে, এই দিনেরে নিবো আমি সেই দিনেরও কাছে।
৮. চান্দেরও মুখ পেন্দেরও মুখ।
৯. মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।
১০. ক্যারায় কইছে হেই কতার জোউ হইছে।
১১. ফহুন্নি বেডি ডাকছে চাছি, আমি কি আর আমি আছি।
১২. আমি করি আতাবাতা ও কয় কতাবাতা।
১৩. কুলেও তোলে না আবার মাথাও নেয় না।
১৪. মরে বেডি বিয়্যার গীত গায়।
১৫. বাইরে ফিটফাট, ভিতরে সদরঘাট।
১৬. যার মরণ যেনু, নাউ ভাড়া দিয়্যা যায় হেনু।
১৭. হায়রে মুখ মুহের চোডে চোহলা নিয়্যা পাদে।
১৮. দাওয়ের যদি জোর না থাকে, আছাড়ির আর কত জোর।
১৯. আরে ব্যাঙের আবার সর্দি।

www.pathagar.com

২০. তুই দিলে আমি দেই, একলা একলা কত দেই।
২১. আরে কইলে ঠারে বোঝে ভাইঙ্গা কইলে গাধায় বোঝে।
২২. জাতে মাতাল তালে ঠিক।
২৩. মানলে তালগাছ না মানলে বালগাছ।
২৪. কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।
২৫. কম পিরিতের কম জ্বালা, বেশি পিরিতের বেশি জ্বালা।
২৬. আমি কান্দি মায়ের লাইগ্যা মায়ে কান্দে হাইয়ের লাইগ্যা।
২৭. একেতো নাচুনে বুড়ি, তার উপরে ঢুলের বারি।
২৮. কইলে নারা নারা, না কইলে পেটটা ভরা।
২৯. কথায় আছে ছালুনে খায় ভাত।
৩০. যে গাছটা ধানী তার দুই পাতাতে চিনি।
৩১. চুন খাইয়া মুখ পুড়লে দই দেইখ্যা ডর করে।
৩২. নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগত ভরমিয়্যা দেখলাম ভাইরে একই মায়ের পুত।
৩৩. পরের উপর ভাত খায় আঠার মাসে বছর যায়।
৩৪. চিড়া কও মুড়ি কও ভাতের সমান নয়
চাচী কও জেডি কও মায়ের সমান নয়।
৩৫. যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পারইতে কতক্ষণ।
৩৬. পরের খায় ঘরের গায়।
৩৭. পরের ঘর ছিপ ফেলতেও ডর।
৩৮. যারে দেখছিনা ওযেন কত সুন্দরি
যার রান্ধন খাইছিনা সে যেন কত রান্ধুনি।
৩৯. কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস।
৪০. হোক তোমার এডা কতা ব্যাঙের এডা মাতা।
৪১. পরের ঘরে আগুন দিয়্যা টিক্যা ধরানো।
৪২. পরের ঘাড়ে বন্দুক রাইখ্যা গুলি করা।
৪৩. মায়ে করে ঝি ঝি, ঝিয়ে করে জামাই।
৪৪. আমি ম্যান কই কী আর সারিন্দা ম্যান বাজায় কী।
৪৫. পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো।
৪৬. আসল ঘরে মুগুর নাই ঢেঁকি ঘরে চান্দুয়া।
৪৭. পরের চোখে পথ চলা আর পরের মুখে ঝাল খাওয়া একই কথা।
৪৮. যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়াপড়শির ঘুম নাই।
৪৯. পরের জন্য গর্ত করলে আপনি তাতে মরে পড়ে।
৫০. খালি কলসি বাঁজে বেশি।
৫১. পুড়িয়ে এলাম নিজের মুখ, পরের দুধে দিয়া ফুঁক।
৫২. হাইয়ের লগে না পাইয়া বেড়া ভাঙ্গে ঠাপাইয়া।
৫৩. পরের ভাত পাতে পাই, কষি খুলে খাই।
৫৪. পরের সোনা দিওনা কানে, কেড়ে নিবে হ্যাঁচকা টানে।

www.pathagar.com

৫৫. গরিবের বাড়িতে হাতির পারা।
৫৬. যে বিলাইয়্যা ইন্দুর ধরে, ঘাড়ের রোমা ফর ফর করে।
৫৭. দিল্লিকা লাডডু, খেয়েও পস্তাতে হয়, না খেয়েও পস্তাতে হয়।
৫৮. আল্লায় দিলে পায়, মাগিয়ে দিলে খায়।
৫৯. একেতে বিদ্যা দুইতে ধন, এতে যুদি না হয় ঠন ঠন।
৬০. পরের পিঠা, ভারি মিঠা।
৬১. যেই লাউ হেই কদু।
৬২. একে চুপচাপ, দুয়ে গণ্ডগোল
তিনে হাট আর চারে বাপরে বাপ।
৬৩. কাম নাই ছেড়ি কাম করে, কলাপাতার বেনি বান্দে।
৬৪. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।
৬৫. অল্প বিদ্যা ভয়ংকরি, জুতারে কয় আলমারি।
৬৬. পরের হাতে ধন থুইয়্যা যে কয় আছে, তার ধন তো খাইয়্যা গেছে বোয়াল মাছে।
৬৭. যার নয়ন যারে লাগে ভাল।
৬৮. হা করলে হামিদপুর বোঝা যায়।
৬৯. বিদেশে দেশের কাওয়া দেখলে মন জুড়ায়।
৭০. ঠক বাছতে গাঁ উজাড়।
৭১. কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালে পাঁজি।
৭২. যখন তোমারে দেখি তার চেয়ে বেশি দেখি যখন তুমারে না দেখি।
৭৩. চোর মাগির বড় গলা , খালি খায় দুধ কলা।
৭৪. মাথাও নাই তার ব্যথাও নাই।
৭৫. দাদারে পাদা শিখায়ো না।
৭৬. আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর নেয়।
৭৭. কাশে পাদ ঢাকে না।
৭৮. যেনু রাইত হেনুই কাইত।
৭৯. গরু বাছুরে মিল থাকলে বন্দ গেলেও দুধ দেয়।
৮০. নাইল্যা খেতে বিয়াইছে গাই , সে সম্বন্ধে মামাত ভাই।
৮১. মুলার ভিতরে আলি নাই, দুলাভাইয়ের শালি নাই।
৮২. বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়।
৮৩. বাঙ্গি খাইতে বালু বালু তরমুজ খাইতে পানি, মাইয়া মানুষ এত নিষ্ঠুর আগে তনা জানি।
৮৪. বউ অইল ৬ আনা, শালি ৭ আনা, শালা আছে যত সব ১ আনা।
৮৫. বেশি বেশি পিরীত, বেশি বেশি জ্বালা, কম কম পিরীত, Lasting করে ভালা।
৮৬. খাইয়্যা আর কাম নাই।
৮৭. নিজের ঘরে খাইয়্যা পরের জন্য খাটি।
৮৮. নিন্দাইলে নিন্দিতে হয়।

www.pathagar.com

৮৯. সারাঘর লেইপ্যা দুয়ারে কালি ।
৯০. সতিনের পোলা মোটাই হয় ।
৯১. আউশের পিডা মধ্যে কাঁচা ।
৯২. চিন্তা কর নুরু, গাছ লাগাইল কুনু, করুল দিল কুনু ।
৯৩. শিয়ালের কাছে মুরগি বাগি দেওয়া ।
৯৪. সাবধানের মাইর নাই ।
৯৫. খাইয়া বাঁচলে কামাই, মাইয়া বাঁচলে জামাই ।
৯৬. হুন্দর হওড়ির সেলাম নাই, মাই হওড়ির কুতকুতানি ।

তথ্যসূত্র : হাসনা হেনা রুমা, পিতা- আবদুল হাকিম, নরুন্দি মাঝপাড়া, জামালপুর, কর্তৃক সংগৃহীত, তারিখ : জুলাই ২০০৯, স্থান : নরুন্দি, জামালপুর

খ. হিতকরী প্রবচন

আহাম্মক একশ এগার

এই প্রবচনগুলো লিখেছেন ভ্রমন্ত সরকার। 'আহাম্মক একশ এগার' নামে তিনি একটি পুস্তিকা ছেপেছিলেন রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, লোকসমাগমের স্থানে বিক্রির উদ্দেশ্যে। মূল্য ছিল এক টাকা। তারই একটি কপি থেকে এই প্রবচনগুলো সংকলিত করা হলো। উল্লেখ্য, ভ্রমন্ত সরকারের আসল নাম ওয়াজেদ আলী মণ্ডল। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ কি ১৯৭৩ সালে তিনি জামালপুরে এসে আমলাপাড়ায় বাসা ভাড়া নিয়ে স্বপরিবারে বসবাস করতেন। তার স্থায়ী বাড়ি ছিল তৎকালীন জামালপুর মহকুমাধীন শেরপুর থানার ঝিনাইগাতীতে। সম্ভবত তিনি ওয়াপদার কোন একটি নিম্নপদে চাকরি করতেন। জামালপুরে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বৃদ্ধ অবস্থা। শ্মশ্রুমণ্ডিত ওয়াজেদ আলী মণ্ডল ছিলেন সহজ সরল একজন লোক। জানা যায়, তিনি অনেক লোকগল্প, লোকছড়া, লোককাহিনি, রূপকথা, ধাঁধা, প্রবচন ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাড়া বাসার সামনে 'লোকসাহিত্য ভাণ্ডারি' নামে সাইনবোর্ড লাগিয়ে ছিলেন। তিনি জামালপুরে একজন লোকসাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে পরিচিত লাভ করেছিলেন। তিনি আশির দশকের শুরুর দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পরিবারবর্গও জামালপুর থেকে চলে যান। তাঁর সংগৃহীত লোকসাহিত্যসমূহের পরিণতি কি হয়েছে সে সম্পর্ক কিছু জানা যায় না।

আহাম্মক এক
যে গরিব হয়ে ধনীর সাথে দেয় ঠেক ।

ভাবার্থ : গরিবের পক্ষে ধনী ব্যক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে নাই ।

আহাম্মক দুই
যে ঘর ছাইয়্যা না ধরে টুই ।

ভাবার্থ : দুইচালের উপরিভাগের সংযোজনের স্থানের 'টুই' না ধরিলে বৃষ্টিতে কষ্টভোগ করিতে হয় ।

আহাম্মক তিন
যে ছোট লোকের কাছে করে ঋণ ।

www.pathagar.com

ভাবার্থ : নীচ আত্মালোকের নিকট হইতে ঋণ করিলে উহা শোধ না করা পর্যন্ত অপমানিত হইতে হয়।

আহাম্মক চার
যে নিজের গোপনীয় কথা করে বার।

ভাবার্থ : নিজের গোপনীয় কথা প্রকাশ করিলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়িতে হয়।

আহাম্মক পাঁচ
যে দু'সীমানায় লাগায় গাছ।

ভাবার্থ : উভয় পক্ষের সীমানার মধ্যস্থলে গাছ লাগাইলে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ দাবি করিয়া থাকে। অতএব সীমানা হইতে কিছু দূরে নিজ জমিতে গাছ লাগান উত্তম।

আহাম্মক ছয়
যে নিজের টাকা অন্যের কাছে থোয়।

ভাবার্থ : নিজের টাকা কখনও অন্যের নিকট রাখিতে নাই, ভবিষ্যতে খোয়া যাইতে পারে।

আহাম্মক সাত
যে জমি থাকতে পায় না ভাত।

ভাবার্থ : নিজের জমি স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিয়া চাষাবাদ করা উচিত। অপরের তত্ত্বাবধানে বা চাষাবাদে রাখিলে রীতিমত ফসল পাওয়া যায় না।

আহাম্মক আট
যে ঝি, বৌ একা দেয় জলের ঘাট।

ভাবার্থ : প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ও ছেলের বৌকে কখনও নিঃসঙ্গ অবস্থায় জলের ঘাটে পাঠাইতে নাই।

আহাম্মক নয়
যে বৌয়ের কাছে গুপ্ত কথা কয়।

ভাবার্থ : গোপন কথা কখনও নিজের স্ত্রীর নিকটে প্রকাশ করিতে নাই।

আহাম্মক দশ
যে হয় ঝি, চাকর ও বৌয়ের একান্তই বশ।

ভাবার্থ : নিজের ব্যক্তিত্ব থাকা উচিত। ঝি, চাকর ও বৌয়ের বশীভূত হইয়া চলিতে নাই।

আহাম্মক এগার
যে পুকুর থুইয়া গোসল করে পাগার।

ভাবার্থ : আমাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে সর্বদা পরিস্কার পানিতে গোসল করা প্রয়োজন। অতএব বাড়ির নিকটে ভাল পানি থাকা সত্ত্বেও খারাপ পানিতে গোসল করিতে নাই।

আহাম্মক বার
যে জমি কিনে নদীর পাড়।

www.pathagar.com

ভাবার্থ : নদীর পাড়ে জমি কিনিলে উহা একদিন না একদিন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

আহাম্মক তের
যে অন্যের কথা হেরফের কইর‍্যা পড়ে ফের।

ভাবার্থ : অপরের কথা লইয়া প্যাচাপেচি করিলে অবশেষে বক্তাকেই বিপদে পড়িতে হয়।

আহাম্মক চৌদ্দ
যে জটিল রোগীকে দেখায় না বিভিন্ন বৈদ্য।
ভাবার্থ : জটিল রোগীকে বিভিন্ন বৈদ্য দেখান উচিত।
আহাম্মক পনর এর কথা বলতে কাঁপে অন্তর
যে বড় নাও কিনে না কিনে নোঙ্গর।

ভাবার্থ : বড় নায়ে নোঙ্গর না থাকিলে ঝড় তুফানের সময়ে বিপদে পড়তে হয়।

আহাম্মক ষোল
যে নিজের পোলা থুইয়্যা অন্যের পোলা লয় কোল।

ভাবার্থ : নিজের সন্তানকে কোলে লইয়া সময় কাটানোর পরিবর্তে দায়ে পড়িয়া যে অন্যের সন্তানকে কোলে লইয়া লালন পালন করে সে দুর্ভাগা।

আহাম্মক সতের
যে হাল জুইড়্যা সীমা ছাইড়্যা লাঙ্গল দেয় বাতর।

ভাবার্থ : নিজের জমির সীমা লজ্ঘন করিয়া অন্যের জমিতে গেলে তাহার সহিত শত্রুতা সৃষ্টি হয় এমন কি জীবন হানির সম্ভাবনা থাকে।

আহাম্মক আঠার
যে বাড় পাইতে ছাড়ে ঘাড়।

ভাবার্থ : মাছ ধরিবার জন্য বাড় পাতিয়া নিকট হইতে চলিয়া গেলে তাহাতে যে মাছ পড়ে, উহা অন্যে লইয়া যায়। এই জন্য নিকটে থাকিয়া পাহারা দেওয়া প্রয়োজন।

আহাম্মক উনিশে বলব কি
যে বাড়ির কাছে বিয়ে দেয় নিজের ঝি।

ভাবার্থ : বাড়ির নিকটে মেয়ে বিবাহ দিতে নাই। ইহাতে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আহাম্মক বিশ এর কথা নাও ধরে
যে নিজের স্ত্রী থুইয়া অন্যের স্ত্রী হরে।
ভাবার্থ : নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্যের স্ত্রীকে হরণ করিলে মহাপাপ হয়।
আহাম্মক একুশ এর কথা কেন ছাড়ি
যে শ্বশুর বাড়ির কাছে করে বাড়ি।

ভাবার্থ : স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হইলে ইহা শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছিয়া যায় বলিয়া পরস্পরে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

আহাম্মক বাইশ
যে খেড়ের পুঞ্জি না করে, আগে কিনে মইষ।

ভাবার্থ : মহিষকে প্রচুর আহার না দিলে দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়ে। অতএব আগে খড় মজুত করিয়া পরে মহিষ কিনিতে হয়। গরু সম্বন্ধে একই বক্তব্য।

আহাম্মক তেইশ এর কথা কেন ছাড়ি
যে দেয় না যেতে মেয়েকে স্বামীর বাড়ি।

ভাবার্থ : কন্যা স্বইচ্ছায় স্বামীর বাড়ি যাইতে চাহিলে এই অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ।

আহাম্মক চব্বিশ এর কথা বলা দায়
যে নিশাকালে বিছানার কাছে কুপি রেখে ঘুমায়।

ভাবার্থ : রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় কুপি বাতি ফাঁকা জায়গায় রাখিয়া ঘুমাইতে হয়। বিছানার নিকটে রাখিলে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে উহাতে হাত লাগিয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আগুন ধরিয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া সলিতার অগ্নিকণা ফুটিয়া বিছানায় পড়িয়া আগুন ধরিতে পারে।

আহাম্মক পঁচিশ এর কথা বলতে লাগে আঘাত
যে বৌয়ের সাথে রাগ কইর‍্যা খায়না ভাত।

ভাবার্থ : নিজের স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া সেই অভিমানে ভাত না খাইলে নিজেরই স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে।

আহাম্মক ছাব্বিশ এর কথা বলতে উঠে জ্বালা
যে গোবরের উপর দেয়া না চালা।

ভাবার্থ : সাররূপে যে গোবর স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয়, উহার উপরে চালা না দিলে রোদ ও বৃষ্টিতে উহার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

আহাম্মক সাতাইশ এর কথা বলি সবার ঠাঁই
যে দুধ না দুয়ে কিনে আনে গাই।

ভাবার্থ : দুধালো গাই কিনিতে হইলে আগে উহা দোহন করিয়া আনা উত্তম।

আহাম্মক আটাইশ এর কথা কেন ছাড়ি
যে ঘন ঘন যায় শ্বশুরবাড়ি।

ভাবার্থ : ঘন ঘন শ্বশুর বাড়ি গেলে জামাইয়ের আদর থাকে না।

আহাম্মক উনত্রিশ এর কথা নাও ধরে
যে নিজের মাল মজুত রাখে অন্যেও ঘরে।

ভাবার্থ : নিজের মাল অন্যের ঘরে রাখিলে লোভ ও অভাবের বশীভূত হইয়া সে আত্মসাৎ করিতে পারে।

আহাম্মক ত্রিশ
যে দেয় না কুয়ার ঘির।

www.pathagar.com

ভাবার্থ : ঘিরহীন কুয়ায় দৈব দুর্বিপাকে গৃহপালিত পশু, পাখি এমন কি অবোধ শিশু পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়া যাতায়াতকালে পড়িয়া যাইতে পারে।

আহাম্মক একত্রিশ এ হল দুনিয়ার বাইর
যে দু'চালা ঘরের লম্বা রাখে পাইড়।

ভাবার্থ : ঘরের পাইড় চাল অপেক্ষা লম্বা রাখিলে নীচ ও বাঁকানো ঘরের নিকট দিয়া যাতায়াতকালে মানুষের মাথায় লাগিয়া দারুণ ব্যথা পাওয়া যায়।

আহাম্মক বত্রিশ এর কথা বলা দায়
যে স্বীকার করে পরাজয় প্রতি কথায়।

ভাবার্থ : কোনস্থানে কিভাবে কথা বলিতে হয় সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকিলে নীরব থাকাই উত্তম।

আহাম্মক তেত্রিশ এর কথা বলি সবার পাছ
যে ঘরের কাছে রাখে তাল, তেঁতুল ও শিমুল গাছ।

ভাবার্থ : ঘরের নিকটে তাল তেঁতুল ও শিমুল গাছ রাখিতে নাই। উহার ছায়াদ্বারা সেই ঘরের লোকের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া থাকে। তদুপরি উহাতে শকুন পড়িলে সেই বাড়ির অবনতি ঘটিয়া থাকে।

আহাম্মক চৌত্রিশ এর কথা শোন মন দিয়া।
যে বিপত্নীক পঞ্চাশের পর যুবতীকে করে বিয়া।

ভাবার্থ : পুরুষের সাধারণত পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত নারীকে তৃপ্তিদানের ক্ষমতা থাকে। উহার পর যুবতীকে বিবাহ করিলে সেই যুবতী বাধ্য হইয়া নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটাইয়া থাকে।

আহাম্মক পঁয়ত্রিশ এর কথা বলতে হই দিশাহারা।
যে যৌথ কারবার করে দলিলপত্র ছাড়া।

ভাবার্থ : দলিলপত্র ছাড়া যৌথ কারবার করিলে পরিশেষে অংশীদারদের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি হইতে পারে।

আহাম্মক ছয়ত্রিশ এর কথা বলতে লাগে আঘাত
যে কথায় কথায় করে 'নাট পাট'।

ভাবার্থ : একজনের ভালমন্দ সম্বন্ধে অন্য আর একজনের সহিত আলোচনা করা উচিত নয়।

আহাম্মক সাইত্রিশ এর কথা বলতে যায় জাত
যে চিরদিন খায় পরের ঘরে ভাত।

ভাবার্থ : যে চিরদিন অপরের ঘরে ভাত খাইয়া আয় করিতে চায়, সে জীবনে উন্নতি করিতে পারে না।

আহাম্মক আটত্রিশ এর কথা শুনে নাও
যে বর্ষে দিনে অন্যরে দেয় নাও।

www.pathagar.com

ভাবার্থ : নিজের কাজ রাখিয়া বর্ষা দিনে অন্যকে নাও দিলে সময় মত উহা ফেরত না পাওয়ার দরুন নিজের কাটা ফসল পর্যন্ত হঠাৎ ঢল নামিলে স্রোতের টানে চলিয়া যাইতে পারে।

আহাম্মক উনচল্লিশ এর কথা বলতে কাঁপে ভ্রু
যে কিনে লাথিমারা ও গুঁতানে গরু।

ভাবার্থ : যে গরু মানুষকে পা দ্বারা লাথি মারে ও শিং দ্বারা তাড়া করে এইরূপ গরু কিনিতে নাই।

আহাম্মক চল্লিশ এর কথা বলতে হারাই হুশ
যে পথিকাবস্থায় রাখে না জিনিসের খোঁজ।

ভাবার্থ : পথিকাবস্থায় বিশ্রামের পর উঠিয়া যাওয়ার সময় ভালভাবে জিনিসের সন্ধান লওয়া উচিৎ। হঠাৎ কোন কিছু ফেলিয়া গেলে উহা আর পাওয়া যায় না।

আহাম্মক একচল্লিশ এর কথা মনে রেখো চিরদিন
যে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও করে ঋণ।

ভাবার্থ : নিজের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও লোভের বশবর্তী হইয়া কখনও ঋণ করিতে নাই।

আহাম্মক বেয়াল্লিশ এর কথা শুন ওগো
যে পরকে জিনিস দিয়া হারায় নিজের কাজের জো।

ভাবার্থ : নিজের ক্ষতি করিয়া কখনও অপরকে কোনো জিনিস দিতে নাই।

আহাম্মক তেতাল্লিশ এর কথা বলে যাই
যে কিনে কাঁচা কাঁঠাল ও গাভিন গাই।

ভাবার্থ : কাঁচা কাঁঠাল পোক্তা না হইলে ভালভাবে পাকিতে পারে না। পাকিলে উহা খাইয়া স্বাদ পাওয়া যায় না। গাভিন গাই সু-বিয়ান নাও দিতে পারে, বিয়ালেও মায়ে বাচ্চাকে দুধ না দিলে বাচ্চা মরিয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কোন কোন গাভি দোহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

আহাম্মক চুয়াল্লিশ এর কথা বলা দায়
যে নিজের গরজে অন্যের ক্ষতি করতে চায়।

ভাবার্থ : অন্যের আর্থিক ক্ষতি করিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চাহিলে প্রায়ই ইহা সফল হয় না।

আহাম্মক পয়তাল্লিশ এর কথা বলতে মাথা হয় হেঁট
যে সাথে নিয়ে চলে টাকার ব্যাগ।

ভাবার্থ : পথিকাবস্থায় টাকার ব্যাগ সঙ্গে লইয়া চলাফেরা করিলে চোর, ডাকাত, দস্যু ইত্যাদি লোকে রাহাজানি করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

আহাম্মক ছয়চল্লিশ এর কথা কেন ছাড়ি
যে নাইয়্যা হইয়া নদীর ভাঙ্গে ফাঁড়ি।

ভাবার্থ : নৌ মাঝি বা জাহাজের নাবিককে সর্বদা আসল নদী দিয়া নৌকা ও জাহাজ চালাইয়া যাইতে হয়। ফাঁড়ি নদীর সম্মুখে চরা হইতে পারে।

www.pathagar.com

আহাম্মক সাতচল্লিশ এর কথা বলতে লাগে আঘাত
যে যানবাহনে টাকা রাখে না সাথ ।

ভাবার্থ : রেলগাড়ি, জাহাজ, উড়োজাহাজ, মটরবাস, নৌকা ইত্যাদি যানবাহনে যাতায়াতকালে টাকা পয়সা সর্বদা নিজের জামা-কাপড়ের ভিতরে অতি সাবধানে রাখিতে হয়। ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, বিছানাপত্র, ব্যাগ, ইত্যাদির ভিতরে টাকা রাখিতে নাই । আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা হইলে উহা পাওয়া যায় না । নিজের নিকটে রক্ষিত টাকা দ্বারা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ।

আহাম্মক আটচল্লিশ এর কথা বলতে করে লাজ
যে নিজের চিন্তা ধারানুপাতে করে না কাজ ।

ভাবার্থ : নিজের চিন্তা ধারানুপাতে কাজ না করিলে কোন কাজেই কৃতকার্য হওয়া যায় না ।

আহাম্মক উনপঞ্চাশ
যে আলো বায়ু হীন স্থানে করে চাষ ।

ভাবার্থ : শাকসবজি, তরিতরকারি, ফল, ফসল ইত্যাদির চাষ করিতে হইলে যেখানে সর্বদা প্রসারিত বায়ু ও প্রখর রৌদ্রের তাপ পাইয়া থাকে সেখানে করা উচিত । ছায়াতে হলুদ, আদা, পান, আনারস, কচু, ধনে ইত্যাদি হইয়া থাকে ।

আহাম্মক পঞ্চাশ
যে বাড়ির ভিতরে লাগায় চোকাফল ও কাঁটাফুল গাছ ।

ভাবার্থ : বাড়ির ভিতরে চোকা ফল গাছ থাকিলে শিশুরা অসুখাবস্থায় খাইয়া আরও অসুখ বাড়াইয়া থাকে । কাঁটাফুল গাছ থাকিলে শিশুরা অসাবধানে উহার ফুল তুলিতে গিয়া হঠাৎ কাঁটা লাগিয়া কষ্টভোগ করিতে হয় ।

আহাম্মক একপঞ্চাশ
যে আগপাছ না ভাইব্যা সম্পত্তি করে নাশ ।

ভাবার্থ : জমি-জমা ও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করিয়া তদুপেক্ষা ভাল জমি কিনার সুযোগ ঘটিলে বিক্রি করা উত্তম । নতুবা নগদ টাকা উড়িয়া যায় ।

আহাম্মক বায়ান্ন এর কথা কেন ছাড়ি
যে বাড়ির সামনে জমি অন্যেরে দেয় করতে বাড়ি ।

ভাবার্থ : বাড়ির সামনে নিজের জমি থাকিলে উহা কখনও অন্যকে বাড়ি করিবার জন্য দিতে নাই । ইহাতে নিজের বাড়ি পিছনে পড়িয়া যায় ।

আহাম্মক তেপান্ন এর কথা বলতে জ্বালা উঠে গায়
যে নিজের জো ছেড়ে অন্যের হাল দিতে যায় ।

ভাবার্থ : নিজের ক্ষেতে চাষের সুযোগ থাকিতে কখনও উহা বাদ দিয়া অন্যকে হাল দিতে নাই ।

আহাম্মক চুয়ান্ন এর কথা শোন মন দিয়া
যে দ্বিতীয় বরের কাছে কন্যাকে দেয় বিয়া ।

www.pathagar.com

ভাবার্থ : কন্যাকে দ্বিতীয় বরের নিকট বিবাহ দিতে নাই।

আহাম্মক পঞ্চান্ন এর কথা কওন যায় না
যে পরচা দাখিলা না দেখে জমি করে বায়না।

ভাবার্থ : জমির স্বত্ব হইল পরচা ও দাখিলা। উহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না দেখিয়া জমি বায়না করিলে ক্রেতাকে ঠকিতে হয়।

আহাম্মক ছাপান্ন এর কথা বলতে হয় কষ্ট
যে অনেকেরে কুযুক্তি দিয়া করে নষ্ট।

ভাবার্থ : আমরা বিপদে আপদে পড়িয়া উহা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকের নিকট পরামর্শ লইয়া থাকি। সে সময় পরামর্শদাতার ভিতরে কেহ কেহ খারাপ বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধ্বংসের দিকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে।

আহাম্মক সাতান্ন এর কথা কওন নাহি যায়
যে বুদ্ধি থাকতে শ্বশুরবাড়ি খেটে খায়।

ভাবার্থ : শ্বশুরবাড়ি থাকিয়া পরিশ্রম করিলে শুধু খোরাক পোশাক পর্যন্তই পাইয়া থাকে। ভবিষ্যতে নিজস্ব সংসার গড়িয়া তোলার কোন আশা করা যায় না।

আহাম্মক আটান্ন এর কথা বলতে করে ভয়
যে পিতামাতার কাছে না বইল্যা ঘর জামাই হয়।

ভাবার্থ : পিতা মাতাকে না জানাইয়া কখনও ঘর জামাই হতে নাই।

আহাম্মক ঊনষাইট এর কথা শোন মন দিয়া
যে শিক্ষিতা মেয়েকে মুর্খের কাছে দেয় বিয়া।

ভাবার্থ : শিক্ষিতা মেয়েকে কখনও মুর্খ বরের সহিত বিবাহ দিতে নাই।

আহাম্মক ষাইট এর কথা বলতে দুঃখ করে বুড়ি
যে বৌকে মারতে হাতের ভাঙ্গে চুড়ি।

ভাবার্থ : নিজের স্ত্রীকে মারিবার সময় যাহাতে তার হাতের চুড়ি না ভাঙ্গে সেই দিকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

আহাম্মক একষট্টি এর কথা বলতে বন্ধ হয় শ্বাস
যে শত্রুকে আবার করে বিশ্বাস।

ভাবার্থ : শত্রুকে বিশ্বাস করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

আহাম্মক বাষট্টি একে যায় না ফেলা
যে শক্তিতে হীন হইয়া করে শত্রুর মোকাবেলা।

ভাবার্থ : শত্রুর দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চয় না করিয়া তাহার সহিত মোকাবেলা করিলে নিজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

আহাম্মক তেষট্টি এর কথা বলা ভার
যে ফসল করে জমিতে না দিয়া সার।

ভাবার্থ : জমিতে পরিমিত ফসল পাইতে হইলে নিয়মানুপাতে দরকারি সার দিয়া বীজ বপন করিতে হয়।

www.pathagar.com

আহাম্মক চৌষট্টি এর কথা যায় না ফেলা
যে বাপ-দাদার ব্যবসা করে হেলা।

ভাবার্থ : বংশগত ব্যবসাকে অবজ্ঞা করিতে নাই। উহা চালু রাখিয়া অন্য ব্যবসা করা ভাল।

আহাম্মক পঁয়ষট্টি এর কথা কেন ছাড়ি
যে বিয়া কইর‍্যা বৌ রাখে শ্বশুরবাড়ি।

ভাবার্থ : দীর্ঘদিন বৌকে শ্বশুর বাড়ি রাখিলে সেখানের সকলের মনমেজাজ খারাপ হইয়া যায়। তাহাতে মতান্তর হইতে পারে। তদুপরি যুবতী কন্যা দীর্ঘদিন বাপের বাড়ি থাকিলে নৈতিক অধঃপতন ঘটিতে পারে।

আহাম্মক ছয়ষট্টি এর কথা বলা নাহি যায়
যে টাকা না খাটায়ে আয় করতে চায়।

ভাবার্থ : নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় খাটাইতে হয়। বিনা টাকায় আয়ের আশা করা বৃথা।

আহাম্মক সাতষট্টি এর কথা বলতে হই হিমসিম
যে নৌকা চালায় না বেঁধে নৌকাডুবির চিন।

ভাবার্থ : ঝড়-তুফানে নৌকা ডুবিয়া প্রায়ই নিখোঁজ হয়। ইহার জন্য দুই হাত পরিমাণ একটা কলাগাছের টুকরা লইয়া নৌকার ভিতরে রাখ। তারপর জলের গভীরতা অপেক্ষা একটা লম্বা রশি দ্বারা এক মাথা কলাগাছের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া অপর মাথাটা নৌকার গলুইয়ের সহিত বাঁধিয়া রাখ। এমতাবস্থায় নৌকাটি ডুবিয়া স্রোতের চাপে যেখানেই যাউক না কেন এই ভাসন্ত কলাগাছের টুকরা দ্বারা অতি সহজেই ধরা যাইবে।

আহাম্মক আটষট্টি এর কথা বলতে করে ভয়
যে জমি কিনে বিক্রিদারের নিকট বাগি দিয়ে থোয়।

ভাবার্থ : সাফকওলা কিংবা রেহান বন্ধকি জমি কিনিয়া কখনও বিক্রিদারের নিকটে বর্গা দিতে নাই। তাহাতে জমি বেদখল হওয়ার সম্ভাবনা।

আহাম্মক ঊনসত্তর এ হল দুনিয়ার বাইর
যে হাটে ঘাটে করে মাইর।

ভাবার্থ : হাটে-ঘাটে কখনও মারামারি করিতে নাই। তাহাতে উভয়দল প্রবল হইয়া রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে।

আহাম্মক সত্তর এর কথা কেন ছাড়ি
যে পুরুষ হইয়া যাতায়াত করে বিধবার বাড়ি।

ভাবার্থ : পুরুষ হইয়া বিধবার বাড়িতে যাতায়াত করিতে নাই। পীরিতের ফাঁদে পড়িলে ভবিষ্যতে গর্ভবতী হইলে উভয়কে কুলকলঙ্ক হইত হয়।

আহাম্মক একাত্তর এর কথা নাও ধরে
যে এক বুদ্ধি থুইয়া সাত বুদ্ধি করে।

ভাবার্থ : এক বুদ্ধি দ্বারা যে কোন কাজ করিলে জয় অনিবার্য। অনেক বুদ্ধি করিয়া সাত কাজে হাত দিলে কোনটাই ঠিকমত হয় না।

www.pathagar.com

আহাম্মক বাহাত্তর এর কথা বলতে জ্বালা উঠে গায়
যে হাতে জুতা ধইর‍্যা চলে খালি পায়।

ভাবার্থ : আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার সময় জুতা ধরিয়া যাইতে নাই। আত্মীয়ের সহিত দেখা হইলে লজ্জা পাইতে হয়।

আহাম্মক তিহাত্তর এর কথা বলব কি
যে হঠাৎ সাক্ষাতে করে পীরিতি।

ভাবার্থ : হঠাৎ সাক্ষাতে কাহারও সহিত প্রেমালাপ করিলে নিজের মানসম্মান যাওয়ার সম্ভাবনা।

আহাম্মক চুয়াত্তর এর কথা বলব কি
যে সাধু হয়ে চোরের কাছে বিয়ে দেয় নিজের ঝি।

ভাবার্থ : ভাল লোকের ঝি কখনও চোরের নিকট বিবাহ দিতে নাই। সে শ্বশুর বাড়ির মালামাল রক্ষা করা দূরে থাকুক নিজেই আরও বেশি করিয়া চুরি করিয়া থাকে।

আহাম্মক পঁচাত্তর এর কথা বলতে জ্বালা উঠে গায়
যে কাঁধে জামা রাইখ্যা চলে খালি গায়।

ভাবার্থ : কেহ জামা কাঁধে ধরিয়া খালি গায়ে চলিলে পথি মধ্যে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে লজ্জা পাইতে হয়।

আহাম্মক ছিয়াত্তর এর কথা মনে রেখো শুনি
যে আগপাছ না বুইঝা মাথায় বাড়ি দিয়া হয় খুনি।

ভাবার্থ : জিদের বশবর্তী হইয়া ভবিষ্যত চিন্তা না করিয়া কাহাকেও খুন করিতে নাই। অপরাধীকে শেষে কারাবাসী হইতে হয়।

আহাম্মক সাতাত্তর এর কথা বলতে করে ঘিনঘিন
যে ঘোড়া কিনে, না কিনে জিন।

ভাবার্থ : বেশি দামের দৌড়ানো ঘোড়া কিনিয়া উহার পিঠে জিন বা চামড়ার গদি ব্যবহার না করিলে মানানসই হয় না।

আহাম্মক আটাত্তর এর কথা বলা দায়
যে ছোট হয়ে বড়র গিবত গায়।

ভাবার্থ : নিজে অর্থহীন ও শক্তিহীন হইয়া অর্থশালী ও শক্তিশালী লোকের সহিত যে কোন বিষয়ে নিন্দা করা উচিত নয়।

আহাম্মক উনাশী এর কথা কেন ছাড়ি
যে অতিরিক্ত জোয়াল ডলনা ছাড়া হাকায় বোঝাই গাড়ি।

ভাবার্থ : গরুগাড়িতে বোজাই মাল লইয়া দূরবর্তী স্থানে যাইতে হইলে সঙ্গে অতিরিক্ত জোয়াল ও ডলনা রাখা উচিত। নতুবা রাস্তায় ভাঙ্গিলে সময় নষ্ট ও কাজের অশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

আহাম্মক আশি এর কথা বলব কি আর
যে মোকামে জিনিস পাঠায় খবর না রেখে বাজার।

www.pathagar.com

ভাবার্থ : খরিদ ও বিক্রির দরপড়তা জানিয়া মাল খরিদ করিয়া রপ্তানি করিতে হয়।

আহাম্মক একাশি এর কথা বলি সবার পাছ
যে বাড়ির ভিতরে লাগায় কামরাঙা গাছ।

ভাবার্থ : শাস্ত্রে বিধান করিয়াছে যে, বাড়ির ভিতরে কামরাঙা গাছ রাখিলে দিন দিন সেই বাড়ির বংশ নাশ হইয়া থাকে।

আহাম্মক বিরাশি এর কথা বলতে কাঁপে ভ্রু
যে হাল মই না দেইখ্যা কিনে আনে গরু।

ভাবার্থ : হাল মই জুরিয়া দেখিয়া শুনিয়া গরু কিনিতে হয়।

আহাম্মক তিরাশি এর কথা কেন ছাড়ি
যে বৌ মইরা গেলেও যায় শ্বশুরবাড়ি।

ভাবার্থ : বৌ মরিয়া গেলে শ্বশুরবাড়ি যাইতে নাই। কারণ জামাইকে দেখিতে পাইয়া মৃত কন্যার মাতা-পিতার দুঃখ আরও বাড়িয়া যায়।

আহাম্মক চুরাশি এর কথা বলি সবার কাছে
যে মলত্যাগকালে আঁধারে আলো ধরে রাখে।

ভাবার্থ : মলত্যাগকালে রাত্রির আঁধারে নিজের নিকটে আলো রাখিতে নাই। সে আলো দ্বারা বাইরের লোকে তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পারে কিন্তু সে বাহিরের লোককে দেখিতে পায় না।

আহাম্মক পঁচাশি এর কথা বলি সবার পাছ
যে হাল থুইয়া ধরে মাছ।

ভাবার্থ : কৃষককে দৈনিক হাল বাহিতে হয়। এমতাবস্থায় ভাল মতো হাল বাওয়া বাদ দিয়া মাছ ধরার পিছনে পিছনে ঘুরিলে অশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

আহাম্মক ছিয়াশি এর কথা নাও ধরে
যে লোভে পইর‍্যা দুই স্ত্রী করে।

ভাবার্থ : প্রথম স্ত্রী ও তাহার ছেলেমেয়ে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেহ ভুলক্রমে আর এক কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয়।

আহাম্মক সাতাশি এর কথা বলব কি
যে কুমারি ও চাকরানীর সাথে করে পীরিতি।

ভাবার্থ : অবিবাহিতা নারী ও চাকরানীর সহিত পীরিতি করিলে অবশেষে কুলকলঙ্ক হইতে হয়।

আহাম্মক অষ্টাশি এর কথা বলি সবার ঠাঁই
যে পালে রাখে চিরবন্ধ্যা গাই।

ভাবার্থ : চিরবন্ধ্যা গাই অপেক্ষা বৎসর বিয়ানি গাভি সর্বোত্তম।

আহাম্মক উননব্বই এর কথা নাও ধরে
যে এক পথে কাঁটা দিয়া তিন পথ করে।

www.pathagar.com

ভাবার্থ : ফসল করা ক্ষেতে কোন কোন স্থানে সোজাভাবে পথিক যাতায়াত করাতে একটা রাস্তা হইয়া যায়। ক্ষেতওয়ালা সেই রাস্তার উভয় মাথায় কাঁটা দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে পথিক উহার উভয় পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করাতে আরও দুইটা রাস্তা হইয়া যায়।

আহাম্মক নব্বই এর কথা কেন ছাড়ি
যে নদীর হানায় করে বাড়ি।

ভাবার্থ : নদী যেখানে ভাঙ্গিয়া যায় সেখানে বাড়ি করিলে একদিন না একদিন উহা ভাঙ্গিয়া যায়।

আহাম্মক একানব্বই এর কথা নাও ধরে
যে শোলা রাখে ধন্নার উপরে।

ভাবার্থ : ঘরের ধন্নার উপরে শোলা রাখিলে উহার নীচ দিয়া লোকে আগুন লইয়া যাতায়াতকালে হঠাৎ আগুন ধরিয়া যায়। ইহার ফলে মুহূর্তের মধ্যে ঘরবাড়ি পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতে পারে।

আহাম্মক বিরানব্বই একে রেখো চিনে চিরদিন
যে ঋণ কইর‍্যা করে টিন।

ভাবার্থ : ঋণ করিয়া কখনও টিন কিনিয়া ঘর দিতে নাই। অবশেষে ঘরবাড়ি বিক্রি করিয়া ঋণ শোধ করিতে হয়।

আহাম্মক তিরানব্বই এর কথা বলাই নাহি যায়
যে প্রথম কথায় ঠেক দিবার চায়।

ভাবার্থ : একজনের কথা সম্পূর্ণ না শুনিয়া কখনও তাহার পূর্বে প্রতিবাদ করা উচিৎ না।

আহাম্মক চুরানব্বই এর কথা বলতে কমে বয়স
যে চারা খেজুর গাছ কাইট্যা খায় রস।

ভাবার্থ : অতি ছোট চারা গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করিলে অল্পদিনের ভিতরেই উহা দুর্বল হইয়া মরিয়া যায়।

আহাম্মক পঁচানব্বই এর কথা কেন ছাড়ি
যে বাড়ির পিছনে করে বাড়ি।

ভাবার্থ : বাড়ির পিছনে বাড়ি করিলে সেই বাড়ির সৌন্দর্য বিকাশ পায় না। এমন কি মুক্ত আলো বায়ু বিহনে সেই বাড়ির বাসিন্দাগণকে চিররোগী হইতে হয়।

আহাম্মক ছিয়ানব্বই এর কথা নাও ধরে
সে পাইকের খানার নিকটে বসত করে

ভাবার্থ : কর্মচারীর বাসস্থানের নিকটে বসত করিলে ভবিষ্যতে মান সম্মানের ক্ষতি হইতে পারে।

আহাম্মক সাতানব্বই এর কথা বলতে করে ভয়
যে যৌবনকালে করে না সঞ্চয়।

www.pathagar.com

ভাবার্থ : যৌবনকালে সঞ্চয় না করিলে বৃদ্ধকালে অশেষ কষ্টভোগ করিতে হয় বলিয়া যৌবনকালে সঞ্চয় করিয়া রাখিও ।

আহাম্মক আটানব্বই এর কথা কেন ছাড়ি
যে নিজের ঝি বিয়ে দিয়ে জামাই আনে বাড়ি ।

ভাবার্থ : নিজের মেয়ে বিবাহ দিয়া কখনও জামাই বাড়িতে আনিতে নাই । ইহাতে ভবিষ্যতে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

আহাম্মক নিরানব্বই এর কথা রেখো জাইনে
যে বাঙালি যানবাহনে গিন্নিকে বসায় ডাইনে ।

ভাবার্থ : বাঙালির স্ত্রীকে যানবাহনে বামে বসাইতে হয় । ডাইনে স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য মেয়ে লোককে লইতে হয় ।

আহাম্মক একশ এর কথা বলি সবার পাছ
যে শ্বশুরবাড়ি ভাত খায় বার মাস ।

ভাবার্থ : চিরদিন শ্বশুরবাড়ি ভাত খাইলে তাহার উন্নতি হয় না । অতএব নিজের খোরাকি খাইয়া উন্নতির চেষ্টা করা উচিত ।

আহাম্মক একশ এক
যে বুক পকেটে রাখে কলম ও মানিব্যাগ ।

ভাবার্থ : বুকপকেটে কলম ও মানিব্যাগ রাখিলে চোর, জুয়াচোর ও পকেটমার কর্তৃক অতিসহজেই উহা চুরি করিতে পারে ।

আহাম্মক একশ দুই
যে পরের চালে দেয় পুঁই ।

ভাবার্থ : অপরের ঘরের চালের উপরে পুঁই বা শাকের গাছ উঠাইয়া দিলে উহা সেই ঘরওয়ালা খাইলেও বুঝা যায় না ।

আহাম্মক একশ তিন
যে নিজের জমি না করে চিন ।

ভাবার্থ : নিজের জমির সীমানা নির্ধারিত না করিলে প্রবল দল সর্বদা সীমা ঠেলিয়া নিজের দিকে বাড়াইতে থাকে ।

আহাম্মক একশ চার
যে প্রমাণ ছাড়া করে বিচার ।

ভাবার্থ : উপযুক্ত প্রমাণাদির দ্বারা ন্যায্য বিচার না করিলে প্রতিবাদের মাধ্যমে পুনরায় জয়লাভ করার সম্ভাবনা থাকে ।

আহাম্মক একশ পাঁচ
যে অন্যের পুকুরে ছাড়ে মাছ ।

ভাবার্থ : অন্যের পুকুরে মাছ ছাড়িলে সেই পুকুরওয়ালার আত্মসাৎ করার সম্ভাবনা থাকে ।

www.pathagar.com

আহাম্মক একশ ছয়
যে ঘুষের টাকা বাকি থোয়।

ভাবার্থ : ঘুষের টাকা বাকি রাখিলে উহা আর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

আহাম্মক একশত সাত
যে বিয়ের আগে দেখেনা বাড়ি ঘর কুলজাত।

ভাবার্থ : বিবাহ দেওয়া ও করানোর আগে উভয়ের বাড়ি ঘর এবং সাত পুরুষ পর্যন্ত খবর লওয়া দরকার।

আহাম্মক একশ আট
যে বাড়ির সামনে বোনে পাট।

ভাবার্থ : বাড়ির সম্মুখে এমনকি বাড়ির সংলগ্ন জায়গাতে পাট বুনিতে নাই।

আহাম্মক একশ নয়
যে ভরবার জন্য জামিন হয়।

ভাবার্থ : ঋণ গ্রহিতা উহা শোধ করিতে না পারিলে জামিনদারকে ভরিয়া দিতে হয়।

আহাম্মক একশত দশ
যে বিয়ে করে সমান বয়স।

ভাবার্থ : বর ও কনের সমান বয়স হইলে স্বামীর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে। এমনকি শেষ বয়সে কেহ কাহারও সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারে না।

আহাম্মক একশ এগার এর কথা বলব কি
যে আবার বিয়ে করে শ্বশুরের ঝি।

ভাবার্থ : প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী বিয়োগে আবার তাহার সহোদরাকে বিবাহ করিলে নতুনত্ব কিছু উপভোগ করা যায় না।

গ. বকশীগঞ্জ উপজেলার প্রবাদ-প্রবচন

১.

কালা কাজলের মাটি
তার জন্য ছয়মাস হাঁটি।

২.

একে তো নাচনী বুড়ি
আরও শুনছে ঢুলের বাড়ি।

৩.

যে না চেহারা
নাম রাখছে পেয়ারা।

৪.

সই থাকলে হক মওলা
কী করবে সিরাজদৌলা?

www.pathagar.com

৫.

হইছি দেহি কাঙালের নারী
যাছি যামু বেয়াই বাড়ি।

৬.

যার কপালে যা
ঢেলি উঠে তা।

৭.

কেডা বলে কইছে
সেই কথার জো হইছে।

৮.

নেসতে মাগুর চেংগিনি
না নেসতে মাগুর চেংগিনি।

৯.

রূপ সুন্দরি চিতল দাঁতি
ভাতারেক ডাহে কাক্কা।

১০.

আগুন খাইলে আঙরা হাগে।

১১.

দারোগা কইছে চুদির ভাই
আনন্দের আর সীমা নাই।

১২.

দিয়া ধন বুঝে মন
কাইরে নিতে কতক্ষণ।

১৩.

যার মন যিনু
নাও ভাড়া দিয়ে যায় সিনু।

১৪.

অল্প পয়সা যার
কুকরা বাগুন তার।

১৫.

অমুকও একটা মানুষ
তেলচোরাও একটা পাখি।

www.pathagar.com

১৬.

অজালানি কল্লের বিচি
আজলাম আজলাম করে।

১৭.

পয়সা দিয়ে খামু দই
গোয়ালিনী কিসের সই।

১৮.

হাতে দই পাতে দই
তাও বলে কই কই?

১৯.

ভাত পাইনা বাহারি
জুতা চুদাইছে।

২০.

গাও গেরামে পাল দেহাও।

২১.

মরণের ওসুদ (ঔষধ) গলাত বানছে।

২২.

নরম মাটিতে বিলেই হাগে।

২৩.

ফেসকুলে দেওয়ানে।

২৪.

গরিব মানষের সুন্দরি বউ
সবাই ডাহে ভাবী।

২৫.

কাম নাই বুড়ি খেতা সিলেয়।

২৬.

বাঁশের চাইতে কঞ্চে বড়।

২৭.

সিয়েন ঘুঘুর ছাও
ফান্দে না দেও পাও।

২৮.

কথায় কথা ওডে
ছালুনে ভাত উডে।

www.pathagar.com

২৯.

হয় সুখি, না হয় পাখি।

৩০.

সোয়ামি মরছে কাল
আজকেই মাগির ফাল।

৩১.

পরের নাগি দর খুদলে
নিজের দরে নিজেই পড়ে।

৩২.

নাও ঘোড়া নারী
যার হাতে তারি।

৩৩.

যার বেটির বিয়ে
সে পায় না পান গুয়ে।

৩৪.

গায়ের দুধে বাছুরের ফাল।

৩৫.

যার যে বুজ
দাড়ি কেটে রাখে মুছ।

৩৬.

গুনারও পাইলাম কামার
দাও বানাইয়ে দেও আমার।

৩৭.

উচের কামাই সুঁচেই যায়।

৩৮.

যেমন গাছ তেমন বাতাস।

৩৯.

হব পোলা ডাকবো বাপ
তাই সেন যাবে মনের তাপ।

৪০.

কইনে ডরে মায়ে যদি মারে।

৪১.

নদীয়ে নদীয়ে দেখা হয়
বোনে বোনে দেখা হয় না।

www.pathagar.com

৪২. কইলে মা মার খায়, না কয়লে বাবা আইটে খায় ।
৪৩. আদিলকে গাছে লাউ ধরছে, তোলা বেগরে বুড়া হইছে ।
৪৪. যখন বলছ তিন ভাই তখন বুঝেছি মেজো ভাই ।
৪৫. এত জানে, অত জানে বেল বাতারের স্বামীর নাম জানে না ।
৪৬. রাক্ষুসের কথা বেশি, ধালিদ্দরের খাওয়া বেশি,
৪৭. সোলার ঢেঁকির বাজ বেশি, অকর্মার বাজনা বেশি ।
৪৮. যাকে দেখেনি তাই বড় সুন্দরি, যার হাতের খায়নি তাই বড় আনধুনি ।
৪৯. অর্ধেক পর অর্ধেক আপন, সেখানে বসবাস কর ।
৫০. নদীর হানা পাহেরঘরে খানা , সে দেশে বসত করা মানা ।
৫১. ভাত পায় না চা খায়, রিক্সা দিয়ে হাগতে যায় ।
৫২. কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি ।
৫৩. কাজের সময় দাদাকে কয়ও খাবার সময় আমাকে কয়ো ।
৫৪. নড়ে চরে বার , ঠাঁইয়ে বসে তের ।
৫৫. বুছিক ছেন পুছিইনা, খাট ছাড়া শুয় না ।
৫৬. নাপিতের গরু ধান খাইছে, জোয়ারের থেকে কাট গেছে ।
৫৭. গায়ের নাম বেন্টার তলি, মদ্দার চেয়ে মাগি ভলি ।
৫৮. বারানির বেটির খরম পাও ধরম ধরম ফেলায় পাও ।
৫৯. কালকে গেছে বিয়ের মানুষ, আজও আসে না ।
৬০. ঐযে দেখা যায় ছাতিয়ালা তিনজন মানুষ তাও না ।
৬১. বল বল আপনার বল ভাইয়ের বল পাছে ।
৬২. ঘরের ভাত থাকলে মাগির বলও আছে ।
৬৩. ব্যারের ধানও যেন উরায় না, পোলাপানও যেন মরে না ।
৬৪. পারে না মুরগি আছরে বেশি ।
৬৫. ঘরের বারান্দা বড় ।
৬৬. একটুখানি ঘি এক খামছা তোমায় দিলে থাকবে আমার কী ?
৬৭. যার মরণ জিনু, নাউ ভারা দিয়ে যায় সিনু ।
৬৮. হাউসের দাম নয়শত টাকা ।
৬৯. অল্প পয়সা যার কুঁকড়া বেগুন তার ।
৭০. পরের আশা করে যাই, নিতি উপাস পারে তাই ।
৭১. টাকায় করে কাম , মরদের হয় নাম ।
৭২. যে মোর চেহারা , নাম তার পেয়ারা ।
৭৩. পাবু হয়ে বোয়াল হতে চাও ?

তথ্যসূত্র : ৪২ থেকে ৭৩ পর্যন্ত প্রবচনগুলোর কথক রোকনুজ্জামান, পিতা : নজিবর রহমান, গ্রাম ও ডাকঘর : ঘাসির পাড়া, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর । তারিখ : মে : ২০১০

www.pathagar.com

ঘ. সরিষাবাড়ি উপজেলার প্রবাদ-প্রবচন

১. চোরের উপর বাটপাড়ি।
২. খুটের বারিয়ে খুট ডাবে না।
৩. ঋণ করে মঙ্গল সাধন হয় না।
৪. আশীর্বাদের দোয়া কবুল হয় না।
৫. স্বর্ণের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে আলু মাপা যায় না।
৬. বড় কষ্ট দিয়ে মাফ চাইলে মুক্তি পাওয়া যায় না।
৭. ভাল বাইস্যা বিয়ে করা এবং ঘর সংসার করা এবং বিয়ে করা ভিন্ন কথা; ঘর সংসার করা এবং মন পাওয়া ভিন্ন কথা।
৮. চোরের মায়ের বড় গলা।
৯. শ্যাঠাৎ নাই ছাল উইঠ্যা মারে ফাল।
১০. খাবার যাইতে মারবার যায়, সেলাম করতে চোখ পাকায়।
১১. বাপের মুখে দাড়ি নাই, পুলার মুখে চাপদাড়ি।
১২. বাপ দাদার নাম নাই, চান মুণ্ডলের বেয়াই।
১৩. আসল ঘরের ফসল নাই, ঢেঁকির ঘরে চান্দুয়া।
১৪. টাপ মাইর‍্যা টিপ করে, পুলা মাইর‍্যা খুন করে।
১৫. গরু মাইর‍্যা জুতা দান।
১৬. ছাল নাই কুইত্ত্যার বাঘা নাম।
১৭. বউ মাইর‍্যা ঝি শাসন।
১৮. ঠুসকার ঢেঁকির বাইজ বেশি অকর্মার কথা বেশি।
১৯. ধরি আমি চালের বাতা জুরি আমি দুঃখের কথা।
২০. হিল পাঠায়ে ঘষাঘষি মইচের মরণ।
২১. ডেলার দরদরি, পুনজেলে বয়ে খায়, নিকের খুচানিতে বউ নাইয়র যাবার চায়।

তথ্যসূত্র : ১ থেকে ২১ পর্যন্ত প্রবাদ-প্রবচনগুলোর কথক ছামিউল ইসলাম (রিপন), ভাটারা, সরিষাবাড়ি, জামালপুর, তারিখ : মার্চ, ২০১০

২২. হাইল্যা ছাড়া নাও,
মাতব্বর ছাড়া গাও।
পুরুষ ছাড়া বাড়ি,
যাইওনা হেই বাড়ি।
গেলে নাগাবো গলায় দড়ি।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত প্রবচনটি কথক মোকছেদ, বয়স : ৮৫, মাজালিয়া, সরিষাবাড়ি থেকে ২৩-২-২০১২ তারিখে সংগৃহীত

ঙ. মেলান্দহ উপজেলায় প্রবাদ-প্রবচন

১. ক্ষেত করবি সুন্দর মাইগ করবি জেন্দর (বিয়ের পাত্রী সন্ধানের জন্য মুরুব্বিদের উক্তি)।
২. নদীর পানি ঘোলাও ভালো, জাতের মেয়ে কালাও ভালো।

www.pathagar.com

৩. লাঠির বাড়ি কইন্যা না হয় কিছু , ফুলের বাড়ি কইন্যা মুছো মুছো ।
৪. তর গায়ের মণ্ডল আমার গাঁয়ে কি, আনছোস ঘোড়া বাতর দিয়েনি ।
৫. না খামু না খামু করে, দাই দিয়ে বাতার ধরে ।
৬. ছেড়ার বুদ্ধি গলায়, বুইড়ের বুদ্ধি তলায় ।
৭. যারে দেখি নাই সে যে কত সুন্দরি, যার হাতের খাই নাই সে কত রান্ধুনি ।
৮. আমি করি মাই মাই মায়ের চোখে পানি নাই ।
৯. মায়ের জন্যেও কান্দে, হুটকির টুকলাও বান্দে ।
১০. অভাগা যে দিকে যায় , সাগর শুকিয়ে যায় ।
১১. মানির মান পাহাড় সমান ।
১২. মানি তো মানি, না মানলে দুই পা দিয়ে ছানি ।

তথ্যসূত্র : আনোয়ার, টুপকারচর, মেলান্দহ । তারিখ : জুন, ২০১০

চ. দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার প্রবাদ-প্রবচন

১. মন মজলে খেলা
না মজলে একলা একলাই ভালা ।
২. আড়ে কইলে ঠারে বুঝে
ভাঙ্গি কইলে গাধায় বুঝে ।
৩. যার বিয়ে তার খবর নাই
পাড়া পড়শির ঘুম নাই ।
৪. যে গাই দুধ দেয়
তার নাত্তিও ভালা ।
৫. আমি যদি কই
গাঙ দিয়ে যায় মই ।
৬. নদীয়ে নদীয়ে দেখা হয়
বোনে বোনে দেখা হয় হয় না ।
৭. উঠ ছেরি তোর বিয়ে
কাপড়চোপড় দিয়ে ।
৮. কার মধ্যে কী পান্তা ভাতে ঘি ।
৯. দলা দিয়ে দলা খামু
সেই দলা ঘরতি পামু ।
১০. বাড়িত নাই ভাত
বন্দরে গাহেন ।
১১. ভাসুর হইসে বৈদ্য
বেজাগায় ঘাও ।
১২. আগের দিন নাইরে বুড়ি
চিনের চাল আঠারও কুড়ি ।
১৩. ঘেগিক তো কেই পুছেই না

www.pathagar.com

খাট ছাড়া শুতেই না।
১৪. বাড়ানি বোটি পদৎ পড়ছে
ধরি ধরি খাটত তুলছে।
১৫. সুখে মরি
কই লগাই দড়ি।
১৬. ছনের ঘরে টিনের বেড়া
সোয়ামির চাইতে দেওর সেরা।
১৭. ওরে আমার আবা জাবা
ওই মুহে বাতাসা খাবা।
১৮. পিরীতে মজলে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।
১৯. গাই বাছুরে মিল থাকলে
বন্দেও দুধ দেয়।
২০. রান্ধে মুরগি কই ডাল।
২১. কানা ঠসা ভেংগুর
তিন শেয়ালের এক নেংগুর।
২২. ছাল নাই কুত্তের বাঘা নাম।
২৩. ঘোড়া বেয়াদব।
২৪. তোলা দুধে পোলা বাঁচে না।
২৫. মা বনে ঝি
কান্দি করবি কি ?
২৬. একবাথানের গরু।
২৭. পায় না মুরগি আচড়ে বেশি
সেই মুরগির তেজ বেশি।
২৮. খ্যাম নাই মুরগির
তিন খাঁচা আণ্ডা।
২৯. অনেক মাছে বগলে কানা।
৩০. কালকে দেখলাম ঝুলি খেতা
আজকে তার ফুটানি কথা।
৩১. বাড়িত নাই ছিঁড়ে খেতা
সে বলে বাজারের নেতা।
৩২. ধারায় নাড়া টানে
পেন্দে চৌদ্দপিরি টানে।
৩৩. যার উঠে পেটের বিষ
তার থাকে না দুনিয়ার দিশ।
৩৪. অঙ্গে ধরছে ভাও
ভুতের বাড়ি যাও।
৩৫. সোনারের ঠক ঠকানি

www.pathagar.com

কামারের এক বারি।

৩৬. আমি যদি কই
গাঙ দিয়ে যায় মই।

৩৭. যাকে দেখমু খাটে পাটে
তাকে দেখমু জলের ঘাটে।

৩৮. শুতলে দুই ঠাং পতেনেই যায়।

৩৯. ধারানি শুধেনি
খেয়া ঘাটে বুঝে নি।

৪০. এতো নালি আদা সের না।

৪১. ভাই গেছে পাতা কাটবের
আমাক মাটিতে দেও।

৪২. টুপলা দেখলে টুপলি নাচে
ঐ বাড়ি দই চিড়ে আছে।

৪৩. দশে হারি ঘর
খোদাই রক্ষা কর।

৪৪ . উড়ি আইছে পানা
তাই হইছে গায়ের আনা।

৪৫. উল্টে কাঁচি ঘাড় কাটে
নিবের না পাইয়ে ভার বান্ধে।

৪৬. জ্ঞানের নারি টনটনা।

৪৭. যদি চলে মনিহারি
পায় না সাথে জমিদারি।

৪৮. মারা গুয়া হাইকোর্ট
করলেও ফিরে না।

৪৯. মামাগরে ক্ষেতের ধান
পাঞ্জায় পাঞ্জায় আন।

৫০. জাত গোষ্ঠী জোলা
আগা ঠ্যাং তোলা।

৫১. আগের হাল যিবে যায়
পিছের হালও সিবে যায়।

৫২. সোনার আংটি বেকাও ভালা।

৫৩. হাঁড়িত থাকলে তো ভইয়ে উঠবো ?

৫৪. দিন যায় আলে ঝালে
রাইত হইলে কাপাস।

৫৫. ভাত খায় ভাতারের
গাহেন গায় নাংগের।

৫৬. মিলে মিলে পানি সান্দায় না।

www.pathagar.com

৫৭. চাড়ি চুড়ি যতই করো
আনাচ পাবে না।
৫৮. পাখির মধ্যে পায়রা
ভায়ের মধ্যে ভায়রা।
৫৯. ভাতে মরদ
ঘাসে বলদ ।
৬০. খ্যাম নাই মুরগির
তিন খাঁচা আণ্ডা।
৬১. কানার মনে মনে জানা।
৬২. মুখে মিল বুকে কিল।
৬৩. চাল মাথায় নিয়ে ভিটে তালাশ করে।
৬৪. জাত কি কচু পাতার পানি
নাড়া দিলেই ঝরে পড়বে ?
৬৫. উপরে ফিটফাট
ভিতরে সদর ঘাট।
৬৬. পিছে গেলে সয়
সামনে গেলে সয়না।
৬৭. খর নদীর চর পড়ে।
৬৮. বেরায় ক্ষেত খায়।
৬৯. আগলা খায়
দুমরি বেড়ায়।
৭০. কুত্তের এক মাস
মানষের বারমাস।
৭১. নয়া নয়া দিন চারি
পুরান হইলে ঝাটার বারি।
৭২. সখের তোলা আশি টাকা।
৭৩. সস্তা কলায় চিরা নষ্ট হয়।
৭৪. বিপদে পড়লে চাম চিকাও নাত্তি মারে ।
৭৫. শুরু ভাল যার
শেষ ভালো তার।
৭৬. ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায় ।
৭৭. সাদা দেখলে দুধ না ।
৭৮. খাবার আগে মারের পিছে।
৭৯. মক্কায় বেশি যাইতে নাই
কিসমতের বেশি খাইতে নাই।
৮০. ধারেও কাটে , ভারেও কাটে।
৮১. আসল ঘরের খবর নাই ।

www.pathagar.com

ঢেঁকির ঘরের চান্দোয়া।

৮২. চাম নাই কুত্তের বাঘা নাম
তলা অতি লক্ষ্মী নাম।

ছ. মাদারগঞ্জ উপজেলার প্রবাদ-প্রবচন

১.

খাবার জানলে চাউলই চিঁড়ে
বসতে জানলে মাটিই পিঁড়ে।

২.

কেটকেটাইনে স্বামীর চেয়ে বিধবেই (বিধবা) ভালা
ঘরে-বাইরে বিবাদ করি সিও এক জ্বালা।
কষা পায়ের জুতার চেয়ে খালি পা-ই ভালা
ঘায়েপুঞ্জে পোলার চেয়ে বাঞ্জাই (বাঁধা নারী) ভালা।
কথক : সাজেদা খাতুন

৩.

নদীর চক্কর, ঘোড়ার টক্কর
নারীর মক্কর, বোঝা বড় দায়।
কথক : হযরত আলী

৪.

ষোলো চাষে মূলো, তার অর্ধেক তুলো
চার চাষে ধান, বিনা চাষে পান।
কথক : হযরত আলী

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

জামালপুরের স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে লোকসংস্কারের শুভ-অশুভ ধারণা প্রবল। শুভ-অশুভ সম্পর্কীত ধারণার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।

১. মাথার উপর কাক ডাকলে অমঙ্গলের আশংকা করা হয়।
২. রাতে পেঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়।
৩. ঘর ঝাড়ু না দিয়ে কোনো কাজ করা হয় না। এতে অমঙ্গল হতে পারে।
৪. পানের বোটা কুটিকুটি করে ভাঙলে বা কাটলে শত্রু বাড়ে।
৫. মাথা বা গালে ঠেস দেওয়া ভালো নয়।
৬. সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার পর টাকা-পয়সা ঘর থেকে দেওয়া ভালো নয়।
৭. রাতে এঁটো পানি বাইরে ফেলে দেওয়া হয় না।
৮. টিকটিকির টিকটিক করাকে সঠিক বলে মনে করা হয়।
৯. রাতে গাছের পাতা ফুল ফল ছেঁড়া বা গাছ কাটা নিষিদ্ধ।
১০. দাঁড়িয়ে পানি পান করা দোষের।
১১. বউদের স্বামী শ্বশুর এবং ভাসুরের নাম নেওয়া দোষের।
১২. দুধ ও আনারস একসঙ্গে খাওয়া ভালো নয়।
১৩. হাতির সামনে পড়লে হাতিকে মামা ডাকলে হাতি কোনো ক্ষতি করে না।
১৪. যাত্রাকালে পিছু ডাকে না।
১৫. যাত্রাকালে ডিম খায় না।
১৬. আঙ্গুল থেকে আঙ্গুলে চুন নিলে ঝগড়া হয়।
১৭. একদেশলাই কাঠিতে তিনটি বিড়ি বা সিগারেট ধরানো ভালো নয়।
১৮. ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসে এবং বাম হাতের তালু চুলকালে টাকা চলে যায়।
১৯. বাম চোখ নাচলে অমঙ্গল হয়।
২০. খাওয়ার পর পরনের কাপড়ে হাত মুখ মুছলে গরিব হয়ে যায়।
২১. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা অমঙ্গলের লক্ষণ।
২২. গামছা সেলাই করে ব্যবহার করা নিষেধ।
২৩. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় কিছু খাওয়া যায় না। এত ক্ষতি হয়, বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা কিছু খেলে ঠোঁট কাটা সন্তান প্রসব করার সম্ভাবনা।
২৪. মেয়েদের আঙ্গুল ফুটানো নিষেধ।
২৫. রাত্রে নখ কাটা ভালো নয়।
২৬. পাল্লা-হাঁড়ি-কুলা-চালুন প্রভৃতিতে পা লাগা ভালো নয়। পা লাগলে সালাম করতে হয়।
২৭. স্বামী বাজারে যাবার সময় কলা আনতে বলা নিষেধ। তাতে স্বামীর অমঙ্গল হয়।

www.pathagar.com

২৮. রাতের বেলা সাপকে পোকা বলতে হয়।
২৯. যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হয় বলে বিশ্বাস।
৩০. বিবাহিত মেয়ের চুলের খোঁপা খোলা রাখলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
৩১. ভাঙা প্লেটে খেলে আয়ু কমে যায়।
৩২. যাত্রাকালে হাঁচি এলে কিছুক্ষণ বসে যাত্রা করতে হয়।
৩৩. যাত্রাকালে আট কুড়ার মুখ দর্শনে যাত্রা শুভ নয়।
৩৪. যাত্রাকালে ডানে শেয়াল দেখলে অশুভ সংকেত এবং বামে দেখলে যাত্রা শুভ হয়।
৩৫. সাদ (শুক্র) শুভক্ষণ না করে বাকি দেওয়া নিষেধ।
৩৬. যাত্রাকালে ভরা কলস দেখলে শুভ এবং খালি করস দেখা অশুভ লক্ষণ।
৩৭. কোনো কিছু দেখে ভয় পেলেও লোহা পুড়ে পানি পান করা হয়।
৩৮. ভাঙা কুলার বাতাস লাগা অশুভ।
৩৯. মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখা অশুভ।
৪০. রাতে নিজের ছায়ার দিকে তাকানো অমঙ্গল।
৪১. পান ভাগ করে খেলে ঝগড়া হয়।
৪২. কাউকে কুপির আগুন দিলে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়।
৪৩. বিড়াল নিজের পা চাটতে থাকলে ঘরে মেহমান আসবে বলে ধারণা করা হয়।
৪৪. চাল ভাজা খাওয়া গরিবের লক্ষণ।
৪৫. এক নাগাড়ে কুকুর ডাকলে অমঙ্গলের আশংকা করা হয়।
৪৬. কুকুর ঘাস খাইলে দেশে অভাব হবে বলে লোকে বিশ্বাস করে।
৪৭. ঘর ঝাড়ু না দিয়ে টাকা-পয়সা লেনদের করা নিষেধ।
৪৮. রাত্রিকালে তেলাপোকা উড়লে অমঙ্গল হবে বলে মনে করা হয়।
৪৯. রাত্রিকালে আয়নায় চেহারা দেখা হয় না।
৫০. রাত্রিবেলা ঘর ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলতে নেই। এতে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়।
৫১. ভিক্ষুককে থুলির মধ্যে ভিক্ষার চাল দেওয়া দোষের।
৫২. হাট বাজারে যাওয়ার সময় হলুদ, চুন বা সুইয়ের কথা বলা অশুভ। বলতে হয় হলুদকে রং, চুনকে পান খাওনি এবং সুইকে সোনালি।
৫৩. ভিক্ষুককে ভাত খাইয়ে একই সঙ্গে টাকা-পয়সা দেওয়া ভালো নয়।

বিয়ে-শাদিতে বৃষ্টি অশুভ বলে মনে করা হয়। এছাড়াও কখনো কখনো যাত্রা মঙ্গলজনক নয়। রোরবার ঘর লেপামুছা ভালো নয়। রোববার বা মঙ্গলবার চুল বা দাড়ি কাটা মঙ্গলজনক নয়। শুক্রবার এবং রোববার পশ্চিম এবং মঙ্গল ও বুধবার উত্তর দিকে যাত্রা করা অশুভ। শনি ও মঙ্গলবারে কোনো শুভ কাজ হয় না।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

মানুষ আদিকাল থেকেই নিজের প্রয়োজনে জ্ঞান ও বুদ্ধি খাটিয়ে কল্পনাশক্তির সাহায্য নিয়ে এমন কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে যাকে লোকপ্রযুক্তি বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ঢেঁকি, লাঙল, হেঁসেল, কাস্তে, দা-বটি, ঘানি, চাঁই, পলো, বাইর, ছর্তা বা জাঁতি, খনতি, জোয়াল, বাটালি, মই, কুড়াল, হাতুড়ি, ছাইদানি, কোদাল, পাসুন, হুঁকা ইত্যাদির নাম বলা যায়। নিম্নে জামালপুর অঞ্চলের বহুল প্রচলিত কয়েকটি লোকপ্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

১. ঢেঁকি

প্রধানত ধানের তুষ ছাড়িয়ে চাল তৈরি করার কাঠের কল বিশেষ। জামালপুর অঞ্চলে চাল ও গমের আটা তৈরিতেও এর ব্যবহার ব্যাপক। দেশে অধুনা অনেক ধানবানা যন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় চালের কল রয়েছে। কিন্তু কৃষক সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যসহ যথেষ্ট সংখ্যক ঢেঁকি এখনও বিদ্যমান।

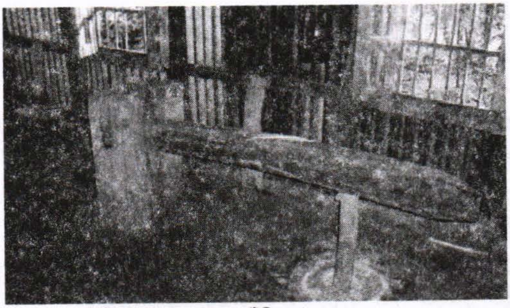

ঢেঁকি

সাধারণত ঢেঁকিতে প্রায় ছয় ফুট লম্বা এবং ছয় ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি কাঠের ধর থাকে। মেঝে থেকে প্রায় আঠারো ইঞ্চি উচ্চতায় ধড় ও দুটি খুঁটির ভিতর দিয়ে একটি ছোট হুড়কা বা বল্টু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই হুড়কার উপরেই ধড়টি ওঠানামা করেন। ধড়ের এক মাথার নিচের দিকে সিলিন্ডার আকারের প্রায় ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এক টুকরো কাঠ যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই কাঠখণ্ডের নিম্নপ্রান্ত একটি লোহার বলয় দিয়ে পরিবৃত করা হয়। এটি মুষলের কাজ করে থাকে। ধড় এটিকে উপরে তোলে, নিজের ওজনে একটি নিচে পতিত হয়। হুড়কা তার শক্তি বৃদ্ধি করে। মুষল থেকে ধড়ের মোট দৈর্ঘ্যের পাঁচ অষ্টমাংশ দূরত্বে স্থাপিত হুড়কা উপস্তম্ভের কাজ করে থাকে। সাধারণত ২-৩ জন মহিলা এই যন্ত্রে কাজ করেন। ১-২ জন মুষল উত্তোলনের জন্য ধড়ের এক প্রান্ত পা দিয়ে পালাক্রমে চাপ দিয়ে থাকেন এবং পা

www.pathagar.com

সরিয়ে নিয়ে মুষলকে নিচে পড়তে দেন। অপর মহিলা বৃত্তাকার খোঁড়ল থেকে চূর্ণীকৃত শস্য সরিয়ে নেন এবং তাতে নতুন শস্য সরবরাহ করেন। মুষলে আঘাত ধারণ করার জন্য খোঁড়লটি কাটা হয় মাটিতে বসানো এক টুকরা শক্ত কাঠের গুঁড়িতে। ঢেঁকিতে পা দেওয়ার কাজ খুবই শ্রমসাপেক্ষ। কাজটিতে মহিলাগণ একে অপরের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু কোন কোন সময় একজন মহিলা সম্পূর্ণ কাজটি একাই করে থাকেন। একাজে তিনি লম্বা হাতলের মাথায় নারিকেলের মালা (খোল) বেঁধে তৈরি করা চালুনির সাহায্যে খোঁড়লে শস্যদানা ভরা ও বের করার কাজ করেন। পরিশ্রম লাঘব করার জন্য এই কাজে নিয়োজিত মহিলাগণ কোন কোন সময় গান বা গীত গেয়ে থাকেন।

২. ঘানি

সরিষা, তিল এবং পাকা নারকেলের শাঁস থেকে পিষে তেল বের করে আনার এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় লোকপ্রযুক্তি। ঘানির উপরিভাগে রয়েছে বালতি সদৃশ ধারণপাত্রসহ কাঠের একটি কাঠামো। তেল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল অল্প পরিমাণে এই ধারণপাত্রের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়। ঘানিতে ঢেলে দেওয়ার পর তা পেষানো হলে তা থেকে ধারাক্রমে একটি গ্রহণকারী অংশে তেল গড়িয়ে পড়ে। ঘানি ঘোরানোর জন্য যান্ত্রিক মোটরের পরিবর্তে পশুশক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঘানি

এই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক হচ্ছে ঘোড়া ও বলদের ব্যবহার। ঘানি ঘুরানোর জন্য একটি মাত্র পশু ব্যবহার করা হয়। পশুটির চোখের পাশে বাঁশের পাতলা বাতার তৈরি দুটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধক জুড়ে দেওয়া হয়। পশুটিকে বৃত্তাকার পথে শুধু সামনের দিকে চলমান রাখার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ঘানি থেকে ধাতুনির্মিত একটি নির্গম পথ বেয়ে গেল বেরিয়ে আসে এবং নিচে রক্ষিত একটি ধারণপাত্রে পতিত হয়। ঘানির অন্য একটি ভিন্নপথে বেরিয়ে আসা খৈল চওড়া মুখবিশিষ্ট একটি পাত্রে সংগ্রহ করা হয়। তেল সম্পূর্ণ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত খৈল

www.pathagar.com

বারবার পেষা হয়ে থাকে। এই পেশায় নিয়োজিত লোকদের কলু নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

৩. চাঁই, পলো, বাইর

জামালপুরের গ্রামাঞ্চলে নদী-নালায় মাছ ধরার জন্য চাই, পলো বা বাইর ব্যবহার হয়। এটি মাপ মতো বাঁশ কেটে ফালি করে দা দিয়ে শলা প্রস্তুত করা হয়। তারপর শলাকে ক্রমান্বয়ে শক্ত সুতা দিয়ে বেঁধে চালি গাঁথা হয়। নিচে একমুখী দরজা রাখা হয়। দরজা এমনভাবে তৈরি করা হয়– এর ভিতরে মাছ ঢুকলে আর বের হতে পারে না।

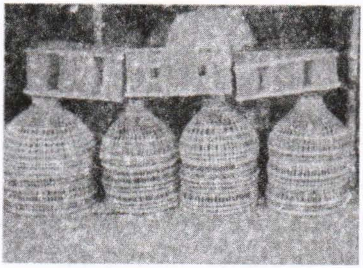

চাঁই, পলো, বাইর

একেকটা চাঁই ২০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। বাবুই পাখির মতো চাঁইয়ের প্রবেশ মুখের ধরন। প্রতিটি বাঁশে কয়েকটি চাঁই তৈরি করা যায়।

৪. হুঁকা

হুঁকা বলতে বোঝায় ধূমপানের বিশেষ কৌশল বা তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্র। জামালপুরে এ যন্ত্রটির ব্যবহার এখনও বিদ্যমান। হুঁকা অনেক রকম হয়ে থাকে। দরিদ্ররা সহজ পদ্ধতিতে হুঁকা ব্যবহার করেন।

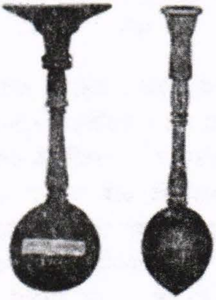

হুঁকা

www.pathagar.com

এটি নারকেলের খোল বা মাটির পাত্র দিয়ে তৈরি করা হয়। তাতে একটি ছিদ্র থাকে। এর সঙ্গে বাঁশের বা কাঠের নল সংযুক্ত করা হয় এবং ছিলিম নামের একটি ছোট পাত্র নলের মাথায় জুড়ে দেওয়া হয়। ছিলিমকে কল্কিও বলে। অধুনা উচ্চবিত্তরা হুঁকার পরিবর্তে চরুট ও সিগারেট খাচ্ছে আর নিম্নবিত্তরা বিড়ি খাচ্ছে। তবুও গ্রামাঞ্চলে এখনও হুঁকা ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫. লাঙল

বীজ বপন অথবা চারা রোপণের জন্য জমির মাটি তৈরি করবার ক্ষেত্রে লাঙল ব্যবহার হয়। কৃষকের এ যন্ত্রটি সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। জামালপুরে এটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

লাঙল

লাঙল দিয়ে হাল চাষ করতে কমপক্ষে একজন লোক ও একজোড়া গুরু অথবা মহিষ প্রয়োজন হয়। একটি লাঙলের কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন– হাতের মুঠো, হাতল, প্রধান দণ্ড, ফলা, কীলক ইত্যাদি। লাঙল তৈরির জন্য শক্ত কাঠ ও লৌহ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত কাঁঠাল, সেগুন, জাম, পিতরাজ, গজারি, ইত্যাদি গাছের কাঠ থেকে লাঙল তৈরি করা হয়। গ্রামে-গঞ্জে ছুতাররা লাঙল তৈরি করে থাকেন।

৬. জাঁতি, যাঁতি বা ছরতা

সুপারি কাটার এক প্রকার সরল যন্ত্র। এটি এক ধরনের লোকপ্রযুক্তি। এলাকাভেদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। জামালপুরে এটি ছরতা বা যাঁতি নামে পরিচিত। কখন কিভাবে এটা আবিষ্কার করা হয় তা জানা যায়নি। সুপারি কাটার প্রয়োজনেই জাঁতি বা ছরতা নির্মিত হয়েছে। বলে ধারণা করা হয়।

এই প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবী কামার। এর উপকরণ লোহা ও লোহা পোড়ানের হাপরের তৈরি কয়লার আগুন এবং গরম লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে ছরতার আকৃতি দানের জন্য প্রয়োজন হয় হাতুড়ি, চিমটা প্রভৃতি লোকযন্ত্র।

www.pathagar.com

ছরতা তৈরির জন্য সামান্য পরিমাণ চিকন লোহাকে কিছুটা চ্যাপ্টা করে দুটি শলাকা একটি পাত তৈরি করতে হয়। পাতটি পুড়িয়ে পিটিয়ে মাঝকানে বাঁকিয়ে এমনভাবে অর্ধবৃত্তাকার করা হয় যে, যাতে মাঝখানে ফাঁক দিয়ে চ্যাপটানো ধারালো পাত প্রবেশ করানো হয়। এ অবস্থায় অর্ধবৃত্তাকার পাতটির নিচের দুটি পৃথক প্রান্ত একটি শলাকার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই শলাকাটি মূলত ধারালো পাতের নিচে থাকে।

ধারালো ও চ্যাপটানো পাতটি অপর একটি শলাকার অগ্রভাগে যুক্ত করা হয়। ধারযুক্ত চ্যাপটানো পাত অর্ধবৃত্তাকার দুটি পাতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিচের শলাকার অগ্রভাগের অংশের সঙ্গে পেরেকের সাহায্যে আটকালে ছরতার কাঠামো দাঁড়ায়। নিচের শলাকা ও উপরের ধারালো পাতের মাঝখানে সুপারি রেখে শলাকা দুটির পেছন ভাগে চাপ দিলে সুপারি কেটে টুকরো করা হয়।

তথ্যসূত্র : ১. শাহ্ মোহাম্মদ আহসানুল কবীর, শিক্ষার্থী, রসায়ন বিভাগ, পানাউল্লাহ্ আহাম্মদ মুসলিম ছাত্রাবাস, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর

২. বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ সংকলিত ও সম্পাদিত *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান* বাংলা একাডেমির অভিধান প্রকাশনার ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বর্তমান অভিধানটিতে প্রায় আট হাজার সাতশত ভুক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে আরবি চার হাজার, ফারসি চার হাজার পাঁচশত এবং উর্দু ভাষার ভুক্তি শতাধিক। প্রতিটি ভুক্তিতে শীর্ষশব্দটি কোন ভাষার সেটি সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে। যেমন আরবি বুঝাতে 'আ', ফারসি বুঝাতে 'ফা' এবং উর্দু বুঝাতে 'উ' ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দগুলো বিন্যস্ত হয়েছে বাংলা বর্ণানুক্রমিকভাবে।

শীর্ষশব্দ বা ভুক্তির বানান, অর্থ, পদনাম, লিঙ্গ ও বচন বাংলা লিপিতে এবং মূল শব্দের উচ্চারণ ও বানান আরবি লিপিতে লিখিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে শীর্ষ শব্দের প্রয়োগরীতি দেখানো হয়েছে।

অভিধানটির প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সংকলিত শব্দাবলি মূল ভাষার বাংলায় রূপান্তরিত শব্দ।

বাংলা ভাষায় প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অভিধানটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।